প্রচ্ছদপটের চিত্রটি
মথুরারীতির ভাস্কর্যের সুপরিচিত নিদর্শন
শুকস্কন্ধা যক্ষিণীমূর্তির অনুসরণে
শ্রীশঙ্খ চৌধুরী কর্তৃক অঙ্কিত

সাহিত্য অকাদেমী ॥ ১৯৫৮

প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

নিবেদন

'আত্মকথা' প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে। বহু বন্ধুর আগ্রহ, অনুরোধ ও শুভেচ্ছার ফলেই ইহা হইতে পারিল। গোড়ায় ইহা 'বিশাল ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল। যদি উক্ত পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীমোহনসিংহ সেঙ্গার বারবার তাগিদ দিয়া না লেখাইয়া লইতেন তাহা হইলে ইহা লেখাই হইত না। ভাবিয়াছিলাম যে লেখা শেষ হইলে ইহা লইয়া এক বিস্তারিত আলোচনা চালানো যাইবে। সময়াভাবে তাহা হইতে পারিল না। সহৃদয় পাঠকদের উপর এই কাজের ভার অর্পণ করা হইল। এক বিশেষ অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথের এক কবিতার অন্তর্গত ভাব ইহাতে এক জায়গায় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে অভিপ্রায় তো সিদ্ধ হইল না, কিন্তু জোড় দেওয়া অংশ যেমনকার তেমনই থাকিয়া গেল। বাণভট্ট ও শ্রীহর্ষদেবের গ্রন্থ 'কথা'র প্রধান অবলম্বন হইয়া আছে। তাঁহাদের নিকট কি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব?

হিন্দী ভবন
শান্তিনিকেতন
২৯. ১১. ৪৬

হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী

প্রথম উচ্ছ্বাস

জয়ন্তি বাণাসুরমৌলিলালিতা
দশাস্যচূড়ামণিচক্রচুম্বিনঃ।
সুরাসুরাধীশশিখান্তশায়িনো
ভবচ্ছিদস্ত্র্যম্বকপাদপাংসবঃ ॥[1]

যদিও বাণভট্ট নামেই আমার পরিচয়, কিন্তু ইহা আমার বাস্তবিক নাম নয়। এই নামের ইতিহাস যদি লোক না জানিত তাহা হইলে ভাল হইত। আমি চেষ্টা করিয়া লোককে ইহার ইতিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞ রাখিতে চাহিয়াছি; কিন্তু নানা কারণে এখনও ঐ ইতিহাস আর বেশি লুকাইতে পারি নাই। আমার লজ্জার প্রধান কারণ এই যে, যে প্রসিদ্ধ বাৎস্যায়ন বংশে আমার জন্ম তাহার ধবল কীর্তিপটে এই কাহিনী কলঙ্কস্বরূপ। আমার পিতৃপিতামহের গৃহ বেদাধ্যায়ীদের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। তাঁহাদের ঘরের শুকসারিকারা বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিত। যদিও লোকের কাছে এ কথা অতিশয়োক্তি মনে হইবে তথাপি এ কথা সত্য যে, আমার পূর্বপুরুষের ছাত্রেরা তাঁহাদের শুকসারিকা দেখিয়া ভয় পাইত। তাহারা পদে পদে ছাত্রদের অশুদ্ধ পাঠ সংশোধন করিয়া দিত।[2] আমাদের পূর্বপুরুষের গৃহ যজ্ঞধূমে নিরন্তর পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু এই সমস্ত আমার শোনা কথা। আমার পিতা চিত্রভানু ভট্টকে আমি নিজে দেখিয়াছি। যদি বলি যে, সরস্বতী নিজে আসিয়া তাঁহার পাণিপল্লবে আমার পিতৃদেবের হোমকালীন শ্রমস্বেদবিন্দু মুছিয়া দিতেন, তাহা হইলে ইহার মধ্যে কোন অত্যুক্তি হইত না। কারণ ঊষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যোদয়ের দুই মুহূর্ত পর্যন্ত নিরন্তর হবন করিবার পর যখন পিতৃদেব পরিশ্রমে এবং ঘর্মে আকুল হইয়া উঠিতেন, তখন তিনি সোজাসুজি অধ্যাপনের কুশাসনের উপর গিয়া বসিতেন। তাহাই ছিল তাঁহার বিশ্রাম। এই সময় বিদ্যার্থীদের বিদ্যাভ্যাস করাইতে করাইতে তাঁহার শ্রমবিন্দু শুকাইয়া যাইত।[3] ইহাকে যদি সরস্বতী মুছাইয়া দিয়াছেন না বলি তবে কি বলিব? এমন কৃতী পিতার আমি পুত্র ছিলাম। জন্ম হইতে লক্ষ্যহীন, গল্পপ্রিয়, অস্থিরচিত্ত ও নিদ্রালু। আমি যখন ঘর হইতে পলাইয়াছিলাম, তখন নিজের সঙ্গে গ্রামের অনেক কিশোরকেও গাঁথিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাহারা শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকিল না। তাহা হইলেও গ্রামে আমার বদনাম তো থাকিয়াই গেল। মগধের ভাষায় লেজকাটা বলদকে

---

[1] তুঃ কাদম্বরী, কথামুখ ২।
[2] তুঃ কাদম্বরী, কথামুখ ১২।
[3] তুঃ কাদম্বরী, ১৯; হর্ষচরিত, ২য় উচ্ছ্বাস।

বলে 'বণ্ড'। সে দেশে ইহা প্রবাদের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে যে 'বণ্ড নিজে নিজে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নয় হাতের দড়িটাও লইয়া গিয়াছে'। তাই লোকে আমাকে বণ্ড বলিতে লাগিল। তাহার পরে সংস্কৃত শব্দ 'বাণ' দিয়া সংস্কার করিয়া আমি এই নামের মান কিছুটা বাড়াইয়াছি। 'ভট্ট' কথাটা তো লোকে আরও কিছু পরে জুড়িয়া দিয়াছিল। না হইলে আমার আসল নাম ছিল দক্ষ। এদিকে আমার প্রতি লোকের আদর ও স্নেহের ভাব বাড়িয়া গেল, তাহারা পারিলে দক্ষ ভট্ট করিয়া লইত। অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে আমি অন্যত্র এই নাম বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, সে কাহিনী এখন বলিব।

আমার পিতারা ছিলেন এগারো ভাই। তার মধ্যে আমি সকলকে দেখি নাই। আমার একজন খুড়তুতো ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম উড়ুপতি। বয়সে তিনি আমার বড় ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারে ছিলেন আমার সমবয়সীর মত। তিনি ছিলেন সে যুগের প্রসিদ্ধ তার্কিক। সেই উড়ুপতিই বসুভূতিনামক বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনের উপর তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল, এবং তিনি হঠাৎ বৈদিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া গেলেন। উড়ুপতি ভট্ট আমাকে যতটা স্নেহ করিতেন, আমাদের পরিবারের অন্য কেহ সেইরূপ করিতেন না।[৩] তিনি আমাকে অনেক দুষ্কর্ম হইতে বাঁচাইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার আলোচনা যথাস্থানে করিব। এখানে এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, চৌদ্দ বৎসরে যখন আমার পিতা ছিলেন না—মা তো অনেকদিন পূর্বেই আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছিলেন[৪]—তখন এই উড়ুপতি ভট্টই মায়ের মত স্নেহরসে আমাকে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাহিনী আমি আমার দুর্ভাগ্যের ক্রন্দন দিয়া আরম্ভ করিব না, নিজের সৌভাগ্যের উদয়ের কথা দিয়াই আরম্ভ করিব। মধ্যে মধ্যে যদি দুর্ভাগ্যের কথা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে পাঠক আমায় ক্ষমা করিবেন।

ভবঘুরে তো আমি ছিলামই। এক নগর হইতে অন্য নগর, এক জনপদ হইতে অন্য জনপদ, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ঘোরা অবস্থায় কোন কার্যই না করিয়াছি! কখনও নট বনিয়াছি, কখনও পুতুলনাচ দেখাইয়াছি, নাট্যমণ্ডলী সংঘটিত করিয়া কখনও পুরাণ-কথক জনপদকে প্রবঞ্চনা করিয়া ফিরিয়াছি। মোট কথা কোন কাজ ছাড়ি নাই। ভগবান আমাকে সুরূপ দিয়াছিলেন। কথা বলার অল্পবিস্তর পটুতাও দিয়াছিলেন। আর কি চাই, আমার কৈশোর ও যৌবনে এই দুই-ই আমাকে সাহায্য করিয়াছিল।

[৩] হর্ষচরিতে বাণের এক পিতৃব্যপুত্রের নাম তারাপতি। সম্ভবতঃ ইনিই উড়ুপতি।

[৪] তুঃ হর্ষচরিত, ১ম উচ্ছ্বাস।

যদিও লোক আমার বহুবিধ কার্যকলাপ দেখিয়া আমাকে 'ভুজঙ্গ' বলিয়া মনে করিতে লাগিল; কিন্তু আমি কদাচ লম্পট স্বভাবের ছিলাম না। ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একবার স্থাণ্বীশ্বর নগরে পৌঁছিয়া গেলাম। সে দিন আমার সৌভাগ্যের দিন বলিয়া মনে করি।

যখন আমি নগরে পৌঁছিলাম তখন খুব ধুমধাম দেখিতে পাইলাম। কূর্মপৃষ্ঠের সমান সুপ্রশস্ত রাজপথে খুব বড় এক শোভাযাত্রা যাইতেছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল অধিক। রাজবধূরা বহুমূল্য শিবিকার উপর আরূঢ় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে সব পরিচারিকা পদব্রজে যাইতেছিল তাহাদের চরণবিঘট্টনে জাত নূপুর ক্বণনে দিগন্ত শব্দায়মান হইতেছিল। সবেগে ভুজলতার উত্তোলনকালে মণিময় চুড়িগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এই জন্য বাহুলতাও ঝঙ্কার করিতেছিল। তাহাদের ঊর্ধ্বোত্থিত হস্ততল দেখিয়া মনে হইতেছিল, বুঝি আকাশগঙ্গায় প্রস্ফুটিত কমলিনী বায়ুবেগে বিলোলিত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। লোকসংঘর্ষে তাহাদের কর্ণপল্লব খসিয়া আসিতেছিল। একের দেহের সঙ্গে অন্যের ধাক্কা লাগিতেছিল। এই জন্য একজনের কেয়ূর অন্যজনের উত্তরীয়ে লাগিয়া অন্য জনের তাল ভঙ্গ করিতেছিল। ঘর্মবারিতে সিক্ত হইয়া অঙ্গরাগ তাহাদের চীনাংশুককে অনুরঞ্জিত করিতেছিল। একদল নর্তকী যাইতেছিল। তাহাদের সহাস্য বদনমণ্ডল দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, যেন প্রস্ফুটিত কুমুদের বন যাইতেছে। তাহাদের চঞ্চল হার-লতা সজোরে নড়িয়া তাহাদের বক্ষোভাগে পড়িতেছিল, উন্মুক্ত কেশরাশি সিন্দুরবিন্দুতে আটকাইয়া যাইতেছিল। রঙ ও আবীর অনবরত উড়িতেছিল বলিয়া তাহাদের কেশ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদেব মনোরম গীতধ্বনিতে সমস্ত রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি নগরের এক চতুষ্পথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একা মুগ্ধভাবে এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌতুককর অংশ ইহাই ছিল যে, রাজপুরের অধিবাসী বামন, কুব্জ, নপুংসক ও মূর্খেরা উদ্ধত নৃত্যে বিহ্বল হইয়া দৌড়াইতেছিল। এক বৃদ্ধ কঞ্চুকীর দশা বড়ই করুণ হইয়া উঠিল। তাহার গলায় এক নৃত্যশীলা রমণীর উত্তরীয় আটকাইয়া গিয়া তাহার অঙ্গের আকর্ষণে বেচারা বৃদ্ধ উপহাসাস্পদ হইয়া গেল। রাজকন্যাদের স্থান ছিল শোভাযাত্রার ঠিক মধ্যভাগে। সেখানকার গীত ও নৃত্য ছিল সংযত, গম্ভীর, মনোহারী। এক দিকে ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, কাহল ও শঙ্খের নিনাদে ধরিত্রী বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, অন্য দিকে রাজকন্যাদের গণ্ডস্থলীতে আন্দোলিত মণিময় কুণ্ডল ও পদ্মপত্রের মধ্য হইতে দেদীপ্যমান শিবিকাগুলি

মধ্যে মধ্যে সনূপুরে চরণের ঈষৎ শিঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলের পিছনে রাজার চারণ ও বন্দীরা প্রশস্তি-গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার মধ্যে কয়েকজন তো আনন্দাতিশয্যে এমনই মদমত্ত হইয়াছিল যে মুখ দিয়াই এক বিশেষ প্রকারের বাদ্যের কাজ করিতেছিল। শোভাযাত্রা পার হইবার পরে দুই দণ্ড সময় চলিয়া গেল,* আমি নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

শোভাযাত্রা যখন বাহির হইয়া গেল, তখন আমি যেন ঘুম হইতে উঠিলাম। নগরবাসীদের নিকট শুনিতে পাইলাম যে মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষদেবের ভাই কুমার কৃষ্ণবর্ধনের পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ও আজ তাহার নামকরণসংস্কার হইতেছে। যখন একথা শুনিলাম, তখন মুহূর্তের জন্য আমার মুখের ভাব অন্যরূপ হইয়া গেল। আমার মনে পড়িল নিজের অবস্থার কথা। একজন এমনই ভাগ্যবান যে তাহার জন্মের পরে এত উৎসব আয়োজন হইতেছে, আর আমি এক হতভাগ্য, দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! আমার জন্মের কথা মনে পড়িল। মা আমার জন্ম হওয়ার কয়েক বৎসর পরেই পরলোকগমন করেন। পিতা তখন বার্ধক্যে উপনীত। তাঁহার নিজের অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন প্রভৃতি অনেকবিধ ব্যাপারে জীবন ছিল কর্মব্যস্ত, তাহার মধ্যে আমাকে মানুষ করিবার দায়ও তাঁহাকে সামলাইতে হইল। স্নেহ বড় দারুণ বস্তু, মমতা বড় প্রচণ্ড শক্তি; কারণ বৃদ্ধ পিতার শ্রান্ত জীবনেও আর এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, এবং তিনি অক্লান্তচিত্তে আমার দায় গ্রহণ করিলেন। হোমবেদী হইতে উঠিয়া যখন তিনি অধ্যাপনের কুশাসনের উপর আসিয়া বসিতেন, তখন আমার ধূলিধূসরিত দেহ প্রায়ই তাঁহার কোলে স্থান পাইত।—আমি তাঁহার স্নেহ যতটা পাইয়াছিলাম, বিদ্যা ততটা পাই নাই। আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন তিনিও আমাকে অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন! আমার জীবনে যাহা কিছু সার বস্তু তাহা পিতার স্নেহ। তাহাতে আমি বিগড়াইয়া গেলাম, আবার দাঁড়াইয়াও গেলাম।—আজ এই আনন্দ-কোলাহল সজোরে আঘাত করিয়া আমাকে পিতার কোলে ফেলিয়া দিল। একবার আকাশের দিকে তাকাইলাম। মনে হইল, পিতামহেরা বুঝি আমার উপর দুঃখাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কোথায় বেদাধ্যায়ীদের 'যশোহংশশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপ' বংশ, আর কোথায় আমি অভাগা বণ্ড! ধরিত্রী, বিদীর্ণ হও, আমি তোমার মধ্যে লুক্কায়িত হই!

হঠাৎ আমার মনে হইল, কুমার কৃষ্ণবর্ধনের পুত্র জন্মিবার উপলক্ষে আশীর্বাদ

* তুঃ কাদম্বরীতে শুকনাসের পুত্রের জন্মোৎসবোপলক্ষে শোভাযাত্রার বর্ণনা।

করিয়া আসি না কেন! আশীর্বাদ করা তো ব্রাহ্মণের ধর্ম, কর্তব্য, বৃত্তি। যদিও আমি পূর্ব হইতে পরিকল্পনা করিয়া কোন কিছু করিতে পারি না—আর এই কারণেই কোনও পুস্তকই শেষ করিতে পারি না—কিন্তু সঙ্কল্প করিতে আমার দেরি হয় না। যেমনই এই চিন্তা আমার মনে জাগিল, অমনই কুমারের গৃহে যাত্রা করিবার আয়োজন শুরু করিলাম। ঐ দিন আমি খুব উৎসাহভরে স্নান করিলাম, শুক্ল অঙ্গরাগ ধারণ করিলাম, শ্বেতপুষ্পের মালা পরিলাম, আগুল্‌ফলম্বী শুক্ল ধৌত উত্তরীয় ধারণ করিলাম—ইহাই ছিল আমার মনোমত পরিচ্ছদ,[৭] আর ভগবান ত্র্যম্বকের চরণে অশ্রুধৌত প্রণাম নিবেদন করিয়া যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। ভগবান মরীচি-মালীর কিরণমালা ভূতল ছাড়িয়া তরুশিখরের উপরে তাহার চেয়েও ঊর্ধ্বে উঠিয়া অস্তগিরির চূড়ায় গিয়া বসিয়াছিল। ধীরে ধীরে চন্দ্রকিরণেও সকল দিক ছাইয়া গেল। সে দিন ছিল শুক্লা ত্রয়োদশী। আমি অতিশয় পুলকিত হৃদয়ে কুমার কৃষ্ণবর্ধনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। একবারও ভাবিলাম না যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিবেন কিনা। আমার মনে আজ বিচিত্র উল্লাস। আজই যেন আমার সমস্ত কলুষ ধুইয়া গিয়াছে, আর দেহমন হইয়াছে লঘুভার। সঙ্কল্প করিলাম, নিজের চরিত্রগত দুর্নাম চিরকালের জন্য ধুইয়া ফেলিব। আজ আমি কুমার কৃষ্ণবর্ধনের সঙ্গে মিত্রতা করিব, দশ দিনের মধ্যেই মহারাজাধিরাজের কৃপাপাত্র হইয়া উঠিব। আবার আমার গৃহ হইতে উত্থিত যজ্ঞধূমের কালিমায় দশদিক ধবল হইয়া যাইবে। আবার আমার দ্বারে শুকসারী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবে, ব্রাহ্মণবালকদের পদে পদে সতর্ক করিয়া দিবে। আর আমি বাৎস্যায়ন বংশের কলঙ্ক কদাচ হইব না।

কিন্তু আমার ভাগ্য এখনও অদৃষ্ট কোন কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ছিল। যাহা হইবার ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে; যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। ইহার পর আমাকে এমন এক ঘটনার কথা লিখিতে হইবে, যাহার কথা লিখিবার সময় আজও ভয়ে ও আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপিয়া ওঠে। যাহা হইতে আমি বাঁচিতে চাহিয়াছিলাম তাহাতেই পড়িয়া গেলাম। ভাগ্যকে কে বদলাইতে পারে? বিধাতা তাঁহার দুর্বার লেখনীতে যাহা কিছু লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা কে মুছিয়া ফেলিতে পারে? অদৃষ্টের সমুদ্র সন্তরণে আজ পর্যন্ত কে সক্ষম হইয়াছে?

---

[৭] তুঃ হর্ষচরিত, ২য় উচ্ছ্বাস।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

আমি জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতেছিলাম। ভবিষ্যৎ জীবনের রংগীন কল্পনায় যে ব্যক্তি ডুবিয়া যাইতেছে আবার ভাসিয়া উঠিতেছে তাহার চারি-দিকে দেখিবার অবসর কোথায়! আমি একপ্রকার চক্ষু বন্ধ করিয়া চলিতেছিলাম। এমন সময় এক ক্ষীণ কোমল কণ্ঠে ডাক আসিল--'ভট্ট, ও ভট্ট, এদিকে দেখ, আমাকে চিনিতে পার কি?' এই ধ্বনি শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। এই সুদূর স্থাণ্বীশ্বরে আমাকে চিনিতে পারে এমন ব্যক্তি এ কে? ধাবমান অশ্বকে বল্গা দিয়া যে ভাবে সংযত করে, তেমনি এই ধ্বনি আমার অপসৃয়মান বিচারধারাকে সংরুদ্ধ করিল। পিছনে ফিরিয়া তাকাইলাম। এক নাতি-কমনীয় রমণী মূর্তি আমাকে ডাকিতেছিল। তাহার মুখমণ্ডলে তারুণ্য ছিল, কিন্তু তাহার দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছিল, ঠিক যেন ধূমায়মান দীপশিখা। তাহার চক্ষুযুগল সন্ধ্যার ম্লান আলোকে চমকিয়া উঠিতেছিল। তাহার ধারে ধারে পরিষ্কার ভাবে যে কৃষ্ণরেখা দেখা যাইতেছিল তাহা ঐ দীপ্তিকে অভিভূত করিতে পারে নাই। সে বসিয়াছিল এক পানের দোকানে। মনে হইতেছিল সে পান অতি সামান্যই বিক্রয় করিতেছিল; বেশি বিক্রয় করিতেছিল তাহার মুখের ঈষৎ হাসি। লোক চিনিতে পারি বলিয়া আমার গর্ব ছিল। আমি নিজেকে হাসির মধ্যে কান্না, ও কান্নার মধ্যে হাসি চিনিতে সিদ্ধহস্ত বলিয়া মনে করিতাম; কিন্তু এ হাসি ছিল এক অদ্ভুত ধরনের। উহাতে আকর্ষণ ছিল, আসক্তি ছিল না; মমতা ছিল, মোহ ছিল না। আমি অনায়াসে ঐ দোকানের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম, আর উহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ও বলিয়া উঠিল- 'ভট্ট, তুমিও চিনিতে পার না!' আরে, এ তো নিপুণিকা। আমি এক মুহূর্তে যেন উন্মথিত, ভ্রান্ত, নিঃসংজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পুনরায় হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলাম -'আরে, নিউনিয়া!' 'নিউনিয়া' নিপুণিকার প্রাকৃত নাম। আমি উহার প্রাকৃত রূপেই বেশি আকৃষ্ট হইয়া-ছিলাম। নিপুণিকা তাহার বড় বড় চোখ মেলিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিল-- 'হল্লা করিতেছ কেন, ধীরে ধীরে বল।' তাহার পর এক আসন ঠেলিয়া দিয়া বলিল- 'বসো, পান তো খাও।' আমি বসিয়া পড়িলাম।

নিপুণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়া দেওয়া উচিত। নিপুণিকা আজকালের সেই সব জাতির একটি জাতির সন্তান, যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া কোনও সময় মনে করা হইত; কিন্তু যাহাদের পূর্বপুরুষেরা সৌভাগ্যবশে গুপ্তসম্রাটদের অধীনে কর্ম করিত। চাকরি মিলিবার পর তাহাদের সামাজিক মর্যাদা কিছুটা বাড়িয়া গেল। তাহারা এখন নিজেদের পবিত্র বৈশ্যবংশে জাত

বলিয়া মনে করিতে লাগিল ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রচলিত প্রথার অনুকরণ করিয়া চলিল। তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা অল্পদিনই হইল বন্ধ হইয়াছে। নিপুণিকার বিবাহ হইয়াছিল কন্দবংশজাত কোনও বৈশ্যের সঙ্গে, সে হীন অবস্থা হইতে উঠিয়া শেঠ হইয়াছিল। বিবাহের পরে এক বৎসরও কাটিল না, নিপুণিকা স্বামীকে হারাইল। বিধবা হওয়ার পর নিপুণিকার সুখে কাল কাটিল, না দুঃখে কাটিল, তাহা আমার জানা নাই, কিন্তু সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। তাহার পূর্বজীবনের কথা সে আমাকে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই বলে নাই; কিন্তু উহার পরবর্তী কাহিনী আমার অনেক কিছুই জানা আছে। নিপুণিকা যখন প্রথম প্রথম আমার নিকট আসিয়াছিল, তখন আমি ছিলাম উজ্জয়িনীতে। সেখানে আমি ছিলাম এক নাটকমণ্ডলীর সূত্রধার। নিপুণিকা মণ্ডলীতে ভর্তি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, আমিও সম্মত হইলাম। নিপুণিকা দেখিতে এমন কিছু সুন্দরী ছিল না। তাহার গায়ের রং অবশ্য শেফালিকা ফুলের বৃন্তের সঙ্গে মিলিয়া যাইত; কিন্তু তাহার সব চেয়ে সৌন্দর্যের উপাদান ছিল তাহার চোখদুটি ও আঙ্গুলগুলি। আঙ্গুলগুলি আমি সৌন্দর্যের অতি মহত্ত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া মনে করি। নটীর প্রণামাঞ্জলি ও পতাকা-মুদ্রা সফল করিতে গেলে সরু সরু আঙ্গুলের প্রভাব অদ্ভুত। তাই আমি নিপুণিকাকে মণ্ডলীতে আসিবার অনুমতি দিলাম। আমার মণ্ডলীর মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অধিক সুখে ছিল। অতি শৈশব হইতেই আমি মেয়েদের সম্মান করিতে জানিতাম। সাধারণত যে সব মেয়েদের চঞ্চল ও ভ্রষ্ট বলিয়া লোকে জানে, তাহাদের মধ্যে এক দৈবী শক্তিও জন্মে, একথা লোকে ভুলিয়া যায়। আমি ভুলি না। আমি স্ত্রীলোকের দেহ দেবমন্দিরের সমান পবিত্র বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে কোনও প্রতিকূল টিপ্পনী আমি সহ্য করিতে পারি না। এইজন্য আমি মণ্ডলীতে এমন কঠোর নিয়ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম যে স্ত্রীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেও পারিত না। লোকসমাজে একথা সকলে জানিত যে বাণভট্টের নর্তকীরা অন্তঃপুরে থাকে। কিন্তু ইহার ফল খুব ভাল হইয়াছিল। সমাজে আমার মণ্ডলীর সমাদর ছিল। নিপুণিকাকে আমি ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চে অবতারণ করাইলাম, কিন্তু তাহার সম্মতি না লইয়া নহে।

একদিন উজ্জয়িনীতে আমারই লেখা এক প্রকরণ অভিনয় হওয়ার কথা ছিল। ঐ দিন পরমভট্টারকের উপস্থিত হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। আমি যথাশক্তি আয়োজন করিয়াছিলাম। আমি সেদিন আমার প্রধান প্রধান অভিনেতাকে তাহাদের শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল দেখাইবার জন্য খুবই উত্তেজিত করিয়াছিলাম। মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে পূর্ণ আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনয় করা

হইবে। হইলও তাই। প্রভু মহাকালের সন্ধ্যারতির পর প্রেক্ষাগৃহে লোকজন একত্র হইতে লাগিল। নগরীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত নাগরিক যথাস্থানে সমাসীন হইলেন। নাগরা বাজিয়া উঠিল, আমিও আড়ম্বরের সংগে পূর্বরংগের বিবিধ প্রকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলাম। গায়ক ও বাদকেরা নিজ নিজ স্থানে বসিয়া গেলেন আর নর্তকীদের নূপুরঝংকারের সংগে সংগেই বীণা বেণু মুরজ মৃদংগ মুখর হইয়া উঠিল। আমি যখন ভৃংগারধর ও জর্জরধরের সংগে সংগে জর্জর-স্থাপনার জন্য রংগভূমিতে আসিলাম, তখন উপস্থিত সজ্জনেরা অশেষ ঔৎসুক্যের সহিত গদ্‌গদচিত্তে তাহা দেখিতে লাগিল। আমার অভিনয় খুবই সুন্দর হইয়াছিল। জর্জর উত্তোলন করার পর আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নেপথ্যশালায় ফিরিয়া গেলাম। নিপুণিকা প্রথম হইতেই পুষ্পোপহার লইয়া সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার ইংগিতমত পুনরায় একবার নাগরায় উপর ঘা পড়িল, আর নিপুণিকা পুষ্পোপহার প্রণামাঞ্জলি লইয়া রংগমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। যবনিকার পশ্চাৎ হইতে আমি তাহার অপূর্ব নৃত্য দেখিতে লাগিলাম। বীণা বেণু মুরজের সংগে কাংস্যতাল ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিতেছিল, নিপুণিকার নূপুরক্বণনকে আরও গম্ভীর, আরও মনোহারী করিয়া তুলিতেছিল। সহসা বাদ্য থামিল, উহার মধুর ধ্বনির অনুরণনের পশ্চাতে নিপুণিকার কোমল কণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। আমি আজ নিপুণিকার কলাকৌশল দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। গান শেষ হইতেই বাজনার সহিত নূপুরের ক্বণন শোনা গেল। অতি সুকুমার ভংগীতে নিপুণিকা তাহার উপহার দেবতাদের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া অভিরাম পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে নেপথ্যশালার দিকে ফিরিয়া আসিল।

মুহূর্তে আমার মানসসমুদ্রে বিক্ষোভের ঝড় বহিয়া শান্ত হইয়া গেল। আমি সর্বদাই নিজেকে সংবরণ করিতে পারি। এই কথায় আমার অভিমান হইল। আমি একবার আগ্রহপূর্ণকণ্ঠে ডাকিলাম—'নিউনিয়া!' নিপুণিকা দাঁড়াইয়া গেল--তাহার বাম হস্ত কটিদেশে ন্যস্ত, কংকণ শিথিল হইয়া সরিয়া আসিয়াছে, দক্ষিণ হস্ত শিথিল শ্যামালতার সমান ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দেহলতা নৃত্যভংগে ঈষৎ আনত হইয়াছে, মুখমণ্ডল শ্রমবিন্দুতে পরিপূর্ণ। আমার মনে পড়িল 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র মালবিকার কথা। আমি হাসিতে হাসিতে কালিদাসের সেই শ্লোক[১] আবৃত্তি করিলাম। নিপুণিকা সংস্কৃত জানিত না,

---

[১] বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্তহস্তং নিতম্বে
কৃত্বা শ্যামাবিটপিসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাংগুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্ধম্ ॥

ও কি বুঝিল কে জানে। উহার অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষু খানিকক্ষণ নিমীলিত হইল। সেই সময়ে ইহার শিথিল কবরীবন্ধ হইতে এক মল্লিকাকুসুম পড়িয়া গেল, আর তৎক্ষণাৎ এই অপরাধের দণ্ড সে পাইল। নিপুণিকা পদাঙ্গুষ্ঠে দিয়া উহা ইতস্ততঃ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। কালিদাসের মালবিকার যে রূপ তাহা নিপুণিকার মধ্যে তখনও আসে নাই। তাহাও আসিয়া গেল আর আমি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমার হাসি দেখিয়া নিপুণিকা মাথা তুলিল। এবার তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত। সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেল। মনে হইল, সে বুঝি আমার হাসি সহ্য করিতে পারিল না। আমি অন্য কর্মে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম। নাটক আরম্ভ হইল, পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া মহাসমারোহে হইতে থাকিল। সেদিন আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। পরমভট্টারকের আনন্দপ্রসন্ন মুখভাব দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইতেছিল যে কল্য প্রচুর পুরস্কার পাইব। তিনি পরের দিন রাজসভায় দর্শন দিবেন বলিয়া কথা দিলেন। উপস্থিত দর্শকদের বারবার সাধুবাদের মধ্যে অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল। ঐ দিনের কার্য শেষ করিয়া আমি গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিতেছিলাম নিপুণিকাকে এক ভাল মত পুরস্কার দিব, এমন সময়ে কে আসিয়া সংবাদ দিল যে নিপুণিকাকে পাওয়া যাইতেছে না। আমি যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সমস্ত রাত্রি নিপুণিকার সন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহাকে পাইলাম না। দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন—নিপুণিকাকে আর পাওয়া গেল না। রাজসভায় যাইতে পারিলাম না। থাকিয়া থাকিয়া নিপুণিকার অশ্রুসিক্ত নেত্রদ্বয় আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমি আমার সেই অশুভ হাসি হইতে অকাল-কুসুমের মত ভয় পাইতে লাগিলাম। পঞ্চম দিবসে আমি নাটকমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিলাম, আর আমার লেখা প্রকরণটি শিপ্রার চটুল তরঙ্গে উপহার স্বরূপ ভাসাইয়া দিলাম। সেই হইতে আজ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল, আমি ঐ ব্যবসাই ছাড়িয়া দিয়াছি। আজ যখন আবার এক পুরস্কারের আশায় রাজসভার দিকে যাইতেছি, তখন সম্মুখে সেই নিপুণিকা। ঐ দিন যাহার অদর্শন বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল, তাহার দর্শন কি আজও বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে? অদৃষ্টের পথ কে রুদ্ধ করিবে!

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মুখে কথা সরিল না। শুধু নির্নিমেষ নয়নে নিপুণিকার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। সে পান সাজিতেছিল; কিন্তু নিতান্ত আনাড়ি লোকও বুঝিতে পারিত যে তাহার মনের মধ্যে কোনও ভয়ংকর আন্দোলন চলিতেছে। অনেক দিনের পর পান সাজিতে ব্যস্ত নিপুণিকার শিথিল অঙ্গুলি দেখিয়া আমার এক অভূতপূর্ব আহ্লাদ হইল। নিপুণিকার

অধরের উপর ঈষৎ হাসি আর চোখে ছিল জল। সেও চুপ করিয়া ছিল। এক খিলি পান সাজিতে এক ঘণ্টা লাগিল। তখন সে আমার দিকে তাকাইল। চোখের জল বাধা মানিল না। তাহা ঝরিতেই লাগিল—ঝরিতেই লাগিল—ঝরিতেই লাগিল। আমি নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া দেখিতে লাগিলাম। তখনও অশ্রু বহিতেছে। শেষে আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম—'নিউনিয়া, কাঁদিও না।' আমার কথা অবশ্য করুণ শুনাইয়া থাকিবে। নিউনিয়া তখন ফোঁপাইতে লাগিল। আমি ধড়ফড় করিয়া উঠিলাম—উহার চোখের জল মুছাইয়া দিই। সে আবার সাবধান হইয়া গেল। ঈষৎ ভর্ৎসনার সঙ্গে বলিয়া উঠিল—'ছি ছি, কি করিতে যাইতেছ? বাজারে বসিয়া আছি, দেখিতে পাওনা কি?' আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—'আমি কোথায় বসিয়া আছি তাহা মোটেই গ্রাহ্য করি না। আমি তোমাকে কখনই এভাবে কাঁদিতে দিব না। অভাগী, তুমি পলাইয়া আসিলে কেন?' নিপুণিকা পুনরায় একবার অপাঙ্গে ভর্ৎসনা করিল। বলিল—'পান খাও'। এবার তাহার গলা স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল। আমি পান লইলাম।

যেখানে যাইতেছিলাম, সেখানে যাওয়া হইল না। আমি এই অভাগিনীর দুঃখসুখের কথা ভাল করিয়া না জানিয়া এখন আর উঠিতে পারি না। বহুদিন পরে নিজের অসতর্ক হাসির জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সারিয়া সামলাইয়া লইবার সুযোগ উপস্থিত। জানি না আমার প্রমত্ত অট্টহাসি এই দুঃখিনীর কোন সুকোমল ক্ষতস্থানকে আবার তাজা করিয়া দিয়াছে, ছয় বৎসর ধরিয়া অনবরত কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, আর এত দিন ধরিয়া না জানি কোন দুর্ভাগ্যের কবলে ছটফট করিতেছে—বাণভট্ট তো এ সমস্ত কথা না জানিয়া এ স্থান হইতে উঠিতে পারে না। এই সহানুভূতিময় হৃদয় আমাকে ভবঘুরে করিয়াছে। যে প্রমত্ত হাসি ছয় বৎসর ধরিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, আজ চোখের জলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নিপুণিকার চরিত্র যে এখানকার শুদ্ধাচারীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট, এবিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই নাই। এই দোকানে বসিয়া আমি অবশ্যই নিজেকে কয়লার কুঠুরিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সবই ঠিক; কিন্তু নিপুণিকা আমার চেয়ে বড়, আমার চেয়ে মূল্যবান্। সারা জীবন আমি স্ত্রীলোকের শরীর কোনও অজ্ঞাত দেবতার মন্দির বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। আজ লোকের কথার ভয়ে সেই মন্দিরকে আবর্জনাময় রাখিয়া যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'নিউনিয়া, তুমি কেন চলিয়া আসিলে, এ পর্যন্ত কোথায় ছিলে, এখন কি করিতেছ? আমি তোমাকে দুঃখী দেখিতেছি। তোমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া আমি এখান হইতে নড়িতে পারি না। বল,

কোন কথার জন্য তুমি পলাইয়া আসিয়াছিলে? আজ ছয় বৎসর ধরিয়া আমার মন অনবরত আমাকে ধিক্কার দিতেছে; এখন মনে হইতেছে যে আমিই বুঝি তোমার সমস্ত দুঃখের মূল। একবার তুমি নিজের মুখে বল যে সেকথা ভুল। আমি কি নির্দোষ?'

নিপুণিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস লইয়া বলিল—'হাঁ ভট্ট, আমার পলাইয়া আসিবার কারণ তুমিই, কিন্তু তোমার দোষ নয়—আমারই দোষ। তোমার উপর আমার মোহ ছিল। ঐ অভিনয়ের রাত্রে আমার ক্ষণেকের জন্য মনে হইয়াছিল যে আমার জয় হইবেই; কিন্তু পরমুহূর্তেই তুমি আমার আশাভরসা চূর্ণ করিয়া দিলে। নিষ্ঠুর, তুমি অনেকবার বলিয়াছ যে তুমি নারীদেহকে দেবমন্দিরের সমান পবিত্র মনে কর; কিন্তু একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে এই মন্দির হাড় মাংসের, ইট চুনের নহে! যে মুহূর্তে আমি সর্বস্ব লইয়া এই আশায় তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম যে তুমি তাহা গ্রহণ করিবে, সেই সময়েই তুমি আমার আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিলে। সেদিন আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে তুমি জড় পাষাণপিণ্ড; তোমার ভিতরে না আছে দেবতা, না পশু, আছে এক অলংঘনীয় জড়তা। আমি এইজন্য সেখানে টিকিতে পারিলাম না। জীবনে আমি তাহার পর অনেক দুঃখ সহ্য করিয়াছি; কিন্তু সেই মুহূর্তের প্রত্যাখ্যানের সমান কষ্ট আমার কখনও হয় নাই। ছয় বৎসর ধরিয়া এই কুটিল সংসারে অসহায় অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে এখন আমার মোহ ভাঙিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভট্ট, তুমি আমার গুরু, তুমিই আমাকে নারীধর্ম শিখাইয়াছ। ছয় বৎসরের কঠোর অভিজ্ঞতার বলে আমি বলিতে পারি যে তোমার জড়তাই ছিল ভাল—আমি অভাগিনী ছিলাম, তোমার আশ্রয় ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমার জীবনেও যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা জানিয়া কি লাভ? আজকাল আমি পান বিক্রয় করি এবং ক্ষুদ্র রাজপরিবারের অন্তঃপুরে পান পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে আমি দুঃখী নই। তুমি আমার ভাবনা ছাড়িয়া দাও। যেখানে যাইতেছিলে যাও। যদি এই নগরে থাক, তাহা হইলে কখনও কখনও দর্শন পাইবার আশা অবশ্যই করিব। কিন্তু তুমি এই দোকানে বেশীক্ষণ থাকিও না। এখানে যাহারা আসে তাহারা স্ত্রীশরীরকে দেবমন্দির মনে করে না।'—এই পর্যন্ত বলিয়া সে একবার হাসিয়া আমার দিকে তাকাইল। সেই দৃষ্টিতে ছিল নিজের উপর একপ্রকার বিতৃষ্ণার ভাব; কিন্তু কোনও প্রকারের পশ্চাত্তাপ বা অনুশোচনার লেশমাত্র ভাবও ছিল না। একটু থামিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—'ভট্ট, আমার কোনও কথার জন্য অনুশোচনা নাই। আমি যাহা আছি, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারিতাম না। কিন্তু তুমি যাহা আছ তাহা হইতে কত শ্রেষ্ঠ হইতে পার। এইজন্য বলি, তুমি

এখানে থামিও না। আমি অনুশোচনা করিলে যে নরকে পড়িয়া আছি সেখানেও আমার স্থান মিলিবে না। তুমি আত্মসংবরণ কর, তাহা হইলে যে স্বর্গে স্থান পাইবে, তাহার কোন কল্পনা আমার মনেও নাই, তোমার মনেও নাই। সংসারে আমি কম দেখি নাই। এই সংসারে তোমার মত পুরুষরত্ন দুর্লভ।' নিপুণিকার চক্ষুর দৃষ্টি নিম্নদিকে আবদ্ধ, যেন এমন সব কথা বলিয়া গেল যাহা বলিতে চায় নাই। আর তাহার আঙ্গুলগুলি জোরে জোরে তাম্বুলপত্রে খদির-রাগ লাগাইতে ব্যস্ত ছিল।

নিপুণিকার শেষ কথাটি আমার মনে বসিয়া গেল। ও যদি অনুশোচনা করিত, তাহা হইলে যে নরকে পড়িয়া ছিল সেখানেও স্থান মিলিত না। ও হইল কুলত্যাগিনী, সমাজে উহার সদ্গুণের মূল্য কি? জিজ্ঞাসা কর আর নাই কর, দোষ তো আছেই। আমি আর একবার উহার কোটরগত নেত্রের দিকে তাকাইলাম। চোখ জলে ভরিয়া আছে। আমি বলিলাম—'নিউনিয়া, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। তুমি অনুতাপ করিতেছ, কষ্টে আছ, আশ্রয় চাহিতেছ, তুমি আমাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতে চাও না। আমি আগেও যা ছিলাম আজও তাহাই আছি, সমস্ত পৃথিবীও তোমাকে আমা হইতে পৃথক করিতে পারে না। এই দোকান এখনই বন্ধ করিয়া দাও। যেখানে লোকে তোমার বিষয় কিছুই জানে না এমন কোনও স্থানে শান্তিতে থাক। আমি তোমাকে আবর্জনার মধ্যে ফেলিয়া যাইতে পারি না। আমার প্রতি তোমার মোহ কাটিয়াছে, এতো ভাল কথা। তুমি এই কলুষময় নগরীর রাজপথ ছাড়িয়া দাও। তোমার চক্ষু কেমন বসিয়া গিয়াছে! অভাগিনী, তুমি আমার নিকট হইতেও লুকাইতে চাও!' নিপুণিকা এবার আহত হইল। সে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে থাকিল। এমন সময়ে দুই একজন গ্রাহককে দোকানের দিকে আসিতে দেখা গেল। উহাদের দূর হইতে দেখিয়াই নিপুণিকা নিজেকে সামলাইয়া লইল। মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া সে দোকানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, আর আমাকে ভিতরে আসিতে ইশারা করিল। দোকানের পিছনে এক ছোট আঙিনা ছিল, তাহার মাঝামাঝি ছিল এক তুলসী গাছ। তাহার পার্শ্বে এক ছোট বেদী, তাহার উপর ছিল মহাবরাহের এক অত্যন্ত ভব্য মূর্তি। মূর্তি ক্ষুদ্রাকারই ছিল, কিন্তু যে শিল্পী উহা গঠন করিয়াছেন তিনি অতি দক্ষ বলিয়া মনে হইতেছিল। মহাবরাহের দন্তোপরি ধৃত ধরিত্রীর মুখমণ্ডলে যে উল্লাস ও দীপ্তির ভাব ছিল, তাহা দেখিয়াই বোঝা যাইতেছিল। মহাবরাহের দুই হাত কটিদেশে এমন ভাবে নিবদ্ধ ছিল, আর বাহুমূলের পেশিগুলি এমন দৃঢ়তার সহিত বাহির হইয়াছিল যে দেখিয়া মনে এক অপূর্ব বিশ্বাসের উদ্রেক হইল। আমার বুঝিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না যে ইনিই নিপুণিকার উপাস্য-

দেবতা, আর নিপুণিকা নিজের উদ্ধারের জন্য এমন ধরনের আশাই পোষণ করিতেছে। নিপুণিকা একবার মূর্তির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল, তাহার কণ্ঠ তখনও রুদ্ধ, আর ইশারা করিয়া আমাকে ছোট এক ঘরে বসিতে বলিল। আমি বসিয়া রহিলাম। সে আবার বাহিরে চলিয়া গেল, আর অতি সত্বরই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—'একটু থামো, আমি এখনই আসিতেছি।' সে আবার কুশাসনের উপর বসিয়া পড়িল এবং মহাবরাহের সামনে রুদ্ধকণ্ঠে এক স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রু পড়িতে লাগিল, বক্ষের বাসন্তী উত্তরীয় অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া গেল। আমি একদৃষ্টে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ধন্য নিপুণিকা, ধন্য মহাবরাহ, ধন্য তুলসী, আর ধন্য আমি অভাগা বাণ, যে এই ত্রয়ীকে দেখিতেছি। একবার আমার নিজের গর্বের তুচ্ছতা বিষয়ে অনুতাপ হইল। কাহাকে আশ্রয় দিবার কথা বলিতেছিলাম? নিপুণিকার যে আশ্রয় মিলিয়াছে তাহার তুলনায় আমার আশ্রয় কত তুচ্ছ, কত নগণ্য, কত অকিঞ্চন! আমার পুরুষত্বের গর্ব, কৌলীন্যের গর্ব, পাণ্ডিত্যের গর্ব, মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইল। নিপুণিকাকে চিনিতে আমি কতখানি ভুল করিয়াছিলাম! সে ভক্তি গদগদ স্বরে স্তোত্র পাঠ করিতেছিল, আর আমি পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া-ছিলাম—ঐ সময়ে তাহার অঙ্গপ্রভা অলৌকিক দেখাইতেছিল; কোটরগত চক্ষু যেন উদ্বেল বারিধারায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের মত বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল; কুন্তল-জাল থাকিয়া থাকিয়া এমন ভাবে বিলুলিত হইয়া উঠিতেছিল যে, যেন মহাবরাহের চরণপ্রান্তে লুটাইবার জন্য ব্যাকুল। ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গেলাম যে নিপুণিকা আমার নাটকমণ্ডলীর পরিচিত নিউনিয়া। মনে হইতেছিল যেন ও কোনও দেবাঙ্গনা, কখন এই কলুষময় পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে উড়িয়া যাইবে, বলা যায় না। আমি এই রমণীর হৃদয়ান্তর্গত পরম-প্রেমমূর্তি মহাবরাহকে মনে মনে প্রণাম করিলাম। প্রথম দর্শনে আমি যাহা কান্নার হাসি মনে করিয়া নিজের সহৃদয়তার গর্ব করিয়াছিলাম, উহা ছিল এক প্রচণ্ড ভুল। আমি মনে মনে নিজের অকিঞ্চনতাকে ধিক্কার দিলাম। এই সময়ে নিপুণিকা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে শান্তিময়ী শ্রীও উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার গতিভঙ্গীতে একপ্রকার ভাব-বিহ্বল মন্থরতা। যেন ভাববিভোর ভক্তিই দেহ ধারণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহার মুখের উপর আবার স্মিতহাস্য। এখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমি প্রথম দর্শনে এই রমণীকে কত ভুল বুঝিয়াছিলাম। করুণাদীপ্ত মুখমণ্ডলে অনুশোচনার ছায়া মনে করা আমার ভুল হইয়াছিল। নিপুণিকা আসিল, আর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল।

আমার মুখ দিয়াও কোনও কথা সরিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর ও-ই আরম্ভ করিল—'ভট্ট, তুমি সত্যই আমার সাহায্য করিতে পার?'

'তোমার সন্দেহ হইতেছে কেন, নিপুণিকা? আমি কি কখনও এমন কিছু বলিয়াছি যাহা পালন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছি?'

'কিন্তু যদি আমার সাহায্য করিতে গিয়া কোনও অন্যায় কর্ম করিতে হয়?'

'দেখ নিউনিয়া, আমি এখনই প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে তুমি যাঁহার নিকটে আশ্রয় পাইয়াছ তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমার আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই, তবু তুমি পরীক্ষা করিবার জন্য এই কথা বলিতেছ। আমার উত্তর স্পষ্ট। সাধারণতঃ লোকে বাঁধা রাস্তায় যাহা উচিত অনুচিত বলিয়া মনে করে, আমি সে রাস্তায় চলি না। উচিত-অনুচিতের কথা আমি নিজের বুদ্ধিতে বিচার করি। মোহ ও লোভের বশে যে সব কাজ করা হয় সে সমস্ত কাজই আমি অনুচিত বলিয়া মনে করি, কিন্তু আমি সর্বদা এই দুই রিপু হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই। আজই আমি এক মহা সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি। জানি না এবিষয়ে আমি কতদূর সফল হইব। অনুচিত কর্ম হইতে আমি সর্বদা নিজেকে বাঁচাইতে পারি নাই; কিন্তু উচিত কর্মের সুযোগ আসিলে তাহা করিবার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত গ্রাহ্য করি না। যে কর্মে আমাকে সাহায্য করিতে হইবে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। তুমি আমাকে জান, আশা করি অনুচিত কর্মে আমাকে কখনও প্রবৃত্ত হইতে দিবে না!'

নিপুণিকা হাসিয়া উঠিল। বলিল—'এখন তুমি বাঁচিবার পথ খুঁজিতেছ। আমার মত নারীর নিকট হইতে, তুমি উচিত কার্যে সাহায্যকারী হইবে, এরূপ আশা কর? তুমি বড়ই সরল।'

এবার আমি সত্যই বিচলিত হইলাম। তথাপি একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলাম—'তাহা হইলে বল না, আমাকে কি করিতে হইবে?'

নিপুণিকা এবার আরও জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল—'দেবমন্দির উদ্ধার করিতে হইবে।'

বুঝিলাম, দেবমন্দিরের অর্থ নারী। এ তো কোনও অনুচিত কর্ম নয়। একটু হাসিয়া বলিলাম—'তোমার উদ্ধার তো মহাবরাহই করিয়াছেন, তোমার কথা আমার ভাবার নয়। এখন আর কোন রমণী বিপদে পড়িয়াছে, আমাকে যাহার উদ্ধার করিতে হইবে?'

নিপুণিকা বলিল—'ভট্ট, এপর্যন্ত তুমি নারীর মধ্যে যে দেবমন্দিরের আভাস পাইয়াছ, তাহা হইল তোমার সরল মনের কল্পনা। আজ আমি তোমাকে সত্যই দেবমন্দির দর্শন করাইব। কিন্তু তাহার জন্য তোমাকে ছোট রাজকুলে আমার সখী সাজিয়া প্রবেশ করিতে হইবে এবং আবর্জনাস্তূপ হইতে সে মন্দির

উদ্ধার করিতে হইবে। আজই তাহার উত্তম অবসর। মহাবরাহই আমার প্রকৃত সহায়। তিনিই তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তুমি না আসিলেও আমার ইহা করিতেই হইত। বলো ভট্ট, তুমি একাজ করিতে পারিবে? অসুরগৃহে বন্দিনী লক্ষ্মীর উদ্ধার করিবার সাহস রাখ? মদিরাপঙ্কে নিমগ্ন কামধেনুকে বাঁচাইতে চাহ? বলো, আমাকে এখনই যাইতে হইবে! মহাবরাহ আজই অনুমতি দিয়াছেন। এই সীতার উদ্ধারকালে তোমাকে জটায়ুর মত হয়তো প্রাণ দিতে হইতে পারে। সাহস আছে?'

আমি হাসিলাম। এ কার্য আমি অবশ্যই করিতে পারিব। শুধু একবার স্বর্গীয় পিতাকে মনে মনেই প্রণাম করিলাম—'পিতা, আজ আত্মোদ্ধার কর্ম হইতে বিরত থাকিতে হইল। সময় ও সুযোগ জুটিলে আবার কখনও সে কর্ম হইবে। জানি না কোন দুঃখিনীর দুঃখমোচন যজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার ডাক আসিয়াছে। আজ ইহারই ঋত্বিক্ হইতে দাও।' নিপুণিকার দিকে তাকাইয়া বলিলাম—'নিউনিয়া, আমি প্রস্তুত, এখন নেপথ্য বিধান কর অর্থাৎ বেশ পরিবর্তনের জন্য বস্ত্রাদি আন।'

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

আঙিনার বাহিরে নিপুণিকা আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার সখী সাজিয়া যখন বাহিরে আসিলাম, তখন হংসবৎ ধবলবর্ণা জ্যোৎস্নাময়ী ধরিত্রীকে দেখিয়া মন এক অননুভূতপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, ভগবান ত্রিলোচনের শিরোদেশ হইতে বিগলিত গঙ্গার ধারা যখন সমুদ্রে আসিয়া পড়িল তখন সে সময়েও এমনই এক শোভার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। চন্দ্রমা নিশ্চয়ই বিলম্বে আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেছিলেন। উদয়ের কালে যে লালিমা থাকে, কোথাও তাহার কোনও চিহ্ন ছিল না। ইন্দ্রের ঐরাবত গজ যখন মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া বাহির হয় তখন তাহার শ্বেতকুম্ভস্থলের উপর হইতে সিন্দুর ধুইয়া গিয়া এমনই শোভা হয়তো দেখা যায়। সমস্ত আকাশ চাঁদনিতে এমন ভরিয়া গিয়াছিল যে মনে হইতেছিল কোনও অজ্ঞাত শিল্পীর সুধা-বিলেপন-চূর্ণের ভাণ্ডারই বুঝি উলটিয়া পড়িতেছে। তারকাদের স্তিমিত দীপ্তি দেখিয়া মনে হইল তাহারা বুঝি ঝিমাইতেছে এবং যে কোনও সময়ে ঢুলিয়া শুইয়া পড়িবে! মৃদু মন্দ সান্ধ্য সমীরণ গৃহধেনুদের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কারণ তাহার স্পর্শে ইহাদের মধ্যে এক অলস-নিদ্রার ভাব দেখা যাইতেছিল। তাহাদের রোমন্থনব্যস্ত চোয়াল ধীরে ধীরে শিথিল

হইয়া পড়িতেছিল এবং চোখের পাতা জুড়িয়া যাইতেছিল। সকলের চেয়ে শোচনীয় অবস্থা, আমার মনে হইল, চাঁদ মামার মৃগের হইয়াছে। বেচারা বুঝি পিপাসার তাড়নায় এই অমৃত সরোবরে আসিয়াছিল, এখন অমৃতপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কর্তব্যমূঢ় হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে![১] ক্ষণেকের জন্য মনে হইল, আমিও কি কোনও অমৃতপঙ্কে ডুবিতে যাইতেছি! কিন্তু এখন চিন্তা করা বৃথা! নিপুণিকার এক ইশারায় আমি অনুচরীর মত তাহার পিছু লইয়াছি। জানি না কেন আমার মনে হইতেছে যে নীচ হইতে উপর পর্যন্ত সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এক অবশ অবসাদের জড়িমা ছাইয়া গিয়াছে। নিপুণিকা অতি সংক্ষেপে আমার কর্তব্য বলিয়া দিয়াছে। সে তাহার পক্ষে ঔচিত্যস্থাপনার জন্য একটুও চেষ্টা করে নাই, তাহার কথাবার্তার মধ্যে কোথাও আমার প্রতি অবজ্ঞার চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমার তো মনে হইয়াছে যেন ও আমাকে এই কর্মের সিদ্ধির নিমিত্তমাত্র মনে করে, উহার আসল সহায় তো মহাবরাহ। উহার সংকল্প যে খাঁটি তাহার প্রমাণ উহার বড় বড় অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটি। ও আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে প্রতাপশালী মৌখরিদের শেষ চিহ্ন হইল ছোট রাজকুল। যেদিন হইতে মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষবর্ধন তাঁহার ভগ্নীপতির রাজ্যও নিজের ছত্রছায়ায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন হইতে ঐ ভগ্নীপতির দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়- যিনি মৌখরি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেন— এই নগরে আশ্রয় লাভ করিলেন। এদিকের জনসাধারণের মধ্যে এখনও মৌখরি-বংশের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা বর্তমান। মৌখরি-বংশের এই আত্মীয় অতি অল্পকালই স্থাণ্বীশ্বরে বাস করিতেছেন। ইঁহার অন্তঃপুরকেই লোকে ছোট রাজপরিবার বলিয়া থাকে। এই ছোট রাজপরিবারের ঐশ্বর্যের কথা নিপুণিকা একটু সবিস্তারেই বুঝাইয়া দিল, তাহার কলংকের কথাও তেমনি সবিস্তারে ব্যক্ত করিল। কান্যকুব্জের রক্ষণশীল সমাজে মৌখরিদের প্রতি প্রীতি ও সম্ভ্রমের ভাব আছে, একথা সুচতুর মহারাজ হর্ষবর্ধন জানিতেন। এই কারণে মৌখরি-বংশের এই দাবিদার স্থাণ্বীশ্বরে 'মহারাজ' নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে কোনও অধিকার দেওয়া হয় নাই, কিন্তু সম্পত্তি দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার মধ্যে এক দায়িত্ববিহীন ভোগলিপ্সা বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা এখন অত্যন্ত নিকৃষ্ট অনাচারের আকার ধারণ করিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ একথা জানিতেন; কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও মৌখরি-বংশের মান আছে বলিয়া সাহস করিয়া এই ছোট মহারাজকে সরাইয়া দিতে পারেন নাই। এই ছোটো মহারাজার বাড়িতে আজ এক মাস হইল অত্যন্ত সাধ্বী এক রাজকুমারী

---

১ তুঃ কাদম্বরী, কথামুখের সন্ধ্যা-বর্ণনা।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্দিনী হইয়া আছেন। যদিও নিপুণিকা এই কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, কিন্তু ঐ রাজকন্যার কথা উঠিতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে তাঁহার এক একটি কথা সবিস্তরে উল্লেখ করিয়া পরিণামে অশ্রুসজল নেত্রে বলিল—'ভট্ট, উনি অশোকবনের সীতা, উঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া নিজের জীবন সার্থক কর।' জীবন সার্থক করিবার উপায় নিপুণিকা নিজেই আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। উহা হইল এক ছোটো মত বিষমাখানো ছোরা, যাহা অনায়াসে গাত্রাবরণে লুকাইয়া রাখা যায়। উহা দেওয়ার সময় সে একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—'ইহার কোনও প্রয়োজন হইবে না ভট্ট, কিন্তু রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি!' আমি হাসিয়া নিপুণিকার পানে তাকাইলাম। সে-ও হাসিতে লাগিল।

আমরা দুজনে নীরবে পথ চলিতেছিলাম। স্ত্রী-বেশ ধারণ করিয়া আমি যেন কিছুটা বদলাইয়া গিয়াছিলাম, কারণ এক অকারণ ভীরুতা থাকিয়া থাকিয়া আমাকে জাগাইয়া দিতেছিল, পরিহিত কঞ্চুকবন্ধ যেন কোন অজ্ঞাত মহা-গৌরবের নিরোধ-যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। আগুল্‌ফলম্বিত উত্তরীয় কোনও অননুভূত সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সারা বাহ্য জগৎ হইতে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। রাজপথ শান্তই ছিল, শুধু দূর হইতে কোনও বিপুল জনসমারোহের ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। নিপুণিকা মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে ডাকিল—'সুদক্ষিণে!' আমি একটু চমকিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইলাম। দক্ষ ভট্টের এই সুকুমার সংস্করণ প্রথম সম্বোধনেই স্পষ্ট হইয়া গেল। আমি একটু হাসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলাম—'হলা নিপুণিকে!' নিপুণিকার চক্ষু আনন্দাতিশয্যে বিকচ পুণ্ডরীকের মত উন্মীলিত হইল। সহাস্য মুখমণ্ডলের মৃদু সংবরণের জন্য গ্রীবা ঈষৎ বক্র হইল, আর সে উল্লাস-গদ্‌গদ স্বরে সাধুবাদ করিল—'অভিনয় উত্তম শ্রেণীর হইয়াছে!' আমি সংকোচ ও লজ্জার হাসি হাসিলাম। আমি ছিলাম এসব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। নিপুণিকা এমন ভাবে চলিতে লাগিল যেন উড়িয়া যাইতেছে। বলিল—'এই শব্দ মদনোদ্যান হইতে আসিতেছে, সুদক্ষিণা! আজ চৈত্র শুক্লাত্রয়োদশী। মদন-পূজার দিন। আজ কুমারীরা ব্রত করিয়া থাকিবে, কামদেবের পূজা দিয়া থাকিবে, বরদানে নিজেদের ইষ্ট বর চাহিয়া লইয়া থাকিবে। কান্যকুব্জে এই উৎসব বড় আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা হয়। আজ মদনোদ্যানে কুমারীরা ফুল তুলিয়াছে, মালা গাঁথিয়াছে, কুংকুম ও আবীরের তিলক ধারণ করিয়াছে ও লাক্ষারস দিয়া ভূর্জপত্রের উপর নিজের নিজের অভীষ্ট বরের প্রতিমা আঁকিয়া গোপনে কুসুম-সায়ককে উপহার দিয়াছে।[২] আজ অন্তঃপুরে খুবই ধুমধাম হইবে।

---

[২] ভবভূতির 'মালতীমাধবে' এই প্রকার একটি উৎসবের বর্ণনার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

অশোকে দোহদ উৎপন্ন করিবার জন্য অন্তঃপুরিকারা প্রমোদবনে চলিয়া গিয়া থাকিবে। সেখানে আজ মদিরা ও মৃদঙ্গের উৎসব চলিতেছে বোধ হয়। ভট্ট, না, সুদক্ষিণা, আজ যুবতীদের আনন্দক্রীড়ার উৎসব। সেই রাজকন্যার উদ্ধারের ইহার চেয়ে অধিক উপযুক্ত অবসর আর মিলিবে না। তোমার মধ্যে কিঞ্চিৎ দ্বিধা দেখিতেছি। না, এ দ্বিধা ঠিক নয়!'

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম। আমার মনে কোনও সংশয় ছিল না, কিন্তু এই আশংকা অবশ্য ছিল যে বুঝি ধরিয়া ফেলিবে, চিনিতে পারিবে। ঈষৎ ক্ষীণ কণ্ঠে যেন অভিনয়ের মত করিতে করিতে আমি বলিলাম—'হলা, লজ্জা তো তরুণীদের স্বাভাবিক অলংকার।' নিপুণিকা রসগ্রহণ করিতে করিতে বলিল—'হইতে দাও না; কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক করিয়া তোলা তো ঠিক নয়। না হলা, আজ লজ্জা-সংকোচ দূরেই রাখ। আজ তরুণীদের উন্মত্ত বিলাসের বিধি।' বুঝিতে পারিলাম। যেখানে সংশয় ছিল, সেখানে আজ উন্মত্ততা বিরাজ করিবে। চন্দ্রমা এখন ধীরে ধীরে উপরে আসিয়া গিয়াছিলেন। যাহা কিছু অন্ধকার ছিল, তাহা দূর করিয়া দেওয়ার যেন সংকল্প ছিল। আমরা রাজবাড়ির দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম।

নিপুণিকা বার বার ছোট রাজবাড়ির কথা বলিতেছিল। আমার তখন রাজবাড়ির অপেক্ষা 'ছোট' কথাটিই অধিক কানে বাজিতেছিল। এই কারণে আমি মনে মনে এক ছোট অন্তঃপুর কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু দ্বারদেশে আসিয়াই আমার নিজের ধারণার পরিবর্তন করিতে হইল। দ্বারের উপর বিস্তীর্ণ রাজবাড়ির বৃক্ষ-বাটিকা দূরদেশ পর্যন্ত প্রসারিত আছে বলিয়া দেখা যাইতেছিল। বাহিরের দিকে অশোক, পুন্নাগ, অরিষ্ট, শিরীষ আদি ছায়াদায়ী বৃক্ষ লাগানো ছিল! তাহাদের হরিস্বর্ণ ঘন পত্ররাশির উপর জ্যোৎস্না ঢলিয়া পড়িয়াছিল! আমার সম্মুখে লৌহের অর্গলযুক্ত বিরাট কপাট ও সশস্ত্র রক্ষী-দল না থাকিলে আমি সেই চাঁদিনী রাতে এই বিশাল রাজবাড়িকে এক ঘন জঙ্গল বলিয়াই মনে করিতাম। তখন আমি ঠিক ধরিতেই পারি নাই যে উহা এই রাজবাড়ির বাহিরের প্রকোষ্ঠ-ঘর কি না। কেবল এক বক্র পথে বাহির হইয়াছিল বলিয়া এইটুকু অনুমান করিতে পারিলাম যে ডান দিকে পুরুষদের বহিঃপ্রকোষ্ঠ আছে। দ্বারী নিপুণিকাকে চিনিত, আমাদের ভিতরে যাইবার কোনও বাধা হইল না! নিপুণিকা একটু হাসিয়া দ্বারীকে তাম্বূল-বীটিকা দিতে দিতে বলিল—'নাগ, খবর কি?' নাগ হাসিতে হাসিতে বলিল—'উপদ্রব, আর খবর কি আছে?' আমরা দুজনে ভিতরে চলিয়া গেলাম। বাটিকার বীথিগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল, কিন্তু দুই পার্শ্বের ঘনবৃক্ষের ছায়ার জন্য অন্ধকার দেখাইতেছিল। একটু ঘুরিয়া আমরা অন্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া

উপনীত হইলাম। দরজার এক পার্শ্বে একজন দ্বাররক্ষিণী স্ত্রী বসিয়াছিল। তাহার হাতে ছিল এক উলঙ্গ তরবারি, আর বাম দিকে এক ক্ষুদ্র কৃপাণ কোষ-বদ্ধ অবস্থায় ঝুলিতেছিল। রক্ষিণীর দেহ খুব সবল না হইলেও তাহার বেশ দেখিয়া মনে হইল, বুঝি চন্দনদ্রুমে বিষধর সর্প জড়াইয়া আছে। মুহূর্তের জন্য আমার বুক ধড়াস করিয়া উঠিল, কিন্তু একটু নিকটে যাইতেই রহস্য পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার স্বাভাবিক কোমলতা কঠোর বেশের জন্য আরও খুলিয়াছিল। যদিও তাহার বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, তথাপি তাহা হইতে এক মনোহারিণী দীপ্তি যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন নীলমণি দিয়া গড়া সুকুমার এক পুত্তলিকা। তেমনই তাহার সমস্ত দেহ আগুল্‌ফলম্বিত নীল কঞ্চুকে আবৃত ছিল, আর মাথার উপরে লাল উত্তরীয় বাঁধা। কিন্তু ইহাতে তাহার শোভার লেশমাত্র হানি হয় নাই, বরং সে সন্ধ্যাকালীন লাল সূর্যকিরণে আচ্ছাদিত নীলকমলের বনস্থলীর মত অধিক রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। ধবল জ্যোৎস্না একদিকে বৃক্ষবাটিকার ঘন-চিক্কণ নীলিমাকে উজ্জ্বলতর করিতেছিল, অন্য দিকে এই দ্বাররক্ষিণীর কানের দন্ডপত্র তাহার মসৃণ কপোলমন্ডল উদ্‌ভাসিত করিতেছিল। তাহার চরণলগ্ন অলক্তক-রস দূর হইতেই দেখা যাইতেছিল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হইল যে হঠাৎ কি মহিষাসুরের বক্ষে নৃত্য করিয়া কবালকৃপাণধারিণী মহাদুর্গা আসিলেন? তাহার ভীমকান্ত রূপ আমার মনে ভয় অপেক্ষা আনন্দই বেশি উৎপন্ন করিতেছিল। তথাপি মনে মনে ভয় তো ছিলই। আমি উত্তরীয়খানি সীমন্তের অনেকটা নীচে টানিয়া আনিলাম আর চকিত মৃগীর মত অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিপুণিকার পিছনে লুকাইয়া গেলাম। প্রকৃতপক্ষে সে মদ্য পান করিয়াছিল। যদিও তাহার রূপের মনোহারিতা ও মলিনতা আমাকে ভগবান্ ত্রিলোচনের নয়নাগ্নিতে ভস্মীভূত মদন দেবতার ধূমে মলিন রতির কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তথাপি তাহার চোখের লালিমা ও অলস জড় ভ্রূলতা বলিয়া দিতেছিল যে মদিরার পূর্ণ প্রভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে একবার স্খলিত বাক্যে নিপুণিকাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, এবং পুনরায় শিথিলভাবে পড়িয়া থাকিল। আমরা দুইজনে আবার মূল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। এখানেও খানিকটা দূর পর্যন্ত বড় বড় বৃক্ষ ছিল; আরও কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম কুব্জক, মল্লিকা, কুরন্টক, নবমালিকা প্রভৃতির গুল্ম। যদিও জ্যোৎস্নায় সমস্ত স্পষ্ট দেখাইতেছিল না, কিন্তু গন্ধ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছিল যে কোথাও বকুলবীথি, কোন দিকে সিন্ধুবারের সারি, কোন ধারে চম্পকের গুল্ম লাগানো হইয়াছে। নানা জাতীয় পুষ্পের সম্মিলিত সৌরভের এক প্রকার ফোয়ারা যেন চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। দূর হইতে মৃদঙ্গ, কাহল

ও শঙ্খের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল। প্রেঙ্খা-দোলার ঘণ্টাধ্বনিও স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। কেহ না বলিয়া দিলেও বুঝিলাম যে মদনোৎসব এই পল্লীতে পূর্ণোদ্যমে পালিত হইতেছে।

পুষ্পগুল্মের বীথিতে আমরা থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম যে দুইজন পরিচারিকা দ্বিপদীখণ্ড গান করিতে করিতে আমাদের দিকে আসিতেছে। তাহাদের হাতে ছিল আম্রমঞ্জরী, তাহারা উন্মত্তের মত নৃত্য করিতেছিল। তাহারা যে মধু পানে মত্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। কারণ তাহারা নারীসুলভ মর্যাদাজ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছিল। নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের কেশপাশ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কবরীবন্ধন মালতীমালা না জানি কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল, পায়ের নূপুর নৃত্যাবর্তের বেগ সামলাইতে না পারিয়া দ্বিগুণ জোরে ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিতেছিল—তাহাদের ভিতরে বাহিরে উন্মত্ত আমোদের আঁধি বহিয়া যাইতেছিল।[৩] তাহাদের মধ্যে একজন নিপুণিকার দিকে আগাইয়া আসিল। জানা গেল, তাহারও নাম নিপুণিকাই হইবে, কারণ সে 'মিত্তিয়া' সম্বোধন করিয়া নিপুণিকাকে ডাকিতেছিল। একটু কাছে আসিয়া সে নিপুণিকাকে ডাকিয়া বলিল—'মিত্তিয়া, আজ তো তোমারই জয় জয়কার। মহারাজ ঘোষণা করিয়াছেন, যে পরিচারিকা নববধূকে প্রমোদবনোৎসবে লইয়া আসিবে, তাহাকে নিজের রত্নহার উপহার দিবেন। তবে যাও না সখী, আর কাহার এত সৌভাগ্য যে নববধূকে ঘর হইতে বাহিরে আনিতে পারিবে। উনি তো পূজায় ব্যস্ত আছেন। অনেক দেখিয়াছি, এই রাজবাড়িতে এমন পূজারিণী কত গণ্ডা আসিয়া গিয়াছে। আরে, এই নতুন পাখি কোথা হইতে ধরিয়া আনিয়াছ, মিত্তিয়া!' এই বলিয়া সে আমার দিকে মুখ ফিরাইল। নিপুণিকা ধীরে ধীরে আমার কানে কানে বলিল—'এ ক্ষীবা।' আমি অর্থ বুঝিলাম। কান্যকুব্জের ভাষায় ক্ষীবা অর্থে মদ্যপায়িনী স্ত্রী। নিপুণিকা আমাকে সাহস দেওয়ার জন্য একথা বলিয়াছিল। বলিতে বলিতে সেই স্ত্রী আমার নিকট আসিল। আমি বুঝিলাম, এখন পরিচয় করিতে চায়। কিন্তু তাহার মুখ হইতে এমন গন্ধ বাহির হইতেছিল যে আমাকে বাধ্য হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে হইল। নিপুণিকা সুযোগ পাইল। বলিল—'উহাকে গালি দিও না মিত্তিয়া, গ্রাম হইতে নূতন আসিয়াছে, এখানকার ধরন-ধারণ এখনও কিছু জানে না।' মিত্তিয়া হাসিয়া উঠিল। 'দুই দিনে শিখিয়া লইবে, ভাই, কতজনের চোখে চোখে নাচিয়া বেড়াইবে!' কিন্তু তাহার বেশি সময় ছিল না। সখীর সঙ্গে নাচিতে নাচিতে সে আবার একদিকে চলিয়া গেল। আমি স্বস্তির

[৩] তুঃ রত্নাবলী, ১ম অঙ্ক।

নিঃশ্বাস ফেলিলাম। নিপুণিকা সাহস দিয়া বলিল—'সব ক্ষীবা, বন্ধু, সকলেই ক্ষীবা!'

তখন দক্ষিণবায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছিল। বৃক্ষলতাগুল্ম সকলই নিস্তব্ধ। তাহাদের মুগের মত লালাভ কিশলয় সম্পৎ তাহাদের সমস্ত সৌন্দর্যকে লাল করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের উপর গুঞ্জনরত ভ্রমরের শব্দ স্খলিতবাক্যের মত শোনাইতেছিল, মলয়ানিলের মৃদুমন্দ তরঙ্গে আহত হইয়া তাহারা সত্যই যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। হয়তো মধুমাসের মধুপানে তাহারাও মত্ত হইয়া থাকিবে। অন্তঃপুরের পরিচারিকারাই শুধু নহে, কুসুমলতাও ক্ষীবা হইয়াছিল।[৪] আমি নিপুণিকার কথায় রহস্য করিয়া টিপ্পনী কাটিলাম—'নিউনিয়া, সকলেই ক্ষীবা।' নিপুণিকা মুখের উপর অঙ্গুলি রাখিয়া ইশারা করিল—চুপ! আর নত হইয়া এক বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। সমস্ত অন্তঃপুরের উন্মত্ত বিলাস-লীলার বিরুদ্ধে এই বৃদ্ধ সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘ শ্বেত কঞ্চুকে সমস্ত দেহ ছিল আবৃত। মস্তকের ও কর্ণযুগলের সমস্ত কেশরাজি দুগ্ধবৎ শুক্ল হইয়া গিয়াছিল। ইনি কঞ্চুকী। ইঁহাকে দেখিয়াই আমাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। বৃদ্ধকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই নিপুণিকা বলিয়া উঠিল—'আর্য, ইনি গ্রাম হইতে নূতন আসিয়াছেন, কোনও রীতি-নীতি জানেন না।' আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—"প্রণাম কর সুদক্ষিণা, ইনি আর্য বাভ্রব্য। অন্তঃপুরিকাদের নিকট ইনি পিতার মত পূজনীয়।' আমি ভূমিতে জানুপাত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বাভ্রব্যের নিকট হইতে সৌভাগ্যবতী হইবার আশীর্বাদ লাভ করিয়া আমরা দুইজনে বিরাট অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

যে নববধূকে প্রমোদবনে লইয়া যাইবার জন্য ছোট মহারাজা রত্নহার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, এই সেই রাজকন্যা, যাঁহার উদ্ধারের জন্য আমি চোরের মত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছি। নিপুণিকা মৃদুগুঞ্জনে আমার কানে কানে বলিল—"আজ মহাবরাহ অবশ্যই প্রসন্ন হইয়াছেন, না হইলে ছোট মহারাজা এমন ঘোষণা করিবেন কেন?' পুনরায় নানা অলিন্দ ও কুট্টিম-বীথির মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা সেই রাজকন্যার গৃহে উপনীত হইলাম। তখন তিনি সত্যই পূজাবেদীর উপর বসিয়াছিলেন। তাঁহার পূজায় যাহাতে কোনও প্রকার বিঘ্ন না জন্মে সেজন্য নিপুণিকা আমাকে চুপচাপ এক কোণে বসিয়া থাকিতে ইশারা করিল, আমিও ধীরভাবে বসিয়া একবার সমস্ত গৃহখানি মনোযোগ-

[৪] তুঃ রত্নাবলী, ১ম অঙ্ক।

পূর্বক দেখিয়া লইলাম। ঘরের এক প্রান্তে এক নাতিদীর্ঘ শয্যা পাড়িয়া ছিল। তাহার দুই প্রান্তে দুইটি উপাধান রক্ষিত ছিল। সমস্ত শয্যা দুগ্ধধবল প্রচ্ছদপটে আবৃত। শয্যার শিরোদেশে কূর্চস্থানে মহাবরাহের এক ভাবময়ী মূর্তি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। মহাবরাহের বিশাল দংষ্ট্রা আকাশের দিকে এমনভাবে উঠিয়া গিয়াছিল, যেন এখনই সবেগে সমুদ্র হইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার দিকে নিবন্ধদৃষ্টি ধরিত্রীর ভীতচকিত মূর্তি বড়ই মনোহারিণী বলিয়া দেখা যাইতেছিল। মহাবরাহের চক্ষুদ্বয় ঠিক প্রস্ফুটিত পদ্মের মত দেখাইতেছিল, এবং সমস্ত শরীর উৎপলপত্রের মত সমান ঘন-চিক্কণ নীল বর্ণের দেখাইতেছিল। প্রকৃত পক্ষে মূর্তিখানি একই নীল প্রস্তর হইতে নির্মিত হইয়াছিল। জীবন্ত নীলাচলের সমান স্ফূর্জিতবীর্য মহাবরাহের মনে মনে ধ্যান মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে প্রণাম করিলাম।* এই মহাবরাহের মূর্তির নীচে এই অন্তঃপুরের নববধূ ও আমাদের অশোকবনের সীতা ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন। তাহার পার্শ্বে এক বেদিকার উপর মাল্য-চন্দন ও অনেক প্রকারের উপলেপন রক্ষিত ছিল। এক ক্ষুদ্রাকার স্ফটিক পীঠিকার উপর সুগন্ধি সিকথ-করণ্ডক ও সৌগন্ধিক পুটিকা রক্ষিত ছিল। একটু দূরে পশ্চাৎভাগে এক কাঞ্চনপাত্রে মাতুলুংগের ছাল ও পানের অন্যান্য উপকরণ রক্ষিত ছিল। শয্যাব পাদদেশে রৌপ্যনির্মিত পতদ্‌গ্রহ ছিল। উপরে দেওয়ালে হস্তিদন্তনির্মিত দণ্ডেব উপর লোহিতবর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত এক বীণা ছিল। দণ্ড কিন্তু শূন্য ছিল, কারণ উহা হইতে পিপঞ্চী নীচে নামাইয়া পূজানিরতা রাজকন্যা ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন। দেওয়ালের অন্য দিকে শ্বেতপট্টের আবরণ ছিল, হয়তো তাহা হস্তিদন্তনির্মিত, নতুবা ঐ ধরনের কোনও শুভ্র-প্রস্তরের। তাহাতে চিত্রফলক, তুলিকা ও বর্ণাধার এবং ভূর্জপত্রে লিখিত এক পুস্তক রক্ষিত ছিল। এ দেশে প্রচলিত পুঁথি হইতে এই পুস্তক কিছুটা পৃথক ধরনের। তাহাব পত্রগুলি মুক্ত নয়, পত্রগুলির উপর পাটার বন্ধন দেখা যাইতেছিল। অন্য এক নাগদণ্ডেব (খুঁটি) উপর কুরণ্টকমালা অতি সুকুমার ভঙ্গীতে লম্বিত ছিল। হযতো কুরণ্টকমালার এই গুণ যে, উহা অনেকক্ষণ ধরিয়া শুকায় না, তাই উহা এখানে আনা সম্ভব হইয়াছিল।* গৃহের আসবাবপত্র অতি সামান্যই, তথাপি বেশ ভবা-ভরা দেখা যাইতেছিল।

এই সময়ে সেই রাজকন্যা বীণা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে

---

* মহাবরাহের ধ্যান :
ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া মহাবরাহঃ স্ফুট-পদ্ম-লোচনঃ।
রসাতলাদুৎপল পত্রসন্নিভঃ সমুত্থিতো নীল এবাচলো মহান্‌ ॥

* বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র নাগব গৃহ-বর্ণনা তুলনীয।

তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। এবার আমি স্বাভাবিক সংকোচ ত্যাগ করিয়া এই কমনীয়তার মূর্তির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত হীন ব্যক্তির হৃদয়েও ভক্তির উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার সারা দেহে স্বচ্ছকান্তি প্রবাহিত হইতেছিল। শরীর অতিধবল প্রভাপুঞ্জ দিয়া যেন একপ্রকার আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতেছিল। যেন তিনি স্ফটিকগৃহে আবন্ধ, অথবা দুগ্ধসলিলে নিমগ্ন, অথবা বিমল চীনাংশুকে সমাবৃত, অথবা দর্পণে প্রতিবিম্বিত, অথবা শরৎকালের মেঘপুঞ্জে অন্তরিত চন্দ্রকলা। তাঁহার ধবলকান্তি দর্শকের নয়নপথ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কলুষ ধবলিত করিয়া দিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন মন্দাকিনীর ধবলধারা সমস্ত কলুষ-কালিমা ধুইয়া পুঁছিয়া ফেলিতেছে। মনে বার বার প্রশ্ন জাগিতেছিল, এত পবিত্র রূপ-রাশি কি করিয়া এই কলুষভরা ধরিত্রীতে সম্ভব হয়? নিশ্চয় ইহা ধর্মের হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে। বিধাতা যেন শংখ হইতে খুদিয়া, মুক্তা হইতে আকর্ষণ করিয়া, মৃণাল হইতে সম্বৃত করিয়া, চন্দ্রকিরণের কূর্চক দিয়া প্রক্ষালিত করিয়া, সুধাচূর্ণ দিয়া ধুইয়া, রজরসে মুছিয়া, কুটজ কুন্দ ও সিন্ধুবার পুষ্পের ধবলকান্তি দিয়া সাজাইয়াই উহা নির্মাণ করিয়াছেন। আহা, কী সেই অপূর্ব পবিত্রতা! এখানে কি মুনিদের ধ্যানসম্পদই পুঞ্জীভূত হইয়া বর্তমান আছে, না রাবণের স্পর্শভয়ে পলায়মান কৈলাস পর্বতের শোভাই স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে, না বলরামের দীপ্তিই বলরামের মত্তাবস্থায় তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, না মন্দাকিনীর ধারাই এই পবিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে![৭] তিনি ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে গান করিতে করিতে বীণা বাজাইতে লাগিলেন। এমন বীণা পূর্বে কখনও শুনি নাই। আবাল্য অভিনয় দেখিয়াই কাটাইয়াছি। হায়, সত্য ভক্তি তো কখনও দেখিই নাই। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে অভিনয় করিবার সময় আমি একবার বীণাকে অসমুদ্রোৎপন্ন রত্ন অবশ্য বলিয়াছিলাম; কিন্তু কথাটার অর্থ তো আজই বুঝিলাম। সেদিন আমি বন্ধুদের সহিত কৌতুক করিতে করিতে শূদ্রকের ঐ শ্লোকটি লইয়া উপহাস করিয়াছিলাম। সেদিন বুঝিতে পারি নাই, সংকেতস্থানে প্রতীক্ষা করিবার সাহস বাঁধা আর অনুরক্ত ব্যক্তির অনুরাগবর্ধন করা ভিন্ন আর এমন কি আছে, শূদ্রক যাহার নাম উৎকণ্ঠিতের বয়স্যতা দিয়াছেন? উৎকণ্ঠিত তো বিরহকাতর ব্যক্তিকেই বলে, তাহার অনুকূলতা তো অনুরাগবর্ধনেই সমাপ্ত হয়। আমি সেদিন এ রহস্য বুঝিতে পারি নাই। আজ দেখিতেছি সত্যই

---

[৭] তুঃ কাদম্বরীতে মহাশ্বেতা-বর্ণনা।

উৎকণ্ঠিত হইলে কি হয়। বীণা সত্যই অসমুদ্রোৎপন্ন রত্ন। শূদ্রকের কথার তাৎপর্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি।*

ধীরে ধীরে বীণা বন্ধ হইল। প্রমোদবনের দিকের গবাক্ষ হইতে প্রমোদ-বনের উৎসবের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। নর্তকীদের একদল চর্চরী তালের সঙ্গে গান করিতে করিতে এইদিক আসিতেছে বলিয়া জানা যাইতেছিল। তাহাদের সম্মিলিত ধ্বনিতে কেমন বুভুক্ষা ছিল, পিপাসা ছিল, আর যেন ক্ষুৎপিপাসা কখনও দূর বা তৃপ্ত হইবে না এমন একটা অস্থিরতার ভাব ছিল। ঈষৎ স্পষ্ট ধ্বনিতে দূর হইতে গান শোনা যাইতেছিল—

ইহ পঢমং মহুমাসো জণস্‌স হিঅআই কুণই মিদুলাই।
পচ্ছা বিন্ধই কামো লদ্ধপ্পসরেহি কুসুমবাণেহি॥[১]

আর এই রাগভরা গানের পৃষ্ঠভূমিতে আমাদের 'অশোকবনের সীতা' ভক্তিকাতর বাক্যে মহাবরাহের স্তুতি করিতেছেন :

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা বিষাণকোট্যাখিলবিশ্বমূর্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা স মে স্বয়ংভূর্ভগবান্ প্রসীদতু॥

আবার তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহাবরাহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে তিনি ইষ্টদেবকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। শয্যায় বসিবার পরেও অল্পক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার চক্ষু ভক্তির মাদকতা হইতে মুক্ত হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে তিনি আমাদের দুইজনের দিকে তাকাইলেন। আহা, দৃষ্টিতে এতখানি পাবকশক্তি থাকে! সে দৃষ্টি যেন পুণ্যরশ্মির দ্বারা দ্রষ্টব্যকে উদ্ভাসিত করিতেছিল, তীর্থ-বারিধারায় প্লাবিত করিতেছিল, তপস্যার দ্বারা পবিত্র করিতেছিল আর সত্যের অন্তর্নিহিত ভাবের তাপের দ্বারা হৃদয়ের অশেষ পাপভাবকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছিল। আমার এমন মনে হইল যে বেদের পবিত্রবাণী বিগ্রহবতী হইয়া আমাকে আজ ব্রাহ্মণত্বের বরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। আজ আমার প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে?

নিপুণিকা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিল, আমিও তাহার অনুকরণ করিলাম। রাজকন্যা বিশ্বাসের দৃষ্টিতে নিপুণিকার দিকে তাকাইলেন। নিপুণিকার

---

* উৎকণ্ঠিতস্য হৃদয়ানুগুণা বয়স্যা সংকেতকে চিররতি প্রবরো বিনোদঃ।
সংস্থাপনা প্রিয়তমা বিরহাতুরাণাং রক্তস্য রাগপরিবৃদ্ধিকরঃ প্রমোদঃ॥
মৃচ্ছকটিক, ৩-৪

[১] তুঃ রত্নাবলী, ১ম অঙ্ক।

পক্ষে তিনি ছিলেন পার্বতীর মতো বন্দনীয়া আর তাঁহার নিকট নিপুণিকা ছিল সখী ও বয়স্যার মতো দুঃখসঙ্গিনী। একবার তিনি তাঁহার স্নেহমেদুর বৃহৎ নেত্রে আমার দিকে তাকাইলেন। সে দৃষ্টিতে ছিল জিজ্ঞাসার ভাব। নিপুণিকা অগ্রসর হইয়া অতি ধীরে ধীরে কিছু বলিল। সে আমার বিষয়ে কিছুই গোপন করিল না; কারণ মুহূর্তের মধ্যে রাজকন্যার চক্ষুতে লজ্জার ভাব উদয় হইল, তাঁহার ধবলায়মান গণ্ডস্থলে লজ্জার লালিমা ধাবিত হইল। ক্ষণেকের জন্য তিনি খানিকটা ম্লানও হইয়া গেলেন। তখন আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য নিজেরই বড় ক্ষোভ হইল; কিন্তু নিপুণিকা কি জানি কি বলিয়া তাহা সামলাইয়া লইল। রাজকন্যা অপাঙ্গে আমার প্রতি একবার ও মহাবরাহের প্রতি কাতরভাবে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতেছিল। সে কাতর দৃষ্টির অর্থ স্পষ্ট—ইষ্টদেব, এখন আর কতই দেখাইবে! নিপুণিকা কিন্তু তাঁহার কানে কানে কিছু বলিয়াই চলিতেছিল। কিছুকাল পর্যন্ত আমি গ্লানিতে ও লজ্জায় বসিয়াছিলাম ও রাজকন্যা নানা চিন্তায় ডুবিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে উঠিলেন। নিপুণিকা ঘরের বাহিরে যে চামরধারিণী বসিয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিল—'হঞ্জে, আর্য বাভ্রব্যকে বলিয়া দাও যে নববধূকে প্রমোদবনে যাইতে নিপুণিকা সম্মত করিয়াছে। তিনি আসিতেছেন।'

চামরবাহিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। খানিকক্ষণ সে ইহা পরিহাস মনে করিল। কিন্তু নিপুণিকা যখন একথা দুইবার বলিল, তখন সে উল্লাসে দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল। মনে হইল যে ক্ষণেকের মধ্যে এ সংবাদ সমগ্র অন্তঃপুরে রাষ্ট্র হইয়া গেল। প্রমোদবনের অন্যান্য বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল, শুধু মঙ্গল শংখ থাকিয়া থাকিয়া বাজিতে লাগিল। আর্য বাভ্রব্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া জয়ধ্বনি দিলেন—'ভাবী মহাদেবীর জয় হউক!' নিপুণিকা জোরে তাহার প্রতিধ্বনি করিল—'জয় হউক!' রাজকন্যা, নিপুণিকা ও আমি ধীরে ধীরে রাজভবন হইতে প্রমোদবনের দিকে যাইতে উদ্যত হইলাম। রাজকন্যা পুনরায় একবার মহাবরাহের দিকে ভক্তিপূর্বক তাকাইলেন, তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, আর তাঁহার চরণতল হইতে একখণ্ড বস্ত্র টানিয়া লইয়া নিপুণিকাকে দিলেন। নিপুণিকা নিঃশব্দে তাহা আমার দিকে সরাইয়া বলিল—'রাখিয়া দাও।' মহাবরাহের সেই প্রসাদ আমি সযত্নে রাখিলাম।

আমরা তিনজন যখন প্রমোদবনের প্রবেশদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাজবাড়ির পরিচারিকাদের এক মণ্ডলী আনন্দকোলাহল করিতে করিতে আসিতেছে দেখা গেল। তাহারা বারবার 'ভাবী মহাদেবীর জয় হউক' বলিয়া উল্লাস প্রদর্শন করিতেছিল। তাহাদের বেশ অসংবৃত, বাণী স্খলিত। ভাবী

মহাদেবীর মুখমণ্ডলে ভাবপরিবর্তনের কোনও চিহ্ন ছিল না। তিনি আমার দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া থামিয়া গেলেন। নিপুণিকাকে জনান্তিকে তিনি কিছু বলিলেন; কিন্তু এত জোরে বলিলেন যে আমার শোনার পক্ষে কোনও বাধা হইল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকেই শোনাইতে চাহিতেছিলেন। বলিলেন—'নিপুণিকা, অন্তঃপুরের মর্যাদা ভঙ্গ হওয়া উচিত নয়। কুমারী ও পরিচারিকাদের আজকার ব্যবহার অসংযত।' পুনরায় আমার দিকে ফিরিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—'ভদ্র, আপনি আমাদের অকারণবন্ধু; কিছু মনে করিবেন না, অন্তঃপুরের এক মর্যাদা আছে।' আমি বুঝিতে পারিলাম। দুই হাত জুড়িয়া শির নত করিয়া, কথা না বলিয়াও উত্তরে জানাইয়া দিলাম যে তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ আমার শিরোধার্য। নিপুণিকা সুচতুরা, সে তখনই ফিরিয়া আর্য বাভ্রব্যের নিকট চলিয়া গেল ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আর্য বাভ্রব্য পরিচারিকাদের সুপ্রধানাকে ডাকিয়া বলিলেন—'ভাবী মহাদেবী আজ তাঁহার এই দুই সহচরীর সঙ্গেই প্রমোদবন ভ্রমণ করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার আদেশ, তাঁহার কোনও কার্যে তোমরা অন্তরায় হইবে না।' পরিচারিকারা সসম্ভ্রমে তাঁহার কথা শুনিল, তাহারা সমস্বরে বলিল, 'ভাবী মহাদেবীর জয় হউক'। তাহার পর তাহারা অন্যদিকে চলিয়া গেল।

'ভাবী মহাদেবী' প্রমোদবনের বাহিরে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃক্ষবাটিকার দিকে চলিয়া গেলেন। বাটিকার মাঝামাঝি এক প্রকাণ্ড বাপী। সমস্ত বাপী কুমুদকহ্লারে পরিপূর্ণ ছিল। জ্যোৎস্নার শুভ্রতা তাহার স্বচ্ছতাকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা তিনজনে সেখানে পৌঁছিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। রাজকন্যা নিপুণিকার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'এখন!' এই বলিয়া প্রস্তর-নির্মিত ঘাটে অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন। নিপুণিকা বলিল—'দেবি, মহাবরাহ সহায় আছেন। ভগবানের দয়ায় দক্ষভট্টের মত সাহসী ও ভদ্র ব্যক্তি আমাদের সাহায্যের জন্য পাওয়া গিয়াছে। দ্বিধা ত্যাগ করুন। উঠুন।' রাজকন্যা আমার প্রতি প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাইলেন। আমি ধীরে অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিলাম—'অভাগা দাসের এক পুণ্য কার্য করিবার সুযোগ জুটিয়াছে। সাহস করুন। যমরাজও আপনার অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।' নিপুণিকা একবার আমার দিকে তাকাইল, রাজকন্যার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল—'ভট্ট, বস্ত্র পরিবর্তন কর। মহাবরাহের প্রসাদবস্ত্র ধারণ কর, আর প্রান্ত বৃক্ষের শাখার সহায়ে প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া যাও। বহির্দ্বারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিও।' আমি সমস্ত বুঝিলাম। বাটিকার এক প্রান্তে গিয়া পুরুষবেশ ধারণ করিলাম। নিপুণিকার সখীর বেশ তাহাকেই দিয়া এক

নাতিদীর্ঘ শিরীষ বৃক্ষে আরোহণ করিলাম এবং বাহিরে আসিয়া রাজপথে দাঁড়াইলাম। নাগ তখন অর্ধনিদ্রিত ছিল। আমি দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন চন্দ্রমা মধ্য গগনে আরূঢ়, মনে হইতেছিল চন্দ্র শুক্ল-বসনধারিণী ধরিত্রীর ললাটে চন্দনতিলক। আজ কি স্বয়ং ধরিত্রীও তাঁহার উদ্ধারকর্তা মহাবরাহের পূজো করিয়াছেন?

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

নিপুণিকা তাহার ভর্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য যে স্থান বাছিয়াছিল তাহা দেখিবামাত্র আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। উহা ছিল এক দেবী-মন্দিরে সংলগ্ন ক্ষুদ্র ও জীর্ণ গৃহ। নিপুণিকার ঘর হইতে আবশ্যক জিনিসপত্র কিছু লইয়া চোরের মত নগরপ্রান্তে সেই মন্দিরের নিকট যখন পৌঁছিলাম, তখন চন্দ্রমা পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল মানসসরোবরে স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, আর কালপুরুষ অস্তগিরির শিখরদেশ স্পর্শ করিয়াছেন দেখা যাইতেছিল। তখনও জ্যোৎস্না দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণে ধরিত্রীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। চণ্ডীমন্দিরের বাহিরে বৃহৎ লৌহদণ্ড দ্বারা নির্মিত এক বিরাট কপাট ছিল। তাহার ভিতর দিয়া চণ্ডীমূর্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। দেবীর সম্মুখে এক লৌহবেদিকার উপর কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ এক মহিষ স্থাপিত ছিল, তাহার সর্বাঙ্গে ভক্তজনেরা লাল ছাপ দিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ বুঝি সাক্ষাৎ যমরাজের বাহন, যমরাজ বুঝি তাঁহার রক্তাক্ত হাত দিয়া থাপড় মারিতে মারিতে উহাকে চালাইয়াছেন। দেবীর চরণপার্শ্বে এক ছোট বেদী ছিল, তাহার উপর লাল-লাল কি একটা যেন দেখা যাইতেছিল। পরে দেখিলাম যে উহা আর কিছু নয়, এক পীড়ির উপর রক্ষিত আবীর-রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড। মন্দিরের সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, তাহার কুট্টিম বিদীর্ণ, তাহার ফাঁক দিয়া হরিদ্বর্ণ তৃণ উদ্গত হইয়া জীবনীশক্তির বিজয় ঘোষণা করিতেছে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যে এক ঘর ছিল, যাহা বাহির হইতে গুহার মত মনে হইত। ঘরের সামনে কিছু অযত্নপরিবর্ধিত করবীর ঝাড় ছিল, তাহার মধ্যে বনকুক্কুটেরা রাত্রির মত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নিপুণিকা অতি সতর্কভাবে সেই ঘর খুলিল, এবং আমরা তিনজনে ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র সাবধানে তাহা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল। বন্ধ করিয়া দিবার পর ঐ আঙিনা চারদিক হইতে ঘেরা হইল। আঙিনায় দুই তিনটি ছোট ছোট কুঠির ছিল, আর একটি জীর্ণপ্রায় কূপ। এই ভগ্নপ্রায় প্রাঙ্গণগৃহ জ্যোৎস্নায়

আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। আঙিনার ভিত্তিতে লালবর্ণে চিত্রিত নানা প্রকারের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। জানা যাইতেছিল, এই ঘরে কখনও কোনও ভৈরব তাহার ভৈরবীর সঙ্গে বামমার্গী সাধনা করিত, কারণ চিহ্নগুলির ঐরূপ অর্থই হইতে পারিত। এই কুসুমসুকুমারী রাজকন্যাকে লুকাইবার জন্য নিপুণিকা এরূপ ভয়ংকর স্থান বাছিয়া না দিয়াছে বুদ্ধির পরিচয়, না দিয়াছে সহৃদয়তার প্রমাণ। কিন্তু তাহার উপায় ছিল না। তাহার মত দাসীর জন্য ইহা হইতে উত্তম স্থান বাছিতে পারা অসম্ভব ছিল। ও কেবল একবার আমার প্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টির স্পষ্টার্থ—'এর চেয়ে বেশি আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল না।' তাহার চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। আমার পৌরুষগর্ব পরাস্ত হইয়াছিল। এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস দ্বারা আমি আমার অসন্তোষ ব্যক্ত করিলাম। আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। সেই নিসর্গ-সুকুমারী রাজকন্যার প্রতি চক্ষু তুলিয়া দেখিবার সাহসও আমার ছিল না। আমি যখন অবসন্ন হইয়া বসিতে যাইতেছিলাম, তখন রাজকুমারী ক্লান্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—'ভদ্র, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, যাহা করিবার আছে তাহা কর।' এই কথা বিদ্যুৎবেগে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে ঝাঁকি দিয়া জাগাইয়া দিল। আমার জড়ভাব চলিয়া যাইতেছিল। এমন মনে হইল, যেন কোন অমৃত-সঞ্জীবনী আমার মধ্যে নূতন প্রাণ ভরিয়া দিল। বিনীতভাবে বলিলাম—'দেবি, আজ এইস্থানে বিশ্রাম করুন। কাল আমি অন্য কোনও ব্যবস্থা করিব। আপনাকে এই স্থানে দেখিয়া বড় কষ্ট হইতেছে, কিন্তু আমি নিরুপায়।' উত্তর মিলিল—'আমার কোনও কষ্টই হইবে না, যাহা কর্তব্য তাহা কর।' নিপুণিকা এক ছোট কুঠরিতে যাইতে ইশারা করিল। তাহার মুখে কথা সরিতেছিল না, হয়তো কাঁদিতেছিল। এই কুঠরি ছিল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও মজবুত। সেখানে পূর্ব হইতেই এক কম্বল বিছানো ছিল। আমরা রাজকন্যাকে সেখানেই অন্ধকারে বিশ্রাম করিতে বলিলাম। রাজকন্যা বসিলে পরে আমরা দুইজনে অন্যান্য কার্যে জুটিয়া গেলাম।

নিপুণিকা কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে কাজ করিতে থাকিল; কিন্তু তাহার প্রত্যেক কর্মে এক ব্যাকুল আশংকার ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আমি তাহাকে ব্যাপার কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রথমটায় সে স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল যে কোনও প্রকারে এখানকার বৃদ্ধ পূজারীকে হাত করিয়া সে এই ঘরটি হস্তগত করিয়াছে। যদিও এই মন্দিরে অতি অল্পসংখ্যক লোকই যাতায়াত করিত, তথাপি এই স্থানটি যে সুরক্ষিত নয় সে বিষয়ে নিপুণিকার কোনও সন্দেহই ছিল না। সে বলিল যে দিনের বেলা এই ঘর একেবারেই বন্ধ থাকা উচিত। আমাকে সারাদিন বাহিরে থাকিতে

হইবে, আর রাত্রে পূজারী শোওয়ার পর তবে নিপুণিকার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু নিপুণিকা বস্তুত যে কথা বলে নাই, তাহাই ছিল তাহার প্রধান বক্তব্য। সে ভয় পাইতেছিল। প্রথমে এই স্থানে আসার পরিণাম সে যত লঘু মনে করিয়াছিল, এখন ততটা লঘু বলিয়া মনে হইতেছিল না। স্ত্রীসুলভ ভীরুতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি সাহস দিয়া বলিলাম—'নিউনিয়া, বাণভট্টের সঙ্গে থাকিয়াও তুমি ভয় পাও?' সে চোখ দুটি নীচু করিয়া থাকিল, স্খলিত স্বরে 'না' বলিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল। প্রাতঃকাল হইতে আর বেশি বিলম্ব ছিল না। আমি বাহির হইয়া আসিলাম। নিপুণিকা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমা পদ্মমধুতে রঞ্জিত বৃদ্ধকলহংসের মত আকাশ-গঙ্গার পুলিন হইতে উদাসভাবে আসিয়া পশ্চিম জলধির তীরে অবতীর্ণ হইলেন। সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল বৃদ্ধ রংকুমৃগের রোমরাজির মতো পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। হস্তিরুধিররঞ্জিত সিংহের জটাভারের মতো, অথবা লোহিতবর্ণের লাক্ষারসের সূত্রের মতো সূর্যকিরণ আকাশরূপী বনভূমি হইতে নক্ষত্ররূপী ফুলগুলিকে এমনভাবে মার্জনা করিতে লাগিল যে মনে হইল উহা বুঝি পদ্মরাগমণির শলাকা দিয়া নির্মিত সম্মার্জনী। তারাগুলি অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দুই একটি তখনও অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের দেখিয়া পশ্চিমাকাশরূপী সমুদ্রতটে শুক্তির উন্মুক্ত মুখ হইতে বিকীর্ণ মুক্তাপটল বলিয়া মনে হইতেছিল। পূর্বদিকে আলো আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ধীরে ধীরে শিশিরবিন্দুবাহী, পদ্মবনপ্রকম্পনকারী, মন্দ মন্দ সঞ্চারী, প্রস্ফুটিত-পদ্মমধুবর্ষী প্রভাতবায়ু, পরিশ্রান্ত নগররমণীদের ঘর্মবিন্দু বিলুপ্ত করিতে করিতে, বন্যমহিষদের ফেনবিন্দুসিক্ত, কম্পমান পল্লব ও লতাগুলিকে নৃত্য-শিক্ষা দান করিতে করিতে, পুষ্পসৌরভে ভ্রমরকুল সন্তুষ্ট করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণ ছোট রাজবাড়িতে কতই কি যেন ঘটিয়া থাকিবে। হয়তো সর্বাপেক্ষা কঠোর আঘাত বৃদ্ধ বাভ্রব্যকেই সহ্য করিতে হইবে। এতক্ষণ হয়তো নিপুণিকার ঘর জ্বালাইয়া দিয়া থাকিবে। আমি আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম, কারণ এই বিপদে আমি নিপুণিকার সঙ্গে ছিলাম, আর সৌভাগ্য-বশত এই নগরীতে কেহ আমাকে চিনিতেও পারিবে না। নিপুণিকার ঘর হইতে আমি যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত লইতে গিয়াছিলাম, তখন আমি নিজের শুক্লবেশ ধারণ করিয়াছিলাম। তখন আমি নিরীহ ব্রাহ্মণ ছিলাম। যদিও সমস্ত রাত্রির ক্লান্তিতে শরীর খানিকটা অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি এ সময়ে আমার বিশ্রাম করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। আমি এ কথাই ভাবিতেছিলাম যে কোনও ভাল জায়গায় কি করিয়া যাইতে পারা যায়।

নিকটবর্তী পুষ্করিণীর ভাঙ্গা ঘাটে হাতমুখ ধুইয়া আমি দেবীর সামনে আসিয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলাম। একটু পিছনেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চণ্ডী মন্দিরের দিকে আসিতে দেখা গেল। তিনি ভক্তিভরে চণ্ডীকে প্রণাম করিলেন এবং পরিক্রমা করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও পরিক্রমা করিলাম, প্রণাম করিলাম। তিনি আমার প্রতি জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইয়া রহিলেন। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে ইতিপূর্বে তিনি আমাকে কখনও দেখেন নাই; আমি কোথা হইতে এখানে আসিয়া পড়িলাম তাহা জানিতে চাহেন। আমি সবিনয়ে জানাইলাম যে আমি বিদেশী, রাত্রে এখানে থাকিয়া গিয়াছিলাম। তিনি খানিকক্ষণ হাসিতে ছিলেন। বলিলেন—'আপনি তো ভাগ্যবান, পুজারীবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই?'

আমি নম্রভাবে উত্তর করিলাম—'পুজারীবাবাকে আমি তো চিনি না।'

তিনি বলিলেন—'জানিলে এখানে থাকিতেন না।'

আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও হাসিয়া পুজারীবাবার পরিচয় দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ খুব রসিক মনে হইল। তিনি পুজারীর বর্ণনা বড়ই সরস ভাষায় করিলেন। বলিলেন যে পুজারী একজন বৃদ্ধ দ্রবিড় সাধু। তাহার দেহের কালো কালো শিরাগুলি এমনভাবে জাগিয়া আছে যে মনে হয় দেহকে প্রজ্বলিত স্তম্ভ মনে করিয়া বুঝি গিরগিটি চড়িয়া আছে। সমস্ত শরীর ক্ষতচিহ্নে এমনই পরিপূর্ণ যে মনে হয় বুঝি অলক্ষ্মীদেবী ঐ দেহ হইতে শুভ লক্ষণগুলি কাটিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া লইয়াছেন। পুজারী খুব সৌখীনও বটে। বৃদ্ধ হইলেও তাহার দুই কানেই ঔড্রপুষ্প ঝুলাইতে ভুল হয় না। সে ভক্তও বটে, কারণ চণ্ডী মন্দিরের চৌকাঠে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া তাহার কপালে অর্বুদ হইয়া গিয়াছে। সে তান্ত্রিক; প্রায়ই বৃদ্ধা তীর্থ-যাত্রিণীদের উপর বশীকরণচূর্ণ ফেলিয়া দেয়। সে প্রয়োগকুশল ব্যক্তিও বটে, কারণ একবার গুপ্তস্থানের নিধি দেখিবার কাজল লাগাইয়া চোখও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সে চিকিৎসকও, নিজের সামনের লম্বা ও উঁচা দাঁতের সমান করিয়া তৈরি করিবার চেষ্টায় অন্যান্য দাঁত হারাইয়াছে, কিন্তু সে উঁচা দাঁত যেখানকার সেইখানেই আছে। সে কৌতুকপ্রিয়, ছেলেদের পিছনে পিছনে একবার ইট লইয়া ছুটিয়াছিল। আর পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে ওষ্ঠ খানিকটা কাটিয়া যায়। অক্ষয় তাহার বিদ্যার ভাণ্ডার। সমস্ত দক্ষিণাপথের সম্পত্তি পাইবার আসায় সে ললাটে তিলক ধারণ করে। সবুজ বহেড়াপত্রের রসে শ্মশানের কয়লা ঘসিয়া তাহা হইতে এক রং রাখিয়াছে, তাহার বিশ্বাস যে উহা দেখামাত্র ধনীদের হৃদয়ে 'উচ্চাটন' হয় এবং তাহারা নিজ নিজ

সম্পত্তি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মায়া-বশীকরণের উপরও তাহার বিশ্বাস। এই কার্যের জন্য সে তালপত্রের পুঁথির উপর আবীরের রং দিয়া একলক্ষ বার 'হুঁফেট্' লিখিয়াছে, এবং গুগ্‌গুলের ধূপে তাহা সুবাসিত করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, এই পুঁথি দেখিয়া রমণীরা তাহার দাসী হইয়া থাকিবে। যদিও চক্ষু সংখ্যায় একটি মাত্র, তথাপি এক চিক্কণ শলাকা দিয়া নিত্য তাহাতে অঞ্জন লাগায়। রাতকানা বলিয়া যদিও রাত্রে দেখিতে পায় না, তথাপি অপ্‌সরাদের অপ্রত্যাশিত আগমনের আশায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। নিদ্রায় কুম্ভকর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু স্বপ্নে অনবরত নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পায়। যদিও বানরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এক পা হারাইয়া বসিয়াছে, তথাপি দুই পায়ের জুতা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণদের সহিত তাহার স্বাভাবিক শত্রুতা, আপনি যদি এখান থেকে চলিয়া না যান, তাহা হইলে অবশ্যই একটা হাঙ্গাম করিয়া বসিবে। ভগবানের এতখানি লোকানুকম্পা অবশ্য আছে যে তিনি উহাকে কানা, খোঁড়া ও কালা করিয়া দিয়াছেন, নহিলে এই স্থাণ্বীশ্বর এতক্ষণ একেবারে লোকবিরল হইয়া যাইত!

বৃদ্ধের এই বর্ণনা শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে নিপুণিকা কি প্রকারে ইহাকে হাত করিয়াছে এবং এখনই বা কেন ভয় পাইতেছে। আমার কৌতূহলও হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলাম—'এমন লোকোত্তর মহাত্মার দর্শন না করিয়া তো যাওয়া চলে না!'

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'অবশ্যই দর্শন করুন, কিন্তু সাবধানে থাকিয়া। কখন মাথায় ডাণ্ডা বসাইয়া দিবে কিছু বলা যায় না।' এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। আমিও প্রাঙ্গণ হইতে দূরে সরিয়া বৃদ্ধ পূজারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে পূজারী বাহিরে আসিল।[১] চণ্ডীমন্দিরের গর্ভগৃহেই সে শুইয়া ছিল। তাহার চোখ দুইটি ছিল লাল। তাহার রূপ বৃদ্ধ যেমন যেমন বর্ণনা করিয়াছিলেন অবিকল তেমনই। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সে কি যেন মন্ত্র পড়িল। তাহার পর হাতের কৌটা হইতে কালোমত চূর্ণ বাহির করিয়া ঐ প্রাঙ্গণ-গৃহের দিকে ছুঁড়িয়া দিল, যেখানে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সে দ্রুতবেগে ঐ গৃহের দিকে অগ্রসর হইল, দুই একবার গতিবেগের জন্য স্খলিতচরণও হইল। প্রাঙ্গণ-গৃহের দ্বারে সে চূর্ণ নিক্ষেপ করিল আর সাবধানে বগল হইতে তালপত্রের পুঁথি বাহির করিয়া সামনে

---

[১] তুঃ কাদম্বরীর 'জরদ্‌দ্রাবিড় ধার্মিক'।

রাখিল। তাহার পর জোরে জোরে দরজায় আঘাত করিল। নিপুণিকা সাবধানে বাহিরে আসিল আর লীলাকটাক্ষে একবার বৃদ্ধ সাধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অমনই পূজারীর উপরের অর্ধাবশিষ্ট দাঁত বাহিরে আসিল, এবং শুষ্ক গণ্ডের উপর অনুরাগের হরিদ্বর্ণ ছুটাছুটি করিল। অনেক দিনের পর তাহার তন্ত্র সার্থক হইয়াছে। সে সর্বদা ঐ আবীর-রঞ্জিত তালপত্রের পুঁথি সামনে রাখিয়া চলিয়াছে। যদিও নিপুণিকা ঐ পুঁথির দিকে বিশেষ মন দেয় নাই, তথাপি ইহা তো স্পষ্টই জানা যাইতেছিল যে সে এই জয়লাভ পুঁথিরই সুফল বলিয়া মনে করিতেছিল। হয়তো তাহার মনে মনে আশংকা ছিল যে পুঁথি সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইলে বশীকরণের প্রভাব চলিয়া যাইবে। আমি দূরে বসিয়া বসিয়া এই কৌতুক দেখিতেছিলাম। নিপুণিকা কি বলিল তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু সে একবার আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইল। পূজারী আমাকে দেখিয়াই অগ্নিতপ্ত হইয়া উঠিল। নিপুণিকা দরজা বন্ধ করিয়া দিল, পূজারী ছুটিয়া আসিল আমার দিকে। হয়তো নিপুণিকা আমাকে দেখাইয়া বুঝাইয়াছিল যে এখন নির্জন নয়, পূজারীর তাহার নিকটে আসা ঠিক হয় নাই। পূজারী আমাকে যে কি কি বলিয়াছিল তাহা আমার ঠিক ঠিক মনে নাই, কারণ তাহার স্খলিত ভাষা স্পষ্ট করিয়া শোনা সহজ ছিল না; কিন্তু সে সব কথা ভদ্রলোকের শোনার মত যে নয় সে সম্বন্ধে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। সে হইয়া উঠিল মূর্তিমান ক্রোধ। একটি পদ খঞ্জ, কিন্তু দৌড়াইবার সময় সে খেয়ালই তাহার ছিল না। গতিবেগের জন্য তাহার হাত হইতে কজ্জলের কৌটা পড়িয়া গেল এবং প্রায় শূন্য হইয়া গেল। বোঝা গেল, এই স্থানে বসার যে অপরাধ তাহার জন্য আমাকে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড আমার উপর ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু সেখানকার প্রস্তরখণ্ডও পূজারীবাবাকে পরিহাস করিতে চাহিল। তাহার উত্তরীয়তে আটকাইয়া সে প্রস্তরখণ্ড তাহার পিঠের উপর আসিয়া পড়িল। বাবার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। আমি তাহাকে শান্ত করিবার কোনও উপায় পাইলাম না; কিন্তু প্রস্তরখণ্ড ঠিক অবসরে আমার সাহায্য করিল। উত্তরীয়তে আটকাইয়া যাওয়ায় তাহার বক্ষোদেশ খুলিয়া গেল, শুষ্কপ্রায় ওড়পুষ্পের মালা বাহিরে আসিয়া পড়িল, কালো বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা উচ্চাটনের মন্ত্র দেখা গেল। এ অবস্থায় কি কর্তব্য তাহা বুঝিতে পারিলাম। অত্যন্ত নম্রতার সহিত প্রণাম করিলাম ও জোড়হাতে বলিলাম—'ধন্য হে মহান্ ধার্মিক, আশ্চর্য এই উচ্চাটনশক্তি, অদ্ভুত ইহার মহিমা! আমাকে নগরশ্রেষ্ঠী ধনদত্ত পাঠাইয়াছেন। আপনার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়াছে। ধনবৈভব পদ্ম-পত্রের বুদ্বুদের মত তিনি নির্বিকার হইয়া ত্যাগ করিয়াছেন। সংসারে

তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আজই আপনার চরণে সমর্পণ করিতে অভিলাষী। যদি আপনি তাঁহাকে আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি এখনই আপনার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন। যতক্ষণ আপনার সম্মতির সংবাদ তাঁহার নিকট লইয়া না যাইব, ততক্ষণ তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। ধার্মিক একবার সগর্বে তাহার আশ্চর্যবিভবহেতু শুদ্ভির দিকে দেখিল, পুনরায় ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া বলিল—'ধনদত্তের কল্যাণ হউক। সে বড় ধার্মিক। তাহাকে বলিয়া দাও যে সে যেন সম্পত্তি দিয়া যায়। শিষ্য হইতে হয় তো সৌগতদের সুগতভদ্রের নিকট যাক। আমি শিষ্য করি না।' এই কথা বলিয়া সে সগর্বে পুনরায় একবার শুদ্ভির দিকে তাকাইল। সে দৃষ্টির তাৎপর্য ছিল—'বাবা, এখন তো ফাঁসিয়া গিয়াছ—কোথায় যাইবে?' আমি একটা নূতন পথ দেখিতে পাইলাম। আমি দুই হাত জোড় করিয়া সবিনয়ে বলিলাম—'তিনি তাঁহার সম্পত্তি আর কাহাকেও দিতে চাহেন না। আপনার চরণেই যথাসর্বস্ব রাখিবেন সংকল্প করিয়াছেন। আপনার অনুমতি পাইলে সৌগতদের শিষ্যও হইতে পারেন। অনুমতি হইলে তাঁহাকে এই প্রকারের সংবাদ দিয়া আসি।' পূজারী বলিল—'হাঁ, যা, এখনই যা। কাল আমি কিছু লইব না। আমি আজই এখান থেকে কান্যকুব্জের দিকে যাত্রা করিব। স্থাণ্বীশ্বরের লোকেরা অসভ্য, ভাগ্যহীন, কুৎসিত। আমি তাহাদের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করি।' আর সত্যই ধার্মিক নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। পুনরায় বলিল—'পরিহাস করিতে হইলে সে এদিকে আসিবে। আমি পূর্ণিমার দিন তাহার অভদ্রতা সহ্য করিতে পারিব না।' এ কথার তাৎপর্য আমি পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কথাটা এই যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনেকবার নাগরিকেরা বৃদ্ধা বেশ্যাদের সহিত পূজারীবাবার বিবাহ দিয়াছিল। এ অঞ্চলের লোকেরা এই ধরনের পরিহাসে সুচতুর। এ পর্যন্ত পূজারীবাবার এই পরিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তিনি অদ্যই স্থাণ্বীশ্বর ত্যাগ করিবেন, হয়তো নিপুণিকাকে সঙ্গে লইয়াই। আমি সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম—'তাহা হইলে চলুন না কেন পরম ধার্মিক শ্রীমান্ শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের বাড়ির দিকে? নগরের সীমায় যে সু-উচ্চ ভবন, তাহাই শ্রেষ্ঠীর নিবাসস্থান।' পূজারীবাবা আজ তাঁহার সফলতার অহঙ্কারে অজ্ঞান। বলিলেন—'আমি কাহারও ভবনের দিকে যাইব না। ধনদত্তের প্রয়োজন হইলে সে এক্শবার এখানে আসিবে। তুই এখান হইতে যা। সৌগত সুগতভদ্রের নিকট যা। সে ঘরে ঘরে ভিক্ষা চাহিয়া ফেরে। আমি চণ্ডীর মন্দির ছাড়িয়া কোথাও যাই না।' আমি বলিলাম—'সাধু, পরম ধার্মিক, সাধু! ইহাকেই বলে তপস্যা, ইহার নামই ভক্তি। আচ্ছা, সে সুগতভদ্র কোথায় থাকেন?'

পূজারী অনতিদূরবর্তী এক বিহারের দিকে উপেক্ষাভরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। বলিল—'ওইখানে!' পুনরায় আমার দিকে না তাকাইয়াই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল। আমি ক্ষণেকের জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে একবার ওদিককার রূপও দেখিয়া আসি না কেন? বাস্তবিকতো আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে আমাকে ধনদত্তের নিকটে পূজারীবাবার অনুমতি বহন করিয়া লইয়া যাইবার কাজ করিতে হইবে। পূজারী একবার আমার দিকে তাকাইল। পুনরায় বেগে আসিয়া বলিল—'শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যা। ধনদত্তকে মারিয়া ফেলিবি। তুই পাপভৃত্য। সে অন্নজল ছাড়িয়া দিয়াছে, আর তুই এখানে দাঁড়াইয়া আছিস!' সত্যই তো আমি কেমন কুভৃত্য!

আমি জোড়হাতে বলিলাম—'হে পরম ধার্মিক, ধনদত্তের ভবন পর্যন্ত আপনাকে যাইতে হইবে। সেখান থেকে তিনি আপনার সঙ্গে গঙ্গাতীর পর্যন্ত যাইবেন আর গোধূলির শুভক্ষণে গঙ্গাজলে সংকল্প করিয়া তাঁহার সকল সম্পত্তি শ্রীচরণে সমর্পণ করিবেন। যতক্ষণ আপনি এই অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িতে পারি না।' পূজারী নরম হইল। বলিল—'তুই বড় জিদী। ভক্ত যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে পারে। আমি চলিয়া যাইতেছি; কিন্তু তোকে সঙ্গে লইতে পারিব না। তুই এখান হইতে চলিয়া যা।' ধার্মিক হয়তো সন্দেহ করিয়া থাকিবে যে আমি একটা অংশ লইতে চাহিব। আমি জোড়হাতে বলিলাম—'তা কি করিয়া হয়? আপনি শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের ভবন দেখিয়াছেন কি?' আমি তো কল্পনায় শ্রেষ্ঠী ধনদত্তকে সৃষ্টি করিয়াছি, আর নগরপ্রান্তে একটা ভবনও সেই শক্তিতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছি। কিন্তু কী আশ্চর্য, ধার্মিক সে ভবন দেখিয়াছে! বলিল—'হাঁ, হাঁ, দেখিয়াছি। ঐ বাড়িতো, যাহার সম্মুখে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে?' আমি বলিলাম—'ধন্য মহারাজ! ঠিক ঐ অশ্বত্থ গাছের নিকটেই শ্রেষ্ঠীর নিবাস। কিন্তু আপনি যদি তাঁহার বাড়িতে যাইতে না চান, তবে অশ্বত্থ গাছের নীচেই অপেক্ষা করিবেন। শ্রেষ্ঠীকে আমি সংবাদ দিতে যাই।' ধার্মিক উপেক্ষা করিয়া বলিল—'যা! আমি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে অপেক্ষা করিয়া থাকিব।' আমি মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিলাম ও এক দিকে রওনা হইয়া গেলাম। অল্পক্ষণ পরেই পূজারী আবীরের রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিল, উত্তরীয় লইল, কজ্জলচূর্ণ লইয়া প্রস্থান করিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম, নগরীর সেই সীমা পর্যন্ত যাইতে পূজারীর খোঁড়া পায়ে অন্তত দুই ঘণ্টা সময় লাগিবে, অপেক্ষা করিতে দুই ঘণ্টা লাগিবে, আর যদি সেই অজ্ঞাত অঞ্চলে প্রবেশ না করে তাহা হইলেও ফিরিবার সময় দুইঘণ্টা তো লাগিয়াই যাইবে। অন্তত ছয়ঘণ্টার জন্য আমি নিশ্চিন্ত। ইহার মধ্যে যদি কোনও ব্যবস্থা সম্ভব হয় তো করিয়া লইতে

হইবে। আমি প্রান্তগৃহের নিকটে গিয়া আস্তে আস্তে নিপুণিকাকে ডাকিলাম। সে প্রথম হইতেই আমার অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই সে হাসিয়া বলিল—'অভিনয় সফল হইয়াছে ভট্ট, পূজারী আসিয়াছিল। প্রচুর আহার্য দিয়া গিয়াছে। গোধূলিবেলা পর্যন্ত সে অবশ্যই অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে অপেক্ষা করিবে। তুমি যে ভবন কল্পনায় নির্মাণ করিয়াছ, তাহা সত্যই আছে, এবং এখান হইতে এক যোজন দূরে আছে। পূজারী আজ রাত্রের মধ্যেও ফিরিতে পারিবে না। ও যে রাতকানা। ইহার মধ্যে যদি কোনও সুব্যবস্থা করিতে পার তো কর। ভট্টিনী অত্যন্ত উদাসভাবে বসিয়া আছেন।' নিপুণিকা রাজকন্যাকে 'ভট্টিনী' বলিয়া ডাকিত। অন্তঃপুরের পরিচারিকারা রানীকে এইভাবে সম্বোধন করে। আমিও এইজন্য তাঁহাকে 'ভট্টিনী' বলা উচিত মনে করিলাম।

ভট্টিনীর উদাসভাবের কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। আমি সাহস দিতে গিয়া একটু জোরেই বলিয়া ফেলিলাম—'ভট্টিনীর উদাস হওয়ার কোনও কারণ নাই। আমি এখনই একটা ব্যবস্থা করিতে যাইতেছি। চারিদিকে যে কি আছে আমি তাহা আদৌ জানি না। শুধু পূজারী বলিয়াছে, ইহার নিকটেই এক বৌদ্ধ বিহার আছে, সেখানে সুগতভদ্র নামে কে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন। আমি একবার সে দিকে গিয়া কি ব্যবস্থা সম্ভব তাহা সন্ধান করিব। ভিক্ষুদের অনেক কিছু জানা থাকে।'

ভট্টিনী আমার কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহাকে শোনানোই তো ছিল আমার উদ্দেশ্য। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'কি বলিতেছেন ভট্ট! ইনি কি সেই সুগতভদ্র যিনি ধর্মপ্রচারের জন্য তক্ষশিলার অভিমুখে গিয়াছিলেন? ইনি কি নালন্দার আচার্য শীলভদ্রের গুরুভাই?'

'আমি তাহা জ্ঞাত নহি, দেবি! আমি ইহাই শুনিয়াছি যে সুগতভদ্র নামে জনৈক ভিক্ষু পার্শ্ববর্তী বিহারে থাকেন।'

'সংবাদ লউন, ভদ্র! যদি ইনি আচার্য শীলভদ্রের সহপাঠী, ও তক্ষশিলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে ভাগ্য আজ আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। তিনি আমার পিতৃতুল্য, আমি তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইব।'

আমি সবিনয়ে বলিলাম—'ভদ্রে, আমি এখনই সংবাদ লইব। কিন্তু যদি তিনিই হন, তাহা হইলে কি বাণী লইয়া যাইব?'

ভট্টিনী বলিলেন—'একথা বলিয়া দিবেন ভদ্র, যে দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের কন্যা আপনাকে প্রণাম জানাইতেছেন এবং অনুগ্রহ হইলে আপনার দর্শন প্রার্থনা করেন।'

প্রাণে বড় লাগিল। বলিলাম—'তাহা হইলে দেবি, আপনি কি তত্রভবান

বিক্রমসমরবিজয়ী বাহ্লীক-বিমর্দন, প্রত্যন্ত-বাড়ব দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের কন্যা?'

রাজকন্যার চক্ষু আনত হইল। বড় বড় পদ্মদল হইতে নয়নযুগলে অশ্রু ভরিয়া আসিল। গভীর স্বরে বলিলেন—'হাঁ, ভদ্র!'

কিয়ৎকাল বিস্ময়সাগরে ডুবিতে ও ভাসিতে ভাসিতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। উপযুক্ত স্থানেই বিধাতার পক্ষপাত। হিমালয় ভিন্ন গঙ্গার ধারার জন্ম হইবে কোথা হইতে? মহাসমুদ্র ভিন্ন কৌস্তুভমণিকে কে উৎপন্ন করিতে পারে? ধরিত্রী ভিন্ন আর কে সীতার জন্মদাত্রী হইতে পারেন? আমি অতি ভাগ্যবান, এই মহিমময়ী রাজকন্যাকে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আহা! কোন পাপ অভিপ্রায় এই কুসুমকলিকাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছে? কোন দুর্বহ ভোগ-লিপ্সা এই পবিত্র শরীরকে কলুষিত করিতে সংকল্প করিয়াছে? কোন দুর্নিবার পাপভাবনা জ্যোৎস্নাকে মলিন করিতে চাহিয়াছে? আমার হৃদয়ের ভক্তি আরও বাড়িয়া গেল। আমি সসম্ভ্রমে হাত জোড় করিয়া বলিলাম—'রাজনন্দিনি, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু আজ তো এ সংবাদ লইয়া যাওয়া বুদ্ধির কাজ হইবে না। আপনি কি একবার ভাবিয়াছেন, আমরা কি অবস্থায় আছি?'

ভট্টিনী অবসন্ন হইয়া বলিলেন—'জানি না ভদ্র! যাহা উচিত হয় তাহাই করুন। যদি ইনিই সুগতভদ্র হন, তাহা হইলে ইঁহাকে কিছু বলিলেও ক্ষতির কোনও আশংকা নাই।' এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নিপুণিকা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—'না ভট্টিনী, কাঁদিবেন না।' বলিয়া তাঁহার কণ্ঠে লীন হইয়া রহিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিপুণিকা রুদ্ধকণ্ঠেই বলিল—'ভট্ট, যাও।'

আমি তখনই বাহির হইয়া আসিলাম। আসিবার সময় দেখিলাম, ভট্টিনী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। আমার হৃদয় তখন অবশ্যই কাষ্ঠবৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকিবে, নতুবা এত বড় বেদনা কি করিয়া সহ্য করিতে পারিল? নিপুণিকা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আমি বৌদ্ধবিহারের দিকে মন্থর গতিতে চলিলাম। পায়ে স্ফূর্তি নাই—চরণ চলিতে চাহে না। দেবপুত্র তুবরমিলিন্দের কন্যার উপযুক্ত কোনও বাসস্থান খুঁজিতে পারিব কি, ভদন্ত সুগতভদ্র কি আচার্য শীলভদ্রের সহাধ্যায়ী? এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বিহারের দ্বারদেশে উপনীত হইলাম। বিহার দোতলা, কিন্তু আজকাল বৌদ্ধদের মধ্যে বিহার নির্মাণের যে নূতন রীতি চলিত হইতে চলিয়াছে, তাহা ইহাতেও দেখা গেল। বাহির হইতে সোজা দোতলায় যাইবার সিঁড়ি আছে, একতলায় আসিবার রাস্তা কিন্তু ভিতরের দিকে। দোতলায় না গিয়া একতলায়

কেহ যাইতে পারে না। আমি ঠিক বুঝিতে পারি না যে এই ধরনের বিহার গঠন করিয়া বৌদ্ধদের সদ্ধর্মের কি লাভ হয়। উহারা এখন সব কথাই রহস্যময় করিয়া তুলিতে বসিয়াছে, হয়তো এই রীতিও রহস্যময়তার পরিণাম। ভাল, এসব কথা দিয়া কি করিব? সম্মুখে বৌদ্ধবিহার। আমাকে জানিতে হইবে, সুগতভদ্র লোকটি কে? নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূল হইলে তো ঠিক, না হইলে সময় নষ্ট করিলে অনর্থ ঘটিবে। বিহারের দরজায় এক শ্রমণ হাতে কি একটা পুথি লইয়া জোরে জোরে পড়িতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি ভাই, ভদন্ত সুগতভদ্র আছেন?'

সে মাথা না উঠাইয়াই উত্তর করিল—'হাঁ।'

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?'

'একটা কেন, দুইটা জিজ্ঞাসা করুন।'—শ্রমণ হাসিয়া মাথা উঁচু করিল।

'এই সুগতভদ্র লোকটির পরিচয় কি?'

শ্রমণের নেত্রে কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভাব খেলিয়া গেল। বলিল—'আপনি কি আচার্য সুগতভদ্রকেও জানেন না? স্বয়ং মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষবর্ধন তাঁহাকে তক্ষশিলা হইতে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন। যাঁহার চরণধূলি পাইবার জন্য মহারাজ সর্বদা সমুৎসুক, সেই আচার্যপ্রবর সুগতভদ্রকেও আপনি জানেন না?'

আমি ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম—'আমি বিদেশী, ভদ্র!'

'কোথা হইতে আসিতেছেন?'

'আমি মগধের অধিবাসী।'

'ভদ্র, আপনি মগধের নাম কলংকিত করিয়াছেন। নালন্দার ভুবনবিশ্রুত আচার্য শীলভদ্রের সহাধ্যায়ী সুগতভদ্রের কথা আপনি জানেন না, আর বলিতেছেন, আমি মগধের লোক!'

নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। বলিলাম—'ভাই, অজ্ঞজনের উপর দয়া করুন। আপনার এই কথা শুনিয়া উপকৃত হইয়াছি। আচ্ছা, আমি আচার্যের দর্শন পাইতে পারি কি?'

'আচার্য অন্তঃপুরে থাকেন না। আপনি কি চাহেন যে আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া আসি?'

'তাঁহাকে বলুন যে, মগধের অধিবাসী দক্ষ ভট্ট—লোকে যাহাকে বাণভট্ট বলিয়া জানে—আচার্যপাদের দর্শনাভিলাষী। তাঁহাকে কিছু নিবেদন করিতে চাই।'

'আপনি কি শাস্ত্রবিচারের জন্য আসিয়াছেন?'

'আমি আচার্যের নিকট কিছু নিবেদন করিতে চাই।'

'আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।'

অল্পক্ষণ পরেই শ্রমণ ফিরিয়া আসিল। তাহার কণ্ঠস্বরে এবার আমার

প্রতি একটু সমাদরের ভাব ছিল। সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কি মগধের মহাপণ্ডিত স্বর্গীয় জয়ন্ত ভট্টের কনিষ্ঠ পৌত্র? আপনার নাম শুনিয়া আচার্যপাদ এই প্রশ্ন করিতে আদেশ দিয়াছেন।' আমি চমকিয়া উঠিলাম। আচার্যপাদ তাহা হইলে আমাকে জানেন? আমার সমস্ত কালিমাপূর্ণ জীবনের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন? ক্ষণেকের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। বলপূর্বক নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—'হাঁ, আমি মহাপণ্ডিত জয়ন্ত ভট্টের অভাগা পৌত্রই বটি।' আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রমণ চলিয়া গেল এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'আচার্যপাদ এখনই আপনাকে দর্শন দিবার অনুগ্রহ করিয়াছেন। আপনি পরম সৌভাগ্যশালী। আসুন।' আমি শ্রমণের পিছনে পিছনে এমনভাবে চলিলাম যেন শূলেবিদ্ধ হইতে চলিয়াছি।

দোতলায় উঠিয়া আমি নীচের দিকে গেলাম, আর এক সংকীর্ণ অলিন্দের পথে নীচের কৃত্রিম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এই প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। নব কিশলয়ে তাহা পরিপূর্ণ ছিল। তাহারই ঘনচ্ছায়ায় আচার্য সমাসীন। নিকটে দুই একজন শিষ্য উপস্থিত ছিল। আমি যখন গেলাম তখন আচার্য কোনও শিষ্যকে কিছু বুঝাইতেছিলেন। আমার আগমন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ভালই হইয়াছিল, আমি ইতিমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইলাম। আচার্যপাদ অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত ছিল; কিন্তু কানের মধ্যে দুইচার গাছি শুভ্র কেশ দেখাইয়া দিতেছিল এবং বুঝাইতেছিল যে জরা আচার্যকে কি ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহার চক্ষু দুইটি ছিল অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও করুণার্দ্র, বাণী ছিল স্পষ্ট ও সুমধুর। তাঁহার ব্যাখ্যারীতি যুক্তিপূর্ণ, তাহা প্রত্যয় উৎপাদন করিত। আমি খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তপস্যাও কত মহিমময় হয়! কারণ এই তপস্যাই তাঁহার আকৃতিকে তপ্তকাঞ্চনের মত নির্মল করিয়া তুলিয়াছে। সেই কান্তি হইতে এক অদ্ভুত শান্তি ঝরিয়া পড়িতেছিল। অল্পক্ষণ পরে আচার্য আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—শিবের জটা হইতে সহস্রধারায় পড়িয়া নির্মল মন্দাকিনীধারা যেমন অশেষ তাপদগ্ধ ধরিত্রীকে শীতল করিতে যায়, তেমনি তাঁহার দুই চক্ষু হইতে এক অনন্ত করুণাস্রোতস্বিনী বহিতেছিল। আমার দিকে মুখ ফিরাইতে তাঁহাকে একটু কষ্ট করিতে হইল। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'এস বৎস, তুমি জয়ন্তের কনিষ্ঠ পৌত্র নও? দেখি একটু। আহা, তোমাকে ঠিক জয়ন্তের মত দেখিতে। জয়ন্ত আমার গুরুভাই ছিল, পুত্র! আমাদের মধ্যে গাঢ় প্রীতির বন্ধন ছিল। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে নিজের ভাই বলিয়াই মনে করিত। যেদিন তক্ষশিলা অভিমুখে যাত্রা করিলাম সেই দিন হইতে আর দুইজনে দেখা হয় নাই। চল্লিশ বৎসর পরে যখন ওদিক

হইতে ফিরিয়া নালন্দা গেলাম, তখন সর্বাগ্রে জয়ন্তের কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার তখন জ্ঞান হইল যে সে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন আমি শুনিয়াছিলাম যে তুমি ঘরবাড়ি ছাড়িয়া কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তোমার সঙ্গে দেখা হইয়া খুবই ভাল লাগিতেছে, বৎস। কি বৎস, এখনও বাড়ি ফিরিতে ইচ্ছা হয় না কি?'

বৃদ্ধ আচার্যের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি নিজেকে কিছুটা প্রীত, কিছুটা গ্লানিগ্রস্ত, কিছুটা আশ্বস্ত ও গৌরবান্বিত মনে করিতে থাকিলাম। বৃদ্ধ যেন আমাকে স্নেহরসে ডুবাইয়া দিলেন। আমি ঈষৎ কাতর ভাবেই বলিলাম—'দেশে ফিরিবার ইচ্ছা তো আছেই আর্য, কিন্তু এক বিশেষ কার্যে আটক পড়িয়া গিয়াছি। আর্যপাদের সঙ্গে পিতামহের সম্বন্ধ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। কিন্তু এখন যে জালে ফাঁসিয়া গিয়াছি তাহার মহত্ত্ব থাকিলেও আমার বংশমর্যাদার অনুকূল নয়, আর আর্য, এমনই বিষয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি যাহা আপনাকে শুধু কষ্টই দিবে। আমি ভাগ্যহীন; কিন্তু আপনাকে যে কার্যে সাহায্যের জন্য বলিতে আসিয়াছি তাহা আপনি যেন অন্যরূপ মনে না করেন।'

আচার্যের দৃষ্টি প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো উন্মীলিত হইল। বলিলেন—'বল না বৎস। কি সে কার্য?'

মুহূর্তকাল এদিক ওদিক দেখিয়া নিবেদন করিলাম—'সেই কথা বলিবার জন্য নির্জন স্থান চাই।'

আচার্য শিষ্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহারা অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠিয়া গেল। শুধু একজন শিষ্য অল্পকাল বসিয়া থাকিল। তাহার পাঠ হয়তো সমাপ্ত হইতে বাকি ছিল। আচার্য পুনরায় আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'একটু থাম বৎস, এই আয়ুষ্মানের এক শংকা মাঝখানে বন্ধ হইয়া আছে।' পুনরায় সেই শিষ্যের দিকে দেখিয়া বলিলেন—'হাঁ আয়ুষ্মান্, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে যে আর্য অসংগ "শূন্যতা" শব্দটিকে এতখানি মহত্ত্ব দিয়াছেন কেন? যে বস্তুর অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, অস্তি নাস্তি দুই-ই নাই, আর এই দুইয়ের অভাবও নাই, তাহাকে শূন্যতা কেন বলিয়াছেন? এই তো তোমার প্রশ্ন, নয়?'

'হাঁ, আর্য!'

'তাহা হইলে আয়ুষ্মান্, তুমি কোনও উপযুক্ত শব্দ বাছিয়া লইতে পার? ভয়ের কারণ নাই, কোনও শব্দ বল।'

'হাঁ আর্য, নিরালম্ব বা পরম তত্ত্ব এমন শব্দ প্রয়োগ করিলে কি দোষ হইত?'

'সাধু আয়ুষ্মান্, আজ সৌগত পণ্ডিতদের এক সম্প্রদায় "নিরালম্ব" শব্দকে অতিশয় মহত্ত্ব দিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু এই নিষেধাত্মক শব্দ দিয়া তুমি কি সেই বস্তুটির বোধ আনিতে পার, যাহার "নাইও নাই"?'

'না, আর্য!'

'আর "পরম তত্ত্ব" বলিলে তো "তত্" বস্তুটির সত্তা মানিতে হইবে। আবার তাহাকে কি "অস্তিত্বও নাই" এমন ভাবে বর্ণনা করা যাইবে?'

'না, আর্য!'

'সাধু আয়ুষ্মান্, তাহা হইলে তোমার দুইটি শব্দই নিরর্থক নয়?'

'তাই তো দেখা যাইতেছে, আর্য!'

'সাধু বৎস! বস্তুস্থিতি এই যে, আয়ুষ্মান্, শূন্যতা বা নিরালম্ব বা নির্বাণ এক অনুভবগম্য বস্তু। ভাষার দুর্বলতা—ভাষা এই পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা তো কেবল বুঝাইবার জন্য কাজচলাগোছ এক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। তুমি উহার শব্দার্থের দিকে যাইও না। মনন কর। ইহা হইল গুহ্য রহস্য। শুধু পুস্তক পড়িয়া তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না।'

'তাহা হইলে আচার্যেরা যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা নিরর্থক, আর্য!'

'না আয়ুষ্মান্, আচার্যেরা জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়াছেন। দীপ কি, তাহার দিকে যদি মন দেও, তাহা হইলে উহার আলোতে উদ্‌ভাসিত বস্তু দেখিতে পাও না। তুমি দীপকে পরীক্ষা করিতেছ, তাহাতে উদ্‌ভাসিত সত্যকে নয়।'

'তাহা হইলে দীপের দোষে আলোকের ক্ষতি হয় না, আর্য!'

'কুতর্ক করিতেছ, আয়ুষ্মান্, উপমা একাংশব্যাপী হয়। তদ্‌গত, ভূয়ো-ধর্মবত্তাই সাদৃশ্য। ধর্মের সাধারণতার দিক দেখ, তখন উপমার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে। আয়ুষ্মান্, সদ্ধর্মে কুতর্কের প্রাবল্য বাড়িতেছে। সংযত হইয়া আচার্যবাক্যের তাৎপর্য অনুশীলন কর। কুতর্ক হইল সদ্বিচারের দাবাগ্নি, বৎস! এখন যাও, আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ আছে। আবার আসিও। ভিক্ষুদের বলিয়া দিও, যতক্ষণ আমি দক্ষভট্টের সহিত বার্তালাপ করিব, ততক্ষণ এদিকে যেন কেহ না আসে।'

আদেশ পাইয়া শিষ্য সেখান হইতে উঠিয়া গেল, আচার্য আমার প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আচার্যের প্রেমপূর্ণ অধ্যাপনশৈলী দেখিতেছিলাম। কি কার্যে আসিয়াছি তাহা ক্ষণেকের জন্য স্মরণ ছিল না। পরে কোনও ভূমিকা না করিয়াই বলিলাম—'বিষম-সমর-বিজয়ী বাহ্লীক-বিমর্দন প্রত্যন্তবাড়ব দেবপুত্র তুবর মিলিন্দের কন্যা আপনার দর্শন পাইতে চাহেন।'

আচার্য বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন, যেন টলিয়া পড়িলেন। ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন—'কি

বলিলে বৎস, দেবপুত্র তুবর মিলিন্দের একমাত্র কন্যা চন্দ্রদীধিতি এখনও জীবিত আছে? সে কোথায়, বৎস? কি অবস্থায় তুমি তাহাকে দেখিয়াছ? সে কুশলে আছে তো? আমি শুনিয়াছিলাম, প্রত্যন্ত-দস্যুরা তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঠিক দেখিয়াছ তো বৎস? সে যে সৌকুমার্যের মূর্তি, পবিত্রতার নির্ঝর, শোভার আকর, শুচিতার আশ্রয়ভূমি, মূর্তিমতী ভক্তি, কান্তিমতী করুণা! আহা, সেই তুবর মিলিন্দের নয়নতারা এখনও জীবিত আছে! বল বৎস, আমি তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল।'

তাঁহার নাম আমি প্রথমবার শুনিলাম। জোড়হাতে বলিলাম—'নিকটেই আছেন, আর্য! কিন্তু আপনি সমস্ত কথা শুনুন, পরে যাহা উচিত মনে হইবে, করিবেন।' এই কথা বলিয়া আমি কাল রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত কথা বলিয়া গেলাম। আচার্যদেবের সহজ শান্ত কোমল মুখমণ্ডলে ঈষৎ বঙ্কিম রেখা দেখা দিল। তিনি অল্পক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—'সাধু, বৎস! তুমি জয়ন্তের উপযুক্ত পৌত্র।' পুনরায় ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'মৌখরিবংশের কল্যাণ হউক, কিন্তু এই ছোট রাজবাড়ি সমস্ত মৌখরি-গৌরবের উপর কালিমা লেপিয়া দিবে। শান্তং পাপম্! শান্তং পাপম্!' আমি আচার্যদেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার উপর কত প্রকারের ভাবই না ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে তিনি যেন কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না। কিয়ৎকাল আমরা দুজনেই নির্বাক হইয়া বসিয়া থাকিলাম। তিনি আবার এক শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'শীঘ্রই কুমার কৃষ্ণবর্ধনের নিকট চলিয়া যাও। বলিবে যে আচার্যদেব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যে যতশীঘ্র সম্ভব দেখা করিতে চাহেন।'

শিষ্য চলিয়া গেলে তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'রাজদণ্ড কঠিন, বৎস! তুমি সাহসের কাজ করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন, কিন্তু রাত্রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করা ধর্মত নিষিদ্ধ। এখানে থাকিলে তুমি রাজরোষের ভাজন হইবে। শীঘ্রই তুমি চন্দ্রদীধিতি ও নিপুণিকাকে লইয়া মগধের দিকে চলিয়া যাও। আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। যাও, চন্দ্রদীধিতিকে আমার দিক হইতে আশীর্বাদ জানাইও। আমি তাহার নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা করিতেছি। যতক্ষণ আয়োজন না হয়, ততক্ষণ তাহাকে দেখিবার ব্যাকুলতা আমি দমন করিতেছি। তুমি গিয়া উহাকে আশ্বস্ত কর। আমার দিক হইতে উহাকে ভরসা দেও যে এখানে কেহই উহার কোনও প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না। যাও, তাড়াতাড়ি কর। পূজারী হইতে সাবধান থাকিও। লোকটা মূর্খ ও নীচ।'

আমি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলাম এবং বেগে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলাম।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

বিহার হইতে যখন বাহিরে আসিলাম তখন মনটা ভারি প্রসন্ন ছিল। আসিবার সময় আমি পথের দিকে তাকাইয়া দেখি নাই। মানুষ চিন্তায় ডুবিয়া থাকিলে অন্ধ হইয়া যায়। এই সময় আমি লক্ষ্য করিলাম, বৃক্ষ ও লতাগুলির উপর বসন্তের প্রভাব পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে—বিকশিত মঞ্জরীর সৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরাবলী আম্রবৃক্ষগুলি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, পুষ্প-ধূলির কেশর-চূর্ণ ঘনভাবে বর্ষিত হইয়া বনভূমিকে পীত বালুকা-পুলিনে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে, পুষ্পমধুপানে ঈষৎ মত্ত ভ্রমরীকুল বিহ্বলভাবে লতারূপে প্রেক্ষাদোলায় ঝুলিতেছে; মত্ত কোকিল লবলীর বিকশিত পল্লবের অন্তরালে লুকাইয়া পুষ্পমধু নিষ্কাসন করিতেছে, আর সেই কারণে সেই বৃক্ষগুলির তলদেশে যেন মধুবৃষ্টি হইতেছে; কোন কোন বৃক্ষ বা লতা হইতে শিথিলবৃন্ত পুষ্প পড়িয়া যাইতেছে এবং ভ্রমরভারে জর্জরিত তাহাদের গর্ভকেশর দ্বারা লতামণ্ডপ মনোরম হইয়া উঠিতেছে; নানা প্রকার বর্ণের পক্ষিগণ বৃক্ষসমূহের শোভা মনোরম করিয়া তুলিতেছে। দূরে এক বিশাল পর্কটীবৃক্ষ মূল হইতে রক্তকিশলয়ের ভারে এমন মনে হইতেছিল যে মেরু-পর্বত বুঝি পদ্মরাগমণির আকস্মিক আবির্ভাবে লাল হইয়া গিয়াছে। প্রস্ফুটিত কাঞ্চনার পুষ্পে নগরপ্রান্তের বনস্থলী নাচিয়া উঠিতেছিল এবং যত্রতত্র অযত্নপুষ্ট ভাণ্ডীরকগুল্মের পুষ্পস্তবক তাহার সুগন্ধ ও মধুরিমায় পথিকচিত্ত অকারণ উৎকণ্ঠিত করিয়া দিতেছিল। কান্যকুব্জের সবচেয়ে প্রিয় বৃক্ষ হইল আম্র আর এ সময়ে আম্রের সৌরভ সমস্ত কান্যকুব্জ সাম্রাজ্যের সৌরভের প্রতীক বলিয়া মনে হইতেছিল।

এই ভরা ফাল্গুনের মধ্যে আমি এমনভাবে ছুটিয়া চলিতেছিলাম যেন উড়িয়া যাইতেছি। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে আচার্য-দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণ ভট্টিনীকে কোনও ভদ্রগোছের জায়গায় লইয়া যাইবার চিন্তাই ছিল প্রবল; ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে তাঁহার আহার ও বিশ্রামের চিন্তাও করিতে হইবে। মনে পড়িল, কাল রাত্রি হইতে নিপুণিকা ও তিনি অনাহারে আছেন। আমারও অবশ্য সেই অবস্থা। তখন এক প্রহর বেলা হইয়াছে।

একবার ভাবিলাম, বাজার হইয়া যাই। কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাই; কিন্তু তাহা অপেক্ষা বেশি প্রয়োজন ছিল ভট্টিনীকে আশ্বস্ত করা। এইজন্য প্রথমে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার পর বাজার যাওয়াই ঠিক মনে হইল। চণ্ডীমন্দিরের নিকট তখন কেহ ছিল না। আমি প্রাঙ্গণগৃহের দ্বারে ঘা দিলাম। নিপুণিকা ধীরে দরজাটা খুলিল, এবং আমি ভিতরে গেলে সাবধানে তাহা বন্ধ করিয়া দিল। আমার মনে তখন সন্তোষের ভাব, আর একটা প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিল। আমি না থাকিলে এই বেচারিদের কতই না কষ্ট সহ্য করিতে হইত! ভালই হইল, আমার গর্ব তখনই চূর্ণ হইয়া গেল। নিপুণিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভট্টিনী কোথায়? নিপুণিকা আমাকে চুপ করিতে ইশারা করিল আর আঙিনার কোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। ভট্টিনী স্নান করিয়া এক অত্যন্ত সাধারণ বস্ত্র পরিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে কাদা দিয়া গড়া এক ক্ষুদ্র বেদী, তাহার উপর নিপুণিকার উপাস্য মহাবরাহের এক ক্ষুদ্রাকার মূর্তি শোভা পাইতেছিল। অতি সাধারণ বস্ত্রের পটভূমিকায় তাঁহার সৌন্দর্য যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নিশ্চল ধ্যানমগ্ন ভট্টিনীর সম্মুখের অঞ্জলিবদ্ধ সুকুমার করতলের অঙ্গুলিগুলি এমন নয়নাভিরাম দেখা যাইতেছিল যে ভ্রম হইতেছিল বুঝি শিখান্তপর্যন্ত প্রফুল্লমালতীতে আচ্ছাদিত তরুণ অশোকের কোমল কিশলয় দীপ্তি পাইতেছে। ধ্যানস্তিমিত নয়নযুগল দেখিয়া মনে হইতেছিল যে মহাবরাহের অপূর্ব শোভায় বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া দুই চপল খঞ্জন-শাবক চিত্রার্পিতবৎ স্থির হইয়া আছে। ভট্টিনীর চতুর্দিকে এক অনুভর-রাশি ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। আমি কিছুক্ষণ ঐ শোভা দেখিতে থাকিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, কী আশ্চর্য, বিধাতার কী বিরূপ ব্যবস্থা। কেমন সুকোমল দেহলতা, আর কত গম্ভীর অনুভাবসম্পত্তি! কেমন মৃদুল হৃদয়, আর কেমন কঠোর তপশ্চর্যা! এমন রূপ দেখিয়াই মহাকবি কালিদাসের মনে 'কাঞ্চন-পদ্ম-ধর্মী' শরীরের-ধারণা হইয়া থাকিবে। সত্যই 'ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-ধর্মি যৎ মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ।' এই চিন্তায় আমি নিশ্চয়ই কিছুটা অতিরিক্ত বিলম্ব করিয়া থাকিব, কারণ নিপুণিকা আমাকে ধীরে ধীরে অন্যদিকে সরিয়া যাইতে ইশারা করিল। আমার নিজের এই আচরণের জন্য অকারণে অনুতাপ হইল। অনুতাপের কোনও কথাই নয়। নিপুণিকার সঙ্গে আমি দরজার নিকটে আসিলাম এবং ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গে বিহারে যে সব কথা হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলাম। সমস্ত কথা বলিবার পূর্বে আমি সামান্য ভূমিকা করিতে চেষ্টা করিলাম। নিপুণিকাকে এখন খানিকটা প্রসন্ন দেখাইতেছিল। সেও স্নান সারিয়া লইয়াছিল। সারা রাত্রির ক্লান্তি অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া

কেলিয়াছিল। তাহার কোটরগত চক্ষুতে জাগরণের খেদ এখনও উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। কিন্তু একটা দৃঢ় বিশ্বাস সেই খেদ-রাগকে স্নিগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেই চক্ষু দেখিয়া আমার এমন মনে হইতেছিল যে প্রস্ফুটিত কাঞ্চনার কুসুমের উপর যেন চন্দ্রের ধবল প্রভা পড়িয়াছে। নিপুণিকার প্রসন্নতা দেখিয়া আমার সন্তুষ্টি হইল। মনের মধ্যে যে গর্বের উদয় হইয়াছিল তাহা আরও একটু উপরে উঠিয়া ধরাতলে আসিয়া পড়িল। নিজের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যেন আমি কথাবার্তা শুরু করিলাম।—'নিউনিয়া, কাল সৌভাগ্য-ক্রমে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল।'

'হাঁ, ভট্ট!'

'আমি ভাবিতেছি, যদি তুমি কোনও ক্রমে একাই ভাট্টিনীকে লইয়া এখানে আসিতে, তাহা হইলে কী কষ্টই না হইত!'

'তাহা তো হইতই।'

'এখন আমি যাহা কিছু করিতেছি তখন তো তাহাও হইতে পারিত না!'

'এইটুকু তো হইয়া যাইত, ভট্ট!'

'ভাল, কে করিত?'

'পূজারী।'

'পূজারী? কিন্তু নিউনিয়া, তুমি তো পূজারীকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলে!'

.'পূজারীর মত মূর্খ রসিককে দেখিয়া ভয় পাইলে, ভট্ট, আজ হইতে ছয় বৎসর পূর্বেই নিউনিয়ার মৃত্যু হইত!'

'কিন্তু আজ প্রত্যূষে কালে তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাইয়াছিলে।'

'সে তো অবশ্যই পাইয়াছিলাম।'

'ভাল, তবে তুমি কাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলে?'

'তোমাকে দেখিয়া।'

'আমাকে?'

'হাঁ ভট্ট, তোমাকে।'

'তা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইয়াছিলে, নিউনিয়া!'

'কি বলিব, ভট্ট! আমার মত স্ত্রী তোমার মত পুরুষকে দেখিয়া কেন ভয় পায়, একথা যদি আজও তোমার বুদ্ধিতে না আসে, তাহা হইলে এখন আর আসিবে না।'

আমি সত্যই ক্লান্ত হইয়াছিলাম। নিপুণিকার আমাকে ভয় করিবার কি কারণ ছিল? নিপুণিকা ঠিকই বলিয়াছিল। আমি আজও সেই অজ্ঞাত কারণ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি নাই। অবশ্য কিছুটা অনুমান করিয়া লইতে

পারিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমার নিজের উপর ভরসা কমই ছিল। আমি আশ্চর্যের সঙ্গে নিপুণিকার দিকে তাকাইলাম আর হার মানিবার মত হইয়া বলিলাম—'তবে নিউনিয়া, আমি চলিয়া যাই?'

নিপুণিকা হাসিল। তাহার দৃষ্টিতে যেন কী রহস্য ছিল। বলিল—'ইহাই তো ভয়ের কথা, ভট্ট, যে কখন তুমি কোন কথার উপর বলিয়া উঠিবে যে আমি চলিলাম!'

অদ্ভুত অবস্থা। আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—'নিউনিয়া, আমি হার মানিতেছি। আমার কিছু প্রয়োজনও ছিল না, আমাকে দেখিয়া তুমি ভয়ও পাও, আবার আমার চলিয়া যাওয়াও ঠিক হইবে না—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

নিপুণিকার নয়নে এক অদ্ভুত আনন্দ খেলিয়া যাইতেছিল। বলিল—'কাহার যে হার তাহাও তো তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। যদি তুমি বুঝিতে পারিতে যে কাহার হার, তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে যে কে ভয় পাইয়াছে। ভট্ট, তুমি ভাল মানুষ! তুমি এই পৃথিবীতে দেহধারী দেবতা!'

আমি আরও গোলে পড়িলাম। ভাল মানুষ, তাহা স্বীকার; দেবতা? তাহাও স্বীকার; কিন্তু ইহাতে ভয়ের কথা কি হইতে পারে? ভাবিলাম, এখন যদি আর কিছু বলি, তাহা হইলে এই বিদগ্ধ রমণী না জানি তাহার মধ্যে কি কি শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া আমাকে পুনরায় নিরুত্তর করিয়া দিবে। বুদ্ধিমানের মৌনই নীতি। আমি হাসিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম। নিপুণিকা নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। আমিও হাসিতে লাগিলাম। পুনরায় প্রসঙ্গের পরিবর্তন করিবার জন্য বলিলাম—'শোন নিউনিয়া, ভট্টিনীর একটা সুব্যবস্থা আজই হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার আহারাদির চিন্তা করিতে হইবে। কালই ভট্টিনী রাজভোগ খাইয়াছিলেন, আজই হঠাৎ তাঁহাকে শুষ্ক খাদ্য দেওয়া উচিত নয়।'

নিপুণিকা প্রসন্নমনে ছিল। আমার কথা এমনভাবে শুনিল যেন তাহার মধ্যে কোনই গুরুত্ব নাই। ভট্টিনীর জন্য কোনও সুব্যবস্থা হইয়া যাইবে, একথা যেন সে প্রথম হইতে জানিত। বলিল—'ব্যবস্থা তো হইবেই, উহার চিন্তা এখন ছাড়। আমি অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি। ভট্টিনীর জন্য সামান্য কিছু দুধ ও মধু পাইলে উত্তম হইত; কিন্তু এখন যদি দেরি কর তো অনর্থ হইবে। যাও, শীঘ্র স্নান করিয়া এস। ভট্টিনী তোমাকে না খাওয়াইয়া অন্ন গ্রহণ করিবেন না।'

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। বলিলাম—'সে কি নিউনিয়া, ভট্টিনী না খাইতে আমি কি করিয়া ভোজন করি! আমি অকিঞ্চন সেবক...!'

নিপুণিকা ইশারা করিল, যেন জোরে জোরে না বলি। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—'ভট্ট, এই ছোট সংসারে তুমিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তুমি পুরুষ, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি পণ্ডিত, তুমি দেবতা। তোমাকে ভোজন না করাইয়া ভট্টিনী অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন কি? এস, তাড়াতাড়ি কর। তোমার সেই সন্ধ্যাপূজার অভ্যাস এখনও আছে তো? দেখ, একটু তাড়াতাড়ি কর। ওঠ।' আমি হতভম্ব হইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলাম। নিপুণিকা আবার বলিল—'ওঠ তো। ভট্টিনীর দেরি হইয়া যাইবে।'

উঠিতে হইল। স্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক তাড়াতাড়ি সারিয়া লইলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ভট্টিনী আমার আহারের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি তখন প্রসন্ন, শরীরে এক প্রকার তৎপরতা স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। সামান্য আহার্য তিনি বিশেষ তন্ময়তার সহিত সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। নিপুণিকা আমাকে ইশারা করিল। আমি লজ্জায় সঙ্কোচে বসিলাম, আমার সমস্ত অস্তিত্বই যেন সংকুচিত হইয়া জড়সড় হইয়া যাইতেছিল। ভোজন করিতে গিয়া এতখানি মূল্য আমি কখনও দিই নাই। ভট্টিনী আনত দৃষ্টিতে স্মিতহাস্যে বলিলেন—'সংকোচ করিতেছেন ভট্ট?'

এখন আর কোনও উপায় থাকিল না। আমি মাথা নীচু করিয়া জোড় হাতে বলিলাম—'দেবি, আপনি এই অকিঞ্চনকে অনুচিত গৌরব দিতেছেন। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য; কিন্তু নিবেদন করিতে চাই যে ভবিষ্যতে যেন এ অকিঞ্চনকে এতখানি গৌরবের অধিকারী বলিয়া মনে করা না হয়।'

ভট্টিনী হাসিলেন। তাঁহার ঈষদার্দ্র মুখমণ্ডল প্রত্যূষকালীন বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত পুণ্ডরীক কোরকের মত সহসা বিকসিত হইয়া গেল। বলিলেন—'ভট্ট, আমার এইটুকু অধিকার পাওয়া চাই যে নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিতে পারি—কতখানি গৌরব কাহার প্রাপ্য।'

নিপুণিকা কিছুটা দূরে বসিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বলিল—'ভোজনের গৌরব তো ভট্টেরই প্রাপ্য।'

নিপুণিকার কথায় আমারও হাসি আসিয়া গেল, আর সেই হাসিতে সমস্ত ব্যাপারটি হইতে সংকোচের আবরণ দূর হইয়া গেল। পত্রের পাত্রে করিয়া আমার সম্মুখে খুব সাধারণ ভোজ্যসামগ্রী আসিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে ছিল অপূর্ব মিষ্টত্ব। আমার মনে হর্ষবিষাদের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যে গৌরব পাইয়াছি তাহার জন্য হর্ষ, আর এই সাধারণ খাদ্য ভট্টিনী কি করিয়া গ্রহণ করিবেন সেই কথা ভাবিয়া বিষাদ। নিপুণিকার মনে কোনও উদ্বেগ নাই। আমি যাহা অন্ন মনে করিয়াছিলাম, তাহার দৃষ্টিতে উহা মহাবরাহের প্রসাদ! তাহা ভাল কি মন্দ একথা বিচার করা তো ভক্তিহীন চিত্তের বিকল্প। ভক্তের

পক্ষে তাহা অমৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ। ঐ সামান্য অন্নের পরিবেশনে ভট্টিনী গৌরব আনিয়া দিয়াছেন। আজ আমি প্রথম বুঝিতে পারিলাম, 'প্রসাদ' কি বস্তু। ভট্টিনী ইহার মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'উনিই তো সুগতভদ্র, না ভট্ট?'

'হাঁ দেবি, ইনিই। ইনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন, আর আপনাকে সস্নেহ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, আজই কোনও ভদ্রমত ব্যবস্থা করিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিবেন। তিনি আপনাকে বড়ই স্নেহ করেন।'

ভট্টিনীর বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল। তিনি সংক্ষেপে উত্তর করিলেন—'হাঁ, ভদ্র!'

আমি কথা আরও একটু অগ্রসর করিয়া বলিলাম—'আপনি জানিয়া আশ্চর্য হইবেন, দেবি, যে ইনি আমার পিতামহের সতীর্থ। আমার প্রতিও ইঁহার সন্তানের মত স্নেহ। আমি একথা আদৌ জানিতাম না।'

ভট্টিনী বিস্মিত হইয়া দীর্ঘায়ত নয়নে আমার দিকে অল্পক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন। বলিলেন—'আপনি একথা মোটেই জানিতেন না?'

'মোটেই না।'

'আশ্চর্য!'

আমি কিছুটা সংকুচিত হইয়া রহিলাম। ভট্টিনীর সরলতা দেখিয়া আমারও কম আশ্চর্য লাগিল না। কথাটা অন্য কোনও দিকে ফিরাইবার জন্য বলিলাম—'তিনি কুমার কৃষ্ণবর্ধনকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। হয়তো তিনিই কিছু ব্যবস্থা করিবেন।' এই কথা শুনিয়াই ভট্টিনী কাষ্ঠবৎ হইয়া গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে স্ফটিক প্রতিমার মত হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিপুণিকা কিছুটা ভয় পাইয়া গেল। আমিও চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম—'দেবি, কিছু অনুচিত কর্ম হইয়াছে কি?'

ভট্টিনী সামলাইয়া লইলেন। বলিলেন—'আমি স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশকে ঘৃণা করি। রাজবংশের সম্পর্কিত কাহারও আশ্রয় লইবার পূর্বে যমরাজের আশ্রয় লইব। ভদ্র, আচার্যপাদ আমার কল্যাণকামনার ভ্রমে আমার সর্বনাশ করিয়াছেন!'

আমি যেন একটা ধাক্কা খাইলাম। কিন্তু অবস্থা বড় সঙ্গীন। সামান্য একটু ত্রুটি হইলে এই মহীয়সী রাজকুমারীর সর্বনাশ হইয়া যাইবে। দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলাম—'ভদ্রে, আপনি বাণভট্টের উপর নির্ভর করুন। সমগ্র কান্যকুব্জের সৈন্যশক্তিও আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে কোথাও লইয়া যাইতে পারিবে না। কাল পর্যন্ত এই দীন ব্যক্তি পথভ্রান্ত অকর্মা ছিল। আজ

হইতে এ পাইয়াছে বিকম সমরবিজয়ী বাহ্লীক-বিমর্দন, প্রত্যন্ত-বাড়ব, দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের প্রাণাধিক কন্যার সেবক হইবার গৌরব। আমি কুমার কৃষ্ণ হইতে মর্যাদা বজায় রাখিয়া ফিরিয়া আসিতে জানি। স্থির হউন, রাজনন্দিনি, সিংহকুমারীর ভীত হওয়া সাজে না। এইদিকে দৃষ্টিপাত করুন, আপনার সেবকের উপর আস্থা রাখুন।'

ভট্টিনী আশ্বস্ত হইলেন। ঢোক গিলিয়া বলিলেন—'সেবক নয় ভট্ট, অভিভাবক বলুন।'

'আমি দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের প্রাণাধিক কন্যার মর্যাদা রক্ষা করিতে জানি। দেবি, আপনি নিশ্চয় জানিবেন আপনার একটু ইঙ্গিতেই বাণভট্ট সম্রাটদের মুণ্ডপাত করিতে পারে। যাহারা সিংহের জটাভার পা দিয়া দলিতে সাহস করিয়াছে তাহারা তাহার ফল পাইবে।'

ভট্টিনী আঙ্গিনার এক কোণে রক্ষিত মহাবরাহের মূর্তির দিকে বিশ্বাসের সহিত দেখিলেন। গম্ভীর ভাবে, অথচ মৃদু স্বরে বলিলেন—'উত্তেজিত হইবেন না, ভট্ট! আপনার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। যেমন উচিত মনে করিবেন তেমন করিবেন। শুধু এইটুকু স্মরণে রাখিবেন যে কোনও রাজকুলের অন্তঃপুরে অথবা তাহার সম্পর্কিত বা সংলগ্ন কোনও গৃহে যাইতে পারিব না।'

আমিও শান্ত হইয়া গেলাম। শুধু এইমাত্র বলিলাম—'বাণভট্ট একথা কখনই ভুলিবে না।'

ভোজন সমাপ্ত করিয়া আমি ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম এবং চণ্ডী-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সুখাসনে বসিয়া রহিলাম। কখন চোখ লাগিয়া আসিয়াছিল জানি না। অল্পকাল পরে কাহার যেন পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। সতর্ক হইয়া বসিলাম। দেখিলাম, বৌদ্ধবিহারের শ্রমণ আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে বলিলেন—'কল্যাণ হউক, ভদ্র, পূজনীয় আচার্য সুগতভদ্র আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। কুমার কৃষ্ণবর্ধন স্বয়ং বিহারে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইয়া আছেন।'

আমি এই সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ভাবিলাম, যাইবার পূর্বে একবার ভট্টিনীর আজ্ঞা লইয়া যাই; কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। কারণ শ্রমণের পিছনে পিছনে চার পাঁচ জন সুগঠিতদেহ তরুণ আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের চার দিকে পৃথক পৃথক ভাবে দাঁড়াইয়া গেল। তাহাদের আকার প্রকারে আমার সন্দেহ হইল; কিন্তু তাহাদের বেশে কোথাও রাজপুরুষের চিহ্ন না দেখিয়া মনে করিলাম যে ইহারা সাধারণ নাগরিকই হইবে। আমি দরজা খোলাইলাম না, বাহিরের শ্রমণকে উদ্দেশ করিয়া একটু জোরেই বলিলাম—'কুমার কৃষ্ণবর্ধনের

সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এখনই চলিলাম।' উদ্দেশ্য—ভিতরের কথা নিপুণিকা ও ভাট্টিনী শুনিয়া যাহাতে সাবধান হইয়া যান। আমি পুনরায় পুষ্করিণীতে মুখ হাত ধুইয়া উত্তরীয় ঠিক করিয়া মনে মনে নানা কথা তোলপাড় করিতে করিতে শ্রমণের সঙ্গে যাত্রা করিলাম। শ্রমণ কথা কহিতে ভালবাসিতেন। তিনি অল্পক্ষণ পরে নিজেই বার্তালাপ শুরু করিয়া দিলেন—'কুমার বড় উদার। তিনি বিদ্বান ও গুণীদের সম্মান করিতে জানেন। তিনি বয়সে তরুণ হইলেও চরিত্রে উজ্জ্বল ও বুদ্ধিতে পরিপক্ক। তিনি আচার্যদেবের ভক্ত, মহারাজ পরম ভট্টারক শ্রীহর্ষদেবের অন্তরঙ্গ। কত বিদ্বানলোককে তিনি রাজকোপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কত গুণীকে বিপদজাল হইতে বাঁচাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।' আমি তাহার কথা শুনিয়া যাইতেছিলাম, উত্তর করিতেছিলাম না। শ্রমণ কিন্তু পরম উৎসাহে বলিয়াই চলিতেছিলেন—'ভদ্র, কান্যকুব্জ বড় বিচিত্র দেশ। এখানে বাহিরের আচারকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়, ভিতরের তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা বড় অল্প। কি ব্রাহ্মণ আর কি শ্রমণ, সকলেই বাহিরের আচারকে বেশি মূল্য দেয়। স্বয়ং মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষদেবও বাদ যান বলা যাইতে পারে না। তাঁহার সব চেয়ে মান্য হইলেন সৌগত তার্কিক বসুভূতি; কিন্তু আচার্য সুগতভদ্রের তুলনায় তিনি কত সামান্য, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। কুমার কৃষ্ণ কান্যকুব্জের মধ্যে রত্ন। তিনি নুনঝাল বুঝিতে পারেন।'

'আপনি কোন দেশ হইতে আসিয়াছেন, ব্রহ্মচারী?'—প্রশ্ন করিলাম।

'আমি সৌবীর হইতে আসিয়াছি। আচার্যপাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিয়াছিলাম। সৌবীরে বাহ্য আচারের পূজা নাই। সেখানকার লোকেরা তত্ত্ব জানিতে চায়।'

'কিন্তু কান্যকুব্জে তত্ত্বজিজ্ঞাসু না থাকিলে কুমার কৃষ্ণ কেমন করিয়া থাকিতেন?'

'কুমারের কথা স্বতন্ত্র। এত অল্পবয়সে এতখানি গাম্ভীর্য দুর্লভ।'

'বসুভূতি কে, ভাই?'

'বসুভূতি এই দেশের শাস্ত্রালোচনায় ধুরন্ধর সৌগত তার্কিক। তিনি চান সদ্ধর্মের প্রচার তর্কের সাহায্যে। এ দেশের হাওয়া এমনি, ভদ্র! তর্কেই যেন ভগবান বুদ্ধের করুণা দেশময় ছড়াইয়া দিবে! ধিক্।'

'আপনার কি মত, ব্রহ্মচারী?'

'আচার্যপাদ বলেন যে তর্কবস্তুটাই ভুল। ভগবান চাহিয়াছিলেন, জীবনে করুণাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে। যাহার মধ্যে সে করুণা নাই, সে সৌগত নহে, সে সদ্ধর্মের সর্বনাশ করে। তর্ক হইতে বিদ্বেষ বাড়ে, বিদ্বেষ হইতে হিংসা পল্লবিত হয়, হিংসা হইতে মনুষ্যত্বের ধ্বংস হয়। বসুভূতির এসব কথা কমই

জানা। সে নিত্যই আচার্যদেবকে শাস্ত্রার্থের জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত করিতে চায়। কিন্তু আচার্যদেব ক্ষমার নিধি। সমস্ত পৃথিবী জানে, স্বয়ং মহারাজাধিরাজ জানেন যে, তর্কসভায় সুগতভদ্র ও বসুভূতির তুলনাই হইতে পারে না। সুগতভদ্র সিংহ, বসুভূতি শৃগাল। কিন্তু যে একেবারে রিক্ত সে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড় বলিয়া মনে করে। বসুভূতিকে আমাদের বিহারের কয়েকজন পণ্ডিত তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তো শুধু আচার্যপাদের সঙ্গেই লড়িতে চান।'

শ্রমণের নিকট হইতে মনোরঞ্জন কথা শোনা যাইতেছিল। আমিও জানিতে চাই, তাই আরও কিছুটা উসকাইয়া দিলাম—'কিন্তু মহারাজাধিরাজের তো একথা বোঝা উচিত ছিল। তিনি এরকম লোককে প্রশ্রয় দিলেন কেন?'

'কান্যকুব্জ হইল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দুর্গ। এরূপ তর্ক-কুক্কুরদের দিয়া লড়াইয়াই এখানকার রাজা সৌগত হইয়া থাকিতে পারেন।'

'তা ব্রহ্মচারী, এটাও তো কম দরকার নয়?'

'আচার্যপাদ বলেন যে ইহার ফল হইবে উলটা। যদি কোনও দিন সদ্ধর্মের অবনতি হয়, তবে কান্যকুব্জ হইতেই সেই অশুভ দিনের আরম্ভ হইবে।'

এই প্রকার কথা বলিতে বলিতে আমরা বিহারের দরজায় উপস্থিত হইলাম। শ্রমণ সোজা আমাকে আচার্যপাদের গৃহের দিকে লইয়া গেলেন। আচার্যদেব কুশাসনের উপর বসিয়াছিলেন। হয়তো আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—'এস বৎস, কুমার কৃষ্ণবর্ধন তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তুমি আয়ুষ্মতী চন্দ্রদীধিতির জন্য কোনও সুব্যবস্থার কথা ভাব। বৎস, কুমার আমার বিশ্বস্ত শিষ্য, তাঁহার নিকট হইতে গোপন করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। তুমি তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপারটি খুলিয়া বলিতে পার। আমিও অল্পবিস্তর বলিয়া রাখিয়াছি।' তিনি পুনরায় শ্রমণকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন--'পণ্ডিতপ্রবর বাণভট্টকে মহাসান্ধিবিগ্রহিক কুমার কৃষ্ণবর্ধনের নিকট লইয়া যাও। তিনি পার্শ্ববর্তী মন্দিরে পণ্ডিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।'

আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। শ্রমণ আমাকে এক নাতিদীর্ঘ গৃহে লইয়া গেলেন। কুমার সেখানে এক তৃণাসনে বসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আচার্যের কথায় আমি প্রথম জানিলাম যে কুমার মহাসান্ধিবিগ্রহিকের মহত্ত্বপূর্ণ-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি সমাদরে আমাকে নিজের তৃণাসনের অর্ধভাগে বসাইলেন। সেসময়ে কুমারের উদারতা, বিনয় ও সদাচার দেখিয়া আশ্চর্য লাগিয়াছিল, কিন্তু কুমার তো ঐরূপই

ছিলেন। তিনি ছিলেন গুণীজনের আশ্রয়, গুণের জন্মভূমি, বিদ্বানদের রক্ষক ও বিদ্যার ভাণ্ডার। তাঁহার নেত্রদ্বয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রূকুটির মধ্য হইতে ভীষণভাব ঝরিয়া পড়িতেছিল। যদিও তিনি এসময়ে বিহারের উপযুক্ত বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকীয় গরিমা সহজেই তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে প্রকট হইতেছিল, যেন ইনি কোনও অন্তর্মদ-তরুণ গজরাজ। তাঁহার হাতে এই সময় কোনও শস্ত্র না থাকিলেও এক স্বাভাবিক তেজ তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, বিষধরবেষ্টিত বালচন্দনতরুর মত তাঁহাকে ভীমকান্ত দেখাইতেছিল। তাঁহার বয়স ছিল অত্যন্ত কম, কিন্তু মুখ-মণ্ডলের উপরে অনাবিল বুদ্ধি ও দ্রুত বিবেচনাশক্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। মুহূর্তের জন্য আমি সেই তেজে অভিভূত হইয়া গেলাম, কিন্তু ভট্টিনীর কথা মনে পড়িতেই নিজেকে সামলাইয়া লইলাম। কুমার আবশ্যক শিষ্টাচারের পর দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের কন্যার বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। আমি আদ্যোপান্ত সকল কথা সংক্ষেপে শুনাইলাম। ইহাও বলিলাম যে কাল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাইতেছিলাম, পথে এই কার্য করিতে হইল। কুমার ধীরভাবে সব কথা শুনিলেন। একবারও তাঁহার আকৃতির কোনও পরিবর্তন বা বৈলক্ষণ্য আসে নাই, যাহাতে বুঝিতে পারি যে কোন কার্য তাঁহার মতে ভাল আর কোনটি মন্দ। সমস্ত শেষ হইয়া যাওয়ার পর আমি জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। তিনি শান্তভাবেই ছিলেন। কোনও বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করিয়াই বলিলেন—'দেবপুত্রের কন্যার জন্য আমার গৃহ প্রস্তুত।'

আমি বিনীতভাবে বলিলাম—'দেবপুত্রের কন্যা স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনও ব্যক্তির গৃহে যাইতে পারিবেন না। আমার বিচারে স্থাণ্বীশ্বর নিজেকে মানীজনের মর্যাদা দিতে অপারগ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।'

কথাটা কুমারকে আঘাত করিল। ভ্রূকুটি করিয়া তিনি একটু উদ্ধত স্বরেই বলিলেন—'কি বলিতেছেন ভট্ট, বুঝিয়া সুঝিয়া বলুন।'

'ভাবিয়াই বলিয়াছি, কুমার!'

কুমারের রোষকষায়িত নয়নে আরও খানিকটা চঞ্চলতা দেখা গেল। তিনি বলিলেন—'আপনি জানেন, কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন?'

একটুও বিচলিত না হইয়া বলিলাম—'আমি কান্যকুব্জ সাম্রাজ্যের মহাসান্ধি-বিগ্রহিক কুমার কৃষ্ণবর্ধনের সঙ্গে কথা বলিতেছি।'

'ভদ্র, আপনি দুর্বিনীত।'

'কুমারের নিকট হইতে এমন কথা শুনিব আশা করি নাই।'

'আপনার এরূপ কথা বলিতে লজ্জা হওয়া উচিত।'

'লজ্জা আমার কেন হইবে, কুমার?'

'তবে কাহার হইবে?'

'সেই শক্তিমান রাজবংশের, যাহারা ছোট রাজবাড়ির মত অত্যাচারীদের প্রশ্রয় দিয়া নিজেদের কলঙ্কিত করিয়াছে।'

কুমারের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল।—'দুর্বিনীত ব্রাহ্মণ-বটু, কাল যাঁহার নিকটে ভিক্ষার্থী হইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার কি এই ধরন?'

'কাল আমি পথের ভিখারী ছিলাম, কাল আমি স্থাণ্বীশ্বরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজবংশের কলঙ্কের কথা জানিতাম না।'

'আর আজ কি?'

'আজ আমি বিষমসমরবিজয়ী বাহ্লীক-বিমর্দন প্রত্যন্ত-বাড়ব দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের প্রাণাধিক কন্যার অভিভাবক।'

'অভিভাবক!'

'হাঁ, অভিভাবক।'

'আমি একটু ইশারা করিলেই তোমার রক্ষণীয়া দেবপুত্র-কন্যার এবং তোমার কি দশা হইতে পারে, তাহা জান কি?'

'জানি; কিন্তু কুমারের হয়তো বাণভট্টের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা নাই। ঐ ইশারাটুকু করার অনেক পূর্বেই ইশারা করিবার চোখ দুটি থাকিবে না।'

কুমার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'দুর্বিনীত ব্রাহ্মণ-বটু, ভিক্ষাজীবী, দম্ভী!' আমি হাসিয়া ফেলিলাম। মুখে কিছুই বলিলাম না। কুমার আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—'অন্তঃপুরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছ, অধার্মিক, তোমার লজ্জা নাই!'

'স্থাণ্বীশ্বরের লম্পট রাজবাড়ির অন্তঃপুরের বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা নাই। যেখানে চৌর্যলব্ধ, অত্যাচারিতা নারীরা বাস করেন, সেই অন্তঃপুরের কোনও মর্যাদাই থাকার কথা নয়। এরূপ অন্তঃপুরের প্রশ্রয় যাঁহারা দেন তাঁহারাই লজ্জিত হইতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের শোভা বাড়িবে। কুমার, সাম্রাজ্যগর্বে অন্ধ হইবেন না। স্থাণ্বীশ্বর রাজলক্ষ্মীর অপমান করিয়াছেন। আর ব্রাহ্মণের প্রতি আপনাব কোপ নিষ্ফল। সে তো ভিখারীও নয়, মহাসান্ধিবিগ্রহিকও নয়। সে হইল ধর্মের ব্যবস্থাপক। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাতে আমি লজ্জাবোধ করি না, তাহাতে আমার ব্রাহ্মণত্বও কলুষিত হয় নাই। আমি দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে অবগত আছি, এবং নির্ভয়ে আবার বলি, স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশ নিজেকে পূজ্য-ব্যক্তিকে পূজা করিবার অযোগ্য প্রমাণিত করিয়াছে। দেবপুত্র-নন্দিনী এই রাজবংশকে ঘৃণা করে।'

কুমার কিছুটা চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তিনি আমার কথার মধ্যে

কিছু সার পাইয়া থাকিবেন। খানিকক্ষণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া আমাকে দেখিলেন। এদিকে কুমারের উত্তেজিত স্বর শুনিয়া আচার্যপাদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঝগড়ার সময়ে আমরা দুজনেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আচার্যদেবের আজ্ঞা পালন করিবার আমরা নিমিত্ত মাত্র। আচার্য আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি পুত্র, অনুচিত কথা কিছু বলিয়াছ না কি? কুমার কৃষ্ণের মত সজ্জনকে তুমি কেন উত্তেজিত করিয়াছ? ছিঃ, এমনও করিতে হয়!' এরূপ বলিয়া তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন এবং কুমারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'কুমার, উত্তেজিত হও কেন? বৎস, বাণভট্ট অজ্ঞ, রাজোচিত সম্মান করিতে জানে না। তাহার কথার অর্থ গ্রহণ কর, শব্দপ্রয়োগের ত্রুটি ধরিও না।' তিনি পুনরায় অতিস্নেহভরে কুমারের পিঠে মৃদু করাঘাত করিলেন। বলিলেন—'বস।'

আচার্যদেব আসনে উপবিষ্ট হইলে আমরা উভয়ে কুট্টিম ভূমিতে বসিলাম। কুমারই প্রথমে আরম্ভ করিলেন—'আর্য, বাণভট্ট স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশকে ঘৃণা করেন।'

আচার্য আশ্চর্যভাবে আমার দিকে তাকাইলেন—'শান্তং পাপম্! হাঁ পুত্র, তুমি এই কথা বলিয়াছ?'

আমি শান্তকণ্ঠে বলিলাম—'আর্য, দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের কন্যাকে যে রাজবংশ অপমানিত করে তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া রাজবংশ প্রমাণ করিয়াছে যে উহা পূজ্য-পূজনের অযোগ্য। আমি দেবপুত্র-নন্দিনীকে সেই রাজবংশের সম্পর্কযুক্ত কোনও ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় লইতে দিতে পারি না। এ কথা আমি তাঁহার অনুমতি লইয়াই বলিতেছি। আমার অবিনয় ক্ষমা করিবেন; কিন্তু একথা আমি অকিঞ্চন বাণভট্টরূপে বলিতেছি না, দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের প্রাণাধিক কন্যার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার রক্ষক হিসাবে বলিতেছি। বাণভট্ট কুমারের অনুগত বশংবদ, কিন্তু দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের আহত অভিমানের প্রতিনিধিরূপে সে উঁহার মতে সায় দিবে এরূপ আশা করিতে পারেন না।'

'সাধু বৎস, তুমি দেবপুত্রের মর্যাদাব উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। আর কুমার, তুমি ধীর, তুমি বিবেকী, তোমাকে স্থাণ্বীশ্বরের কলংক-পঙ্ক ক্ষালনরূপ পবিত্র কার্য করিতে হইবে। তুমিই এই কার্য করিতে পার। দুধের জলভাগ মাঠা করিয়া খাইয়া ফেল। না কুমার, তোমাকেই আয়ুষ্মতী চন্দ্রদীধিতির সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একবার প্রত্যন্তদেশের দিকে তাকাও। যৌধেয়রা সৌবীর হইতে গান্ধার পর্যন্ত আতঙ্ক বিস্তার করিয়াছে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কীর্তি আজ পর্যন্ত চন্দ্রকিরণের মত ধবল, কিন্তু রণদুর্মদ যৌধেয়দের দমন

করিতে না পারিলে সদ্ধর্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ কার্যে দেবপুত্রকে তোমার মিত্র করিয়া লইতে হইবে। সেই মিত্রতার জন্য তোমাকে আয়ুষ্মতী চন্দ্রদীধিতির অভিপ্রায় মত কাজ করিতে হইবে, আর তাহার বিপদে অকারণ-বন্ধু বাণভট্টের বাণীর উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে হইবে।'

কুমার নির্বিকার রহিলেন। শান্তকণ্ঠে বলিলেন—'তাহা হইলে কি আদেশ, আর্য!'

আচার্য বলিলেন—'আয়ুষ্মতীকে ঐ স্থান হইতে সরাইতে হইবে, একটু ভদ্রমত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে, স্থাণ্বীশ্বরের কলঙ্ক ধুইয়া তাহার প্রতি লোকের যাহাতে বিশ্বাস হয় এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, আর দেবপুত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইবে। বৎস, আমি চণ্ডীমণ্ডপের মূর্খ পূজারীকে ভয় করি। ও লোকটা না জানি কখন কি করিয়া বসে। উহার কোনও ব্যবস্থা করিয়াছ কি, কুমার?'

কুমার পূর্বের মতই নির্বিকার। শুধু সিক্তকণ্ঠে বলিলেন—'নাগরিক বেশে পাঁচজন সশস্ত্র সৈনিককে চণ্ডীমণ্ডপের প্রহরার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছি।'

আচার্য সাধুবাদ করিলেন। পুনরায় কুমারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'কী ভাবিতেছ, বৎস? তোমার ক্রোধ কি এখনও শান্ত হয় নাই?'

সুযোগ বুঝিয়া আমি বিনীতভাবে বলিলাম—'কুমারকে উত্তেজিত করিবার অপরাধ আমার, আর্য! তাহার দণ্ডও তো আমার পাওয়া চাই। কিন্তু আমার ঔদ্ধত্যের জন্য দেবপুত্র-নন্দিনীর কোনও অনিষ্ট হওয়া উচিত নয়।'

কুমার আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করি, ভট্ট! তোমার মত ব্রাহ্মণ এর পূর্বে কেন যে আমার চোখে পড়ে নাই, একথাই ভাবিতেছি।'

আচার্য স্নেহপূর্ণ হাসির সহিত বলিলেন—'কখনও খুঁজিয়াছিলে, বৎস?'

কুমার বলিলেন—'না, আর্য!'

আচার্য পুলকিত হইয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণই বা কি, আর শ্রমণই বা কি, কুমার! মনুষ্যত্ব উভয়ত্রই বিরল।' এই কথা বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কুমারের পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কুমার আমার দিকে তাকাইলেন। তিনি যেন কী এক চিন্তায় পড়িয়াছেন। পুনরায় তাঁহার চক্ষু দুইটি আচার্যের দিকে ফিরাইলেন। বলিলেন—'স্থাণ্বীশ্বরে তো আমি এমন বাড়িই দেখিতে পাই না, রাজকুলের সহিত যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। আবার ধর্মত আমি যাহা কিছু জানি তাহা মহারাজাধিরাজের নিকট নিবেদন করা প্রয়োজন। ধর্মত বাণভট্টও রাজরোষের ভাজন হইবে আর হতভাগী নিপুণিকার সর্বনাশ তো

নিশ্চিত। এইজন্য ভাবিতেছি যে বাণভট্ট কাল সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত দেবপুত্র-নন্দিনী ও নিপুণিকাকে লইয়া মগধের দিকে যাত্রা করুক। আজই আমি একখানা বড় নৌকার জোগাড় করিয়া দিতেছি। দেবপুত্র-নন্দিনী আজ রাত্রে সেখানেই বিশ্রাম করুন। কাল প্রস্থানের পূর্বে বাণভট্ট আমার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করে। কাল হোলির উৎসব। কাল শাসন ও ধর্ম, এই দুই বিভাগের ছুটি। আমি পরশু মধ্যাহ্নে মহারাজাধিরাজকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব। যাহাতে দেবপুত্র-নন্দিনীর কোনও কষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব, এবং তাঁহার প্রীতি অর্জন করিবার চেষ্টাও করিব।'

আচার্য উৎসাহ দিয়া বলিলেন—'সাধু, বৎস! এই তো কুমারের উপযুক্ত কথা।'

কুমার একটু থামিয়া বলিলেন—'কিন্তু এই অনুতাপ আমার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে আর্য, যে দেবপুত্র-নন্দিনী নির্দোষ রাজবংশের প্রতি কুপিত হইয়াছেন। ছোট রাজবাড়ি যে পাপ করিতেছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত যদি আমাদের এইভাবে করিতে হয়, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে।' পুনরায় আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেবপুত্র-নন্দিনীর সম্মুখে যাইতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। ভদ্র, তুমি সত্যই বলিয়াছ, স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশ প্রমাণ করিয়াছে যে উহা পূজ্য-ব্যক্তিকে পূজা করিবার অযোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত ঘটিয়াছে না জানার ফলে। সুযোগ পাইলে দেবপুত্র-নন্দিনীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাঁহারই ইচ্ছায় পূজ্যকে পূজা করিবার এই সুযোগও রাজবংশের হাত হইতে বাহির হইয়া গেল! যদিও সাহস হয় না, তবু বলি, আমার দিক হইতে তুমি তাঁহাকে শিবিকায় করিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত যাইবার জন্য প্রস্তুত করিও। যাহারা দেবপুত্র-নন্দিনীর অপমান করিয়াছে তাহারা সমস্ত স্থাণ্বীশ্বরের রাজলক্ষ্মীকে পদাঘাত করিয়াছে। ইহার হিসাব তাহাদিগকে দিতে হইবে, কিন্তু আমি কোনও কর্ম লঘুভাবে করা নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। দেখ ভট্ট, সৌভাগ্য-বশে তুমি দেবপুত্র-নন্দিনীর বিশ্বাসভাজন হইয়াছ, এইজন্য ইহাও প্রয়োজন যে তুমি তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝাইয়া দিবে, সেই সব অপরাধীরা আজই যে দণ্ড পাইতেছে না তাহার কারণ রাজনৈতিক জটিলতা। কুমার কৃষ্ণবর্ধন প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে দুর্নীতির উচ্ছেদ করিয়াই সে নিঃশ্বাস ফেলিবে। দেবপুত্র-নন্দিনীর অপমান তাহার নিকটে নিজের ভগিনীর অপমানের তুল্য।' আচার্য করুণার্দ্র দৃষ্টিতে একবার কুমারের দিকে তাকাইলেন। তিনি পুনরায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন—'সাধু, বৎস! সাধু, স্থাণ্বীশ্বরের প্রতাপশালী রাজবংশের উপযুক্ত কথা।' কুমার বলিলেন—'কিন্তু আর্য, আমার হৃদয়ে যে কাঁটা বিঁধিয়াছে তাহা যেমন তেমনই আছে। দেবপুত্র-নন্দিনীর কোনও ইচ্ছার বাধা

দেওয়া আমার ইচ্ছার বাহিরে। কুমার কৃষ্ণ আজ পর্যন্ত এতখানি লজ্জা কখনও পায় নাই। আজ ঐ শীর্ণ দেবায়তনের প্রাঙ্গণ-গৃহে কুসুমসুকুমারী রাজকুমারী রুক্ষ ও কদন্ন গ্রহণে অথবা হয়তো নিরন্ন থাকিয়া সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, সে কথা যখন মনে পড়ে তখন আমার সমস্ত ক্ষাত্রত্ব যেন উদ্বেল হইয়া ওঠে। আমি অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত রাখিয়াছি। আমার দুঃখ, এ বিষয়ে আমি কিছুই করিতে পারি না। আমার প্রতিটি কর্ম দেবপুত্র-নন্দিনীর মনে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিতে পারে। আমার রোষ আরও প্রবল হয় যখন ভাবি, যাঁহার দোর্দণ্ডপ্রতাপে রোমকপত্তনের উত্তরস্থিত দেশ কম্পমান, যাঁহার খরতর অসিধারা স্রোতস্বিনীতে শকাধিপতির মত নরেশ ফেন-বুদ্‌বুদের মত হইয়া গেলেন, যাঁহার প্রতাপাগ্নি যেমন ক্রীড়া-পরায়ণ শিশুরা ছত্রকদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে উদ্দণ্ড বাহ্লীকদের সেইভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, যাঁহার স্ফূর্জিত-দীপ্ত-কীর্তিবহ্নিতে প্রত্যন্ত স্বয়ং পতঙ্গের মত আচরণ করিতেছে, ইনিই সেই দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের কন্যা। সেই বিষম-সমর-বিজয়ী অজ্ঞাত-প্রতিস্পর্ধী বিকট দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের কন্যাকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়াও যে কোন সাহায্য করিতে পারি না, এই বিশাল শল্য আমার আহত চিত্ত হইতে বাহির হইতেছে না। আমার এই অনুরোধ তুমি পালন করাইয়া দেও, আর্য, যে রাজকন্যা গঙ্গাতট পর্যন্ত যাওয়ার সময়ে পায়ে হাঁটিয়া না যান, আমার প্রেরিত শিবিকায় বসিতে সংকোচ না করেন। কুমার কৃষ্ণবর্ধন তাঁহার ভাই হওয়ার গৌরব পাইতে চায়।'

কুমারের প্রভাদীপ্ত মুখমণ্ডলে কখনও রোষ, কখনও ক্ষোভ, কখনও গ্লানি আর কখনও নিঃসহায়তার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। সায়ংকালীন মেঘমালার মত তাঁহার ঈষদার্দ্র মুখমণ্ডলে ঘন ঘন বর্ণ পরিবর্তন হইল। আচার্যপাদ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'বৎস, আমার দিক হইতে কুমারীকে অনুরোধ পালন করিবার কথা বলিবে। আমি গঙ্গাতীরে তাহার সহিত দেখা করিব। তুমি এখন বিদায় গ্রহণ কর।'

আচার্যের ইঙ্গিত অনুসারে কুমার ও আমি উভয়েই উঠিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, মধ্যাহ্ন-সূর্য সহস্র সহস্র তপ্তকিরণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছেন। বাতোদ্ধৃত ধূলি একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া আকাশকে ধূসরবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছিল। বিহারের অঙ্গন-কুট্টিম সূর্যকিরণে তপ্ত হইয়া অগ্নির সমান দগ্ধ করিতেছিল, আর এই অঙ্গারময় বাতাবরণে বিহারের মধ্য-স্থিত আপাদ-তাম্র কিশলয়ে আবৃত অশ্বত্থকে এমন দেখাইতেছিল যে ধরণীর ভিতর হইতে বুঝি কোনও জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি অগ্নিশিখার রূপে ধরণীর অন্তঃস্থিত প্রচণ্ড উষ্ণতা উদ্‌গিরণ করিতেছে। কিন্তু উহা কি উষ্ণতাই

ছিল? না, অশ্বত্থের কিশলয়-সম্পদকে উষ্ণতা মনে করা শুধু বিকৃত-চিন্তার পরিণাম। প্রকৃতপক্ষে তো উহা ধরণীর হৃদয়ের রসরাশি, যাহা প্রচণ্ড তাপের ভিতরেও নিজের শীতলতার কথা ঘোষণা করিতেছিল। কুমার কৃষ্ণবর্ধনের হৃদয়স্থিত প্রেমরাশিও যে আমি উষ্ণতা মনে করিয়াছিলাম, তাহা আমার বিকৃত চিন্তারই পরিণাম। পার্শ্ববর্তী কুমারের দিকে ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক দৃষ্টিপাত করিলাম। কুমারের মুখমণ্ডল শান্ত ছিল। তাহা হইতে এক স্নিগ্ধ জ্যোতি বাহির হইতেছিল, তাহা যেন দর্শককে অভয় দান করিতেছিল। আমার দৃষ্টির অর্থ কুমার বুঝিতে পারিলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—'দেবপুত্রের মর্যাদা তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ, ভদ্র! তোমার সহিত পরিচয়ে আমি প্রসন্ন হইয়াছি।'

কুমারের অনুগ্রহ জোড়হস্তে মৌন বিনয়ের সহিত গ্রহণ করিলাম।

সহৃদয় কুমার বুঝিলেন, কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে আমার কথা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রসন্ন হইলেন।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

শিবিকা বাহির হইতে হইতে গোধূলির সময় উত্তীর্ণ হইল। বিলম্বের কারণ ছিলাম আমি। গঙ্গাতটে নৌকা-ব্যবস্থা না দেখিয়া ভট্টিনীকে সেখানে প্রেরণ করা আমার ঠিক ভাল লাগে নাই। গঙ্গাতীর হইতে যখন ফিরিলাম, তখন দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতেছিল। সূর্যমণ্ডল পরিণত পিয়ঙ্গু-মঞ্জরীর কেশরের মত পিঞ্জরিমাতে রঞ্জিত পশ্চিম সমুদ্রের দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছিল। অস্তকালীন রৌদ্র দিগ্‌বধূদের মুখের উপর পড়িয়া এমন এক মিহি চাদরের মত দেখাইতেছিল যাহা কুসুম্ভরসের অবিরল ধারাপাতে লাল ও কোমল হইয়া গিয়াছে। আকাশের নীলিমা অনেকখানি দূরে হইয়া গিয়াছিল, আর উহা চকোরের নয়ন-তারকার মত পিঙ্গল কান্তিতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কোকিলনেত্রের সমান লালাভ পিঙ্গল কিরণে সমস্ত ভুবন-মণ্ডল অরুণায়িত হইয়া যাইতেছিল। অধিক উজ্জ্বল দুই-একটি নক্ষত্র পূর্বগগনে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল, আর সমস্ত সন্ধ্যা যেন মোহনবেশা গৈরিকধারিণী এক ভৈরবী মূর্তিতে চণ্ডীমণ্ডপে নামিয়া আসিতেছিল। শিবিকা দুইটি প্রথম হইতেই হাজির ছিল। ভট্টিনী ও নিপুণিকা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। আমি আসিতেই শিবিকায় উপবেশন করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

প্রাঙ্গণ-গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমি একবার চারিদিকে চাহিলাম।

আকাশের অর্ধাংশিমা ধুইয়া গিয়াছে। মাথার উপরে ছড়ানো দেখা যাইতেছে আকাশ গাঢ় নীল পট্টের মত। মধ্যাহ্নের নীলিমা এখন আরও গভীর হইয়া গিয়াছে। চারিদিকের বৃক্ষাবলীর হরিৎবর্ণ কালিমায় পরিবর্তিত হইয়াছে। বনরাজি বন্য মহিষের মসীবর্ণ শরীরের মত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া চলিয়াছে। তাহার উপর হইতে পাখীদের যে ডাক শোনা যাইতেছিল, তাহা এখন শান্ত হইয়া গিয়াছে। সম্মুখের ভগ্ন দীর্ঘিকা তাহার শান্ত বক্ষোদেশে আকাশের সমস্ত শোভা সম্পদ লইয়া হাসিতেছিল। সব কিছুই ছিল শান্ত, নিস্তব্ধ ও মহিমা-পূর্ণ। মুহূর্তের তরে ভাবিলাম, পূজারী যদি এখন ফিরিয়া আসিত তবে একটু প্রাণ খুলিয়া ঠাট্টা-তামাশা করিয়া লইতাম। কিন্তু জানি না, পূজারী এখন কোথায়। যাওয়ার পূর্বে আবার একবার প্রাঙ্গণগৃহে গেলাম, যেন কোনও জিনিস ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহা খুঁজিব। মোহও কেমন এক বিচিত্র বস্তু! এই ভাঙ্গা প্রাঙ্গণগৃহের প্রতি আমার আকর্ষণ এই সময়ে যেন কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল। উহা তো সর্বদাই শূন্য থাকিত; কিন্তু ভট্টিনী চলিয়া যাইবার পর উহা বিকটভাবে শূন্য হইয়া গিয়াছিল। উহার দেওয়ালগুলি যেন বার বার চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, আজ আমরা প্রকৃতই শূন্য। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি অকারণ সেখানে সোজা দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ভট্টিনীর এক দিনের পূজা-বেদীর মাটি এখনও নরম আছে। তাহার উপর দিয়া মহাবরাহ চলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের উদ্ধার-মহিমার চিহ্ন তাহার উপর রাখিয়া গিয়াছিলেন; খানিকক্ষণ আমি ঐ বেদীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাকিলাম, পুনরায় একবার সেই তান্ত্রিক চিহ্নগুলির দিকেও স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। ভৈরবীচক্রের চিহ্নের পৃষ্ঠ-ভূমিতে মহাবরাহের বেদী এতই অদ্ভুত দেখাইতেছিল যে ক্ষণেকের জন্য আমি উহা ভবিষ্যতের কারণ নির্দেশক না মনে করিয়া পারিলাম না। এই যে এক দিনের জন্য পরস্পর-বিরোধী প্রতীকের সমন্বয়, উহা আকস্মিক হইতে পারে, কিন্তু অকারণ নিশ্চয়ই নয়। ইহাতে কোনও ভাবী বিরোধাভাসের সূচনা আছে। হঠাৎ আমার মুখ হইতে আমার রচিত এক পুরাতন আর্যা বাহির হইয়া পড়িল।

সে সময়ে আমি বারাণসীর নিকটবর্তী জনপদে পুরাণ-পাঠকের অভিনয় করিতেছিলাম। হৃদয়ে কোথাও ভক্তির লেশও ছিল না; কিন্তু স্বেদ, অশ্রু ও রোমাঞ্চের এত উত্তম আয়োজন করিয়াছিলাম যে সরল-হৃদয়া জনপদ-বধূরা ও গ্রাম-বৃদ্ধেরা আমার কথায় মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। একদিন সন্ধ্যায় আমি আসনে বসিতেই এক অতি কমনীয় মূর্তি বৃদ্ধা আসিয়া আমার চরণ স্পর্শ করিল। তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—তাহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক পদ্ম-ফুলের মত খিন্ন। কুণ্ডলিত কেশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। চোখে এক প্রলয়-

পুরের দৃশ্য। আহা, সে কত ভক্তিমতী ছিল, কত বিশ্বাসপরায়ণা, কত সরল-হৃদয়া! জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেন মা এত ব্যাকুল? কি হইয়াছে? কল্যাণ হউক মা, আপনার ব্যথা আমাকে খুলিয়া বলুন। আমি কি সাহায্য করিতে পারি?' বৃদ্ধা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—'আর্য, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি পৃথিবীর দেবতা, আপনার আশীর্বাদে আমার কল্যাণ হইবে। আমার একমাত্র পুত্র বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া না জানি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কোনও উপায় বলিয়া দিন যে নিজের হারানিধি ফিরিয়া পাই। কোন ব্রত-অনুষ্ঠান, কোনও জপ-হোম বলিয়া দিন, যাহাতে আমি আমার দুলালকে ফিরিয়া পাই। হায়, তাহার বালিকা-বধূকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই?' বৃদ্ধার কথায় ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হইলাম। আমিও তো বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইলাম, না, আমার তো মা নাই যিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধার্মিকতার ভান যাহারা করে তাহাদের নিকট অনুষ্ঠান-বিধির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইবেন! কোনও বালিকা বা যুবতী স্ত্রীও নাই যে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কেহ মাথা ঘামাইবে! কিন্তু কে এই হতভাগ্য যে এমন মাতা ও বধূকে ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছে? কোথায়ই বা যাইবে? বৃদ্ধাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম—'ব্যাকুল হইবেন না, মা, আপনার হারানিধি ফিরিয়া পাইবেন।' আবার কিছু কিছু ব্রত-উপবাসের বিধি বলিয়া নিজের কাজ শেষ করিলাম। বৃদ্ধা তাহার পুত্রবধূর হাতও দেখাইয়াছিল। আহা, কত করুণ সে মুখ! আমি চমকিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইলাম। তাহাকে দেখিয়া নিরাশ বলিয়া মনে হইতেছিল। বৃদ্ধা চলিয়া গেল; আমার মানসপটে এক মস্ত বড় ছেদচিহ্ন রাখিয়া গেল। আমার কেহই নাই—খোঁজ করিবার কেহ নাই, সান্ত্বনার আশা দিবার কেহ নাই। আমি একা, আমি সঙ্গিহীন, আমি হতভাগ্য, থাকিয়া থাকিয়া এই চিন্তা আমার মনকে অবশ করিয়া তুলিল। ইহা আমার নিকট দুর্লক্ষণের মত মনে হইল। এ পর্যন্ত যাহার হৃদয়ে সংসারের হাসি-কান্না পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত আসিল আর গেল, সে ব্যক্তি আজ ব্যাকুল কেন? অরুণকে দেখিয়া কি সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা হয় না? পবনকে দেখিয়া জলাগমের অনুমান সঙ্গত নয় কি? তাহা হইলে আমার চিত্তের এই বিকার কোন পূর্ব-নিদর্শনের উদয়ের সমান? আমি উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলাম—

অরুণ ইব পুরঃসরো রবিং পবন ইবাতিজবো জলাগমম্।
শুভমশুভমথাপি বা নৃণাং কথয়তি পূর্বনিদর্শনোদয়ঃ॥

তখন হইতে আমি এই ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ হঠাৎ আমার মুখ হইতে এই আর্যা বাহির হইয়া পড়িল। তাহা হইলে কি দুর্লক্ষণ এখনও কাটে

নাই? কাল সন্ধ্যা হইতে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনার এক বাত্যাচক্রের মধ্যে কঠিনভাবে জড়াইয়া গিয়াছি। কোনও অদৃষ্ট শক্তি কি কোনও অচিন্তনীয় বিরোধের অবস্থায় আমাকে টানিয়া লইতেছে? আজ হইতে বাণভট্টের হৃদয় কি পদ্মপত্রের মত অনাসক্ত থাকিতে পারিবে না? কে জানে!

এই সময়ে গৃহদ্বারে বনকুক্কুটের উড়িয়া যাওয়ার একটা শব্দ হইল। দ্বারের এক পার্শ্বে অযত্নবর্ধিত করবীর ঝাড় ছিল। সন্ধ্যা হইতেই উহার উপর বনকুক্কুটের ঝাঁক আসিয়া বসে। উহারা হঠাৎ উড়িয়া যাওয়ায় আমার সন্দেহ হইল যে কেহ বুঝি আসিয়া গিয়াছে। নিশ্চয় পূজারীই হইবে। আমি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। দরজায় যাহা দেখিলাম, তাহা শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অদৃষ্টপূর্বও বটে। আমি এমনই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়াছি। সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক গাঢ় গৈরিক বস্ত্রধারিণী স্ত্রীমূর্তি। তাহার এক হাতে ত্রিশূল, অন্যহাতে কৃষ্ণবর্ণ কি এক পাত্র। উন্মুক্ত পিঙ্গল কেশরাশি আগুলফ বিলম্বিত, যেন সায়ংকালীন অরুণ মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎশিখা অচঞ্চল হইয়া প্রতিহত হইয়া আছে। তাহার স্বর্ণাভ মুখমণ্ডল গৈরিক বস্ত্রে এমনভাবে কুণ্ডলাকারে আবৃত ছিল যে মনে হইতেছিল, ধাতুময়ী অধিত্যকায় বুঝি এক ঝাড় 'আরগ্বধ' ফুটিয়া আছে। তাহার চোখ দুটি বিকচ কাঞ্চনার পুষ্পের মত ঈষৎলাল ও উন্মীলিত, সেগুলির মধ্য হইতে এক মন্দ মন্দ আলোর মত বাহির হইতেছিল। সে মূর্তি মনোহর ছিল না। ভয়ংকরও ছিল না। যদি হঠাৎ সে প্রথমেই আমাকে ধমক না দিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাহাকে সাক্ষাৎ বিগ্রহধারিণী চণ্ডিকা বলিয়াই মনে করিতাম। সেও আমাকে সেখানে দেখিয়া আশ্চর্যভাব দেখাইল। পরমুহূর্তে তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে আরম্ভ করিল। বিস্ফারিত চোখ দুটি আরও বিস্ফারিত হইয়া গেল। নাসাগ্রে এক প্রকার স্ফুরণ, ভ্রূলতার বিকুঞ্চন। ললাটের বলিরেখা স্পষ্টই দেখা গেল। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—'এই সাধনাগৃহে চোরের মত ঢুকিয়াছিস্, কে তুই?'

আমি এপর্যন্ত নিজেকে সামলাইতে পারি নাই। কি বলিতে হইবে, কি না বলিতে হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলাম। বেশ দেখিয়া অনুমান করিলাম, কোনও ভৈরবী হইবে। আবার মনে পড়িল এই প্রাঙ্গণগৃহের ভিতরের বিচিত্র চিহ্নগুলি। মনে হইল, কিছুক্ষণ পূর্বে যে দুর্নিমিত্তের আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহা মাথার উপর আসিয়াছে। এই সময়ে ভট্টিনী যে এখান থেকে চলিয়া গিয়াছেন একথা ভাবিয়া মনে খুবই সন্তোষ হইল। নিজেকে সামলাইতে পারিলাম। জোড়-হাতে বলিলাম, 'আমি বিদেশী, মা, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

ভৈরবী একবার আমাকে নীচ হইতে উপর পর্যন্ত মন দিয়া দেখিলেন। বলিলেন—'তুই ব্রাহ্মণ?'

'আমার জন্ম ব্রাহ্মণবংশেই হইয়াছে, মাতঃ!'

'বৈদিক ক্রিয়ার অভ্যাস আছে?'

'সামান্য কিছু।'

'এই সাধনাগৃহে তুই কি করিতেছিলি?'

আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই যে ভৈরবী আমার কাছ থেকে কি জানিতে চাহেন। এখানে আমি কোনও বৈদিক ক্রিয়া করি নাই; কিন্তু প্রাঙ্গণগৃহে এক নরম মাটির বেদী এখনও আছে, উহার কৈফিয়ৎ তো আমাকে দিতেই হইবে। প্রসঙ্গবশে আবার ভট্টিনীর কথাও উঠিতে পারে। এতদিন পর্যন্ত বামমার্গী সাধকদের বিষয়ে আমার মনে শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। বিশেষ করিয়া এই সব ভৈরবীদের সম্বন্ধে আমি এমন সব কথা শুনিয়াছিলাম যে তাহাদের বিষয়ে শ্রদ্ধা বাড়িতে পারে নাই। এইজন্য আমি নিজেকে সংযত করিলাম। বলিলাম—'এই গৃহে আমি খুব অল্পক্ষণই ছিলাম, দেবি! এখানে বৈদিক কি অবৈদিক কোনও অনুষ্ঠানই করি নাই।'

ভৈরবীও আমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে আমি কিছু লুকাইতেছি। বলিলেন—'ঠিক ঠিক বল, না হইলে অকল্যাণ হইবে।'

এবার আমি ভয় পাইলাম। এসব ভৈরবীরা মঙ্গল না হউক অমঙ্গল অবশ্যই করিতে পারেন, আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল। জোড় হাতে বলিলাম—'অজ্ঞজনের উপর দয়া হউক, মাতঃ!' ভৈরবী মৃদু হাস্য করিলেন। এ হাসি আদৌ নারীজনোচিত ছিল না। উহাতে কোনও প্রকারের শীল, বিনয়, লজ্জা বা মাধুর্যের একান্ত অভাব ছিল। উহা শুষ্ক ছিল না, রহস্যপূর্ণ ছিল। উল্কার ক্ষণস্থায়ী আলোর মত ঐ হাসি আমার মনের আশংকাকে দীপ্ত করিয়া গেল। আমি আবার ভয়ে ভয়ে বলিলাম—'অপরাধ ক্ষমা করুন মাতঃ!'

ভৈরবী বলিলেন—'এইদিকে এস', পুনরায় ঈষৎ জোরে ডাকিয়া বলিলেন—'আর্য, দেখুন, এই লোকটি কে?'

ভৈরবী আমাকে ভাঙ্গা পুকুরঘাটে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রথম হইতেই তিন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দুইজন তো কোনও সাধক ভৈরব ও ভৈরবী হইবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বিশিষ্ট এক সাধুও ছিলেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্মের উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় শুইয়া ছিলেন। তাঁহার শরীর হইতে একপ্রকার তেজ বাহির হইতেছিল। মাথায় চুল নাই বলিলেও চলে; কিন্তু কর্ণবিবর শুভ্র কেশে আবৃত। ললাটমণ্ডলের সহজ রেখা ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। চোখের উপরের ভ্রূলতা দুইটি একত্র মিলিয়াছিল, আর সমস্ত

মুখমণ্ডল ছোট-ছোট শ্মশ্রুলোমে পরিব্যাপ্ত। চোখ দুইটির আকর্ষণী শক্তি সমধিক। উহাদের দেখিয়া বড় বড় সামুদ্রিক কড়ির কথা মনে হয়। মনে হইতেছিল যে ঐ চোখ দুইটি কখনই সম্পূর্ণরূপে খোলে না—সর্বদাই অর্ধ-নিমীলিত, তাই নীচের মাংসখণ্ড ফুলিয়া ওঠে, কোণে একপ্রকার সঙ্কোচন দেখা যায়। তাঁহার বেশে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের চিহ্ন ছিল না, শুধু দক্ষিণ ভাগে রক্ষিত পান-পাত্র দেখিয়া অনুমান হইতেছিল যে ইনি কোনও বামমার্গী অবধূত হইবেন। তাঁহার পরিধানে ছিল ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ড, তাহা লাল তো নহেই, দেহ ঢাকিবার পক্ষে কোনও প্রকারে পর্যাপ্তও নহে। তাঁহার ভুঁড়ি প্রকৃতপক্ষে অনেকটা বাহির হইয়া না থাকিলেও বাহির হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছিল। ভৈরবী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল—'বাবা, এই দেখ, এই ব্যক্তি সাধনাগৃহ ভ্রষ্ট করিয়া আসিয়াছে।' বাবার চোখ বোজা ছিল। ভৈরবীর কথা শুনিয়া তিনি একটু সচেতন হইয়া নিজের অর্ধনিমীলিত নয়নে মুহূর্তের জন্য আমার প্রতি তাকাইলেন। সেই দৃষ্টি অতি পবিত্র বলিয়া মনে হইল। বাবা আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিছুকাল সেই অবস্থায় থাকিয়া বলিলেন—'মায়াবিনী! মায়াবিনী! মায়াবিনী!!' আমার মনে হইল, তিনি যেন প্রত্যক্ষরূপে সব কিছু দেখিতেছেন, ত্রিকাল যেন তাঁহার হস্তামলকবৎ। ভৈরবী আর একবার আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। বাবা শিশুর মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'কি রে, ওখানে গিয়াছিলি কেন? পাগলা, ও যে মায়াবিনী, উহার জালে ফাঁসিয়া গেলি!' এই বলিয়া তিনি চণ্ডীমণ্ডপের মূর্তির দিকে ইশারা করিলেন। আবার বলিলেন—'একলা ছিলি?' মনে হইল, বাবা বুঝি সব জানিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে কোনও জিনিস লুকাইবার চেষ্টা করা বিফল। কিন্তু বাবার অন্যরূপ অভিপ্রায় ছিল। আমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া গড় গড় করিয়া বলিয়া চলিলাম—'কাল রাত্রে দুইটি দুঃখিনী স্ত্রী লইয়া এই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলাম, বাবা! এই গৃহে আমরা আহারাদি করিয়াছি, উচ্ছিষ্ট দ্বারা অপবিত্র করিয়াছি। যে দুঃখিনী কন্যাকে আশ্রয় দিবার জন্য এখানে আনিয়াছিলাম, সে মহাবরাহের পূজাও করিয়াছে—কিন্তু সব কিছুই হইয়াছে আমার অজ্ঞাতে। অপরাধ ক্ষমা করুন! আর্য!' এই বলিয়া আমি সভয়ে প্রণিপাত করিলাম। বাবা বলিলেন—'ভয় পাইতেছিস নাকি রে?' আমি সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—'হাঁ, বাবা!'

বাবা অনেকটা এমন সজাগ হইলেন যেন কোনও শিশুকে তামাশা দেখাইতেছেন। তিনি উঠিয়া সোজা বসিয়া পড়িলেন, আর কৌতূহলের সঙ্গে বলিলেন—'এদিকে আয়!' আমি নিকটে গেলে তিনি আমার ললাট স্পর্শ করিলেন। আমার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ তিনি তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ দিয়া টিপিয়া

ধরিলেন, আবার ছাড়িয়া দিলেন। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মুহূর্তের মধ্যে আমার সম্মুখে এক ভয়ংকর দৃশ্য উপস্থিত হইল। দেখিলাম, ভট্টিনী ও নিপুণিকা নৌকায় বসিয়া পূর্বদিকে যাইতেছে। ওদিকে পূর্বগগন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মেঘের আগে আগে পিঙ্গলবর্ণের ধূলিরাশি দৌড়িয়া চলিয়াছে, তাহারও অগ্রভাগে ছোট ছোট তালচঞ্চু পক্ষীদের এক দল ধূলা ও মেঘের সঙ্গে খেলিতে খেলিতে পলাইয়া আসিতেছে। আমি তীরে দাঁড়াইয়া। মেঘ আরও ঘন হইয়া আসিল। বায়ুমণ্ডলে অল্প শৈত্যের আভাসও পাইলাম। পুনরায় ভয়ংকর প্রভঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশমণ্ডলে বিকট বিদ্যুতের গর্জন হইল। গঙ্গার তরঙ্গ একে অন্যের উপর যেন ক্রোধে আছড়াইয়া পড়িল। আকাশ ধূলিতে, দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারে এবং গঙ্গাপ্রবাহ ফেনপুঞ্জে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ভট্টিনীর নৌকা অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়-নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল না। পায়ের তলার মাটি কুম্ভকারের চাকের মত ঘুরিতে লাগিল। এই সময়ে বিদ্যুৎ চমকাইল। নৌকা স্রোতে ডুবিয়া গেল। নিপুণিকা ও ভট্টিনী জলে লাফাইয়া পড়িল। পুনরায় অন্ধকার, গর্জন, বৃষ্টির ফোঁটা। মাথা ঝন ঝন করিয়া উঠিল। শিরা এমনই ফুলিয়া উঠিল যেন উহা রক্তের চাপ আর সহ্য করিতে পারে না। মেঘ ছড়াইতে লাগিল, আঁধির বেগ বাড়িয়া চলিল, গর্জনের শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া চলিল, ফুৎকারের বিকট শব্দ দিঙ্‌মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া উঠিলাম—'ত্রাহি, আর্য, ত্রাহি!' এ সময়ে আমার ললাটে আর একবার অঙ্গুলি-স্পর্শ অনুভব করিলাম। গঙ্গার ধারা শান্ত হইল, আকাশ স্বচ্ছ হইয়া গেল, ভুবনমণ্ডল প্রসন্ন হইয়াছে মনে হইল। দেখিলাম, ভট্টিনী নৌকায় বিশ্রাম করিতেছেন। নিপুণিকা তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া কিছু বলিতেছে। ভট্টিনীর মুখ প্রসন্ন, চক্ষু উৎসুকতায় ভরা, গণ্ডদ্বয় উৎফুল্ল। আবার বাবার দিকে তাকাইলাম, তাঁহার অর্ধনিমীলিত নেত্রে মিটি-মিটি হাসি। ভয়ে ভয়ে বলিলাম—'বাবা, এ আমি কি দেখিলাম? এমন ঘটনা কি হইবেই?' বাবা শিশুর মত কৌতুকভরে বলিলেন—'আমি কি জানি?' পুনরায় তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিল। কিছুটা ভাবাবেশে বলিলেন—'কতই মায়া জানিস, পাগলী!' আবার আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'কি রে, ভয় পাইতেছিস নাকি?'

'আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আর্য!'

'তুই কি অপরাধ করিয়াছিস রে?'

'আমি সাধারণ মানুষ, আর্য। অপরাধ করিয়াই চলিয়াছি; কিন্তু জানিয়া

বুঝিয়া কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই। আমি অকল্যাণের কথা ভাবিয়া ভয় পাইতেছি।'

'ব্রাহ্মণ?'

'হাঁ, আর্য।'

'তোদের জাতিই তো ভীরু। কি রে, মহাবরাহের উপর তোর বিশ্বাস নাই?'

'আছে, আর্য!'

'মিথ্যা কথা! তোর জাতই মিথ্যাবাদী! কি রে, তুই আত্মাকে নিত্য বলিয়া মনে করিস?'

'মনে করি, আর্য!'

'পাষণ্ড! তোর সব শাস্ত্রই অধর্ম শেখায়! কি রে, কর্মফল স্বীকার করিস?'

বাবার এই প্রশ্নের উত্তর এখন সহজেই দিতে পারিলাম না। আবার কে জানে আমার জাতিকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করিবেন! একটু বক্রভঙ্গীতে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলাম—'কি করিয়া বলি, বাবা!'

বাবা হাসিলেন। বলিলেন—'বল না, তুই কর্মফল মানিস, কি না?'

'মানি, আর্য!'

'তাহা হইলে অমঙ্গল দেখিয়া ভয় পাস কেন? তুই মিথ্যাচারী!'

'হাঁ, আর্য, সে তো ঠিক!'

'তবে কিছু সত্য কথা শিখিয়া নে না?'

'কি আর্য?'

'এই যে ভয় পাইলে চলিবে না। যাহাকে বিশ্বাস করিবে তাহাকে পুরাপুরি বিশ্বাসই করিবে—তা পরিণাম যাহাই হউক। যাহাকে মানিতে হইবে তাহা শেষ পর্যন্ত মানা চাই।'

'মায়াপঙ্কে মগ্ন সংসারকীট আমি, আর্য! অনেক কিছু বুঝিতে পারি, কিন্তু করিতে পারি না।'

'প্রপঞ্চী! তোর জাতটাই যে প্রপঞ্চী। এক শ কথা বুঝিয়া ঘুরিতেছ কেন? একটাই বোঝ, আর তাহাই পালন কর। কি রে, ঐ মেয়েটার উপর তোর মমতা আছে কি না?'

প্রশ্ন অদ্ভুত। কী জবাব দিব? চুপ করিয়া থাকাই ঠিক বলিয়া মনে হইল। বাবা এখন ঐ ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহামায়া! সব ঠিক আছে তো?'

ভৈরবী বলিল—'এখনই ঠিক হইয়া যাইবে।' একথা বলিয়া সে আর অন্য

দুইজন সাধক উঠিয়া পড়িল। আমি একা থাকিলাম। বাবা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি রে, বলিস না কেন?'

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম—'ঐ কন্যার সেবক হওয়া গৌরবের বিষয়, আর্য! আমি উহার মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।'

বাবা হাসিতে থাকিলেন। বলিলেন—'না রে পাগল, প্রাণ আমি চাই না। আমি জানিতে চাই যে ঐ কন্যার উপর তোর মমতা আছে কি নাই। সোজাসুজি বলিস না কেন? তোর জাতটাই যে বেঁকা। হাঁরে, মহাবরাহের উপর তোর মমতা আছে?'

'আছে আর্য!'

'মনে কর এক নিশাচর হঠাৎ আসিয়া তোকে ধরে আর বাঁ হাতে তোর স্বামিনীকে ডান হাতে মহাবরাহ মূর্তিকে লইয়া বলে যে তুই তোর প্রাণ দিয়া একটিকে বাঁচাইতে পারিস, তাহা হইলে তুই কাহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দেওয়া পছন্দ করবি?'

বাবা অদ্ভুত লোক। এমন প্রশ্নও করে! আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। অল্পক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম—'আমি দুইজনকেই বাঁচাইতে চাহিব।'

বাবা ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন—'আবার মিথ্যা বলিতেছিস, জন্মপাতকী, কর্মে ভাগ্যহীন, মিথ্যাবাদী, পাষণ্ড!! মহাবরাহকে বাঁচাইবি তুই! দম্ভী!'

আমি নিশ্চেষ্ট, নির্বাক, স্তব্ধ! বাবার ক্রোধ বাস্তবিক ছিল না। আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই তিনি এই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আমি বিচলিত হইয়া গেলাম। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কে যেন আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল—'প্রাণ দিয়া আমি ভট্টিনীকে বাঁচাইব।'

বাবা হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্ধমুদ্রিত নেত্রে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বলিলেন—'অভাগা, সমস্ত জীবনে তুই এই একটা কথাই সত্য বলিয়াছিস। কি রে, লজ্জা কেন? দূর, পাগলা, ঐ মায়াবিনীর জালে ফাঁসিয়া গিয়াছিস? খারাপ কিরে, ত্রিপুরসুন্দরী যে রূপে তোর মন ভুলাইয়াছে, তাহা সাহসপূর্বক স্বীকার করিস না কেন? তুই অভাগা হইয়াই থাকবি, বোকা! তোর মনে মহাবরাহের চেয়ে অধিক পূজ্য ভাব ঐ মেয়েটির প্রতি। নয় কি? আমায় মিথ্যা বলবি হতভাগা?'

'না বাবা, মিথ্যা কি আমি বুঝিয়া সুঝিয়া বলিতেছি, কে যেন বলাইতেছে। ভট্টিনীর প্রতি আমার ভাব পূজার ভাব, একথা সত্য।'

'হাঁ, তুই এখন ঠিক কথা বলিতেছিস। ভুবনমোহিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াও তুই ঘুরিয়া ফিরিতেছিস, পাগলা! দেখরে, তোর শাস্ত্র তোকে ধোঁকা দিতেছে। তোর ভিতরে যাহা সত্য, তাহা চাপিয়া যাইতে বলিতেছে; যাহা তোর ভিতরে মোহন,

তাহা ভুলিতে বলিতেছে; যাহাকে তুই পূজা করিস, তাহা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছে। মায়াবিনী, এ মায়াবিনী, তুই এর জালে ফাঁসিয়া যাস না। সমস্ত পুরুষকে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে, স্ত্রীদের অপদস্থ করিতেছে, মায়ার দর্পণ খোলা রাখিয়াছে। তুই উহাকে দেখিতে পাস না, আমি দেখিতেছি। তোকে দেখিয়া ও হাসিতেছে।'

আমি মুগ্ধের মত হইয়া বাবার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তাঁহার প্রতিটি কথা আমার অন্তস্তলে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, যেন বহু বৎসরের ময়লা পরিষ্কার হইয়া যাইতেছিল। বাবার কথাগুলি যেমনই বিচিত্র, তেমনই অন্তর্ভেদী। অল্পক্ষণ পর্যন্ত অভিভূতের মত থাকিয়া আমি জোড়হাতে প্রশ্ন করিলাম—'কি বাবা, আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা কি হইবেই?'

বাবা নির্ভয়ে বলিলেন—'তা মন্দটা কি রে? এই প্যাঁচের মধ্যে আসিস কেন? ঘটিতে দে না, কতখানি আনন্দ হইবে! তুই ভুলিয়া যাস, পাগল! সেও যে লীলায় রস পায়? আচ্ছা, ঠিক বল, তুই এই মেয়েটিকে কি মনে করিস?'

'আমি...আমি...আমি...'

'দূর মূর্খ, কিছু বল না। যে কথা তোর মনে প্রথমে আসে, সেই কথাই বলিয়া দে না।'

'উনি পবিত্রতার মূর্তি, আর্য!'

'তুইও পশু নহিস!'

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই সময়ে মহামায়া নামে ভৈরবী আসিল। বাবা তাহাকে বলিলেন—'মহামায়া, এ পশু বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু বীরও নয়। অমঙ্গলকে ভয় পায়। একে আজ প্রসাদ দিতে হইবে। অমঙ্গলের কথায় এর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছে।'

মহামায়া ক্ষণেকের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। পরে বিনীত ভাবে বলিল—'এ কি অধিকারী, আর্য!'

বাবা আবার হাসিয়া উঠিলেন। 'তুমিও এখনও উহার জাল হইতে বাহিরে আসিতে পার নাই, মহামায়া! বলিয়া তো দিয়াছি, পশু নয়। অধিকারী না হইলে কি আর করিবে? তোমাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইবে, এই তো? ভয় পাইতেছ। দূর পাগলি, তুইও ভয় পাস?'

মহামায়া বলিল—'যে আজ্ঞা, আর্য!'

বাবা বলিলেন—'দাঁড়াও মহামায়া, তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিই।' এই বলিয়া তিনি আমাকে নিকটে ডাকিলেন। জানি না কি দেখিতে পাইব, এই ভাবিয়া আমি ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার

উত্তরীয় সরাইয়া দিয়া মেরুদণ্ড ধীরে ধীরে পরীক্ষা করিলেন। অর্ধেক পিঠ পর্যন্ত আসিয়া তিনি হাত সরাইয়া লইলেন। বলিলেন—'আমি ঠিকই বলিয়াছি, মহামায়া! এই দেখ, ইহার কুণ্ডলিনী জাগ্রত।'

মহামায়া ভৈরবীও হাত দিয়া ঐ স্থান স্পর্শ করিয়া দেখিল। আশ্বস্ত হইয়া বলিল—'তাহা হইলে যেমন আজ্ঞা হয়, বাবা!'

'ইহাকে কুয়ার পাশে বসাইয়া দিও।' আবার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'অমঙ্গল দূর হইয়া যাইবে, কিন্তু তুই অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া মনে করিস না কেন? আজ পূর্ণিমা লাগিতেই ইহাদের গোপন সাধনা হইবে। মহামায়া তোকে প্রসাদ দিবে। সে প্রসাদ তুই নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিস, আর দেখ বাবা, উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ঘুরিস না। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু দেবতা। দেবতা যে রূপে তোকে সব চেয়ে অধিক মোহিত করিয়াছে তাহারই পূজা কর। আয়, তোকে মন্ত্র বলিয়া দিই।' আমি বাবার নিকট এমনভাবে আকৃষ্ট হইলাম, লোহাকে চুম্বক যেমন টানে। তিনি আমাকে একটা মন্ত্র দিলেন আর বলিলেন—'যখন তোর মনে ভয়, লোভ আর মোহের সঞ্চার হইবে, তখন তুই ইহাই জপ করবি।'

আমি ভক্তিপূর্বক বাবার কথা স্বীকার করিলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত বাবা নিশ্চলের মত বসিয়া থাকিলেন। পুনরায় কাহারও পদশব্দ শুনিয়া তিনি চোখ মেলিলেন। বলিলেন—'কে?'

'আমি বিরতিবজ্র, আর্য!'

'এস।'

বিরতিবজ্রের বয়স পঁচিশের নীচেই বলিয়া মনে হইল। তাহার মুখমণ্ডল নির্মল, মোহন ও আকর্ষক। সে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মত চীবর পরিধান করিয়াছিল; কিন্তু চীবরের বর্ণ হরিদ্রা না হইয়া লোহিত ছিল। জ্যোৎস্নায় সেই বর্ণ আরও খুলিয়াছিল। তাহার কণ্ঠস্বরও ছিল কোমল ও বালকোচিত। বাবাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সে এক জায়গায় শান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। বাবা আগের মতই ঝিমাইতেছিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি স্থির করিয়াছ, বিরতি?'

'কিছু বুঝিতে পারি নাই, আর্য! আমার আদিগুরু অমোঘবজ্র আমাকে এমন কিছু করিতে বলেন নাই। তিনি কেবল নৈরাত্ম্যের ভাবনায় স্থির থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। একবার আমার চিত্ত যখন অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল তখন গুরুও চিন্তিত হইলেন। মানসিক উৎক্ষেপের কারণ তো তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াই ছিলাম। একদিন তিনি হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—আয়ুষ্মান্, আমি এখন অধিক দিন থাকিতে পারিব না। তুই কৌলাচার্য

অঘোরভৈরবের নিকট যা। তিনিই তোর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ঐ দিন হইতে আমি আর্যের সন্ধানে ছিলাম। কিন্তু আমি আমার আদিগুরুর কথা ঠিক বুঝিতে পারি নাই, কেন তিনি আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইলেন।'

'নৈরাত্ম্য-ভাবনা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ?'

'না, আর্য!'

'তোমার উপর কেহ বিশ্বাস করিলে তাহাকে ত্যাগ করিবার সাহস তোমার আছে?'

'না, আর্য!'

'তুমি আর আমি—এই দুইয়ের ভেদ ভুলিতে তুমি আনন্দ পাও কি?'

'হাঁ, আর্য!'

'স্ত্রী-পুরুষের ভেদ তুমি ভুলিতে পার কি?'

'না, আর্য!'

'বন্ধ ও বন্ধের ভেদ তোমার ভাল লাগে, না মন্দ?'

'ভাল লাগে, আর্য!'

'সাধু আয়ুষ্মান্, তুমি সত্যবাদী। অমোঘবজ্র বুঝিয়া সুঝিয়াই তোমাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছে। তুমি সৌগততন্ত্রের অধিকারী নও, তুমি কৌলমার্গে বিচরণ করিয়া দেখিতে পার। কিন্তু আয়ুষ্মান্, শক্তি বিনা সাধনা তো এই মার্গে চলিতে পারে না। এবিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত তোমাকে করিতেই হইবে।'

'একথাটাই আমি বুঝিতে পারি না, আর্য!'

'যতক্ষণ তুমি পুরুষ ও স্ত্রীর ভেদ ভুলিতে পারিবে না, ততক্ষণ তুমি অর্ধ, অপূর্ণ, আসক্ত। ততক্ষণ "তুমি ও আমি"র ভেদ অনবরত তোমার মধ্যে লাগিয়া রহিবে। যদি তোমার নৈরাত্ম্য ভাবনার প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে শক্তি বিনাও সাধনা অগ্রসর হইতে পারিত। তোমার মধ্যে সেই প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু আমি নিজ হইতে এই সাধনা তোমার মাথায় চাপাইয়া দিতে চাই না। তোমার অভিরুচি হইলে স্বীকার কর। দেখ, প্রবৃত্তি লুকানোও উচিত নয়, তাহা দেখিয়া ভয় পাওয়াও কর্তব্য নয়, লজ্জিত হওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়। এই কথাগুলি যত্ন করিয়া মনে রাখিও, তাহার পর গুরুর উপদেশ অনুসারে চলিতে থাক। আজ তুমি চক্রে একত্র বসিতে পার।'

বিরতিবজ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আদেশ পালনে সম্মতি জানাইল। তাহার চেহারা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল যে তাহার ভিতরে অশান্তি, সে যথাশক্তি তাহা চাপিয়া রাখিতেছিল। গুরুকে প্রণাম করিবার পর সে আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। ঠিক এই সময়টায় জ্যোৎস্না তাহার মুখের উপর পড়িল। আহা, কি কমনীয় মুখ! মুহূর্তের জন্য লাল চীবরে আবৃত

বিরতিবজ্রকে দেখিয়া আমার মনে পড়িল ধূর্জটির নয়নাগ্নিশিখায় বলারিত মদনদেবের কথা। অস্থানে বৈরাগ্যের উদয় হইল। বিদ্যুল্লতা চন্দ্রমণ্ডলের উপর খেলিয়া গেল। সান্ধ্য কিরণে পুণ্ডরীক পুষ্প আটকাইয়া গেল। উষা-কালীন আকাশমণ্ডলে শুক্রগ্রহ স্থির হইয়া গেল। মদনের শোকে আকুল বসন্ত বৈরাগ্য গ্রহণ করিল। আহা, ইহাও কি সম্ভব? বিরতিবজ্র প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। আমিও যেমন তাহার রূপ দেখিয়া এ সমাজের বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, সেও আমার বেশ দেখিয়া অনুরূপ মনে করিয়াছিল। বাবাই মধ্যস্থতা করিলেন—'এ বিদেশী ব্রাহ্মণ, বিরতি! সাধনা-গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। মহামায়া ইহার প্রতি অপ্রসন্ন। এখনও জাল হইতে বাহির হইতে পারে নাই। ঐ মায়াবিনীর জাল বিকট, তাহার বিধান দুরতিক্রম্য। মহামায়া এখনও ফাঁসিয়া আছে। ব্রাহ্মণ অমঙ্গলকে ভয় করে, মোহও আছে, শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার, মিটিতে মিটিতে কত বৎসর লাগিবে। পশু নয়, বাহির হইয়া যাইবে। মহামায়া ইহাদিগকে প্রসাদ দিবেন। তিনিও প্রসন্ন হইবেন। ইহারাও ভয় হইতে মুক্তি পাইবে।' এই পর্যন্ত বলিয়া বাবা আকাশের দিকে তাকাইলেন। বলিলেন—'সময় হইয়া আসিয়াছে, বিরতি, একটু সুধাপাত্র দাও!' বিরতি পাত্র আগাইয়া দিল। বাবা উপরের দিকে মুখ করিয়া ডাকিলেন—'মায়াবিনী, মায়াবিনী!' আর ঢক ঢক করিয়া পান করিলেন। কিছুকাল পর্যন্ত এক অদ্ভুত মত্ত দশায় তিনি ঝিমাইতে থাকিলেন এবং পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন! আমরা দুজনেও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিরতির সঙ্গে তিনি সাধনাগৃহে চলিয়া গেলেন এবং আমাকে একটু পরে আসিতে আদেশ দিলেন। চলিতে চলিতে বলিয়া গেলেন—'কাহাকেও ভয় করিবে না, গুরুকেও না, মন্ত্রকেও না, লোককেও না, বেদকেও না। মন্ত্র মনে আছে তো?'

'হাঁ, আর্য!'

'অল্পক্ষণ পরে কেহ না ডাকিলেও নির্ভয়ে আসিবে। কেমন?'

'হাঁ, আর্য!'

বাবা চলিয়া যাওয়ার পর ভাবিবার অবসর পাইলাম। এ কোথায় আসিয়া জড়াইয়া পড়িলাম! বাবার কথাগুলির মানে কি? মহামায়া যদি নিজেই চটিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার প্রসাদ নিষ্ঠাপূর্বক গ্রহণ করিব কি করিয়া? কিন্তু বাবা তো এই আদেশই দিয়া গিয়াছেন। বাবার প্রভাবে যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা কি সত্য? ভট্টিনী এই সময়ে নিরাপদে আছেন তো? নিপুণিকার কি অবস্থা? আমি কি ভট্টিনীরই পূজার অধিকারী? কী আশ্চর্য! এত সহজ কথায় আমার মনে এতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে কেন? পুনরায় ভয় হইল, এখনই বুঝি মাথা ঘুরিবে। বাবার দেওয়া মন্ত্র জপ

করিলেই কল্যাণ। আমি নিষ্ঠা সহকারে জপ করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্তের পর আমার কেন যেন মনে হইল যে বাবা ডাকিতেছেন। অভিভূত-ভাবে সাধনা-গৃহের দিকে চলিলাম। প্রাঙ্গণ-গৃহের দ্বার হইতেই আমি অত্যন্ত শান্ত ও মৃদুকণ্ঠে এই শ্লোক উচ্চারিত হইতে শুনিলাম—

আদায় দক্ষিণকরণে সুবর্ণদর্বীং দুগ্ধান্নপূর্ণামিতরেণ চ রত্নপাত্রম্।
ভিক্ষান্নদাননিরতাং নবহেমবর্ণামম্বাম্ ভজে সকলভূষণভূষিতাঙ্গীম্॥

কণ্ঠ মহামায়ার। অনুমানে বুঝিতে পারিলাম, যখন অন্নপূর্ণার ধ্যানমন্ত্র পড়া হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভোজনের কোনও ব্যাপার আছে। কিন্তু ভিতরে গিয়া যাহা কিছু দেখিলাম, ভোজনের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিকট নয়। এক চক্রাকার মণ্ডলে পাঁচজন বসিয়া আছে। কৌলাচার্য অঘোরভৈরবের পার্শ্বে মহামায়া ভৈরবী প্রায় গাত্রসংলগ্ন হইয়া বসিয়া। সাধক ভৈরবদের অন্য দুইজনেও একটু দূরে ঐভাবেই সমাসীন। বিরতিবজ্র একাই এক প্রান্তে পদ্মাসনে বিরাজমান। কুয়ার নিকটে নির্দিষ্ট স্থানে আমি বসিয়া গেলাম। সেখান থেকে বাবা ও মহামায়া একেবারে সম্মুখে। সকল সাধকের নিকটেই একটি করিয়া পানপাত্র, সকলই লালবস্ত্রে আবৃত। কিন্তু শরীরের উপর কাহারও বস্ত্র ছিল না। প্রথমে যে ছোটখাটো নেকড়া ছিল তাহাও না জানি কখন খসিয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রস্থলে লাল কাপড় দিয়া ঢাকা কারণপাত্র, তাহার উপর অষ্টদল কমলের আকারে কোনও একটা পাত্র রাখা হইয়াছিল। সাধকেরা জপ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। বাবা কিছুই করিতেছিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, অদ্ভুত এক আত্মবিস্মৃতির অবস্থায় আছেন। তাঁহার সমস্ত শরীর নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির ও প্রশান্ত। তাঁহার মুখমণ্ডলের উপর জ্যোৎস্নারাশি আসিয়া পড়িতেছিল, মনে হইতেছিল, সমাধিস্থ শিবের উত্তমাঙ্গের উপর গঙ্গার ধবলধারা সহস্রধারা হইয়া ঝরিতেছে। আমি এখন মহামায়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। তাহার মুখমণ্ডল ছিল কমল কোরকের মত দীর্ঘ, তাহার উপর ললাটপট্ট অষ্টমীর চন্দ্রের সমান আয়ত ও স্বচ্ছ হইয়া শোভা পাইতেছিল। জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হওয়ায় সেই মুখ-মণ্ডলের স্নিগ্ধতা বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রথমবার আমি তাহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু ও বক্র ভ্রূকুটি আমার মনে অশ্রদ্ধার ভাব আনিয়া দিয়াছিল। এখন আমি তাহার পার্বতীপ্রতিম নিশ্চল-গৌর মুখমণ্ডল দেখিয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিলাম। অঘোরভৈরবের পাশে শান্তভাবে আসীন মহামায়াকে ভগবান্ শঙ্করের পার্শ্ববর্তিনী উমার সমান শান্ত, মনোরম দেখাইতেছিল। অনুষ্ঠানের বিধিগুলি সম্পাদন করিবার

ভার ছিল তাহারই উপর। বাবা শান্ত ও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিলেন। মহামায়া কারণঘট হইতে পাত্র পূর্ণ করিয়া অস্ফুটধ্বনিতে মন্ত্র পড়িয়া যাইতেছিল। সমস্ত সাধকেরই পাত্র ভরিয়াছিল। মহামায়া প্রথমে বাবা অঘোর-ভৈরবের হাতে পাত্র দিল। দিবার পূর্বে সে কিছু মন্ত্র পড়িয়া দিল। সম্ভবত উহা সুধাদেবীর ধ্যানমন্ত্র। আবার কয়বার দুইহাত দিয়া কিছু বিশেষ মুদ্রায় পাত্রকে মুদ্রায়িত করিল। পুনরায় একবার নিজের চারদিকে তর্জনী দিয়া শব্দ করিয়া না জানি কি অনুষ্ঠান করিল। হয়তো ইহা ছিল দিগ্‌বন্ধনের বিধি। বাবা যেমনই হাতে পাত্র লইলেন, অমনই সাধকেরা নিজ নিজ পাত্র হাতে উঠাইয়া লইলেন। অত্যন্ত মৃদুমন্দ কণ্ঠে বিরতিবজ্র প্রথম পাত্রের বন্দনা স্তুতি পড়িল :—

শ্রীমদ্ভৈরবশেখরপ্রবিচলচ্চন্দ্রামৃতপ্লাবিতম্
ক্ষেত্রাধীশ্বরযোগিনীগণ-মহাসিদ্ধৈঃ সমাসেবিতম্।
আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাৎত্রিখণ্ডামৃতম্
বন্দে শ্রী প্রথমংকরাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদম্॥[১]

মন্ত্র সমাপ্ত হইতেই বাবা মহামায়ার অধরোষ্ঠে পাত্র স্পর্শ করাইলেন আর ধীরে ধীরে কোনও প্রকারের শব্দ না করিয়া তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। সাধকেরাও তাহাই করিল। কিয়ৎকাল পর্যন্ত করবী ফুলের সৌরভ ও গুগ্‌গুল ধূমের সহিত মিশ্রিত কারণের সৌরভ আমার মনপ্রাণ উভয়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সাধকেরা কেহই বিচলিত হইলেন না। জপ চলিতে থাকিল, অন্যান্য সাধকেরা পানের সময়ে ডান হাতে কিছু বিশেষ প্রকারের মুদ্রা ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু বাবা পূর্ববৎ থাকিলেন। তিনি না মন্ত্র পড়িলেন, না মুদ্রা ধারণ করিলেন, না কোনও অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি কৈলাসশিখরে সমাধিস্থ ভগবান্ ত্রিনয়নের সমান শান্ত ও নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিলেন। সাধকেরা ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় পাত্র আবাহন করিল। ইহাও সাতবার হইল। পান-মুদ্রা-জপ, পান-মুদ্রা-জপ, পান-মুদ্রা-জপ! অন্য ভৈরবযুগলকে কিছু চঞ্চল বলিয়া মনে হইল। মহামায়া ও বিরতিবজ্র পূর্ববৎ অনুষ্ঠানে লাগিয়া থাকিল। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। এবার বাবা চোখ মেলিলেন। তাঁহার মনে কোনও চাঞ্চল্য ছিল না, শুধু একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন। ভৈরবযুগল কিছু অধিক চঞ্চল হইল। বাবা অঘোর-ভৈরব প্রথমবার শান্ত পরিষ্কার স্বরে আদেশ দিলেন—'শান্তিমন্ত্র পাঠ কর।' মহামায়া ও বিরতিবজ্র অতি মনোহর কণ্ঠে শান্তিমন্ত্র পাঠ করিল। সমস্ত মন্ত্রটা আমার মনে নাই, কিন্তু তাহার ভাব ছিল ভারি সুন্দর। প্রত্যেক মন্ত্রের

[১] তুঃ কৌলাবলিনির্ণয়, ৮ম উল্লাস

পর বিরতিবজ্র একাই এক শ্লোক পড়িতেছিল। বার বার শোনার ফলে এখনও আমার উহা মনে আছে :—

শিবমস্তু সর্বজগতঃ পরহিতনিরতা ভবন্তু ভূতগণাঃ।
দোষাঃ প্রয়ান্তু শান্তিং সর্বো লোকঃ সুখী ভবতু॥
সর্বো লোকঃ সুখী ভবতু॥[১]

ভৈরবযুগল প্রকৃতিস্থ হইল। অনুষ্ঠান পুনরায় অগ্রসর হইল। একাদশ পাত্র সমাপ্তির পর সাধকদের হাতে বিশেষ প্রকারের আকৃতি দেখা দিতে আরম্ভ করিল। জ্যোৎস্না সরিয়া গিয়াছিল। অঙ্গনের কৃত্রিম অন্ধকারে, বায়ুমণ্ডল মদিরগন্ধে, নভোমণ্ডল গুগ্‌গুল ধূমে পরিপূর্ণ ছিল। আমার মাথা এসব সহ্য করিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিল না। আমার এমনই মনে হইল যে আকাশ হইতে বুঝি বিকটাকার ভূত ও বেতাল নামিয়া আসিতেছে, ঘটের চারদিকে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইতেছে। সাধকদের চক্রাকার মণ্ডলী ছায়াচিত্রের মত দেখাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া সেই সব ছায়াচিত্রের মধ্যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন হইতে থাকিল। আমি নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না। মাথা ঘুরিয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া কখন পড়িয়া গেলাম, তাহা জানিতেই পারি নাই।

অল্পকাল পরে আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মাথার দিকে কিছু ঠাণ্ডা অনুভব করিলাম। যদিও আমার চক্ষু তখনও বন্ধ ছিল, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষ দেখিলাম, নভোমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে আনন্দভৈরব নামিতেছেন। তাঁহার শরীরে কোটি কোটি সূর্যের প্রভা, তথাপি তাঁহাকে কোটি কোটি চন্দ্রমা হইতে অধিক শীতল মনে হইতেছে। অমৃতসমুদ্র হইতে উদ্‌ভূত ব্রহ্মার কমল হইতে উঠিয়া তিনি সুধাধবল বৃষভের উপর আরূঢ় হইলেন। তাঁহার কণ্ঠের নীলিমা এই শ্বেত পৃষ্ঠভূমিতে এমন করিয়া লাগিয়া রহিল যে মনে হইল বুঝি কর্পূর গিরির উপর নীলমণির ছোট অংকুর উদ্গত হইয়াছে। তিনি তাঁহার অষ্টাদশ হস্তে ঘণ্টা, ডমরু, পাশ, অংকুশ, খট্টা আদি বিবিধ শস্ত্র ও এক হাতে অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া ছিলেন। আনন্দভৈরবের সঙ্গেই আনন্দভৈরবী সুরাদেবীর পদার্পণ হইল। আনন্দভৈরবের মতই ইঁহারও পঞ্চ মুখ, ত্রিনেত্র, অষ্টাদশ ভুজ ছিল। তাঁহার বর্ণ তুষার, কুন্দ ও চন্দ্রের মত ধবল ছিল। চক্ষু চঞ্চলখঞ্জরীর মত লীলাপরায়ণ। প্রবালের মত আরক্ত ওষ্ঠপুটে মন্দ মন্দ হাসি লাগিয়াই ছিল। তিনি আনন্দের মূর্তি, মত্তার প্রভবভূমি, সৌন্দর্যের বিশ্রান্তিস্থল, আভার আবাসগৃহ ও যৌবনের মূর্ত বিগ্রহরূপে দেখা দিলেন। আনন্দভৈরবের ইঙ্গিতে তিনি আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন। মনে

[১] নাগানন্দের শেষ শ্লোকটি প্রায় এইরূপ

হইল, কেহ বুঝি অমৃত-তুলিকায় আমায় সমস্ত শরীর অনুলেপন করিয়া দিলেন। আনন্দভৈরবী আমায় শিরোদেশ ধীরে ধীরে তাঁহার উৎসঙ্গে তুলিয়া লইলেন। আমার সমস্ত জড়তা মুহূর্তের মধ্যে লয় পাইল। আনন্দভৈরবী মন্দহাস্যপূর্বক আমার নয়ন ও কপোলপ্রান্ত তাঁহার অমৃতার্দ্র হস্তে মুছিয়া দিলেন। আমার চক্ষু উন্মীলিত হইল। তখনও আমার মস্তক ভৈরবীর ক্রোড়ে। অভিভূতের মত বলিলাম—'অপরাধ ক্ষমা করুন, মাতঃ! আজ আমি কৃতার্থ।' ভৈরবীর মুখের উপর আনন্দধারা বহিয়া গেল। তিনি আবার ভৈরব ও সুরা-দেবীর ধ্যানমন্ত্র পড়িলেন। এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার মস্তক মহামায়ার ক্রোড়ে। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, মধুর ও করুণ শোনাইল। তাঁহার নেত্র হইতে মাতৃস্নেহ উছলিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ প্রভা বাহির হইতেছিল। সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। আমি কৃতজ্ঞভাবে বলিলাম—'মাতঃ, আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। অত্যন্ত বাল্য-বয়সে আমি আমার মাতাকে হারাইয়াছি। পিতৃমুখও বেশি দিন দেখিতে পারি নাই। মাতৃপিতৃহীন অভাগা বাণভট্ট বাৎস্যায়ন বংশের কলঙ্ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আজ আমার জন্ম সফল, আমি আনন্দ ভৈরবীর অমৃতায়মান স্নেহ-স্পর্শ পাইয়াছি। মাতঃ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, অমঙ্গল দূর হউক, কল্যাণ হউক।' ভৈরবী সস্নেহে বলিলেন—'কল্যাণ হউক, বৎস, মহামায়ার প্রসাদ গ্রহণ কর।' এইবার আমি ভাল করিয়া চোখ মেলিলাম। মহামায়াই তো? মুষলধারার বর্ষণের পর শিথিলবৃন্ত অশোকপুষ্পের মত তাঁহার নয়ন রক্ত হইলেও আর্দ্র ছিল, শেফালিকা-কুসুমবৃন্তের সমান তাঁহার নাসাবংশ পিঙ্গল হইয়াও ছিল মনোরম, বিদ্যুৎশিখাসংবলিত মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত চন্দ্রমণ্ডলের মত তাঁহার আনন কপিশবর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াও নয়নাভিরাম ছিল। কৃষ্ণবর্ণ জল হইতে উদ্ভূত স্ফীত কোবিদার বৃক্ষের মত তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র শ্লথকুঞ্চিত হইয়াও সুন্দর ছিল, কারণঘটের উপর স্থাপিত জবা পুষ্পের সমান তাঁহার সিন্দূর-তিলক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াও ছিল পবিত্র। তাঁহার আজ্ঞায় আমি উঠিয়া বসিলাম। অত্যন্ত স্নেহে ও আদরের সহিত তিনি প্রসাদ দিলেন। প্রসাদের মধ্যে ছিল মধু, আর্দ্রক, কন্দ ভাজা ও অপরাজিত পুষ্পের কিছু দল। আমি ভক্তিপূর্বক সে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। মহামায়া ভৈরবী প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। আমি চার দিকে একবার সতর্কভাবে দেখিলাম। মহামায়া ছাড়া আর কেহই সেখানে ছিলেন না, এমন কি কারণপাত্র ও করবী-পুষ্পের এক ক্ষুদ্র দলও সেখানে ছিল না। আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—'মাতঃ, আর্য অঘোরভৈরব কোথায় গিয়াছেন? আর ঐ দুইজন সাধকই বা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন?'

মহামায়া সংক্ষেপে উত্তর করিলেন—'সকলে নিজের নিজের আশ্রমে চলিয়া গিয়াছে। আমিও যাইব। বাবাজীর আজ্ঞা ছিল যে তোমাকে প্রসাদ দিয়া দিই, এই জন্য এখনও থাকিয়া গিয়াছি।'

'উহারা কি এখন আর এদিকে আসিবে না?'

'বৈশাখের অমাবস্যার পূর্বে নয়।'

'বাবাও নয়?'

'বাবা সিদ্ধ অবধূত, তাঁহার কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই। আসিতেও পারেন, না আসিতেও পারেন। তাঁহার প্রসাদ পাওয়া তোমার পরম পুণ্যের ফল।'

'মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?'

'কর।'

'বাবা আমাকে কাল যাহা-কিছু বলিয়াছেন, তাহার অর্থ কি?'

'বাবার চেয়ে আমি আর কি বেশি বলিতে পারি।'

'প্রবৃত্তির পূজা করার তাৎপর্য কি হইতে পারে?'

'বাবা কি বলিয়াছেন?'

'বাবা বলিয়াছেন যে প্রবৃত্তি হইতে ভয় পাওয়াও ভুল, তাহা লুকানোও ঠিক নয়, তাহার জন্য লজ্জা করাও মূর্খতা। আবার বলিয়াছেন যে ত্রিভুবন-মোহিনী যে রূপে তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছেন, সেই রূপের পূজা কর, উহাই তোমার দেবতা। পুনরায় বিরতিবজ্রকে বলিয়াছেন—এই মার্গে শক্তি বিনা সাধন হইতে পারে না। এমন অনেক কিছু তিনি বলিয়াছেন, যাহা পূর্বে কখনও শুনি নাই। মা, শক্তি কি স্ত্রীকে বলে? আর স্ত্রীজাতির মধ্যে সত্যই কি ত্রিভুবনমোহিনীর বাস হইতে পারে?'

'দেখ বাবা, তুমি অনর্থক তর্ক করিয়া চলিতেছ। বাবা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা পুরুষের পক্ষে সত্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে সত্য ঠিক ঐরূপ নয়।'

'তাহার বিরোধী কি, মা?'

'অনুপূরক। অনুপূরক বিরোধী হয় না।'

'বুঝিতে পারিলাম না।'

'বুঝিতে পারিবি, তোর গুরু প্রসন্ন, তোর কুণ্ডলিনী জাগ্রত, কৌল অবধূতের প্রসাদ পাইয়াছিস। উতলা হোস না। এইটুকু মনে রাখ যে পুরুষ বস্তুবিচ্ছিন্ন ভাবরূপ সত্যে আনন্দের সাক্ষাৎ পায়, স্ত্রী বস্তুপরিগৃহীতরূপে রস পায়। পুরুষ অসঙ্গ, স্ত্রী আসক্ত; পুরুষ নির্বন্ধ, স্ত্রী বন্ধোন্মুখী; পুরুষ মুক্ত, স্ত্রী বদ্ধ। পুরুষ স্ত্রীকে শক্তি মনে করিয়া পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রী স্ত্রীকে শক্তি মনে করিয়া অপূর্ণ থাকিয়া যায়।'

'তাহা হইলে স্ত্রীর পূর্ণতার জন্য পুরুষকে শক্তিমান স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই কি?'

'না। তাহাতে স্ত্রী নিজের কোনও উপকার করিতে পারে না, পুরুষের অপকার করিতে পারে। স্ত্রী প্রকৃতি। তাহার সফলতা পুরুষকে বন্ধনের মধ্যে ফেলায়, কিন্তু সার্থকতা পুরুষের মুক্তিতে।' আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে মহামায়ার দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। ভৈরবী বুঝিল যে আমি মূলেই কোথাও ভুল করিয়াছি। বলিল—'বুঝিতে পারিস নাই? মূলেই প্রমাদ করিয়াছিস, মূর্খ! তুই কি নিজেকে পুরুষ আর আমাকে স্ত্রী মনে করিয়াছিস? এইখানেই ভুল। আমার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা প্রকৃতির অভিব্যক্তির মাত্রা অধিক, তাই আমি স্ত্রী। তোর মধ্যে প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষের অভিব্যক্তি অধিক, তাই তুই পুরুষ। ইহা লোকের প্রজ্ঞপ্তিপ্রজ্ঞা, বাস্তব সত্য নয়। এরূপ স্ত্রী প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ প্রতিনিধি; এরূপ পুরুষ প্রকৃতির দূরস্থ প্রতিনিধি। যদিও তোর মধ্যে তোরই ভিতরের প্রকৃতিতত্ত্ব অপেক্ষা পুরুষতত্ত্ব অধিক, কিন্তু সেই পুরুষ-তত্ত্ব আমার ভিতরের পুরুষ-তত্ত্ব অপেক্ষা অধিক নয়। আমি তোর চেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ, বেশি নির্ব্বন্ধ, বেশি মুক্ত। আমি নিজের ভিতরের অধিকমাত্রাযুক্ত প্রকৃতিকে নিজেরই ভিতরের পুরুষতত্ত্ব দিয়া অভিভূত করিতে পারি না। তাই আমার প্রয়োজন অঘোরভৈরবের। যে কোনও পুরুষপ্রজ্ঞপ্তিযুক্ত মনুষ্য আমার বিকাশের সাধন হইতে পারে না।'

'আর অঘোরভৈরবের আপনাকে কি প্রয়োজন?'

'আমারই অন্তঃস্থিতা প্রকৃতিরূপে আমাকে সার্থকতা দেওয়া। উনি গুরু, উনি মহান্, উনি মুক্ত, উনি সিদ্ধ। ওঁর কথা স্বতন্ত্র।'

'কিন্তু এই তত্ত্বের বিষয়ে এই কারণদ্রব্য কি সাহায্য করে?'

'তুই বুঝিতে পারিবি না। মদিরা প্রকৃতির অভিব্যক্তির কারণ। উহা তাহাকে লুকাইয়া থাকিতে দেয় না। ইহা গোপন রহস্য!'

তা হইবে। মনে মনে মহামায়া ভৈরবীর অপূর্ব চিন্তাশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন, যেন কোনও কথা মনে করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার রক্তিম নয়নকোরকে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। কিছু ব্যাকুলতম হইয়া পড়িলেন। পুনরায় বলিলেন—'যা, যেখানে যাওয়ার ছিল চলিয়া যা। আমাকে দূরে যাইতে হইবে।' আর অপেক্ষা না করিয়াই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। আমি বিব্রত হইয়া প্রণাম করিলাম ও সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—'মা, বিরতিবজ্র কে?'

'তাঁহার আশ্রম হিমালয়ের পাদদেশে কোথাও হইবে। তিনি সৌগত

অবধ্তে অমোঘবজ্রের শিষ্য; কিন্তু সৌগততন্ত্রে অনধিকারী জানিতে পারিয়া গ্রুর্ তাহাকে আমাদের সম্প্রদায়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন।'

'অনধিকারী কেন, মাতঃ?'

'ত্রিভুবনমোহিনীর মায়া। ও শক্তিহীন। ওর শক্তি আছে ওর প্রতীক্ষায়। বারাণসীর জনপদে ওর জন্ম, ওর সে শক্তিও সেখানে কোথাও আছে।'

মহামায়া ভৈরবীর কথা শ্রনিতে শ্রনিতে আমার বারাণসী জনপদের সেই বৃদ্ধার কথা মনে পড়িল। বিরতিবজ্রের মুখের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য আছে। আহা, এই কি সেই বৃদ্ধার আদরের ধন? আর কি এই সাধকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না? কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। মহামায়া ততক্ষণ দূরে চলিয়া গিয়াছে। আমিও সবেগে বাহিরে আসিলাম। আকাশ তখন বৃদ্ধ কপোতের মত ধূম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রমা কর্তিত পতঙ্গের মত অস্তশিখরের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে। তরুণ অরুণের পীতাভ রশ্মিগুলি স্বর্ণশলাকা নির্মিত সম্মার্জনীর মত পূর্বগগনের নক্ষত্রগুলিকে মার্জিত করিতেছে। মহারুদ্রের পিনাকের মত ধনুরাশি আকাশের পশ্চিমমণ্ডলার্ধে প্রত্যক্ষ হইয়াছে আর ক্ষীণভূয়িষ্ঠা রজনী সন্ন্যাস লইবার জন্য একে একে নিজের নক্ষত্রালংকারগুলি খুলিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপ তুহিনসিক্ত হইয়াছে আর সামনের ময়দানে দূর্বাদলগুলি অলস-শিথিলভাবে পড়িয়া আছে দেখা যাইতেছে। আমি গঙ্গাভিমুখে চলিলাম।

সপ্তম উচ্ছ্বাস

গঙ্গাতীরে যখন পেঁৗছিলাম তখন সকাল হইয়া গিয়াছে। আমি মোটেই ভাবি নাই যে আমার দেরিতে বিলম্ব হওয়ায় ভট্টিনী ও নিপুণিকা এত চিন্তিত হইয়া পড়িবে যে সারা রাত্রি ঘুমাইতেই পারিবে না। ভট্টিনীর জাগরণ-খিন্ন চক্ষু আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির বাষ্পে পরিম্লান বন্ধুজীব কুসুমের মত করুণ দেখাইতেছিল। তাঁহার চক্ষু দুইটি দেখিয়া আমার হৃদয় অজানা এক আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। অভাগা বাণের জন্য কাহারও এতখানি চিন্তা হইতে পারে, একথা আমার একেবারেই জানা ছিল না। আমি নিজের আনন্দের কারণ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি, ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমি তখন একেবারেই বুঝিতে পারি নাই যে ভট্টিনীর ঐ খিন্নমনোহর চক্ষু আমাকে দেখিয়া কেন অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি কাতরভাবে আমার দিকে তাকাইলেন এবং কিছু না বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। নৌকা বড় ছিল। কুমার কৃষ্ণবর্ধন উহাতে সমস্ত

আবশ্যক সামগ্রী রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাধারণ বেশে কয়েকজন সৈনিকও সঙ্গে সঙ্গে পৃথক এক নৌকায় ছিল। আমি ভট্টিনীর অপ্রসন্নতার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। শুধু অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিপুণিকা আমাকে কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিতে দেখিল। উহার নিকট আমার এইরূপ দুঃখিত হওয়ার ভাব ভালই লাগিয়া থাকিবে। আমার মনে একই সঙ্গে হাজার রকমের চিন্তা আসিয়া জুড়িয়া বসিল। সমস্ত জীবনই তো দায়িত্বহীনভাবে সময় কাটাইয়া ফিরিয়াছি। কত রাত্রি কত দিন না জানি কোথায় কোথায় কাটাইয়াছি; কিন্তু অপরাধী তো আজই হইতে হইল। স্বেচ্ছায় এ কি বন্ধন নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইলাম। কাল পর্যন্ত আমি স্বতন্ত্র ছিলাম, আজ পরাধীন। আমার রাত আমার নয়, আমার দিন আমার নয়, আমার গতি আমার নয়, আমার মন নিজের নয়। কেন এমন হইল? যে বাণভট্ট আজীবন চটুলতায় কাটাইয়াছে আজ সে নিজেকে এতখানি পরাধীন বলিয়া মনে করে কেন? কে বলে যে তুমি চাকরি করিতেছ, চাকরের মত থাকিতে হইবে? কেহ তো সে কথা বলে না। এই পরাধীনতা তো তুমি নিজেই কিনিয়া লইয়াছ। ইহা ভাবিয়া আমাব সবচেয়ে আশ্চর্য বোধ হইয়াছে যে একবারও আমার অন্তর বিদ্রোহ করে নাই, একবারও বলে নাই যে আমার দ্বারা ইহা হইবে না। বরং এই কথা ভাবিয়াই উল্লসিত হইয়াছে যে সে অপরাধী, সে ভয়ংকর দোষ করিয়াছে, তাহাকে দণ্ড পাইতে হইবে। অপরাধ কি, তাহার খোঁজ নাই; কিন্তু অপরাধ করিলেই যেন পুরস্কার মিলিবে। নিপুণিকা আমার চিন্তাস্রোতকে বেশি দূর বহিতে না দিয়া বলিল—'তোমার এভাবে ভট্টিনীকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ভট্ট।' এখন আমি ঐ অপরাধের স্বরূপ অল্প-স্বল্প বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমি তো ভট্টিনীর কল্যাণের জন্যই তাঁহাদের ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। রাত্রিতে যাহা যাহা হইয়াছিল সমস্তই সংক্ষেপে নিপুণিকাকে শোনাইলাম। শুনিয়া নিপুণিকার মনে না হইল বিস্ময় না হইল দুঃখ। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গুষ্ঠ দিয়া নৌকার পাটাতনে দাগ কাটিতে কাটিতে ভাবিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সে যখন চোখ উপরে উঠাইল, তখন তাহার মধ্যে অদ্ভুত এক অবসাদের ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। চিন্তাকুলভাবে বলিলাম—'নিউনিয়া, তুমিও উদাস হইয়া গেলে?'

নিপুণিকা নিজেকে সামলাইয়া লইল। সে মুখে প্রসন্নতার ভাব আনিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সে চেষ্টায় এক প্রকার যে মানসিক ক্লেশ অনুভব করিতেছিল, তাহা আমাব নিকটে গোপনও করিল না, গোপন করিবার চেষ্টাও করিল না। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—'নিউনিয়া, তুমি কেন উদাস

হইয়া রহিলে?' নিপুণিকা সহজভাবেই উত্তর করিল—'কিছু নয় ভট্ট, আমি শুধু ভাবিতেছিলাম যে মহামায়া যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা কত অর্থপূর্ণ, কত সত্য! পুরুষের সত্য এক, নারীর সত্য অন্য। আমি নারীর শরীর পাইয়াছি, কিন্তু তাহা হইতে না হইয়াছি সফল, না সার্থক। কি ভট্ট, নারী-জন্ম সার্থক করিবার কোন উপায়ের কথা কি মহামায়া বলিয়াছেন?' আমি চিন্তিত হইয়া বলিলাম—'মহামায়া আমাকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগই দেন নাই। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তরে যদি অবধূতের কথাই প্রামাণ্য মানা যায়, তাহা হইলে আমার অনুমান উঁহার এই উত্তর হইবে যে প্রবৃত্তি দমন করাও ঠিক নয়, প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হওয়াও ঠিক নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দেবতা পৃথক। প্রবৃত্তিগুলিই হয়তো দেবতার পরিচয় করায়। আমি বহুবার নিজের দেবতাকে মনে মনে পূজা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাঁহার সন্ধানই পাইলাম না। সত্য বলিতেছি। নিউনিয়া, আমি এসব কথা বুঝিতেই পারি না; কিন্তু মনের কোনও কোণ হইতে বারবার প্রতিধ্বনি হইতেছে যে এই কথার মধ্যে সত্য আছে।' নিপুণিকা কথাটা মন দিয়া শুনিল। সে যেন প্রত্যেকটি অক্ষর বুঝিয়া লইতে চাহিতেছিল। সে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল—'ভট্ট, শীঘ্র স্নান করিয়া লও, আচার্যদেব তোমাকে কুমারের নিকট যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি কাল সন্ধ্যায় আসিয়াছিলেন।' এই বলিয়া সে ভট্টিনীর নিকট চলিয়া গেল। ও আর বেশি কিছু বলিলও না, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগও দিল না। আচার্যদেব ও ভট্টিনীতে কি সব কথা হইল তাহা জানিবার জন্য আমার মন উৎসুক হইয়া উঠিল; কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় জানিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল মনে হইল।

স্নানাদি শেষ করিয়া কুমার কৃষ্ণবর্ধনের আবাসাভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। নৌকার নীচে নামিতেই শব্দ পাইয়া পিছনে ফিরিলাম। দেখিলাম, ভট্টিনী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল, মেঘমুক্ত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ও মনোহর দেখাইতেছিল। তিনি সদ্যস্নাতা ও কুসুম্ভ-বস্ত্র পরিহিতা। প্রত্যগ্রস্নান তাঁহার কুংকুমগৌরকান্তিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার রুচির অঞ্চল মন্দ মন্দ বায়ুভরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কাষ্ঠতরণীতে সদ্যঃসমুপজাত চলকিশলয়বতী মধুমালতীলতার ন্যায় ফুল্লকমনীয় হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার উন্মুক্তকবরীর বিক্ষিপ্ত সুবর্ণাভ কেশ, কুসুম্ভের আভাসে এতই মনোহর দেখাইতেছিল যে তাহা দেখিয়া সুবর্ণ শিরীষের সুকুমার তন্তুগুলির পরাগপিঞ্জরজালের কথা মনে পড়িতেছিল। তাঁহার মূর্তি আনন্দে প্রদীপ্ত দেখাইতেছিল। ভট্টিনীকে প্রসন্ন দেখিয়া আমার চিত্ত আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল। আমি কিছু না বলিয়াই তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায়

দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—'শীঘ্রই ফিরিবেন, ভদ্র।' আমি মাথা নোয়াইয়া কাতরভাবে বলিলাম—'শীঘ্রই ফিরিব।' আমার বাণীর বাক্যার্থ যাহাই হউক না, প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা হৃদয়ই জানিত। তাহার বাস্তবিক অর্থ ইহাই ছিল যে 'দেবি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন, ভবিষ্যতে আর এরূপ ভুল হইবে না।' আমি যেন আমার বাক্যের ব্যঞ্জনা বুঝিয়াই লজ্জিত হইয়া রহিলাম। ভট্টিনী স্নেহ-মেদুর স্বরে বলিলেন—'হাঁ।' পুনরায় ফিরিয়া গেলেন। আমি নগরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। কান্যকুব্জের প্রমত্ত মদনোৎসবের দিন। ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আজ নগরে প্রবেশ করা কি সাহসের কাজ। সমস্ত নগর পুরবাসীদের করতলধ্বনি, মধুর সংগীত ও মৃদঙ্গের শব্দে গুঞ্জিত। মধুমত্ত নগরবিলাসিনীদের সম্মুখে যে কোনও পুরুষ পড়িলে তাহার উপর শৃঙ্গকের (পিচকারি) রংগীন জলের বর্ষণ হইতেছিল। বড় বড় চতুষ্পথ মর্দলের গম্ভীর ঘোষে ও চর্চরিধ্বনিতে শব্দায়মান। স্তূপীকৃত সুগন্ধি আবীর দশ দিকে এমনভাবে উড়িতেছিল যে দশদিক রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল, আর নগরীর রাজপথ আবীরে এমন ভরিয়া গিয়াছিল যেন তাহার উপর ঊষার ছায়া পড়িয়াছে। পৌরজনের দেহে পরিহিত অলংকার আর শিরে ধৃত অশোককুসুম এই লাল ও হরিদ্রাবর্ণে সৌন্দর্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। মনে হইতেছিল, নগরীর সকল অধিবাসীকে বুঝি সোনালী রং-এ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমৃদ্ধিশালী ভবনগুলির পুরস্থিত আঙিগনায় ধারাযন্ত্রের মধ্য হইতে উৎক্ষিপ্ত জলে নিজ নিজ পিচকারি ভরিবার জন্য কত ভিড়! এই সকল স্থানে পৌরবিলাসিনীদের অনবরত যাতায়াতের ফলে তাহাদের সীমন্তের সিন্দুর ও কপোলের যে আবীর ঝরিত তাহাতে সমস্ত ভিত্তি লাল আবীরের পঙ্কে ভরিয়া সিন্দুরময় হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রমত্ত রং-এর বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য অনেক কৌশল করিলাম, রাস্তা ছাড়িয়া সরু গলিতে প্রবেশ করিলাম, উলটা-সোজা চক্রগতিতে গিয়া রাজমার্গ হইতে কিছু দূরে চলিয়া গেলাম। এখানকার উৎসব যেমনই মাদক তেমনই মনোহর। স্থানে স্থানে পণ্যবিলাসিনীদের নৃত্য হইতেছিল। মন্দ মন্দ তাড়িত আলিংগক বাদ্যে, মধুর শিঞ্জনের মঞ্জুল বেণুনাদে, ঝনঝনায়মান ঝল্লরীর ধ্বনিতে, কলকাংস্য ও কোশীর মনোরম ক্বণনে, এইগুলির সঙ্গে দত্ত উত্তাল তালে, নিরন্তর তাড্যমান তন্ত্রীপটহের গুঞ্জরণে ও মৃদুমন্দ ঝংকারে ঝংকৃত অলাবুবীণার মনোরম ধ্বনিতে সে নৃত্য একদিকে যতই আকর্ষণ করিতে ছিল, অশ্লীল রাসকপদের রুগ্ন শৃঙ্গারের জন্য অন্যদিকে ততই দূরে সরাইয়া দিতেছিল। বিটদের কর্ণকুহরে এই অশ্লীল পদই যেন অমৃত সঞ্চার করিতেছিল। কী আশ্চর্য, একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতাদের কত বিপরীত-

ভাবে প্রভাবিত করিতেছিল। সৌন্দর্যকেও বিধাতা কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। এই যুবতীদের কর্ণে নব কর্ণিকারের ফুল দুলিতেছিল। চঞ্চল কেশ-রাশিতে অশোকস্তবক শোভা পাইতেছিল, গণ্ডদেশে নিষ্কম্প অঙ্গুলি দ্বারা অংকিত সুচিত্রিত মঞ্জরী দীপ্তি দিতেছিল। কুঙ্কুমগৌরকান্তিবলয়িত ললাটে তাহাদের কাশ্মীর কিশোরীদের মত দেখাইতেছিল। নৃত্যের নানা ভঙ্গীতে যখন তাহারা নিজ নিজ বাহুলতা আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল যেন তাহাদের সমুৎসুক বলয় উচ্ছলিত হইয়া সূর্যমণ্ডলকে বন্দী করিয়া রাখিবে। তাহাদের কনকমেখলার কিংকিণী হইতে উত্থিত কুরণ্টকমালা তাহাদের কটিদেশকে ঘিরিয়া এমনই শোভিত করিয়া রাখিয়াছিল যে মনে হইতেছিল বুঝি অনুরাগের বহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়াছে। তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে আবীর ও সিন্দুরের ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল, আর সেই লোহিতাভ কান্তিতে অরুণায়িত কুণ্ডলপত্র এমন শোভা পাইতেছিল যে মনে হইতেছিল উহা বুঝি মদনচন্দনদ্রুমের সুকুমার লতাদের বিলুলিত কিশলয়। তাহাদের নীল, বাসন্তী, চিত্রক ও কৌসুম্ভ বস্ত্রের উত্তরীয় যখন নৃত্যবেগের ঘূর্ণনে তরঙ্গায়িত হইতেছিল, তখন তাহারা শৃঙ্গার রসের চটুল-তরঙ্গের মত উল্লসিত হইয়া উঠিতেছিল। ঘনপটহধ্বনির পৃষ্ঠভূমিতে সাত্ত্বিক অভিনয়ে যখন তাহারা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, তখন সহৃদয়দের মনে পড়িত দুর্দিনের গর্জনমুখর মেঘের ছায়ায় যে কেতকীলতা কুসুম-ধূলি উদ্‌গিরণ করিতেছে তাহার কথা। উহা মদকেও মদমত্ত করিয়া দিত, রাগকেও করিয়া দিত রঙ্গীন, আনন্দকেও আনন্দিত করিত, নৃত্যকেও নাচাইত এবং উৎসবকেও উৎসুক করিয়া তুলিত। তাহাদের মধ্যে নারীসুলভ সুকুমার চিন্তার লেশও ছিল না। তাহারা পরিত্যক্ত দেবমন্দিরের মত, রাজপথে প্রক্ষিপ্ত প্রতিমার মত, আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত মালতীমালার মত প্রতিষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, নিজেদের শুচিতা ম্লান করিয়া দিয়াছিল। নারীর সৌন্দর্যকে আমি সংসারের সবচেয়ে প্রভাবশালিনী শক্তি বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু এখানে কি দেখিলাম? মহামায়া বলিয়াছেন, নারীর সফলতা পুরুষকে বাঁধায়, সার্থকতা তাহাকে মুক্তি দেওয়ায়। ইহা সফলতা, না সার্থকতা? আমার মনে থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই ধ্বনিত হইতে লাগিল যে নারীর সৌন্দর্য এখানে বাহ্য, নিষ্ফল, ঊষর। কেন এমন হইল? এই মহাশক্তিশালী তত্ত্ব হইতে অন্য কোনও বড় শক্তি আছে কি, যাহা ইহাকে এইরূপ হীনদর্প করিয়া দিয়াছে? অবশ্যই আছে। আমার বিশ্বাস, এই শক্তিই মহাসম্পদ।

অলিগলি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ছোট রাজবাড়ির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দরজায় নাগ ছিল না, আমার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সেই

রাত্রির অসাবধানতার দোষে নাগকে কি বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে? না, সে শূল-বিদ্ধ হইয়া আছে? ছোট রাজবাড়িতে উৎসবের কোনও সমারোহ চোখে পড়িল না। একটা মৃত্যুর ছায়া সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে অভিভূত করিয়া ছিল। এই সময়ে সেই পলিতকেশ বৃদ্ধ বাভ্রব্যের কথা স্মরণ হইল। বেচারীর না জানি কি গতি হইয়া থাকিবে। ভট্টিনীর বাহির হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে তাহাকে অবশ্যই সাহায্যকারীরূপে ধরা হইয়াছে। ছোট মহারাজ তবে ঐ বৃদ্ধের দেহ হইতে চর্মাবরণ ছাড়াইয়া লইয়াছেন। মন আমার গ্লানি ও দুঃখে অভিভূত হইয়া গেল। আমার যদি পক্ষী হইবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় উড়িয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতাম, সেখানকার কথা শুনিয়া আসিতাম। রাজপথের যে স্থানে রাজবাড়ির বিশাল উদ্যান শেষ হইয়াছে, সেখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেখানে এক প্রকাণ্ড বকুল গাছ ছিল, যাহার মদগন্ধি-সৌরভে মাথা ঠিক থাকে না। আমার এমনই মনে হইল যে রাজবাড়ির ভিতরের সংবাদ না জানিয়া অগ্রসর হওয়া পাপ হইবে; কিন্তু সংবাদ পাওয়া অসম্ভব ছিল। আমি অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার চিত্তে গ্লানি, লজ্জা, খেদ। এই সময়ে অত্যন্ত মৃদু ও স্পষ্ট ধ্বনিতে এক সারিকাকে কিছু বলিতে শুনিলাম। তাহার মুখ হইতে যে সব অক্ষর বাহির হইল তাহার কথা বুঝিতে আমার এক তিলও বিলম্ব হয় নাই। সে অতি মিষ্ট সুরে বলিয়া চলিতেছিল—'স মে স্বয়ংভূর্ভগবান্ প্রসীদতু।' আমার হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। এক নবীন শক্তি সমস্ত শিরা উত্তেজিত করিয়া দিল। আমি নিজে নিজেই বলিয়া উঠিলাম—'নিশ্চয় এ ভট্টিনীর সারিকা।' আমি এদিক ওদিক তাকাইলাম, নিজের মূর্খতার জন্য অনুতাপ করিলাম। কেহ শুনিলে কি যেন বলিত। সারিকা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার শোনাইল—'যা অভাগী, পলাইয়া যা এই অন্তঃপুর হইতে। তোর ভট্টিনী পলাইয়া গিয়াছে, আমি মরিতে যাইতেছি!' হায়, এ তো বাভ্রব্যের কথা জানা যাইতেছে। মুখরা সারিকা তাহার মুক্তির ঘোষণাপত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছে। আমি নিঃশব্দে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। এখন আর কি শুনিতে পাইব তাহার ঠিক কি! সারিকা এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সুর করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিল—'স মে স্বয়ংভূর্ভগবান্ প্রসীদতু,'[৩] পুনরায় উড়িয়া রাজবাড়ির বৃক্ষসংকুল উদ্যানে অন্তর্ধান হইয়া গেল। আমার মন উদ্বেগে ব্যাকুল হইয়া গেল। সাহিত্যশাস্ত্রে পড়িয়াছিলাম, শুক-সারিকা আর শিশুর মুখ দিয়া

---

[৩] রত্নাবলীর দ্বিতীয় অঙ্ক তুলনীয়।

অন্তঃপুরের গল্প শুনিতে পারা ভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব।[৪] শাস্ত্রের এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস! অন্তঃপুরের এই কাহিনী শোনাইয়া সারিকা আমার ভাগ্যকে কী বিড়ম্বনায় মধ্যে ফেলিল! হায় নির্দোষ বাভ্রব্য! তোমার প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে, আর অপরাধী বাণ এখনও জীবিত আছে। ভট্টিনী কি কখনও এই সব গরিবের কথা চিন্তা করিয়াছেন? যখন তিনি শুনিবেন যে অন্তঃপুরিকাদের পিতৃসম পূজ্য বাভ্রব্য কি পরিতাপের সহিত তাঁহার সারিকাকে মুক্তি দিয়াছেন, তখন কি তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইবে না?'

আজ ছোট রাজবাড়ির অন্তঃপুর নিস্তব্ধ। আজ তাহার ক্রীড়া-পর্বতের উপর সুন্দরীরা তাহাদের বলয়ধ্বনিতে উন্মদ ময়ূরদের নৃত্য করিতে শিখাইতেছে না। আজ তাহাদের ক্রীড়া-সরোবরের মৃদঙ্গ চক্রবাকদম্পতিকে অকারণ উৎকণ্ঠিত করিতেছে না হয়তো। আজ হয়তো অন্তঃপুরের কুট্টিম-ভূমি পাদালক্তকে লাল হইতেছে না। আজ হয়তো 'মিত্তিয়া'দের অঙ্গহার মহোৎসবের মঙ্গলকলশ সুসজ্জিত করিয়া দিবে না, চঞ্চল চক্ষুর কিরণে সারাদিন কৃষ্ণসারমৃগে পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে না, ভুজলতার বিক্ষেপে জীবলোক মৃণালবলয়ে বলয়িত বলিয়া মনে হইবে না, শিরীষ কুসুমের স্তবকের কর্ণপুরে অন্তঃপুরের ধূপ শুকপিচ্ছের রঙ্গে রঙ্গীন হইবে না, শিথিলধম্মিল্ল হইতে চ্যুত তমালপত্র অন্তরীক্ষকে কজ্জলীয়মান করিবে না, আভরণের রণৎকারে দিকে দিকে কিংকিণী ধ্বনিত হইবে না। ছোট রাজবাড়ির অন্তঃপুরে আজ না জানি কত ভীতি ও আশঙ্কা দানা বাঁধিয়া আছে। নানা দেশের অপহৃতা, লাঞ্ছিতা অন্তঃপুরিকারা বৎসরে একদিন আনন্দোৎসব পালন করে; হায়, আজ তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সত্য, আমি এক ভট্টিনীকে উদ্ধার করিয়াছি; কিন্তু আমার কি জানা আছে যে এই অন্তঃপুরে আর কতজন ভট্টিনী আছে! আর এই ধরনের অন্তঃপুরের সংখ্যা তো এইখানেই শেষ হয় না। এখনই যে উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য দেখিয়া আসিয়াছি আর সেখানে যে ভীতিভাব লক্ষ্য করিয়াছি, এই দুই অবস্থার মধ্যেই আপাততঃ কতখানি প্রভেদ আছে; কিন্তু ইহা সত্য যে উভয় স্থানেই এই সৃষ্টির সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু অপমানিত হইতেছে। কেন এমন হইতেছে? কেন স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই এই জাল বোনে, আর তাহাতে নিজেরাই আটকাইয়া যায়? আমি যে পথ ধরিয়া চলিতেছি সেখান দিয়া কোনও মদোন্মত্ত উৎসবের দল বাহির হইয়া গিয়াছে। কালিদাস

[৪] দুর্বারাং কুসুমশরব্যথাং বহন্ত্যা
কামিন্যা যদভিহিতং পুরঃ সখীনাম্।
তদ্ ভূয়ঃ শুকশিশুসারিকাভিরুক্তং
ধন্যানাং শ্রবণপথাতিথিত্বমেতি॥—রত্নাবলী ২।৭

উজ্জয়িনীতে প্রাতঃকালে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহা আমি স্থাণ্বীশ্বরে মধ্যাহ্নে দেখিতেছি। ঠিক ঐরূপ গমনের উৎকম্পবশে এখানেও সুন্দরীদের কেশ হইতে মন্দারকুসুম ঝরিয়া পড়িয়াছে, কান হইতে সোনালী কমল খসিয়া ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, হৃদয়দেশে বার বার আঘাত করার ফলে গলার হার হইতে বড় বড় গন্ধরাজ পুষ্প ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও আমি ইহাকে প্রেমাভিসারের পথ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই।[৫] এই পথ দিয়া উল্লাস ও উন্মাদ হয়তো গিয়াছে, অনুরাগ ও ঔৎসুক্য তো যায় নাই। এ সমস্ত কেন হইতেছে? ইহা কি ধর্ম? ইহা কি ন্যায়? আমার মন বলে, মনুষ্যসমাজ কোথাও না কোথাও অবশ্যই ভুল করিয়াছে। এই উন্মত্ত উৎসব, এই রাসক গান, এই শৃঙ্গক-শীৎকার, এই আবীর-গুলাল, এই চর্চরি ও পটহ মানুষের কোনও দুর্বলতা লুকাইবার জন্য, ইহা দুঃখ ভুলাইবার মদিরা, ইহা আমাদের মানসিক দুর্বলতার আবরণ। এইসব আছে বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে মানুষের মন রোগগ্রস্ত, তাহার চিন্তাধারা আবিল, তাহার পারস্পরিক সম্বন্ধ দুঃখপূর্ণ। আমার মন এই দুর্বহ চিন্তাভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল। হয়তো আরও কিছুকাল দাবাইয়া রাখিলে আমি চীৎকার করিয়া উঠিতাম। চিন্তার উৎকট রোগ আমার পায়ে চঞ্চলতা আনিয়া দিল। আমি ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নগরের রাজপথে উৎসবের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। সৌধ-বাতায়ন হইতে অবসাদেব বায়ু বাহির হইতেছিল। নাগরিক গৃহের পরিচারিকারা মন্থরগতিতে গৃহকার্যে লিপ্ত হইয়াছে, বিশ্রাম-গৃহের সুগন্ধি ধূপবর্তিকা দিঙ্‌মণ্ডলকে সৌরভে আকুল করিয়াছে। কুমার কৃষ্ণবর্ধনের গৃহদ্বারে আসিয়া যখন পোঁছিলাম, তখন মধ্যাহ্ন হইয়া গিয়াছে, রৌদ্র তখন সন্তাপদায়ী, আকাশমণ্ডলও ক্লান্ত হইয়া শিথিলগাত্র হইয়াছে। কুমার আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি যখন তাঁহাকে আমার আগমন সংবাদ দিলাম, তখন তিনি নিজেই বাহিরে আসিলেন এবং সাদরে আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

কুমারের গৃহ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুন্দর। দেওয়ালগুলি ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তাহাদের উপরিভাগে অনেক উত্তম অলংকরণ চিত্র আঁকা ছিল। প্রস্ফুটিত পদ্মের অবিরলপ্রবাহী স্রোতের চিত্র অংকিত ছিল, যাহার প্রত্যেক বিন্দুতে হংস, মৎস্য, গজ ও শার্দূল স্রোতের অনুকূলে গা

---

[৫] গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিচিতচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্‌ ॥—মেঘদূত ৬৮

চলিয়া দিয়াছে এমনভাবে অংকিত ছিল। উপরের সমস্ত ভাগে ছিল এক সূক্ষ্ম কমলিনী লতার বিস্তার, তাহার পত্রে পত্রে কোনও না কোনও জীবের মূর্তি অংকিত ছিল। দ্বারদেশের সম্মুখে বেস্‌সন্তর জাতক হইতে এক ভাবপূর্ণ চিত্র। যে ব্রাহ্মণ রাজকুমারের পুত্রকে দানরূপে পাইতে চাহিয়াছিল, তাহার কাতর মুখমুদ্রা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু রাজকুমার ও তাঁহার পুত্রের যে সহজ দানবীরের ভাব তাহা দেখিবার মত। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই চিত্রকারের কলা মুগ্ধ হইয়া দেখিতে থাকিলাম। আজকাল দেওয়াল চুনকাম করিয়া মহিষের চর্ম গোলক দিয়া লেপ লাগাইবার যে প্রথা, তাহা এই চিত্রে দেখা যাইতেছিল না; কারণ এইরূপ ভিত্তিপট্টের জন্য বজ্রলেপ লাগাইবার প্রথা আছে, যাহা হাওয়ায় ঠাণ্ডা হইয়া শুকাইয়া যায়। এইরূপ পট্ট বংশনালিকায় সংলগ্ন তাম্রতিন্দুকের তুলী-কূর্চকেরই যোগ্য, যাহা বাছুরের কানের লোম দ্বারা* নির্মিত হয়। এই চিত্রে স্পষ্টই মনে হয় এরূপ রোমতুলিকা ব্যবহৃত হয় নাই, তথাপি চিত্রে ভাবপ্রকাশের কলা কতই মনোহর ছিল! রাজকুমারের পুত্রের কোমলকান্ত মুখভঙ্গিমায় আত্মদানের কেমন দৃঢ় ভাব ফুটিয়াছিল! চমকিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, মোম আর ভাতে কাজল রগড়াইয়া যে রং তৈরি হয় তাহাতে কেমন স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! কাজল, মোম আর ভাত কি এমন স্বর্গীয় ভাব উৎপাদন করিতে পারে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের ভক্তিপূর্ণ চিত্তই প্রকৃত উপাদান, যাহা এই মনোহর দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছে। এই এক চিত্র ছাড়া অন্য কোনও চিত্র ঐ গৃহে ছিল না। কুমারের আসনের জন্য এক ক্ষুদ্রাকার স্ফটিকের পীঠ ছিল। তাহার উপর সুকোমল শয্যা ও উপাধান রক্ষিত ছিল। কয়েকটি চন্দনের আসনও ঐরূপ সজ্জিত ছিল। সেগুলি ছিল পণ্ডিত ও মহাত্মাদের বসার জন্য। কুমার আগ্রহ করিয়া আমাকে এক চন্দনপীঠিকার উপর বসাইলেন। আমি না বসা পর্যন্ত তিনি নিজে আসন গ্রহণ করিলেন না।

আসন গ্রহণান্তর কুমার ভট্টিনীর কুশলসংবাদ প্রশ্ন করিলেন। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম যে তিনি প্রসন্ন আছেন, কিন্তু কুমার আরও শুনিতে চাহিতেছিলেন। কাল হইতে আজ পর্যন্ত ভট্টিনীকে দেখিয়া যাহা বোঝা যায়, যথাসম্ভব মনের প্রত্যেকটি ভাব জানিবার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। কুমার তো আর জানিতেন না যে আমি ভট্টিনীকে কত কম জানিতাম। কিন্তু আমার মনে মনে এই গর্ব অবশ্যই হইতেছিল যে ভট্টিনীর বিষয়ে জানিতে হইলে আমাকেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। আমি কুমারকে নিজের জানা

---

* অভিলষিতার্থ চিন্তামণি ৩

কোনও কথা লুকাই নাই। কারণ আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে কুমার আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। কুমারের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি যখন ভট্টিনীর নিকট ফিরিয়া আসিলাম তখন যাহা যাহা ঘটিয়াছে সবই বলিলাম। ভট্টিনী উৎসুক হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন আমি তাঁহাকে বলিলাম যে কুমার কৃষ্ণবর্ধন বলিয়াছেন দেবপুত্র-নন্দিনীকে তাঁহার ভাইয়ের অনুরোধ তো মানিতেই হইবে, অর্থাৎ শিবিকা করিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত যাইতে হইবে, তখন ভট্টিনীর নীলোৎপলবৎ বৃহৎ বৃহৎ নেত্র হইতে সুনির্মল অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেইসব স্থূল অশ্রুবিন্দু দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে উহারা বুঝি অন্তস্তলের চিত্তশুদ্ধি সঙ্গে করিয়াই বাহির হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসাদ যেন বর্ষিত হইতেছে, তপস্যার রসই স্রুত হইয়া আসিতেছে, চক্ষুর ধবলপ্রভা যেন দ্রবীভূত হইয়া পড়িতেছে, পবিত্রতার মেঘমালা যেন বর্ষারূপে দেখা দিতেছে, কৃতজ্ঞতার মুক্তামালা বুঝি ছিঁড়িয়া গিয়া বিকীর্ণ মতির মত এদিক্ ওদিক্ গড়াগড়ি যাইতেছে। তিনি কিছুক্ষণ মাটির দিকে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। পুনরায় অল্পকাল আত্মবিস্মৃতের মত হইয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যেন আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাসই হয় নাই, যেন আমি কুমারের কথা না বলিয়া কোনও স্বর্গীয় দেবতার কথা বলিতেছি, আর পুনরায় শান্তভাবেই বলিলেন—'শিবিকা ডাকিয়া দিন।'

আমার এসব কথা কুমার আগ্রহ করিয়া শুনিলেন। কাল তাঁহার আকৃতিতে যে কূট চতুরতা ছিল, তাহা আজ আর নাই। কাল তিনি ছিলেন মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, আজ কোনও অজানা বোনের ভাই। কাল তাঁহার কোনও মনোবিকার অবদমিত হয় নাই, তাঁহার চটুল মৎস্যের মত চঞ্চল নয়ন সন্তরণেই রস পাইতেছিল। আমার বলার সামগ্রী ছিল কম, তাঁহার শোনার আগ্রহ ছিল বেশি। আমাকে দেখিয়া তিনি আগ্রহ চাপা দিলেন। বলিলেন—'ভট্ট, দেবপুত্রনন্দিনীর উপযুক্ত বচন। আমার প্রার্থনা তিনি গ্রাহ্য করিয়াছেন। কুমার কৃষ্ণ আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে। আমি তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু সত্য কথা বলি, ভট্ট, আপনি বড় ভালোমানুষ। আপনি দেবপুত্র-নন্দিনীর মর্মব্যথা দেখেন নাই। নিপুণিকা জানে ও বোঝে। উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনি তাঁহার মন বুঝিতে পারেন।' আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কুমার এমন কি কথা দেখিয়াছেন যাহা আমি দেখিতে পাই নাই! নিপুণিকা নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে; কিন্তু কুমার এমন কি বুঝিয়াছেন যে আমাকে ভালোমানুষ বলিলেন! আজন্ম-চতুর বাণভট্ট কাল হইতে শুনিতেছে যে সে বড় ভালোমানুষ! কেহ কেহ অন্যকে ভালোমানুষ মনে করিয়া আনন্দ পায়।

কুমারও কি তেমনই? অত্যন্ত খিন্ন ও বিনীত স্বরে আমি প্রশ্ন করিলাম—'কুমার আমার মধ্যে কি ভালোমানুষি দেখিলেন?' কুমার হাসিলেন। বলিলেন—'আপনি যতটা কবিত্ব করেন, ততটা বস্তুস্থিতির জ্ঞান নাই। আপনি ভট্টিনীকে তাঁহার মনের কথা কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? আপনি কি মনে করেন যে ভট্টিনীর অন্তর্গূঢ় বেদনা দিনরাত তাঁহার জিহ্বাগ্রে থাকিবে? ভট্ট, কবিত্ব খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু আপনি যে গুরু সেবাভার লইয়াছেন, তাহা চায় বাস্তব। ভট্টিনী যে বাভ্রব্যের জন্য কতটা ব্যাকুল, তাহা কি আপনি জানেন?' কুমারের নিকট বাভ্রব্যের নাম শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বাভ্রব্যের জন্য আমারও চিন্তা হইতেছিল; কিন্তু ভট্টিনী তো আমাকে কিছুই বলেন নাই; কুমার কি করিয়া জানিলেন যে ভট্টিনী ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্য ব্যাকুল! কুমারকে নম্রভাবে বাভ্রব্যের সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করিতেছি সে কথা বলিলাম, আর জিজ্ঞাসা করিলাম, ভট্টিনীর ব্যাকুলতার কথা কে তাঁহাকে বলিল। কুমার হাসিলেন। বলিলেন—'ভট্টিনী কাল আচার্যদেবকে বলিয়াছেন, তিনি আবার আমাকে বলিয়াছেন।' রহস্য বুঝিবার পর আমার মুখ গেল শুকাইয়া, শিরায় রক্তের বেগাধিক্যে কান পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল, পায়ের নীচে মাটি যেন সরিয়া গেল, দিঙ্‌মণ্ডল কুম্ভকারের চক্রের মত ঘুরিতে লাগিল। আমি মূর্খ! ভট্টিনীর আমার উপর ভরসা নাই। না হইলে উনি কেন আমাকে এসব কথা বলিলেন না? আমি কি ভট্টিনীর এক ইঙ্গিতে প্রাণ বিসর্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি নাই? ভট্টিনী আমার উপর কি আর বিশ্বাস করেন, ভরসাই রাখেন না। অভাগা বাণ আজও অভাগাই। ততক্ষণ কুমার আমার ভালোমানুষি দেখিয়া খুশি হইতেছেন। তাঁহার ক্রীড়াচপল নয়নতারা আমার মনের হাসি-কান্নার ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার হাসি হাসি মুখখানি মধ্যাহ্নকালীন নবমল্লিকার মত স্থির ও উৎফুল্ল দেখাইতেছিল। তাঁহার বঙ্কিম দৃষ্টিপাতে বিকুঞ্চিত গণ্ডমণ্ডল ফুটন্ত পদ্মকোরকের পার্শ্বদিকের মত প্রসন্ন দেখাইতেছিল—তিনি আমার মানসিক ক্লেশে কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন। কুমারের মনোভাব আমি বুঝিতে পারিলাম, আর বেশিক্ষণ সেখানে বসা উচিত মনে হইল না।

আজ যখন ভাবিয়া দেখি, সেদিনের মনোভাবের কথায় আশ্চর্য হইতে হয়। কুমার যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এত বেশি লজ্জিত ও খিন্ন হইবার কোনও কথাই তো ছিল না। কুমারের নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিতেই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—'বসুন ভট্ট, আপনি মোটেই বিষয়টি বুঝিতে পারেন নাই। দেবপুত্র-নন্দিনী আপনার কৃতজ্ঞতার ভারে নুইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সংসারে এমন ধন খুঁজিয়া পান নাই, যাহা দিয়া আপনার উপকারের ঋণ

কিছুমাত্র শোধ করিতে পারেন। তিনি কি আপনাকে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আদেশ পালন করিতে দিতে থাকিবেন? যদি আপনি কৌশলে তাঁহার মনের ব্যথা জানিয়া লন, তাহা হইলে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইতে পারেন। তিনি হিমালয় হতেও মহীয়সী, সমুদ্র হইতেও গম্ভীর। কুমার কৃষ্ণবর্ধন এইরূপ ভগিনীর ভাই হইয়া গৌরবান্বিত।' একথায় মনটা খানিক হালকা হইল; কিন্তু অভিমানের এমন এক বোঝা বুকের উপর চাপিয়া বসিল যে শীঘ্র তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না। ভট্টিনীর মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য সম্বন্ধে কেহ আমাকে উপদেশ দেয়, ইহা আমার অসহ্য মনে হইতেছিল। পুনরায় চলিয়া আসার জন্য কুমারের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম।

কুমার ঈষৎ ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—'আজ সন্ধ্যায় আপনাদের এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, ভট্ট! রাজনীতি ভুজঙ্গ অপেক্ষাও অধিক কুটিল, অসিধারা হইতেও অধিক দুর্গম, বিদ্যুৎশিখা হইতেও অধিক চঞ্চল। সময় অনুকূল না হইলে আপনাদের ও ভট্টিনীর এখানে থাকা উচিত নয়। কাল আপনি নিজেকে দেবপুত্র-নন্দিনীর অভিভাবক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই এই মহান্ দায়িত্বের উপযুক্ত, কিন্তু আপনি বুঝিতেছেন না যে এই পদ পাইয়া আপনি রাজনীতির কোন্ আবর্তসংকুল তরঙ্গে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপনার মনোবিকার অতিশয় স্পষ্ট, কারণ আপনার মধ্যে অশুচি কূটনীতির লেশমাত্র নাই; কিন্তু আপনাকে দেবপুত্র-নন্দিনীর ভাল অভিভাবক হইতে হইবে। আপনি হয়তো মিথ্যাকে ঘৃণা করেন, আমিও করি; কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত, তাহাকে মানিয়া লইয়া যদি কোনও কল্যাণ-কার্য করিতে চান তাহা হইলে আপনাকে মিথ্যারই আশ্রয় লইতে হইবে। সত্য এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে। ইহাকে চিনিতে ভুল করিবেন না। ইতিহাস সাক্ষী যে দেখা-শোনা কথাও যেমন তেমন করিয়া বলিয়া দেওয়া বা স্বীকার করা সত্য নয়। যাহাতে লোকের আত্যন্তিক কল্যাণ হয়, তাহাই সত্য। উপর হইতে উহা যতই কেন মিথ্যা দেখাক না, উহাই সত্য।[৭] আপনারা দেবপুত্র-নন্দিনীর সেবা এইজন্য করিবেন না যে দেবপুত্র-নন্দিনী আপনাদের দৃষ্টিতে পূজার্হ ও সেব্য, কিন্তু এইজন্য করিবেন যে তাঁহার সেবার দ্বারা আপনারা লোকের আত্যন্তিক কল্যাণ করিতে যাইতেছেন। আমি আপনাদের নিকট এইটুকু আশা করিব যে যথাসময়ে আপনারা মিথ্যা দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিবেন না, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতেও সঙ্কোচ করিবেন না, যাহাতে সমগ্র মনুষ্যজাতি উপকৃত হয়।' এতখানি দীর্ঘ উপদেশ দিয়া কুমার একবার

---

[৭] তুঃ—'সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং এতৎসত্যং মতং মম॥'—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২২৯।১৩

কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইলেন। নিজেকে এই প্রকারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর রূপে জাহির করাতে তিনি নিজেই খানিকটা লজ্জিত হইয়াছিলেন। নিজের লজ্জাই কিছুটা ঢাকিবার জন্য পুনরায় বলিয়া চলিলেন—'আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, ভট্ট, সব ঠিক ঠিক বুঝিলেন তো? লোকের হিতসাধনই প্রধান কর্তব্য। যে পথে তাহা সম্ভব হয় তাহাই সত্য। আচার্য আর্যদেব সবচেয়ে বড় সত্যকেও সর্বত্র বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। অনুচিত স্থানে প্রয়োগ করিলে ঔষধের মতন সত্যও বিষ হইয়া দাঁড়ায়।[১] আমাদের সমাজব্যবস্থাই এমন যে, সত্য তাহাতে অধিকাংশ স্থানেই বিষের মত কাজ করে।' আমি হাঁ-ও বলিলাম না, 'না'-ও বলিলাম না। শুধু অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। কুমারের মনে এই ভাবিয়া গ্লানি হইল যে তিনি তাঁহার কথা আমাকে ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিলেন না। উপরাগগ্রস্ত চন্দ্রমণ্ডলের মত তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার মনেও কষ্ট হইল। আমি নম্রভাবে উত্তর করিলাম—'কুমারের আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করিব।'

কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'আপনি ভট্টিনীকে এই দুইটি উপহার দিবেন।' তিনি এক কোণে রক্ষিত চন্দনকাঠের এক প্রকাণ্ড সিন্দুক হইতে এক মূর্তি বাহির করিলেন। মূর্তি কালো পাথর কাটিয়া প্রস্তুত এক বুদ্ধপ্রতিমার। মূর্তির আয়তন এক বিতস্তি মাত্র; কিন্তু ইহাতে কলাকার এক বিচিত্র চারুতা ভরিয়া দিয়াছেন। শকনরপতিরা নিজেদের বুদ্ধভক্তির আবেশে এদেশে ভারতীয় ও যবনদেশের শিল্পের গঙ্গাযমুনায় যে সব মূর্তি প্রস্তুত করাইতেন আমি সেগুলি একেবারেই পছন্দ করিতাম না। সেগুলি না পৌঁছিত মূর্তির অর্থ-পুরুষের গভীরতায়, না যাইত প্রমেয়-পটুতায়। এক দিকে সেগুলির মধ্যে যাবনী প্রতিমার মত অঙ্গ-প্রমাণের দিকে বেশি রকম মন দেওয়া হইত, অন্য দিকে হাত ও পায়ের মুদ্রায় বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হইত। যে ক্ষুদ্র মূর্তিটি এখন কুমার কৃষ্ণের হাতে ছিল, তাহার শোভা ছিল অদ্ভুত ধরনের। পদ্মাসনের পদতল বাস্তবে যেমন, তেমনই তৈরি করা হইয়াছে, এই আমি প্রথম দেখিলাম। ভারতীয় শিল্পীদের অনুকরণে কুষাণ নরপতিরা চরণতল ঊর্ধ্বমুখ করিয়া পদ্মাসনই বসাইতেন। প্রমাণপাটবযুক্ত যাবনী মূর্তির মধ্যে এরূপ পদ্মাসন ঊর্ণাতন্তুতে সেলাই করা চীনাংশুকের মত অসঙ্গত লাগে। এই মূর্তিতে বুদ্ধের মস্তক মুণ্ডিত করা হইয়াছিল, শকনরপতিদের মূর্তিতে দক্ষিণাবর্ত কুঞ্চিত কেশ তেমনটা ভালো লাগে না। মূর্তিকার এমন মূর্তি গড়িয়াছিলেন যে দেখিয়াই মনে হইত, সত্যই বুঝি বুদ্ধ বসিয়া

---

[১] শূন্যতা পুণ্যকামেন বক্তব্যা নৈব সর্বদা।
ঔষধং যুক্তস্থানে গরলং ননু জায়তে॥—চতুঃশতক, ৮।১৮

আছেন। তাঁহার অর্ধস্তিমিত নয়নের উপর ভ্রূলতা ধারাযন্ত্রের ঊর্ধ্ববিক্ষিপ্ত পয়োরেখার বক্রিমতা গ্রহণ করে নাই, কিন্তু এমনভাবে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল যে নাসাবংশের ছত্রের কাজ করিতেছিল। হাতের অঙ্গুলিগুলি ছিল স্বাভাবিক। গুপ্তদের মূর্তিকলার সঙ্গে উহার দূরতম সম্বন্ধও ছিল না। সমাধি ও নিদ্রায় এক ভেদ আছে। অধিকাংশ কুষাণ মূর্তি ঐ ভেদের কথা স্মরণ করিতেও দেয় না; কিন্তু এই মূর্তি এত ওজস্বী ছিল যে তাহার প্রতি অংশে জাগ্রতভাব প্রকট হইতেছিল। কুমার বলিলেন যে ঐ মূর্তি ভট্টিনীকে দিতে হইবে, বলিতে হইবে যে ইহা আপনার ভাইয়ের সশ্রদ্ধ উপহার। তিনি পুনরায় আর এক মূর্তি বাহির করিলেন। আমি যুগপৎ উল্লাস, আশ্চর্য ও ঔৎসুক্যে নীচু হইয়া দেখিলাম। ইহা ছিল ভট্টিনীর উপাস্য মহাবরাহের মূর্তি। মূর্তিটি হাতে লইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন—'ইহা আপনি নিজের দিক হইতে দিবেন।' পুনরায় কুমার এক ক্ষুদ্রমত চন্দনকাষ্ঠের পেটিকা বাহির করিলেন। তাহার চার কোণে চারটি শ্বেত হস্তী ছিল। তাহাদের আসনের উপর এই পেটিকা নির্মিত হইয়াছিল। মূর্তি দুইটি তিনি ঐ পেটিকার উপর সামনাসামনি বসাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন—'ইহা লইয়া দুই ব্যক্তি আপনার সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাদিগকে আপনি তীরদেশ হইতে ফিরিয়া পাঠাইবেন। আপনি নিজে উপহারগুলি নৌকায় চড়াইবেন। দেবপুত্র-নন্দিনীকে বলিয়া দিবেন যে বাভ্রব্যের কোনও বিপদ হইবে না। সে আমার নিকটেই আছে।' আমি কুমারকে আশ্চর্যব্যঞ্জক মুদ্রার সঙ্গে দেখিলাম। বাভ্রব্য কি করিয়া বাঁচিলেন, তিনি কোথায়, অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের সমাচার কি, নাগের কি হইল, ইত্যাদি প্রশ্ন আমার মনোমধ্যে উঠিতে লাগিল। কুমার বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—'ঠিক সময়ে সমস্ত জানিতে পারিবেন, ভট্ট! এখন এইটুকু মনে রাখিবেন যে মিথ্যা কথা বলা সর্বদা অনুচিত নয়।' আমি কৃতজ্ঞতাপূর্বক মাথা নোয়াইয়া বিদায় হইলাম।

তখন ভগবান মরীচিমালী মধ্যগগন হইতে পশ্চিম দিকে বিলম্বিত ছিলেন, যেন প্রকৃতিসুন্দরীর সীমন্তের মধ্যমণি তাহার ভ্রান্ত অবস্থায় শিথিল হইয়া স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে। ছায়া পূর্বের দিকে এত বেগে বাড়িতে লাগিল যে মনে হইতেছিল, পূর্বপ্রান্তের উদয়গিরির নিকট কোনও সংবাদ পেঁছাইতে যাইতেছে। আমি আমার সঙ্গী দুইটির সহিত তাহাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। পথে এক মন্দিরের সম্মুখে নানা প্রকারের তোরণ-কলশ ও আয়োজন দেখিয়া সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কি হইতে

যাইতেছে? তাহারা বলিল যে ইহা সরস্বতী-মন্দির। প্রতি বৎসর মদনোৎসবের সময় এখানে 'সমাজ' বসে, তাহার প্রস্তুতি হইতেছে। 'সমাজে' নগরের লক্ষ্মী, শোভার খনি, কলার স্রোতস্বিনী, পরম শীলগুণান্বিতা গণিকা চারুস্মিতার ময়ূর ও পদ্ম-নৃত্য হইবার কথা। প্রতি বৎসর 'সমাজের' ব্যবস্থা 'ছোট মহারাজ'-এর দিক থেকে হইয়া থাকে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত কবি, কলাকার ও গণিকা নৃত্য-গীতের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। নানাবিধ কাব্যসমস্যা, মানসী কাব্যক্রিয়া, পুস্তক-বাচন, দুর্বাচক-যোগ, অক্ষরমুষ্টিক, পদ্মবিন্দুমতী ইত্যাদি কলার সাহায্যে সমস্ত নাগরিকদের চিত্তবিনোদন হইয়া থাকে। কিন্তু কাল কেন না জানি ছোট মহারাজ 'সমাজ' বন্ধ করাইয়া দিয়াছেন। অনেক গুণী ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্থান্বীশ্বরের কীর্তি মলিন হইতে দেখিয়া কুমার কৃষ্ণবর্ধন স্বয়ং এই 'সমাজের' ব্যবস্থা করাইয়াছেন। আজ এই জন্য শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতি হইতেছে। প্রদোষকালে চারুস্মিতার ময়ূর ও পদ্মনৃত্য হইবে। আজ পর্যন্ত এই নৃত্য রাজপুরুষ ভিন্ন আর কাহাকেও সে দেখায় নাই; নাগরিকেরা আজ প্রথম এই দুর্লভ নৃত্য দেখিবে। এইজন্য আজ নগরে বড়ই সমারোহ। কান্যকুব্জের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ গণিকার অপূর্ব নৃত্যকৌশল দেখিবার জন্য আজ নাগরিক জনস্রোত বন্যাকারে আসিবে। সরস্বতী মন্দিরের সম্মুখে নির্মিত এই বিশাল প্রেক্ষাগার দেখিলাম। শাল-প্রাংশু ষোলটি স্তম্ভের উপর বিরাট্ পটাবাস দাঁড়াইয়া ছিল। উহা ক্রমশ নতোদর ভূমিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সভাপতির আসন প্রফুল্ল কমলে সজ্জিত ছিল। সভাপতির দক্ষিণ দিকে সংস্কৃত কবিদের জন্য আসন নির্দিষ্ট ছিল, আর বাম দিক নির্দিষ্ট ছিল প্রাকৃত ও অপভ্রংশের কবিদের জন্য। সভাপতির পশ্চাদ্‌ভাগে স্থান নির্দিষ্ট ছিল করণিকদের জন্য, এবং দক্ষিণে এক পার্শ্বে তিরস্করিণীর পশ্চাতে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের জন্য। তাঁহার সম্মুখে ও বাম দিকের পার্শ্বদেশে ব্যবস্থা ছিল সমস্ত নাগরিকদের বসিবার। রঙ্গভূমি ছিল ঠিক মধ্যখানে। উহাতে অভ্র-আবীর বিছানো ছিল—আমি ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম। উহা ছিল ময়ূরনৃত্য বা পদ্মনৃত্যের আধার। কান্যকুব্জের লোকেরা বড়ই সংস্কৃতির অনুগামী ও চিত্রপ্রবণ। তাহারা ময়ূর ও পদ্মনৃত্যের মত কলা এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহার সম্মানও করিয়া থাকে। মগধে ময়ূর-নৃত্য দেখিবার জন্য লোকে এত ব্যস্ত হয় না। মগধে এইসব প্রসঙ্গ কবে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। আমার নিজের মত তো এই যে, ময়ূর-নৃত্য তাণ্ডবের সবচেয়ে নিম্নস্তরের ভেদ। ইহাতে তালই প্রধান। পা দুইটি তাল দিতে দিতে এমন বেগে সঞ্চালিত করা হয় যে উহা দিয়া কুট্টিম ভূমির আবীরে পদ্মের চিত্র আঁকা হয় কি ময়ূরের চিত্র আঁকা হয়; কিন্তু তাহাতে এমন কি

একটা রসপূর্তি হয়? রসকেই নৃত্যের প্রধান রহস্য বলিয়া স্বীকার করি। কান্যকুব্জের লোকদের প্রকৃতিই বিচিত্র। লাস্য অপেক্ষা তাণ্ডবে তাহাদের অধিক রুচি। মানুষের মনোভাব অপেক্ষা তাহার করণকৌশলেই তাহারা অধিক গুরুত্ব দেয়। আমি তাহাদের দৃষ্টি ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না। তথাপি সময় থাকিলে এই নৃত্য অবশ্যই দেখিতাম। চারুস্মিতার নাম-যশ অনেক শুনিয়াছি, তাহার অভিরাম পদসঞ্চারের অনেক কাহিনীও শুনিয়াছি। তাহার নির্মিত ময়ূর বা পদ্মের চিত্রের প্রতি আমার আদৌ অনুরাগ ছিল না; কিন্তু তাহার তাল-লয়-সমন্বিত পদসঞ্চার দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠা অবশ্যই ছিল। থামিবার শক্তি আমার ছিল না; কিন্তু আমার দুর্বার মন বল্গাদমিত ঘোড়ার মত বাগ মানিতেছিল না। প্রেক্ষাশালা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কারিগরেরা স্ফূর্তি করিয়া কাজে লাগিয়াই ছিল। বাহিরে দিব্য গায়কের এক স্রোতস্বিনী পদ্ম-ফুল দিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল। এই সকল কারিগরের শিল্প-পটুতা আশ্চর্যরকমের ছিল। আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া নিজের মনকে এই শিল্পজাল হইতে মুক্ত করিয়া অচিরে গঙ্গাতীরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলাম।

তীরের পার্শ্বে আসিয়া এক অদ্ভুত শান্তি অনুভব করিলাম। দূর হইতে শীকরসিক্ত তরঙ্গবায়ু আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতেছিল, আর শ্বেত-পংকজের মালার মত দিগন্তসীমা পর্যন্ত প্রসারিত মন্দাকিনীর ধারা নয়নকে অপূর্ব শ্যামশোভায় স্নিগ্ধ করিতেছিল। গঙ্গা কৈলাসের সমস্ত ধবলিমার মূর্তিমতী ধারা, হরজটা হইতে পরিস্রুত চন্দ্রমার পীযূষস্রোত, ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে উচ্ছল বেদবিদ্যার প্রবাহ, আর্যাবর্তের জনগণের মাতৃত্বের চিরন্তন আশ্রয়। সম্মুখে যে স্ফটিক-স্বচ্ছ জলরাশি তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাহা কত পবিত্র, কত শীতল, কত মনোহর! আহা, এখানে গগন-তলই যেন জলরূপে অবতরণ করিয়াছে, তুষারগিরিই যেন দ্রবীভূত হইয়া বর্তমান হইয়াছে, চন্দ্রাতপই যেন রসরূপে পরিণত হইয়াছে, শিবের পবিত্র হাসিই যেন জলধারায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পার্বতীর অপাঙ্গ দৃষ্টি যেন তরলিত হইয়া গিয়াছে, ত্রিভুবনের পুণ্যরাশিই যেন গলিয়া গিয়াছে, শরৎকালের মেঘমালাই যেন স্তম্ভিত হইয়া আছে, সরস্বতীর কর্পূর-ধবল কান্তিই যেন গলিয়া গিয়াছে. ইহা চারুতার আশ্রয়, শুচিতার প্রবাহ, মহিমার স্রোত। তীরে ক্রৌঞ্চ ও কলহংসদের কলস্বন শোনা যাইতেছিল। তীরস্থিত দ্রুমরাজির পুষ্পসৌরভে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সারসদের কলরবে পুলিনভূমি মুখরিত হইয়াছিল। ধবলায়মান বক-পংক্তি শুভ্র মালতীমালার মত মন আকর্ষণ করিতেছিল, আর সূর্যকিরণ নির্মল বারিধারায় প্রতিহত হইয়া শত শত বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। নৌকার নিকটে আসিয়া চন্দনের বাক্সটি তুলিয়া লইলাম এবং সঙ্গীদের সাদরে বিদায় দিলাম।

গোধূলির সময়ে মাল্লারা নৌকা খুলিয়া দিল। অল্পক্ষণ পূর্বেই আচার্য সুগতভদ্র ভট্টিনীকে স্নেহাশীর্বাদ প্রদান করিয়া ও তাঁহার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার আশ্বাস দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যে পথ দিয়া আচার্য গেলেন ভট্টিনী অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেদিকে উদাসভাবে তাকাইয়া ছিলেন। তাঁহার ঘন চিক্কণ কেশরাশি বিপর্যস্ত হইয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, দেখিয়া শৈবালজালে বেষ্টিত পদ্মপুষ্প বলিয়া ভ্রম হইত। ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারায় লোহিতবর্ণের চন্দ্রবিম্ব দেখা দিল, আর দেখিতে দেখিতে শত শত রূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবগাহন স্নান করিতে আরম্ভ করিল, যেন সারা দিন আবীর খেলিয়া এখন শরীরে যে আবীরচূর্ণ লাগিয়া আছে তাহা ধুইয়া ফেলিতে চায়। রাত্রির অন্ধকার ঘন হইয়া চলিল, জ্যোৎস্না শুভ্রতর হইয়া সমস্ত গঙ্গাপুলিনকে দুগ্ধধবলিত করিতে আরম্ভ করিল, আর গঙ্গার চটুল তরঙ্গের উপর চন্দ্রমা ও নক্ষত্রমণ্ডলের নৃত্য হইতে লাগিল; কিন্তু ভট্টিনী কেমন যেন উদাস হইয়া বসিয়া থাকিলেন। আমি আর দেখিতে পারিলাম না। ব্যথিত হইয়া বলিলাম—'দেবি, চিন্তা ত্যাগ করুন, বাণভট্টের উপর বিশ্বাস রাখুন, আচার্যপাদের আশীর্বাদ সফল হইবে। আমি যেমনই হই, আপনাকে বিষম সমরবিজয়ী, বাহ্লীক-বিমর্দন, প্রত্যন্ত-বাড়ব, অজ্ঞাত-প্রতিদ্বন্দ্বী-বিকট দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের নিকট পৌঁছাইয়া দিব। মগধে তো যাইতেছি শুধু আচার্য-পাদের আজ্ঞাপালনের নিমিত্ত। ঠিক বলিতে পারি না, আমাকে মগধ লইয়া যাইবার আজ্ঞা তিনি কেন দিলেন; বিলম্ব হউক তাহাও স্বীকার, কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিবই।'

ভট্টিনী আমার প্রার্থনা শুনিলেন। তাঁহার মৃণাল-কোমল আঙ্গুল দিয়া বিপর্যস্ত কেশজাল সংযত করিয়া মন্দ হাসিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মুহূর্তে মধ্যে নৌকা দিয়া এক স্বচ্ছ প্রভা বহিয়া গেল। আমি মনে মনেই সেই অপূর্ব কল্পনার কবি কালিদাসকে স্মরণ করিলাম। আহা, মহাকবি যখন চন্দ্রমাকে উদয়গূঢ় কিরণ দিয়া অন্ধকার দূরে হটাইতে দেখিয়া অলকসংযমন হেতু নয়নহারিণী প্রাচী দিগ্‌বধূর কল্পনা করিয়াছিলেন,[১] তখন তিনি কি একটুও ভাবিয়াছিলেন তাঁহার সেই উক্তির দুইশত বৎসর পরে গঙ্গার পবিত্র বক্ষে দ্যুলোক ও ভূলোকে একই সঙ্গে এই অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টি-

১ উদয়গূঢ়-শশাংক-মরীচিভিস্তমসি দূরতরে প্রতিসারিতে
অলকসংযমনাদিব লোচনে হরতি মে হরিবাহন-দিঙ্মুখম্।
—বিক্রমোর্বশী

গোচর হইবে? তিনি কি জানিতেন যে একদিন যখন চন্দ্রমা বাহ্যজগৎকে সুধাসলিলে প্লাবিত করিতে থাকিবে, চন্দনরসের অবিরলস্রাবী নির্ঝর দিয়া রসময় করিয়া তুলিবে, অমৃতসাগরের বন্যায় ভুবনান্তরাল ভরিয়া দিবে, শ্বেত-গঙ্গার সহস্র সহস্র প্রবাহ চলিতে থাকিবে, আর মহাবরাহের দংষ্ট্রামণ্ডলের শোভা বিচ্ছুরিত হইতে থাকিবে, সে সময়ে গঙ্গাপ্রবাহে গঙ্গাবৎ পবিত্র, জ্যোৎস্না-স্বরূপা, এক রাজবালা তাঁহার মন্দ মন্দ হাসি দিয়া অন্তর্জগৎকেও সেই প্রকার পবিত্র, নির্মল ও উৎফুল্ল করিয়া দিবেন! ভট্টিনীকে প্রসন্ন দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল। আমি উৎসাহভরে বলিলাম—'দেবি' মহাবরাহ সহায় আছেন, আপনি আপনার সেবকের উপর ভরসা রাখুন। যাহারা সিংহের জটাভার পায়ে দলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা উহার ফল পাইবে। অকিঞ্চন বাণভট্টকে আপনি উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে করিবেন না। আজও আর্যাবর্তে কৃতজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব হয় নাই, বাহ্লীক ও প্রত্যন্ত হইতে বর্বর হূণদের যিনি উৎখাত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন সেই পরমভাগবত পরমসৌগত দেবপুত্রের প্রতি এদেশের ভক্তির স্রোতও শুকাইয়া যায় নাই। যেদিন দেবপুত্র জানিতে পারিবেন যে আপনি কোথায়, সেদিন যমরাজও তাঁহার গতি রুদ্ধ করিতে পারিবেন না। আজ দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত দেবপুত্র শোকে হতবুদ্ধি হইয়া না জানি কোথায় পড়িয়া আছেন; কিন্তু বিশ্বাস করুন, এমন একদিন অবশ্য আসিবে যখন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের রক্ষক, মন্দির ও দেবমূর্তির আশাভূমি, তরুণী ও বৃদ্ধাদের মর্যাদারক্ষক দেবপুত্র আপনার সংবাদ পাইবেন। সেদিন পথের বড় বড় বাধাও ছত্রকদণ্ডের মত ভাঙিগয়া যাইবে, ভয়ংকর হইতেও ভয়ংকর ব্যূহ কাঁচা কলশের মত ছিটকাইয়া পড়িবে। সেদিন পুনরায় একবার সমুদ্রবৎ অপ্রমেয় দেবপুত্রবাহিনীর বিক্ষোভে ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠিবে এবং যে বাণভট্ট আজ চোরের মত পলাইয়া বেড়াইতেছে সেদিন সে প্রলয়পুরের বাঁধের মত কাজ করিবে। দেবি, আপনি আশ্বস্ত হউন, বাণভট্ট কখনও কর্তব্যে ভুল করিবে না।'

ভট্টিনীর চোখে জল আসিয়া গেল। তাহা লুকাইবার জন্য তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। পুনরায় আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া তিনি আমার দিকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে তখনও চোখের জলের সঙ্গে হাসি লাগিয়া আছে। সে হাসির অর্থ আমি বুঝিলাম। তাহাতে কৃতজ্ঞতা ছিল, ভরসা ছিল না। সে হাসি যেন উচ্চস্বরে ভট্টিনীর নিগূঢ় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিল—'আশ্বাস দিতেছ, সেজন্য কৃতজ্ঞ আছি; কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞাপালন দুঃসাধ্য ব্যাপার।' আমি মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া ভট্টিনীর করুণ-গম্ভীর মুখ-ভঙ্গিমা দেখিতে থাকিলাম। আমি তাঁহার মর্মব্যথা জানিয়া লইতে চাহিয়া-

ছিলাম; কিন্তু এক সহজ অনুভাবে তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল এমন আবৃত থাকিত যে আমি তাহা অতিক্রম করিয়া তাঁহার মর্মের ভিতর না পারিতাম দেখিতে, না পারিতাম সাহস করিয়া কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে। নিপুণিকা আমার সাহায্য করিল। সে বেদনা-ভরা কাতরতার সহিত বলিল—'ভট্ট, তুমি খুব উপর উপর ঘুরিয়া বেড়াও। কবিতা ছাড়, ভট্টিনীর মর্মবেদনা গভীর। প্রথমেও উঁহার সেবা করিবার লোক ছিল, এখনও আছে; কিন্তু তাহাতে ভট্টিনীকে বাঁচাইতে পারা গেল না। তুমি একা কি করিবে? বুঝিয়া-সুঝিয়া প্রতিজ্ঞা কর।'

নিপুণিকা পুনরায় একবার আমার অভিমানে ঘা দিল। আমি এজন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কোনও দুঃস্থ ব্যক্তিকে আশ্বাস দিতে গিয়া লোকে কিছু বাড়াইয়া বলিয়া থাকে। আমিও মর্যাদা অতিক্রম করিয়া গিয়া থাকিব; কিন্তু নিপুণিকার এভাবে আঘাত করা ঠিক হয় নাই। মুহূর্তের জন্য আমার মনে গ্লানি হইল। নিজের দৃষ্টিতেই আমি যেন কিছুটা নামিয়া গেলাম। সায়ংকালীন শিরীষপত্রের মত আমার চক্ষু নিজে নিজেই আনত হইল, আহত শম্বুকের মত আমার মুখ নিজে-নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া যেন লুকাইয়া গেল। কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকিল না। আমার আহত অভিমান আমাকে উদ্ধত করিয়া দিয়াছিল। আমি ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কিছু বলিতে চাহিতেছিলাম, এমন সময়ে মধ্যপথে ভট্টিনী কথা বলিলেন। আমার মলিন মুখ দেখিয়া তাঁহার আমার প্রতি দয়া হইয়া থাকিবে। তিনি নিপুণিকাকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন 'ছিঃ নিউনিয়া, তুমি এমন কথা বলিতেছ কেন? ভট্টের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কবিত্বের শক্তি তুমি জান না। ভট্ট কবি। তিনি নিজেই জানেন না যে তিনি কি! তবে আমরাও ভুলিয়া যাইব যে তিনি কত মহান্? আমার সেবা করিবার লোক প্রথমেও ছিল; কিন্তু এমন দেবোপম অভিভাবক আমি প্রথমে পাই নাই। তুমি হয়তো প্রতিজ্ঞা পালন করাটাই বড় বলিয়া মনে কর। না বহিন, প্রতিজ্ঞা করাটাই বড়। আর দেখুন ভট্ট, আমার আশা মহাবরাহেরই উপর। মহাবরাহই আপনাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। মহাবরাহ চাহিলে পিতার সঙ্গে আমার মিলন ঘটাইতেন। তাঁহার ইচ্ছাই প্রধান, আপনি-আমি তো যন্ত্র মাত্র। তিনি যাহা চাহিবেন তাহাই হইবে। ঔদাস্য ও প্রসন্নতা, হাসি ও কান্না, সব তাঁহারই প্রসাদ। মানুষের সাধ্য কি যে কিছু করে?'

কিছুক্ষণ থামিয়া ভট্টিনী বলিলেন—'ভট্ট, আমার অনেক পূর্বেই মরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। যেদিন নগরহারের পথে প্রত্যন্ত-দস্যুরা আমার উপর আক্রমণ করিয়াছিল, সেদিন বাছা বাছা দুইশত বিশ্বস্ত সেবক আমার পালকির

সঙ্গে ছিল। পিতামহের সমান পূজ্য ও প্রবল পরাক্রান্ত আদিত্যসেনের বিশ্বাসভাজন ধীর নাপিত আমার সঙ্গে ছিল। ডাকাতেরা হঠাৎ আক্রমণ করিয়াছিল। ধীর শেষ পর্যন্ত আমাকে ছত্রের মত আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার দুইশত বীর রক্ষী দেবপুত্রের নাম লইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে তাহারা কোনও দস্যুকে আমার পালকির নিকটে আসিতে দেয় নাই। আমি কম্পমান বক্ষস্থলে প্রস্তর বাঁধিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে বিশ্বাসী সেবকদের মৃত্যুর দৃশ্য দেখিতে থাকিলাম। ধীর তখনও গলা ছাড়িয়া দেবপুত্রের জয়ধ্বনি করিতেছিল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে এই কথাই বলিতেছিল যে নির্ভয়ে থাক কন্যা, দুষ্টেরা তোমার ছায়া স্পর্শ করিতে পারিবে না। পঞ্চাশজন দস্যু আঠার মত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিল। তাহারা উহার বস্ত্র ও কেশ ছিঁড়িয়া ফেলিল; কিন্তু কিছুতেই সে পালকি ফেলিয়া হটিয়া গেল না, কিছুতেই গেল না। তাহার রক্তে আমার পালকি ভিজিয়া গেল। শেষবার যখন সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল যে কন্যা, নির্ভয়ে থাক, তখন আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না। পালকি হইতে বাহির হইয়া আমি বৃদ্ধকে পালকির ভিতরে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। ততক্ষণে তাহাকে তিন খন্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। আমি অভাগিনী তাহার পায়ের অংশটাই পাইলাম। কাটা গাছের মত পড়িয়া গেলাম। ভট্ট, তখন কেন আমার মৃত্যু হইল না!'

একটু চুপ করিয়া ভট্টিনী নিপুণিকার দিকে ফিরিলেন। তাহার চোখ দিয়া অশ্রুর নির্ঝর বহিতেছিল। ভট্টিনী বলিলেন—'কাঁদিও না নিউনিয়া, আমি অনেক কাঁদিয়াছি। নগরহার হইতে পুরুষপুর, পুরুষপুর হইতে জলন্ধর, তাহার পর আর না জানি কোথায় কোথায় আমাকে দস্যুদের সঙ্গে ঘুরিতে হইল, শেষে স্থাণ্বীশ্বরের ছোট রাজবাড়িতে আশ্রয় পাইলাম। যেদিন নগরহারের পথে দস্যুরা এই হতভাগ্য শরীরকে স্পর্শ করিয়াছিল, সেই দিন পর্যন্ত আমার দেবপুত্রের কন্যা বলিয়া অভিমান ছিল। আমি এক মাস ধরিয়া পিতার নাম লইয়া কাঁদিতে থাকিলাম। তাহার পর এই অভিমান চলিয়া গেল। ভগবানের গড়া অন্য লক্ষ লক্ষ কন্যার মত আমিও একজন মনুষ্য কন্যা। তাহাদের মত আমিও সুখদুঃখের ভাজন। তাহাদের মত আমারও জন্ম আমার সার্থকতার জন্য নহে। আমার অহংকার মরিয়া গিয়াছে, অভিমান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কৌলীন্যগর্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি ধর্ষিতা, অপমানিতা, কলঙ্কিনী শত শত মানবীর মত সামান্য একজন নারী। জগতের দুঃখপ্রবাহে ফেন-বুদ্বুদের মত আমিও নষ্ট হইয়া যাইব, আর প্রবাহ তাহার উন্মত্ত ধরনে চলিতে থাকিবে। মাতার নিকট আমি বৌদ্ধ দুঃখবাদের ভাব পাইয়াছি, পিতার নিকট

হইতে পাইয়াছি ভাগবত অনুকম্পা। আমার উপর মহাবরাহের করুণা আছে, ইহাই একমাত্র সুখ, আর এই করুণাই আমার সঙ্গে তোমার ও ভট্টের যোগাযোগ করিয়া দিয়াছে। না নিউনিয়া, কাঁদিয়া কি লাভ? আমি আজও নিজের কান্না বন্ধ করিতে পারি নাই, কিন্তু তুমি উহা সাময়িক আবেগ বলিয়া মনে করিও। আমি সব কিছু ভুলিয়া যাইবার সাধনা করিতেছি। পিতার সঙ্গে কি আর দেখা হইবে? মহাবরাহই জানেন, আমি কেন চিন্তা করি?'

আমি আর শুনিতে পারিলাম না। উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—'কে বলে, দেবি, যে আপনি কলঙ্কিতা নারী? পার্বতীর সমান নির্মল অন্তঃকরণ, গঙ্গার সমান পাবন বিচারধারা, কৈলাসের সমান শুভ্র চরিত্র আর মানসসরোবরের মত সকরুণ হৃদয় যে দেবীকে অশেষ লোকের পূজনীয় করিয়াছে, তাঁহাকে কলঙ্কিনী মনে করিলে যে নরকে পচিতে হইবে। দেবি, অগ্নিকে কখনও কলঙ্ক স্পর্শ করে না, দীপশিখায় অন্ধকারের কালিমা লাগে না, চন্দ্রমণ্ডলকে আকাশের নীলিমা কলঙ্কিত করে না, জাহ্নবীর বারিধারাকে পৃথিবীর কলুষ স্পর্শও করে না। আপনার অবসাদের কথা আপনার উপযুক্ত নয়। দেবি, শৃগালের স্পর্শে সিংহ-কিশোরী কলুষিত হয় না, অসুরগৃহবাসিনী লক্ষ্মী ধর্ষিতা হন না, দুষ্টের স্পর্শে কামধেনু অপমানিত হন না, চরিত্রহীনদের মধ্যে বাস করিলে সরস্বতী কলংকিত হন না। আশ্বস্ত হউন দেবি, আপনি পবিত্রতার মূর্তি, কল্যাণের খনি। সমগ্র আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, দেব-মন্দির ও শস্যক্ষেত্র, অনাথ ও নারী, পৌর ও জানপদ যেদিন তাহাদের রক্ষক দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দের নয়নতারাকে চিনিতে পারিবে, সেদিন তাহারা মন্দিরে আপনারই মূর্তি গড়াইয়া পূজো করিবে, আর যদি কোথাও এই চিরদৃপ্ত দেশে প্রাণকণিকার লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রত্যন্ত-দস্যুদের নিজেদের কৃতকর্মের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দেবি, সত্যই আমি জানি না যে আমি কবি। আমাকে এক একটি শ্লোক রচনা করিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা ঘামাইতে হয়, কিন্তু যদি আমি কবি হইতাম তাহা হইলে কি করিতাম, তাহা কি আপনি জানেন? এমন গান লিখিতাম যে আর্যাবর্তের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত দেবপুত্রের নয়নতারার শুভ্র যশ ছড়াইয়া পড়িত, এমন কাব্য লিখিতাম যে যুগ যুগ ধরিয়া এই পবিত্র আর্যভূমিতে নারীসৌন্দর্যের পূজা হইতে থাকিত, এবং এই পবিত্র দেবপ্রতিমাকে অপমান করিবার সাহস কাহারও হইত না। কিন্তু দেবি, আমি কবি নই।'

ভট্টিনীর মুখমণ্ডল প্রভাতকালীন নবমল্লিকার মত প্রস্ফুটিত হইল। স্ময়মান মুখের গণ্ডযুগল বিকশিত হইয়া গেল। নয়নকোরকে বঙ্কিম আনন্দ-রেখা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। ললাটের বলিরেখাগুলি বিলীন হইয়া

তাঁহাকে অষ্টমীর চন্দ্রের মত মনোহর দেখাইল। অশোক-কিশলয়ের সমান তাঁহার আতাম্র অধরোষ্ঠ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ধীর প্রসন্নভাবে তিনি বলিলেন—'কে বলে ভট্ট যে আপনি কবি নন? শ্লোক রচনা করাই তো কবিতা নয়। নিরন্তর পবিত্রচিন্তনের জন্য আপনার চিত্ত অপগতকলুষ হইয়া গিয়াছে। আপনার চারিত্র্যপূত হৃদয়ে আছে সরস্বতীর নিবাস। আপনার অধর হইতে বিমলধারার মত বাণীর স্রোত ঝরিতে থাকে। কে বলে যে আপনি কবি নন? যেদিন আপনার শক্তিশালিনী বাক্-স্রোতস্বিনীতে এই ধরার কলুষ ধুইয়া যাইবে, সেই দিন সত্যই লোকে শান্তি লাভ করিবে। ভট্ট, কবিতা আর শ্লোক এক নয়। আমাদের যবন-সাহিত্যে গদ্যকে বলে কাব্যের 'নিষ্কর্ষ'। ছন্দ ও অলঙ্কার তো কবিতার প্রাণ নয়। প্রাণ হইল রস, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক রস। আপনি সত্যই কবি! আমার কথা লিখিয়া রাখুন, আপনি এই আর্যাবর্তের দ্বিতীয় কালিদাস।' এই পর্যন্ত বলিয়া ভট্টিনী হঠাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইলেন, যতটা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহার চেয়ে যেন বেশি বলা হইয়াছে; যেন যেখানে থামা উচিত ছিল, তাহার চেয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল একটু রক্তিমও হইয়া উঠিয়াছিল। বড় বড় খঞ্জনশাবকের নয়ন হইতেও চপল নয়ন আনত হইয়া গেল, অধরোষ্ঠের মৃদুমন্দ হাসি শীঘ্র শীঘ্র ভিতরে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ভট্টিনীর আনন্দ লুকাইতে পারা গেল না। থাকিয়া থাকিয়া গণ্ডদেশ বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল আর নয়নকোরক বিস্ফারিত হইতেছিল। ভট্টিনীর মুখ আনন্দ, ব্রীড়া ও মন্দ হাস্যে মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভট্টিনী বলিতেছিলেন, আমি আর্যাবর্তের দ্বিতীয় কালিদাস। কালিদাস আর্যাবর্তের গৌরব ছিলেন। আমার একবার মনে পড়িল মালিনীতটের সেই আশ্রম, যাহার বৃক্ষপত্র হোমধূমে মলিন হইয়া গিয়াছিল, যেখানে সৈকতপুলিনে হংসমিথুন লীন হইয়া আছে, জলাশয়ের পথ মুনিদের বল্কল হইতে ক্ষরিত জলধারার পংক্তিতে সিক্ত, যেখানকার শান্তবিশ্বস্ত মৃগযূথ একেবারেই জ্যানির্ঘোষের সঙ্গে পরিচিত নহে, যেখানে কেহ লোল অপাঙ্গ দর্শন করে নাই, যেখানে সরল ঋষিকন্যারা কৃতক পুত্রদের ঘরকরনা লইয়া আনন্দ করেন। এই শান্ত বাতাবরণের মধ্যে মনে পড়িল সেই সৌন্দর্যমূর্তি, সৌকুমার্যের খনি, শৈবলানুবিদ্ধ কমলিনীর তুল্য বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলাকে। আমার মনে পড়িল নবোদিত বসন্ত-শ্রী, নগাধিরাজ হিমালয়ের শোভা সম্পত্তি ও শিবের ধ্যান। সেদিন কৈলাসের দেবদারু-দ্রুম-বেদিকার উপর নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির ভাবে আসীন মহাদেবের সম্মুখে স্বয়ং যৌবনভারে অবনত, বসন্তপুষ্পের আভরণধারিণী পার্বতী যখন পুষ্পস্তবকের

তারে অবনত সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নীল অলকে শোভমান কর্ণিকার ও কর্ণে বিরাজমান নব কিশলয়দল অসতর্কতায় বিস্রস্ত করিতে করিতে সেই তপস্বীর পাদপ্রান্তে আনত হইয়াছিলেন, তখন যোগী ক্ষণেকের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জোর করিয়া তাঁহার দুই চক্ষু পার্বতীর সুন্দর মুখের দিকে প্রেরিত করিলেন, ক্ষণেকের জন্য উহাতে সারা সংসার মধুময় হইয়া উঠিল— অশোককুঞ্জে কুসুম ফুটিল, বকুল কণ্টকিত হইল, সুন্দরীদের আশিঞ্জিত নূপুরের প্রতীক্ষা করিল না, না করিল প্রতীক্ষা গণ্ডূষসেকের। কিন্তু এক মুহূর্তেই যোগী সংযত হইলেন। বোঝা গেল, ইহা যে অপদেবতার অনধিকার চর্চা—কুসুমবাণসন্ধান ঠিক হয় নাই। যতক্ষণ আকাশে মরুদ্‌গণ তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য আবেদন করিতেছিল, ততক্ষণে কামদেব কপোত-কর্বুর ভস্মে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। কিশোরী পার্বতীর কোমল হৃদয় তাহার সৌন্দর্যের এই ব্যর্থতা দেখিয়া উত্তেজিত হইল, তপস্যার দ্বারা তিনি চাহিলেন এই ব্যর্থতাকে দূর করিতে। প্রথম দর্শনে প্রেমের উপর, যাহা রূপের আকর্ষণের উপর মুহূর্তে বজ্রপাত করাইয়া, সমস্ত হিমালয়ের সৌন্দর্যকে এই ভাবে ব্যর্থ করাইয়া কালিদাস ত্যাগ ও তপস্যার আয়োজন এমন উন্মাদনার সহিত করিতে লাগিলেন যেন কিছুই ঘটে নাই; যেন কুমারসম্ভবের প্রথম তিন সর্গ মায়া, তাহাদের উপর কবির কোনই মায়া নাই, কোনই মমতা নাই, কারণ তিনি মানুষ ও মানুষের এই পৃথিবীকেই সব কিছু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। আরও কিছু আছে, এই দৃশ্যমান সৌন্দর্যের পরপারে, এই ভাসমান জগতের অন্তরালে এক শাশ্বত সত্তা আছে, যাহা ইহাকে মঙ্গলের অভিমুখে লইযা যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছে।

কালিদাস ভুবনমোহিনীর গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল পৌরুষের মর্যাদাহীন উচ্চাকাংক্ষাকে দোষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। রাজ্যগঠন, সৈন্যসঞ্চালন, মঠস্থাপন ও নির্জনবাস পুরুষের সমতাহীন, মর্যাদা-হীন, শৃঙ্খলাহীন উচ্চাকাংক্ষারই পরিণাম। ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এ শক্তি একমাত্র নারীরই আছে। কালিদাস এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী, এই মহিমময়ী শক্তি উপেক্ষা করিতে গিয়া সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মঠ বিধ্বস্ত হইয়াছে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জঞ্জাল ফেনবুদ্‌বুদের মত মুহূর্তে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোথায় কালিদাস, আর কোথায় অভাগা বণ্ড! ভট্টিনী হয় জানিয়া শুনিয়া আমাকে কেবল আশ্বস্ত করিবার জন্য একথা বলিয়াছেন, নয়তো তিনি কালিদাসকে ঠিক ঠিক জানিতেনই না। কালিদাস যে মহাসত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহা প্রকাশ করার শক্তিও রাখিতেন। সাক্ষাৎ সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে বাস করিতেন। তিনি ছিলেন বাগ্‌দেবতার দুলাল।

আমি পথভ্রান্ত, অকর্মা, তাঁহার সঙ্গে তুলনা কি করিয়া সম্ভব? তাছাড়া আমার প্রতি ভট্টিনীর স্নেহের ভাব তো আছেই। মুহূর্তের জন্য আমি ভাবনা-চিন্তা ছাড়িয়া ভট্টিনীর মনোহর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। উহা পাটল-পুষ্পের মত রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে রক্তিমায় তাঁহার সৌন্দর্য শতগুণে বাড়িয়াছিল। ভট্টিনী আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তিনি নিপুণিকার দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। নিপুণিকার আকৃতি ম্লান হইয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল, কোনও অজ্ঞাত আশংকায় সে ভীতত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নিদাঘের অন্তে গ্লানিপ্রাপ্ত স্খলিত আরগ্বধ-কুসুমের সমান তাহার বিবর্ণ মুখ রক্তহীন দেখাইতেছিল। তাহার চোখের নীচে নীল রেখা আরও নীল দেখাইতেছিল। আমি ভয়ে ডাকিয়া উঠিলাম—'নিউনিয়া, তোমার কি হইল?' নিপুণিকা কিছু বলিল না। ভট্টিনীর আগ্রহসত্ত্বেও সে চুপ করিয়াই থাকিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ভট্টিনী তাহার অনুগমন করিলেন। আমি নৌকার ছাতের উপর চলিয়া আসিলাম।

গঙ্গার স্বচ্ছ সৈকত-পুলিন জ্যোৎস্নায় ঝিক ঝিক করিতেছিল আর তাহার মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারা দূরপ্রসারিত রজত-চূর্ণে সমাবৃত পারদ-প্রবাহের মত দেখাইতেছিল। দিগন্তের এক কোণ হইতে এক ক্ষীণ নীল রেখার রূপে এই ধারার আবির্ভাব হইয়াছিল, আর অন্য দিগন্তের কোণে অনুরূপ এক ক্ষীণ নীল রেখার রূপে উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মাঝখানে উহার চপল তরঙ্গগুলি একের পর এক সোপানশ্রেণীর মত সজ্জিত ছিল এবং চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব বার বার তাহাতে প্রতিহত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছিল। সমস্তই ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ ও মনোরম। আকাশে তারাগুলির সভায় চন্দ্রমা ছিলেন রাজার মত বিরাজমান, আর গঙ্গার ধারায় নিপুণ মল্লের মত নানাপ্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করিতেছিলেন। এই নিঃশব্দ প্রকৃতির অন্তরালে আমার সম্মুখে এক কোলাহল-ময় যুদ্ধ চলিতেছিল। ভট্টিনীর পালকি চলিয়া যাইতেছে। সব কিছু শান্ত, গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ প্রত্যন্ত-দস্যুদের দল তাহার উপর ভাঙিয়া পড়িল। দুই শত বিশ্বস্ত সৈনিক এক একটি করিয়া মারা পড়িল। শ্রমবিন্দুতে সুসজ্জিত তাহাদের ললাটমণ্ডল কখনও আনত হইবে না, সে কথা স্থির। তাহাদের হাতে উলঙ্গ তরবারি, স্কন্ধে তীক্ষ্ণ-ফলক কুন্ত, হৃদয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সাধ, আর মনে মনে ভট্টিনীকে বাঁচাইতে না পারার জন্য গ্লানি। তাহাদের শিরা হইতে রক্তধারা বেগে নির্গত হইতেছিল। মাংসখণ্ড আলগা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা শিলাখণ্ডের মত নিজের নিজের স্থানে দৃঢ়ভাবে

অবস্থান করিতেছিল। ধীর নাপিত নিরাশাপূর্ণ স্বরে কন্যাকে নির্ভয়ে থাকিবার কথা ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ, মস্তিষ্ক চেতনা-হীন, হস্ত শত্রুকে প্রহারে উদ্যত, বাণী কাতর; কিন্তু ভট্টিনীকে রক্ষা করিবার আশা অদম্য। আর ভট্টিনীর আননকমল ভয়ে বিবর্ণ, বিকট দৃশ্যে চক্ষু প্রস্তরবৎ, কর্ণ বধির—ভট্টিনী হতচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। আমার দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল। অনুভব করিলাম, শিরায় শিরায় সর্বত্র কিছু করিবার জন্য এক উন্মাদনা; কিন্তু কি করিব? সংসারে এই বিকট ঘৃণিত দৃশ্য প্রথমবার দৃষ্টিগোচর হইল না, এইখানে ইহার সমাপ্তিও নহে। বাণভট্ট যতই চিন্তিত ও উত্তেজিত হউক না কেন, এই জঘন্য দৃশ্য সংসারে বার-বার দেখা দিবে। মহাপুরুষেরা করুণা ও মৈত্রীর অনেক উপদেশ দিয়াছেন, ভ্রাতৃভাব ও জীবে দয়ার সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। আমি নিরাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। ইহা কি কখনও বন্ধ হইবে না? সংসারে যাহা সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য তাহা কি এইভাবে অপমানিত হইতেই থাকিবে? আমার মন বলিতেছিল, যতক্ষণ রাজ্য থাকিবে, সৈন্য সংগঠন থাকিবে, পৌরুষ-দর্পের প্রাচুর্য থাকিবে, ততক্ষণ ইহা হইতেই থাকিবে। কিন্তু ইহা কি কখনও সম্ভব যে মানবসমাজে রাজ্য থাকিবে না, সৈন্য-সংগঠন থাকিবে না, সম্পত্তিমোহ থাকিবে না? কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এই সময়ে পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, নিপুণিকা দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বলিল—'একটা কথা বলি ভট্ট, আমি পলাইয়া আসিবার পরে চার দিনের দিন তোমার সঙ্গে উজ্জয়িনীতেই দেখা হইয়াছিল।'

ভূমিকাবিহীন এই প্রসঙ্গের কোনও তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু উজ্জয়িনীতে নিপুণিকার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, ইহা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। কুতূহলের সহিত প্রশ্ন করিলাম—'কি বলিতেছ নিউনিয়া, উজ্জয়িনীতে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল?'

'হাঁ ভট্ট, আমি উজ্জয়িনীতে তোমার দেখা পাইয়াছিলাম। তুমি তখন শার্বিলকের আড্ডায় আমাকে খুঁজিতে গিয়াছিলে।'

শার্বিলকের আড্ডা! উজ্জয়িনীর জনাকীর্ণ লোকালয়ে মাটির প্রদীপে সদা সুসজ্জিত সেই দুর্গন্ধযুক্ত পান-শালার কথা মনে পড়িল, যেখানে মদ্যপ, দ্যূত-ক্রীড়ক, আর তস্করেরা থাকে। সেখানে স্ত্রীলোক কেনা-বেচাও হইয়া থাকে। নগরের নিম্নশ্রেণীর বিট, বিদূষক ও লম্পটের এই আড্ডা। আমার সন্দেহ ছিল যে নিপুণিকা ইহাদের জালে কোথাও না আটকাইয়া যায়, এইজন্য কয়েকজন দণ্ডধর লইয়া আমি সেই নরককুণ্ডে সন্ধান করিতে গিয়াছিলাম। উহা ছিল

দুর্গন্ধের ভাণ্ডার, দুরাচারের আশ্রয়, লম্পটতার আবাস। সেখানে নিপুণিকার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল! আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কেমন করিয়া সেখানে গেলে, নিউনিয়া?'

'আমি মদ যাহারা খায় তাহাদের পানপাত্র ভরিয়া ভরিয়া মদ দিয়া যাইতাম।'

'এই বেশে?'

'না, আমি ছেলেদের বেশ ধারণ করিতাম।'

'তুমি স্বেচ্ছায় গিয়াছিলে, নিউনিয়া?'

'হাঁ ভট্ট, আমি স্বেচ্ছায় শুধু এক দিনের জন্য চাকরি করিয়াছিলাম আর পরের দিন বেতন না লইয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম।' আমি অবাক হইয়া নিপুণিকার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। সে হাসিতে হাসিতে বলিল—'তুমি বুঝিবে না ভট্ট, আমি বুঝাইয়া বলিতেছি।' নিপুণিকা পুনরায় নিজের কাহিনী বলিয়া যাইতে থাকিল—'তুমি জানিয়া আশ্চর্য হইবে যে যদিও তোমার নর্তকীরা অন্তঃপুরে থাকিত আর তুমি উহাদের কুলবধূদের যোগ্য সম্মান দিতে, তথাপি তাহারা শার্বিলকের দোকানের সন্ধান রাখিত। যে অশুভ রজনীতে আমি তোমার আশ্রয় ছাড়িয়া পলাইলাম, সেই রাত্রে শার্বিলকের দোকান বন্ধ ছিল। সে গিয়াছিল তোমার প্রকরণ-অভিনয় দেখিতে। আমি নেপথ্য হইতে নটীর বেশেই পলাইয়াছিলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি উজ্জয়িনীর শূন্য গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। সে রাত্রে উজ্জয়িনীর সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ বাণভট্টের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল। গবাক্ষের কপাট বন্ধ ছিল। অলিন্দের দেহলীগুলি ছিল শূন্য। বীথিগুলিতে যত্র-তত্র রাজকীয় প্রদীপ অন্ধকার দূর করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। দুই এক ঘণ্টা আমি স্থিরই করিতে পারিলাম না যে কোথায় যাই। আমার মনে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছিল। লজ্জা ও নিরাশায় আমি পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। আজ ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, কত বড় মূর্খতার কাজ করিয়াছিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া গেলাম, একবার মনে হইল তোমারই আশ্রয়ে ফিরিয়া যাই। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তুমি আমাকে ক্ষমা করিতেও পার। কিন্তু ভাগ্যদেবী আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আমি অগ্রসর হইলাম। কোথায় যাইতেছি সে জ্ঞান আমার মোটেই ছিল না। চলিতে চলিতে এক বড় প্রাসাদের সম্মুখে পৌঁছাইলাম। মনে হইল, ইহা নিশ্চয় পরমভট্টারকের কোনও রাজকর্মচারীর প্রাসাদ হইবে। প্রাসাদের ভিতরটা দীপমালিকার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। ভিতরে দুই চারিজন দাসী হয়তো ছিল, কিন্তু বাহিরে কেহ ছিল না। অন্ধকারে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখানে আমাকে এক রাত্রির জন্য কেহ থাকিতে দিবে কি? এমন সময়ে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহার নিকটেই একটা

কেমন যেন গণ্ডগোল হইল। ভূতের মত কালো দুইজন লোক ঐ স্থানের এক গর্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের সমস্ত শরীরে তেল মাখা ছিল আর পরনে এক নীল কোপীন ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। বাহিরে আসিতেই তাহারা কি একটা লুকাইতে চাহিল। তাহাদের দেখিয়া আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম ও মূর্চ্ছিত হইয়া শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া তাহারা সব-কিছু ফেলিয়া ছড়াইয়া চলিয়া গেল। ততক্ষণ তোমার প্রকরণ-অভিনয় শেষ হইয়া গিয়া থাকিবে; কারণ আমার পতনের অল্প কাল পরেই নগরীর প্রধান গণিকা মদনশ্রীর গাড়ি আসিয়া সেখানে লাগিল। এক দাসী আমাকে উল্কার আলোতে দেখিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। মদনশ্রী গাড়ি হইতে নামিয়া আমাকে উঠাইল। আমি তখন জ্ঞান হারাই নাই। কিন্তু আমার শিরাগুলি নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। লজ্জা ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। মদনশ্রী আমার বেশ দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারিল। বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে যেন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। অস্ফুট স্বরে বলিল - 'এ তো বাণভট্টের নর্তকী!' সে তখন আদর করিয়া আমার মাথায় হাত রাখিল, আর লঘুভাবে বলিল—'কোথায় চলিয়াছিলে, ভাই! এই বেশে অভিসারে গিয়াছিলে? সে কোন্ সৌভাগ্যবান্ প্রেমিক, যাহার নিকট এই গহন অন্ধকারে চলিয়াছ? সে নিষ্ঠুর, সখি, সে নিষ্ঠুর!' আমি মদনশ্রীকে চিনিতে পারিলাম। হাসিয়া বলিলাম—'আমার প্রিয় তো যমদেব ভাই!' মদনশ্রী আমার কপোলদেশে মৃদু আঘাত করিল—'ছিঃ, সরলা, এমন কথাও বলে! ওঠ তো।' আমি উঠিতেই আমার কাপড়ে আটকাইয়াছিল এক পটোলিকা, তাহা পড়িয়া গেল। তাহার ভিতরে যে সকল সামগ্রী ছিল তাহা রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িল। পলাইবার সময় চোর উহা ফেলিয়া গিয়া থাকিবে। পটোলিকায় অলক্তক, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গুল ও রাজাবর্তের চূর্ণ রক্ষিত ছিল। স্পষ্টই উহা ছিল মদনশ্রীর চিত্রকর্মের উপকরণ। পরে সন্ধান পাইয়াছিলাম যে মদনশ্রী চিত্র-কর্ম খুব ভালই জানিত। মহাকালের মন্দিরে হরপার্বতীর মনুষ্যপ্রমাণ যে প্রতিকৃতি দেখিয়াছিলে, উহা ছিল ঐ মনঃশিলা ও রাজাবর্ত চূর্ণের মিশ্রণের সুফল। সে ইহার অদ্ভুত প্রয়োগ জানিত। সিক্থক বা মোম এমন কোন বস্তু সে উহাতে মিশাইয়া দিত যাহাতে মনঃশিলার রং এক বিচিত্রভাবে খুলিত। ঐ পটোলিকা দেখিয়া গণিকা যে কি পরিমাণ বিস্মিত হইল তাহা বলা যায় না। আমাকে ভয় পাইতে দেখিয়া প্রথমে সে অনুমান করিয়াছিল যে উহার রথ দেখিয়াই আমি ভয় পাইয়াছিলাম। পরে যখন আমি তাহাকে চোরের কথা বলিলাম, তখন সে শংকিতভাবে সিঁধের দিকে তাকাইল। পটোলিকা ব্যতীত তাহার সাজসজ্জার উপকরণ যাহাতে থাকিত সেই পেটিকাও বাহিরে পড়িয়াছিল।

প্রথমে তো সে কাতরভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হায়, আমার সব লুটে করিয়া লইয়াছে!' কিন্তু ভালো করিয়া যখন দেখিল তখন বুঝিতে পারিল যে পেটিকা হইতে কিছু যায় নাই। তখন সে কৃতজ্ঞভাবে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—'সখি, তুমি না আসিলে তো আমার সর্বস্ব লুটপাট হইয়া যাইত।' আবার একটু থামিয়া বলিল—'সখি, তোমরা তো বাণভট্টের কুলবধূ, এখানে একরাত্রও কি থাকিতে পার না?' আমি কি বলিব ভট্ট, যখন সে এইভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করিল, তখন আমার মুখ ক্রোধে ক্ষোভে লাল হইয়া উঠিল। তাহার একথা বলার তাৎপর্য তুমি বুঝিতে পারিবে না। উহা ছিল কলুষিত মনের কলুষতর অভিযোগ। আমার নিজের উপরও খুব রাগ হইল। ও বেচারি আমাকে তখনও অভিসারিকা মনে করিয়া আমাকে রাগাইবার জন্যই ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। আমি শান্তভাবে বলিলাম—'সখি, আমার মত অভাগিনীকে দেখিয়া বাণভট্টকে ছোট মনে করিও না। আমি এখন সেখানে যাইব না।' গণিকা অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমার হাত ধরিয়া বলিল—'চল, ভিতরে যাই।' আমি মদনশ্রীর সঙ্গে তাহার বিশাল প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। যাহাকে এক মুহূর্ত পূর্বে 'বাণভট্টের কুলবধূ' বলা হইয়াছিল, গণিকাগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহার মরাই ছিল ভালো। ভট্ট, আমি তোমার পবিত্র নাম কলংকিত করিয়াছি, আমি অপরাধিনী!'

এই বলিয়া পা ছুঁইয়া নিপুণিকা আমাকে প্রণাম করিল। আমি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিপুণিকার এসব কথার রহস্য আমি মোটেই বুঝিতে পারিলাম না। সে শান্ত ভাবে বলিল—'বসো, ভট্ট, আর একটু বসো।' আমি বসিয়া পড়িলাম। নিপুণিকার আকৃতি প্রসন্ন হইল। মুহূর্তেই মেঘমুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের মত, শৈবালমুক্ত কমলপুষ্পের মত, কর্দমপরিষ্কৃত পুষ্করিণীর মত, কুজ্ঝটিকা-বিরহিত দিঙ্মণ্ডলের মত তাহার আকৃতি নির্মল ও প্রসন্ন হইল, যেন তাহার হৃদয়ের কোন বিশাল শল্য বাহির হইয়া গিয়াছে, চিত্তে প্রবিষ্ট লৌহকীলক বাহির হইয়াছে। সে বলিতে লাগিল—'মদনশ্রীর প্রাসাদ ছিল বড়ই প্রকাণ্ড। তাহার দ্বারদেশে নানাজাতীয় কুসুমমালিকা মনোহরভাবে সজ্জিত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে শুক-সারিকা, লাও-তিত্তির, হংস-কারণ্ডব, ময়ূর-সারস থাকিত। অশ্ব ও মেষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা ছিল আর 'নাগর'দের বিশ্রাম ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা চিত্তবিনোদনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট ছিল। উহার প্রমোদবনের স্থণ্ডিল-পীঠিকার উপর নগরীর বড় বড় শ্রেষ্ঠিকুমার কুসুমাস্তরণ বিছাইয়া রাখিত। উহার ক্রীড়া-বাপীর হংসে ও চক্রবাকদের মৃণাল ভক্ষণ করানো নাগরিকেরা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিত। মদনশ্রী অতি উদ্ধত গর্বের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করিয়াছিল ভট্ট,

কিন্তু সে বেচারীর দোষ ছিল না। সে পুরুষ দেখেই নাই। সেই জারজ, বিট, লম্পট ও স্ত্রৈণদের রঙ্গভূমিতে কোথাও মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। সে যখন গর্ব করিয়া বলিয়াছিল যে 'তোর বাণভট্টের মত শত শত লোক এখানে পা চাটিতে আসে, সখি' তখন তাহার উপর আমার ক্রোধ হয় নাই। আমি কেবল উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছিলাম। পরের দিন যখন সে চীনাংশুকে সাজিয়া গলদেশে রত্নাবলী পরিধান করিয়া লোধ্ররেণুতে কপোল সংস্কার করিয়া ও সালক্তক-চরণ কুসুমস্তবকযুক্ত উপানৎ দ্বারা সন্নদ্ধ করিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে যায়, তখন আমি মুহূর্তের জন্য চিন্তিত হইয়াছিলাম!' এই পর্যন্ত বলার পর নিপুণিকা কিছুটা লজ্জিত মত হইল। আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—'তোমার মনে নাই ভট্ট, পরের দিন সে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল?'

আমি এ ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ নিপুণিকা মনে করাইয়া দেওয়ার পর উজ্জয়িনীর মদনশ্রীর রূপ স্মৃতিপটে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন নিপুণিকাকে পাওয়া যায় নাই বলিয়া আমি অতিশয় চিন্তিত ছিলাম। এমন সময় আমার এক ভৃত্য সংবাদ দিল যে নগরীর প্রধান গণিকা মদনশ্রী গতকল্য অভিনয়ের সফলতার জন্য সংবর্ধনা জানাইতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তাহার মধ্যে ছিল কুলকন্যার শীল, ও কবির মত প্রতিভা। সে অলক্তকও ব্যবহার করিয়াছিল, একথা আমার খুব মনে আছে; কারণ যখন সে কুট্টিম-ভূমির উপর পা রাখিল তখন আমি আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম যে তাহার উপর প্রবাল-মণির রসধারার মত বহিয়া গেল; এমন মনে হইল যে লাল-লাল লাবণ্যস্রোতে সারা কুট্টিম প্লাবিত হইয়া গেল। তাহার চীনাংশুকের পাড় দিয়া এক লঘু লালবর্ণের ঢেউ যেন খেলিতেছিল। নূপুরের ক্বণন সেই তরঙ্গায়িত অলক্তকের আভাকে মনোহারী করিয়া দিয়াছিল। রত্নাবলী মালা আমি হয়তো লক্ষ্যই করি নাই; কিন্তু তাহার অঞ্চল হইতে বহির্নির্গত বাহু-যুগল দেখিয়া মৃণাল-নাল বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাহার পাতলা চঞ্চল আঙ্গুলের নখপ্রভা তাহাকে যেন বলয়িত করিয়া রাখিয়াছিল। মদনশ্রী নগরের প্রধান গণিকা হইবারই উপযুক্ত ছিল। তাহার প্রবালবৎ লোহিত অধরযুগল অনুরাগ-সাগরের তরঙ্গের সমান মোহিনী শক্তি ধারণ করিয়াছিল। তাহার গণ্ডস্থলের রক্তাবদাত কান্তি দেখিয়া মনে হইতেছিল, মদিরারসে পূর্ণ মাণিক্য-শুক্তির সম্পুটের কথা। তাহার সুবৃহৎ কৃষ্ণতার চক্ষু শতদল-নিবদ্ধ ভ্রমরের মত মনোহর ছিল। ভ্রূ-লতা মদমত্ত যৌবন-গজরাজের মদরাজির মত তরঙ্গায়িত হইতেছে দেখা যাইতেছিল, আর ললাট-পট্টের উপর মনঃশিলার লোহিতবিন্দু অনুরাগ-প্রদীপের মত জ্বলিতেছিল। সে লোধ্ররেণুর দ্বারা অংসস্থলের সংস্কার অবশ্য করিয়া থাকিবে, কারণ তাহা হইতে উত্থিত চূর্ণ মাণিক্য কুন্তলে

সংলগ্ন হইয়া ছিল এবং এমন মনে হইতেছিল যে কর্ণোৎপল হইতে ক্ষরিত মধুধারায় পদ্ম-কিঞ্জল্কচূর্ণ বাহিয়া যাইতেছিল। ললাটমণির লোহিত কিরণে ধৌত তাহার কৃষ্ণ কেশপাশ সায়ংকালীন মেঘাড়ম্বরের মত দর্শককে সবলে আকৃষ্ট করিতেছিল, এবং মনে হইতেছিল যে এক অদ্ভুত মদধারা দৃশ্য জগৎকে বিহ্বল করিয়া দিতেছে। তাহার হাসিতে বালিকার মত সরলতা ফুটিয়া উঠিতেছিল, আর মুহূর্তের জন্য আমার উদ্বিগ্ন চিত্ত-ও সেই শোভার মনোহারিণী পদ্মরাগ-পুত্তলিকা দেখিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছিল। তাহার সঙ্গে অল্পক্ষণই আলাপ হইল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া, যে নিপুণিকাকে হারাইয়াছি তাহার কথাতেই আসিতেছিলাম; কিন্তু সে চাহিতেছিল কলা ও শিল্পের বিষয়ে আলাপ করিতে। সে যখন উঠিয়া চলিয়া গেল, তখন কেহ যে আসিয়াছিল তাহা আমি ভুলিয়াই গেলাম। বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ী প্রভার মত সে এক বিস্মরণীয় দ্যুতি রাখিয়া গিয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল যে সে আমার বৈদগ্ধ্যের সমাদর করিতে পারিল না, আর আমি সে কথা গ্রাহ্যও করি নাই, কারণ আমি তখন নিজের বিদগ্ধতার শ্রাদ্ধ করিবার জন্য যাইতেছিলাম।

নিপুণিকা বলিল—'ভট্ট, সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে জীবনে এই প্রথম এমন পুরুষ দেখিল, যে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করে, কিন্তু পদতল লেহন করে না। কাষ্ঠহাসি হাসিয়া সে বলিল—"বাণভট্ট মানুষ নয়, ভাই!" আমি সগর্বে উত্তর দিলাম—"সখী, ও দেবতা!" ভট্ট, আমি তোমার নাম কলংকিত করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সম্মান রাখিয়াছিলে। আমি তাহার সম্মুখে গর্বভরে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই দুর্ভাগ্যময়ী রজনীর সমস্ত ক্ষোভ আমি ধুইয়া ফেলিলাম। সেই দিন হইতে আমি নিজেকে হাড়-মাংসের বোঝা অপেক্ষা অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। তুমি আমাকে মুক্তি দিয়াছ, ভট্ট!'

আমি অবাক হইয়া নিপুণিকার কথা শুনিতেছিলাম। এখন আর আমার ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বলিলাম—'আমি দেবতা, এখন সেকথা জানিয়া আমার কি লাভ, নিউনিয়া! আসল কথাটা কি তাহা বল না। এত বড় গল্প ফাঁদিবার আজ কি প্রয়োজন?' নিপুণিকা আহত হইয়া বলিল—'তোমার নিকট এ কাহিনীর কোনই মূল্য নাই, কিন্তু আমার তো ইহাই সর্বস্ব। আকণ্ঠ পাপপঙ্কে নিমগ্ন নিউনিয়ার নিকটে আর কি ধন আছে, ভট্ট?' আমি সস্নেহে বলিলাম—'না নিউনিয়া, আমার নিকটে ইহার মূল্য পর্যাপ্ত। তোমার সারা জীবনের কাহিনী আমি শুনিতে চাই। তুমি আমার মধ্যে যাহা কিছু দেখিয়াছ, তাহা আমি নিজে দেখিতেও পারি নাই বুঝিতেও পারি নাই। মূল্য কেন থাকিবে না, কিন্তু প্রয়োজন কি তাহা তো বল।'

কিন্তু নিপুণিকা সব কিছু বলিতে চাহিতেছিল। তাহাকে থামানো ঠিক হইত না, কারণ তাহাতে উহার দুঃখী চিত্তে আঘাত লাগিত। একবার তাহাকে আঘাত করিয়া যে প্রকার চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম, তাহার পুনরাবৃত্তি এখন অসম্ভব ছিল। সে বলিতে লাগিল আর আমি সাবধান হইয়া শুনিতে থাকিলাম। নিপুণিকা একটু সামলাইয়া লইয়া মৃদুভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল—'তুমি বিশ্বাস করিতে পারিবে না, ভট্ট, মদনশ্রী বেশিরকম পরাজিত হইয়াছিল।' এই পর্যন্ত বলিয়া নিপুণিকার চক্ষু দুইটি আনত হইল, আর সে হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল—'বলিব, ভট্ট? একদিন মদনশ্রী-র প্রমোদ-বনে বেড়াইতেছিলাম। প্রমোদবনের পূর্বপ্রান্তে অশোক ও বকুল বৃক্ষের মধ্যে মাধবীলতার মণ্ডপ ছিল। তাহার চার দিকে ছিল কুরুবকের বেড়া দেওয়া। আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, সেই নিভৃত কুঞ্জে উজ্জয়িনীর প্রধান গণিকা একাগ্রচিত্তে চিত্র আঁকিতেছে। অপটু জনও বুঝিতে পারিত যে তাহার হৃদয় গভীর অনুরাগে অস্থির। দুকূল একদিকে বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, কঞ্চুকবন্ধ শিথিল হইয়া গিয়াছে, নয়ন-পক্ষ্ম শিথিল ও চিন্তামগ্ন, আঙ্গুলগুলি চারিদিক পরিষ্কার করিবার জন্য নাড়িতেছে, আর প্রবালমণিবৎ রক্তিম ওষ্ঠের উপর মনঃশিলা ও রাজাবর্তের রং লাগিয়া আছে। তখন বনস্থলী ছিল শান্ত, বৃক্ষের উপর পক্ষীদের ডাক একেবারেই শোনা যাইতেছিল না, লতার কিশলয় পর্যন্ত যেন সম্ভ্রমে স্তব্ধ হইয়া আছে। আমি পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম, আর রুদ্ধশ্বাসে তাহার কলানৈপুণ্য দেখিতে লাগিলাম। তাহার চিত্রের প্রায় সমস্তটাই নীল প্রাবরণে আবৃত, শুধু পায়ের অঙ্গুলিগুলি বাকি ছিল। সে অতি যত্নে তাহাতে রং চড়াইতেছিল। চিত্র সমাপ্ত হইলে অতি সুকুমার ভঙ্গীতে সে নীল প্রাবরণখানি সরাইয়া ফেলিল। আমি আশ্চর্য স্তব্ধ হইয়া থাকিলাম। ভট্ট, সেই চিত্রখানি ছিল তোমারই প্রতিকৃতি।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'নিউনিয়া, চণ্ডী-মণ্ডপের পূজারীর পর উপহাস করিবার লোক তুমি আর কাহাকেও পাও নাই, এখন আমাকে পাইয়াছ!' নিউনিয়া মাথা উঁচু করিল। সে হাসিতেছিল। তাহার চোখ বার বার নত হইতেছিল, বার বার সে উপরে চোখ মেলিয়া তাকাইতে চাহিতেছিল। হাসির শুচিতা চোখকে উপরে উঠাইতেছিল, আর সরসতা আনিতেছিল নীচের দিকে। অপাঙ্গে একটু স্থির ভাবে দেখিতে দেখিতে বলিল—'কিন্তু প্রকৃত কথা তো আমি এখনও বলিই নাই।' এখন সে চোখ নীচু করিয়া খানিকক্ষণ হাসিয়া লইল। আবার সামলাইয়া লইয়া বলিল—'ভট্ট, তাহার হস্ততলে ঘর্ম-বিন্দু আসিয়া গিয়াছিল, আর চিত্রের উপর এক-আধ ফোঁটা চোখের জলও পড়িয়াছিল!' ইহা বানানো কথা। নিপুণিকার চোখই তাহার প্রমাণ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'সাত্ত্বিক

ভাবের স্বেদবিন্দু?' নিপুণিকা তখন উচ্চহাস্য করিল। তাহার চক্ষু আর উপরের দিকে উঠিল না, আঁচল মুখের উপর চলিয়া গেল। অল্পক্ষণের পর নিপুণিকা বলিল—'আমি পিছন হইতে সীৎকার শব্দ করিলাম। গণিকা আমাকে দেখিয়া লজ্জা পাইল। তাহার লজ্জিত মুখ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল, ভট্ট! তুমি দেখিলে কবিতা লিখিয়া বসিতে। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন ভাগ্যবানের চিত্র আঁকিতেছ, ভাই!" লজ্জা ও অনুরাগ গণিকাকে মূক করিয়া দেয় না, আরও প্রগল্‌ভ করিয়া তোলে। সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"তোমার দেবতার!" আর চিত্র-ফলক আমাকে দিয়া দিল। আমি পরের দিনই তাহা চুরি করিয়া পলাইয়া আসিলাম।'

পুনরায় একটু থামিয়া নিপুণিকা বলিল—'ভট্ট, আমি বেশি দিন বাঁচিব না, অল্প দিনের জন্যই অতিথিরূপে আছি। আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতেই হইবে।' নিপুণিকার এই কাহিনীর এরূপ উপসংহার শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম—'ছিঃ নিউনিয়া, এরূপ বলা উচিত নয়।' কিন্তু সে আমার কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলিয়া চলিল—'পলাইবার সময় আমি বালক-বেশ ধারণ করিয়াছিলাম। তোমার আবাসস্থলে গেলাম, খবর পাইলাম যে তুমি আমাকে খুঁজিতে কোথায় গিয়াছ। ইহাও জানিতে পারিলাম যে শার্বিলকের দোকানে দণ্ডধরের সঙ্গে খানাতল্লাশ করিবার জন্য যাইবে। আমি শুধু তোমাকে একবার দেখিয়া উজ্জয়িনী ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলাম। শার্বিলকের দোকানে যাইতেছিলাম এমন সময়ে পথমধ্যে শকদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা হইল। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল—"এসো বাপু, তোমার ভাগ্য গুনিয়া দিই।" জ্যোতিষীকে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম। আমার নিকটে অনেক দীনার ছিল। সে মাটিতে নানাপ্রকার চক্র টানিয়া বলিল—"তোমার ভবিষ্যৎ ভাল, কিন্তু দুঃখভোগ আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি যাহার সহিত দেখা করিতে চলিয়াছি, তাহার বিষয়ে কিছু বল।" সে একটু গুনিয়া বলিল—"সে বড় যশস্বী কবি হইবে; কিন্তু কোনও রচনা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিবে না। যেদিন সে কবিতা লিখিতে বসিবে, সেই দিন হইতে তাহার আয়ু ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইবে। সে তাহার পর এক সহস্র দিন পর্যন্ত বাঁচিতে পারিবে।" জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম, দুই হাত জোড় করিয়া বলিলাম—"বাঁচিবার কোনও উপায় আছে কি, আর্য?" জ্যোতিষী মাথা নাড়িয়া বলিল—"আছে"। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া জ্যোতিষী বলিল—"উহাকে বলিয়া দিও যে কোনও জীবিত ব্যক্তির নামে কাব্য রচনা না করে।" একথা শুনিয়া আমি তখনই শার্বিলকের দোকানের পথ ধরিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ সে তখন প্রসন্নমনে ছিল, পানপাত্র ভরিবার কাজে আমাকে নিযুক্ত করিয়া

লইল। তুমি দণ্ডধরের সঙ্গে আসিলে, আর আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। তুমি ঘৃণায় আমার দিকে একবার তাকাইলেও না। একটু পরে নগর-প্রতীহার আসিল, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে যে তোমার রচিত প্রকরণ তুমি সিপ্রার জলে ফেলিয়া দিয়াছ। আর যতদিন নিপুণিকার দেখা পাইবে না, ততদিন তুমি নাটকও লিখিবে না, অভিনয়ও করিবে না। একথা শুনিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম এবং দেখা না করিবার সংকল্প লইয়া পলাইয়া আসিলাম। আজ ভট্টিনীর বেলায় তুমি যখন কবিতা লিখিবার কথা বলিলে, তখন আমার চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল। আমি একথা বলিতে আসিয়াছি ভট্ট, যে তুমি ভট্টিনী কি জীবিত অন্য কাহারও বিষয়ে কবিতা লিখিও না। আমার অনুরোধ রাখ, আমি দরিদ্র অকিঞ্চন, শুধু প্রার্থনাই করিতে পারি।'

নিপুণিকা জানুপাত করিয়া প্রণাম করিল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিতে দিতে বলিলাম—'নিউনিয়া, আমি তোমার অনুরোধ পালন করিব, কিন্তু জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করি না।' নিপুণিকা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। জ্যোতিষীর কথা অবিশ্বাস করা উহার মাথায় প্রবেশ করিল না। আমি বেশি কিছু বলিলাম না। শুধু আকাশের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলাম। আমি জানি, সম্প্রতি যবনেরা যে হোরা-শাস্ত্র ও প্রশ্ন-শাস্ত্র নামে জ্যোতিষ-বিদ্যার প্রচার এ দেশে করিয়াছে, তাহা যাবনী-পুরাণ-গাথা অবলম্বনে রচিত স্থূল অনুমানসিদ্ধ নিয়ম। ভারতীয় বিদ্যা যে কর্মফল ও পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করিয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোনই মিল নাই। এমন কি, আমাদের পুরাণপ্রথিত গ্রহদেবতাদের জাতি, স্বভাব ও লিঙ্গেও অদ্ভুত বিরোধ স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের পুরাণপ্রসিদ্ধ শুক্র ও চন্দ্রমা এই জ্যোতিষে স্ত্রী-গ্রহ বলিয়া ধরা হইয়াছে, কারণ যবনগাথার ভীনাস ও ডায়ানা হইলেন দেবী, আর তাঁহাদিগকেই এই দুই গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া মানা হইয়াছে। গ্রহমৈত্রীর বিধান তো অদ্ভুত। আর্ষপুরাণগ্রন্থে এই মৈত্রীবন্ধের কোনও সমর্থন হয় না। দেশের অশিক্ষিত জনসমাজে এই বিদ্যার খুব প্রভাব পড়িয়াছিল, আর ধীরে ধীরে এই বিদ্যা কুসংস্কারের রূপে রাজা ও পণ্ডিতদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে ভগবান বুদ্ধের প্রবর্তিত সৌগত মার্গেও ইহার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। আমি ইহার রহস্য জানিতাম; কিন্তু নিউনিয়া জানিত না। তাহা হইলেও উহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, কোনও জীবিত ব্যক্তির বিষয়ে কবিতা লেখার কার্যে সংকোচ করিব। শেষ পর্যন্ত আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু যে দিন উহা ভঙ্গ হইল, সেদিন নিপুণিকা আমাদের ছাড়িয়া

লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। আমরা দুই জনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিলাম। নৌকার নীচ হইতে আনন্দ-গদ্‌গদ স্বরে শোনা যাইতেছিল—

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা বিষাণকোট্যাখিলমূর্তিধারিণা।
সমুদ্‌ধৃতা যেন বরাহরূপিণা স মে স্বয়ংভূর্ভগবান্ প্রসীদতু॥

কণ্ঠ ভট্টিনীর। নিপুণিকা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'ভট্টিনীর পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। চল, প্রসাদ লই গিয়া।'

নবম উচ্ছ্বাস

ত্রিবেণী পার হইবার পর আমাদের নৌকা গুণ না টানিয়াও তীব্র বেগে চলিতে লাগিল। ইহার পূর্বে মাল্লাদিগকে কয়েক স্থানে নৌকা টানিতে বা ঠেলিতে হইয়াছিল; কিন্তু প্রয়াগের পরে জল কোথাও কম ছিল না। সব চেয়ে বড় কথা এই যে তখন আমার চারদিকের দৃশ্য চিত্তকে চঞ্চল করিতে লাগিল, গঙ্গা এখন প্রায়ই ছোটো-খাটো পাহাড়ের পাশ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিন্ধ্যাটবীর আকর্ষণ আমি নিজের জীবনে কখনই কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। পূর্বসমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পৃথিবীর মনোহর মেখলাতুল্য, মধ্যদেশের অলংকারস্বরূপা এই পরম রমণীয় বিন্ধ্যাটবী বাল্যকাল হইতেই আমার চিত্তরূপী চপল অশ্বের খলীন স্বরূপ, বৈরাগ্যরূপী দ্বিরদের অঙ্কুশের স্বরূপ, ভ্রমণোন্মাদরূপ মানসিক দ্বন্দ্বের রক্ষাকবচ। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহার নিকটেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আমি সেই সব বৃক্ষের মায়া কাটাইতে পারি নাই, যেগুলি বন্য হস্তীর মদজলে সিক্ত হইয়া বর্ধিত হইয়াছিল, যেগুলির শিরে স্থিত শ্বেত-কুসুম উচ্চে অবস্থিতির জন্য বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মত শোভিত হইতেছিল, যাহাদের ঘনচ্ছায়া যুগপৎ শান্তি ও সম্ভ্রম সৃষ্টি করিতেছিল। শৈশবকালে আমি এই বিশাল বিন্ধ্যাটবীর একাংশের মাত্র আস্বাদ পাইয়াছিলাম, আজ দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর আমি ইহার প্রত্যেক ভাগের রস নিপুণভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। এখানে কোথাও মদমত্ত কুরর পক্ষী তাহার চঞ্চু দিয়া মরীচ-পল্লব কাটিতেছে দেখা যায়; কোথাও গজশাবকদের শুণ্ড-কণ্ডূয়নে তমালবৃক্ষের কিশলয় ভাঙিয়া ভাঙিয়া বনভূমিকে সুরভিত করিতেছে; কোথাও মধুপানে রক্তিম কেরলকামিনীর কপোলতলের শোভা-আহরণকারী বাল-তরু-পল্লব যেন লীলা-লোল বনদেবতাদের চরণালক্তকের রঙ্গে লাল হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে; কোথাও এমন বিস্তর লতামণ্ডপ রহিয়াছে যাহার তলদেশ শুকপক্ষি-

কর্তিত দাড়িম্বফলরসে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, যাহার মধ্যে চপল বানরেরা কম্পিল্ল-বৃক্ষের ফলপল্লব ফেলিয়া গিয়াছে, যাহা নিরন্তর পুষ্পরেণু ঝরিয়া যাওয়ায় রেণুময় হইয়া গিয়াছে, এবং যাহার অভ্যন্তরে পথিকেরা লবঙ্গপল্লবের শয্যা বিছাইয়া বিশ্রাম করিয়া লয়।

আমাদের নৌকা যখন এই সব পাহাড়ের তলদেশ দিয়া যাইতেছিল, তখন আমার চিত্ত ছিন্ন-রজ্জু বৃষভের মত পালাইতেছিল, আর মদস্রাবী গজযূথ, নির্ঝরমুখর গিরিকন্দর, নীরন্ধ্রনীল নিচুলকুঞ্জ ও এলা লবঙ্গ ও তমালবনের মাঝখানে ছুটিতেছিল। বিন্ধ্যাটবী-বেষ্টিত গঙ্গা চরণাদ্রিদুর্গকে তিনদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। এখান হইতে একবারেই একদৃষ্টিতেই আমি সুদূর প্রসারিত বদরীবৃক্ষের জঙ্গল, বনপনসের ঝাড় ও সীতাফলের কৃষ্ণবর্ণ বনরাজি দেখিতে পাইলাম। একবার মনে হইল, লাফাইয়া পড়ি এই বনদেবতাদের আবাসস্থলে, এই উন্মদ ময়ূরদের বিলাসস্থলীতে, এই করেণুসেবিত কান্তারে, এই নির্ঝর-মুখর বিন্ধ্যারণ্যে। দুর্গের অপর প্রান্তে ঘাট ছিল। নৌকা সেখানেই থামানো হইল। আমি অতি উদাস ভাবে বিন্ধ্যাটবীর দিকে তাকাইয়া ছিলাম, কারণ উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার স্বাধীনতা আমার ছিল না।

এমন সময় আমার সঙ্গী নৌকার একজন সৈনিক যুবক আমার সম্মুখে আসিয়া জানুপাতপূর্বক প্রণাম করিয়া বলিল—'আর্য, অনুমতি হইলে এক প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছু নিবেদন করি।' যুবকের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। একহারা শরীর, প্রশস্ত বক্ষ, দীর্ঘায়ত নেত্রযুগল, সহজ আনন্দে পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল। দেখিয়া অহৈতুক আনন্দের মত অনুভব হইল। 'কি বলিবার আছে, ভদ্র! আমি অবহিত আছি, বলুন।' যুবক নম্রভাবে বলিল—'ইহা চরণাদ্রি দুর্গ। ইহাই কান্যকুব্জেশ্বরের এখন পর্যন্ত পূর্বসীমানার দুর্গ। ইহার পরবর্তী দেশে এখন অরাজকতার অবস্থা। উত্তরে কাশী ও দক্ষিণে করূষ জনপদ এখন না মগধের গুপ্তদের হস্তে, না কান্যকুব্জের অধীন। মহারাজাধিরাজের পূর্ববর্তী রাজগণ এখানে অতি কুশলনীতির অনুবর্তী ছিলেন। তাঁহারা উত্তর তটের কিছু কিছু ব্রাহ্মণদের ভূমির অগ্রহার দিয়া নিজেদের পক্ষভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই ভূমি-অগ্রহারভোজী ব্রাহ্মণেরা সমস্ত জনপদে প্রধান হইয়া বসিল। উহারাই এই অঞ্চলের সামন্ত। উহাদের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়া লোপ পাইয়া যাইতেছে। এখন উহারা প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধ রাজাদের সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণের ব্যাঘ্রসরোবরে আভীর-সামন্ত ঈশ্বরসেনের প্রতাপ আছে। সে গুপ্তসম্রাটদের বড়ই বিশ্বাসভাজন। কুমার আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে নৌকা যেন উত্তর তট হইতে লইয়া যাওয়া হয়,

আর এই সব দেশে আমাদিগকে কেহ যেন কান্যকুব্জের লোক বলিয়া না বুঝিতে পারে। আর্যকেও এই স্থানে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে।'

এই সংবাদ আমাকে যেন নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিল। কুমারের সেই উপদেশ মনে পড়িল, যখন তিনি সঙ্কোচের সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, মিথ্যা কথা বলা সর্বদা অনুচিত নয়। সেই উপদেশ কি এই সময়ের জন্য? যদি এই সময়ে সেই উপদেশের প্রয়োজন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই কোনও ভীষণস্থানে আসিয়াছি। আমি কোন কথা বলিলাম না; কিন্তু আমার মুখের উপর উদ্বেগের চিহ্ন অবশ্যই দেখা দিয়া থাকিবে, কারণ সেই প্রসন্ন-মনোহর যুবকের দীপ্ত ললাটে গাম্ভীর্যের চিহ্ন প্রকটিত হইল, তাহার গণ্ডস্থল ধৌতকেশর কদম্ব-পুষ্পের মত পরিম্লান হইল, তাহার রক্ত অধরোষ্ঠ কিছু বলিবার জন্য ব্যগ্রভাবে স্ফুরিত হইল। কিন্তু সে মুখে কিছু বলিল না। ধীরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, আর অল্পক্ষণ পরে এক বৃদ্ধসৈনিককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি তখন চিন্তামগ্ন ছিলাম। পুনরায় ভট্টিনীকে লইয়া এক ভীষণস্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছি কি? কিন্তু আমি তো কান্যকুব্জেশ্বরের রাজ্য হইতে বাহিরে যাইবার জন্যই চলিয়াছি। তবে ভয় পাইবার কি আছে?

বৃদ্ধসৈনিক প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিল—'আর্য, এই বালক আপনাকে যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা সত্য; কিন্তু ইহাতে আপনার চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবার কথা নয়। অন্য নৌকাটিতে দশজন ক্ষত্রিয়কুমার আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত। আর্য, এই ধমনীতে মৌখরিদের উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। আমি প্রতাপশালী যশোবর্মার সেবক। মদমত্ত হস্তীদের ধারাজলের বর্ষণে আমার জীবন কাটিয়াছে, শস্ত্রের ঝনৎকারেই আমি জীবনের সঙ্গীত শুনিয়াছি, অশ্বের পৃষ্ঠেই আমার বিশ্রাম হইয়াছে। আজ মৌখরিদের প্রতাপানল নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু জাতির মধ্যে এখনও প্রাণ আছে। আজ অতিশয় পুণ্যের বলে এই পবিত্র জাহ্নবীর জলধারার উপর ব্রাহ্মণ দম্পতির সম্মান রক্ষার ভার এই ভুজদ্বয়ের উপর পড়িয়াছে। বিগ্রহবর্মা আজ পর্যন্ত পরাজয়ের মুখ দেখে নাই। মৃত্যুর তোরণদেশে দাঁড়াইয়া সে কদাচ নিজের সমস্ত জীবনের যশ কালো হইতে দিবে না।'

বৃদ্ধের দর্পোদ্ধত গর্বোক্তির মধ্যে এক অত্যন্ত সহজ ভাব ছিল। তাহার রোমে রোমে আত্মবিশ্বাস প্রকট হইতেছিল। কিন্তু মৌখরি শব্দে আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভট্টিনী যেন ইহা জানিতে না পারেন। কিন্তু সমস্ত জানিয়া বুঝিয়া কুমার আমাদের রক্ষার জন্য মৌখরি বীরদের কেন নিযুক্ত করিলেন? আবার এই বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়সৈনিক 'ব্রাহ্মণ দম্পতি' কাহাকে বলিলেন? আমি ভিতরে ভিতরে শুকাইয়া উঠিলাম। ভট্টিনীর কানে এই দুইটির মধ্যে কোন একটিও

শব্দ যেন না পৌঁছায়। ছিঃ! এ কি লজ্জার কথা! আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া নিজেই নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম—'জানি, ভদ্র, প্রতাপশালী যশোবর্মার বিমলকীর্তির সঙ্গে পরিচিত আছি। কে না জানে সেই দুর্ধর্ষ পরাক্রান্ত যশোবর্মাকে, যাঁহার দৃঢ়মুষ্টি-বদ্ধ তরবারি মদমত্ত হস্তীর কুম্ভোপরি পতিত হইলে স্থূলে স্থূলে গজমুক্তা তাহাতে এত দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিত যে মনে হইত, মুষ্টি বাঁধিবার জোরে তরবারির ধারাই বুঝি বড় বড় বিন্দুর রূপে পড়িয়া যাইতেছে। এই মুক্তালগ্ন দন্তুর কৃপাণধারাই না জানি কত শত্রুর রাজলক্ষ্মী বলে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। জানি ভদ্র, অনেকসংখ্যক যোদ্ধার বক্ষস্থলে আবদ্ধ লোহ কবচে অন্ধকার হইয়া গেলে হস্তীর মদধারা জনিত দুর্দিনে ভিজিতে ভিজিতে রাজলক্ষ্মীরা যে যশোবর্মার নিকট অভিসারিকার মত আসিতেন, সেই অতুলপরাক্রম মৌখরিবীরকে আমি জানি। ভদ্র, আপনার প্রতাপশালী ভুজদণ্ডের উপরও আমার বিশ্বাস আছে, আমি নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু একটি কথা জানিতে আমার বড় ঔৎসুক্য। আপনি কি ছোট মহারাজের সৈনিক?'

বৃদ্ধের চক্ষু সহসা রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তাহা হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'না আর্য, ছোট মহারাজ লম্পট চরিত্রের। সে মৌখরিবংশের কলঙ্ক। তাহাকে পুষিয়া নীতি-নিপুণ মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষদেব সমগ্র দেশে মৌখরিদের উপর ঘৃণা উৎপন্ন করাইয়া দিয়াছেন। আমি পট্টদেবী রাজ্যশ্রীর আজ্ঞায় বৌদ্ধ নরপতির সেবা করিতেছি। পট্টদেবী হরজটাপ্রবাহিতা জাহ্নবীর মত পবিত্র, অদ্বিতীয় পতিব্রতা অরুন্ধতীর পার্থিব বিগ্রহ, এই ধরায় ভ্রান্তিবশে সমুপগতা কল্পলতিকা, পার্বতীর তরল হাস্যের মূর্তিমতী প্রতিমা, সরস্বতীর কর্পূর গৌরব কান্তির সারবান রূপ। তিনিই মৌখরিদের নেত্রী, তিনিই তাহাদের সর্বস্ব। আজ ঐ দেবীর রূপেই মৌখরি-রাজলক্ষ্মী জীবিত আছেন। আজও তাঁহার ইংগিত-মাত্রেই মৌখরিবীর ধরিত্রীকে আন্দোলিত করিতে পারেন। আমি তাঁহার ইচ্ছাতেই এখন মহারাজাধিরাজের বিশ্বস্ত অনুচর হইয়াছি। তাঁহার দয়াতেই ছোট মহারাজ এখনও জীবিত আছেন, নতুবা মৌখরিকুলকলংক এই রাজনামধারী অত্যাচারী কাপুরুষ কবে নরকে চলিয়া যাইত।' বৃদ্ধের কথায় আমি আশ্বস্ত হইলাম, এবং অতিশয় উৎসাহের সহিত তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম। আমার প্রসন্নতায় বৃদ্ধ যেন কোনও বড় পুরস্কার পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। সে প্রণামান্তে সহজভাবে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে নৌকা চলিতে আরম্ভ করিল।

আভীর-সামন্ত ঈশ্বর সেনের সৈনিকদের আমাদের উপর সন্দেহ হইল।

তাহারা নৌকা আটক করিতে চাহিল। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। উহা আরম্ভও হইয়া গেল। তখন হয়তো অর্ধেক রাত্র হইয়া থাকিবে। আমাদের নৌকাগুলি যথাসাধ্য পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের এক স্থানে ঘিরিয়া ফেলিল। তমসার সংগম পার হওয়া গিয়াছিল। আরও কোনও ছোট নদীর সংগম পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। প্রাণপণ করিয়া মগধের সীমার ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছিলাম। কিন্তু যাহা হইবার নয় তাহা হইল না, আর যাহা হইবার ছিল তাহাই হইল। বিগ্রহবর্মা ও তাহার বীর সৈনিক অদ্ভুত বিক্রমের সহিত শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সংখ্যায় তাহারা উহাদের অর্ধেকেরও কম ছিল; কিন্তু এখন পলায়ন করা ছিল অসম্ভব। দেখিতে দেখিতে তাহাদের হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল, ধনুষ্টংকারে আকাশমণ্ডল এবং বাণে গঙ্গার ধারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বীর যোদ্ধাদের কবচ হইতে নির্গত হইয়া স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারের নীলিমাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। আমাদের নৌকাগুলি বেগে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল, আরও বেগে আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। তাহারা ক্রমশ নিকটে আসিয়া পড়িল, আর এতখানি কম দূরে রহিল যে বাণযুদ্ধ অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিগ্রহবর্মা মৌখরিকুললক্ষ্মী রাজ্যশ্রীর নাম লইয়া জয়ধ্বনি করিলেন আর স্বপক্ষের সৈন্যদের কুন্ত প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। আমি এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া এই যুদ্ধ দেখিতেছিলাম। তখনও আশা ছিল যে কোনও না কোনও প্রকারে এ বিপত্তি দূর হইয়া যাইবে, কিন্তু বিপদ এখন একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তে স্মরণপথে আসিল নগরহারের পথে আক্রান্ত ভট্টিনীর করুণাপূর্ণ মুখমণ্ডল। দেখিলাম যে, ঘটনা পুনরাবৃত্ত হইতে চলিয়াছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার দেহে বর্মের আবরণ ছিল না, হস্তে শস্ত্র ছিল না, হৃদয়ে আশাও ছিল না। স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, ধীর নাপিতের মত আমিও ভট্টিনীর জয়ধ্বনি করিতে করিতে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইব। আর চিন্তা করা নিষ্ফল। আমিও বিগ্রহবর্মার নৌকার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। শুধু ক্ষণিকের জন্য আমি ভট্টিনী ও তাঁহার নীল উপাস্য মূর্তির কথা চিন্তা করিলাম। আমার মনের কোথাও কোনও আশা ছিল না; কিন্তু পুনরায় মহাবরাহের ভরসায় আমি কিছুটা আশ্বস্ত হইতে চাহিয়াছিলাম। ঈশ্বরই তো দুর্বলের সম্বল। আমি উঠিয়া পড়িলাম। জয় হউক সেই মহাবিষ্ণুর, সেই নরসিংহ মূর্তির, যাঁহার ক্রোধ-কষায়িত রক্তদৃষ্টিতেই হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। জয় হউক সেই মহিমশালী বরাহমূর্তির, যাঁহার চন্দ্রকিরণের অংকুরবৎ দন্তে অসুরকুলে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমি উঠিয়া পড়িলাম। বিগ্রহবর্মা

লোভ দেখাইতেছিল—'বীরগণ, মরণের এমন উৎসব দুর্লভ। সাবধান, শত্রু যেন ব্রাহ্মণদম্পতির ছায়া স্পর্শ করিতে না পারে। জয় মৌখরিকুল রাজলক্ষ্মী, জয় মহারাজ্ঞী রাজ্যশ্রী, জয় জয় মৌখরিবংশের জয়!' যোদ্ধারা একসঙ্গে জয়ধ্বনি করিয়া লইল। তীক্ষ্ণফলক কুন্ত লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাদের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল। নৌকাগুলি পরস্পরে প্রায় মিশিয়া গিয়াছিল। মাল্লারাও বিকটস্বরে জয় ঘোষণা করিল। গঙ্গার জল রক্তে লাল হইয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে 'দুম' করিয়া একটা শব্দ হইল। নিপুণিকা চীৎকার করিয়া উঠিল—'ভট্ট, বাঁচাও, বাঁচাও।' আর সে নিজেও নদীতে লাফাইয়া পড়িল। আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। নীচে আসিয়া দেখি—ভট্টিনী ও নিপুণিকা জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মুহূর্তের মধ্যে আমি নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া লইলাম, জলে লাফাইয়া পড়িলাম। নিপুণিকা চীৎকার করিয়া বলিল—'আমাকে ছাড়িয়া দাও, ভট্টিনীকে সামলাও। ঐদিকে দেখ, ঐদিকে...।' আমি ভট্টিনীর দিকে লাফাইয়া পড়িলাম। এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে ভট্টিনী গঙ্গার তলদেশে চলিয়া যাইতেন। আমার মধ্যে না জানি কোথা হইতে অদ্ভুত শক্তি আসিয়া গিয়াছিল। ভট্টিনীকে আমি ধরিয়া লইলাম, নিজের পৃষ্ঠদেশে উঠাইতে পারিলাম। মনে হইল ভট্টিনী অনেকখানি জল খাইয়াছেন। তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, অনেক ভারি মনে হইতেছিল। পুনরায় তাঁহাকে লইয়া নৌকার দিকে ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু নৌকা পিছনে ছুটিয়া গিয়াছিল। নাবিকেরা ও সৈনিকেরা একত্র হইয়া শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল। নৌকা দেখিবার অবসর কাহারও ছিল না। স্রোতের বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ যুঝিতে পারিলাম না। নিরুপায় হইয়া স্রোতের মুখেই ভাসিতে লাগিলাম। একবার মনে হইল, ভট্টিনীকে পিঠে করিয়া বেশিক্ষণ বহিতে পারিব না। শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। এমন না হয় যে ক্লান্তির জন্য আমার অঙ্গ শিথিল হইয়া গেল আর ভট্টিনী আমার পৃষ্ঠদেশ হইতে গড়াইয়া পড়িলেন! আমি আমার উত্তরীয় দিয়া ভট্টিনীকে জোর করিয়া বাঁধিতে চাহিলাম। যখন উত্তরীয় ভট্টিনীর ভুজদেশে জড়াইতে যাই, তখন শক্ত দ্রব্য অনুভব করিলাম। টানিয়া দেখিলাম, এ যে মহাবরাহের মূর্তি! হায়, 'জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা'র উদ্ধারকর্তা আজ তাঁহার ভক্তকেই ডুবাইতেছেন, এ কী বিষম বিড়ম্বনা! এই মূর্তির জন্যই ভট্টিনীকে ভারি লাগিতেছিল, আর নিরন্তর যে ডুবিয়া যাইতেছিলেন তাহারও এই কারণ! অবধূতের প্রশ্ন আজ মূর্তিমান হইয়া সম্মুখে আসিল—কাহাকে বাঁচাইব—ভট্টিনীকে, না মহাবরাহকে? মনে পড়িল অবধূতের ক্রুদ্ধ মুদ্রা—'মূর্খ, তুই বাঁচাইবি মহাবরাহকে?' সত্যইতো, এই মহামহিমশালী উদ্ধারকর্তাকে বাঁচাইবার সংকল্প কি স্পর্ধা

নয়? হে জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরার উম্ধারকর্তা, তোমার অপেক্ষা তোমার ভক্তের চিন্তাই আমার নিকটে অধিক, অবিনয় ক্ষমা কর, আমি তোমাকে গঙ্গার পবিত্র জলে বিসর্জন দিতেছি। সম্মুখে অবধূত বাবা অঘোরভৈরবের প্রসন্ন মূর্তি খেলিয়া গেল। মনে হইল তিনি প্রেমপূর্বক তিরস্কার করিতেছেন—'আবার মিথ্যা বলিতেছিস, জন্মপাপী, কর্মে ভাগ্যহীন, মিথ্যাবাদী, পাষণ্ড! মহাবরাহকে বাঁচাইবি তুই! দম্ভী!!' আমি খানিকটা যেন লজ্জা পাইয়া গেলাম। পুনরায় মনে হইল, তিনি যেন সস্নেহে বলিতেছেন, 'দেখ বাবা, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু দেবতা; ত্রিপুরসুন্দরী যে রূপে তোমাকে সব চেয়ে অধিক মুগ্ধ করিয়াছেন, তাহার পূজো কর।' আবার মহাবরাহের মূর্তি আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। অঘোরভৈরবের মূর্তি আকাশের দিকে উপরে উঠিতে লাগিল। উহা দূর হইতে দূরতরে চলিয়া গেল। আমার ধমনীতে রক্তস্রোত ক্ষীণভাবে বহিতে লাগিল, হাত শিথিল হইতে লাগিল, চক্ষুর সামনে অন্ধকার ছাইয়া গেল। শুধু দূর হইতে মেঘ বিদীর্ণ করিয়া একটা শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল : 'কাহাকেও ভয় করিবে না, গুরুকেও না, মন্ত্রকেও না, লোককেও না, বেদকেও না!' আমার সমস্ত অবসন্ন হইয়া গেল, শুধু চেতনার পর মৃদু আঘাত করিতে করিতে সেই অদৃশ্য শব্দ আকাশে বিলীন হইতে হইতেও শোনা যাইতেই লাগিল। অবধূতের মূর্তি আরও উপরে উঠিল, নক্ষত্রমণ্ডলেরও উপরে, আরও উপরে, আরও...।

আমি ভূমি স্পর্শ করিলাম। অঙ্গ-সকল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যেমনই ভট্টিনীর কথা মনে পড়িল, অমনি সহসা, কোথা হইতে জানি না, অজ্ঞাত এক শক্তি জাগিয়া উঠিল। ভূমিতে বালুকারাশির একটা স্তূপ ছিল; কোনও প্রকারে ভট্টিনীকে সেই পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলাম। ভট্টিনী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আকৃতিতে গ্লানির কোনও চিহ্ন ছিল না। আর্দ্র কেশপাশ আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বঙ্কিম ভ্রূ-যুগল আরও কুটিল আকার ধারণ করিয়াছিল, সিক্তবস্ত্রে ঘনশ্লিষ্ট সৌন্দর্যলক্ষ্মী আরও অনুভাববতী হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল, ভট্টিনী কোনও মধুর স্বপ্ন দর্শনে নিরত আছেন। সলিলবৎ উত্তরীয়ের অন্তরালে সমস্ত শরীর দীপ্তিমতী দীপজ্যোতির মত চক্ষুকে তাহার স্নিগ্ধ আলোকে প্রসন্ন করিতেছে। ভট্টিনীকে লইয়া কোনও উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজিয়া লইব এমন শক্তিও আমার দেহে অবশিষ্ট ছিল না। অবশ অবসন্নতায়ও আমি ঐ স্তূপের উপর পড়িয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে প্রভাত হইল। সূর্যদেবের লোহিত কিরণে অন্ধকারের ঘন আবরণ ছিন্ন করিল। দিনমণি যখন আকাশে কিছু উপরে উঠিয়া আসিলেন তখন শরীরে কিছু উষ্ণতা বোধ হইল। উঠিয়া বসিলাম। হায়, যে দেবীকে উত্তমভাবে রক্ষা করিবার

প্রতিজ্ঞা বার বার করিয়াছিলাম, তাঁহার এ কী দশা হইল! বস্ত্র বিপর্যস্ত, মৃণাল-নালের তুল্য কোমল ভুজলতা শিথিল পড়িয়া আছে, পদ্মপলাশকে লজ্জা দেয় এমন চরণতল রক্তহীন হইয়া গিয়াছে, আর পদ্মরাগবৎ প্রভাবর্ষী নখ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে! বালুকার আস্তরণ কি এই অপূর্ব লাবণ্যপুত্তলিকার যোগ্য? ধিক্ ভাগ্যহীন বণ্ড! ধিক্!!

সূর্যকিরণ বালুকাকণায় প্রতিফলিত হইতে লাগিল। মনে হইতেছিল যে সূর্যদেবতার অশ্বখুরাগ্রে নক্ষত্রমণ্ডলী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পৃথিবীর উপর পড়িতেছে, আর এই অনর্থে মুহ্যমান চন্দ্রলক্ষ্মী তাহা ঢাকিবার জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হায়, বিষম সমরবিজয়ী প্রত্যন্তবাড়ব, অবিজ্ঞাতপ্রতি-স্পর্ধিবিকট তুবর-মিলিন্দের কন্যার এই দিনও দেখিতে হইল! কিন্তু শোক করা তো মূর্খতা। এখন তো অল্পক্ষণ পরেই বালুকাকণা অগ্নিতুল্য তপ্ত হইয়া উঠিবে, ভট্টিনীর আরও অধিক ক্লেশ হইবে। কি করিব, কি উপায় আছে! এই অবস্থায় ভট্টিনীকে একা ছাড়িব কি করিয়া? আহা, এ সময়ে নিপুণিকার অভাব কতই দুঃখ দিতেছে! নিপুণিকা কি বাঁচিয়া গিয়াছে? আমারই যখন এই দশা, তখন নিপুণিকা কি আর বাঁচিয়া আছে। সে নিশ্চয় ডুবিয়া মরিয়াছে। ও নিউনিয়া, তুমি কোথায় আছ? দেখো, তোমার ভট্টিনী কি অবস্থায় আছে! হায়, এই সময়ে এমন তো কেহ নাই যে ভট্টিনীর শিথিল বস্ত্র ঠিক করিয়া দেয়! নিউনিয়া, যেখানে থাক দৌড়াইয়া এসো। কে আমার সহায়তা করিবে? ধীরে ধীরে অবধূতের মূর্তি আকাশ হইতে নামিয়া আসিল। বাষ্পাকুল নেত্রে স্পষ্টই দেখিলাম, দিগন্তের অন্য কোণ হইতে অঘোরভৈরব বেগে আমার দিকে আসিতেছেন—'ভয় কাহাকেও করিবে না, গুরুকেও না, মন্ত্রকেও না, লোককেও না, বেদকেও না!' আকাশ হইতে অঘোরভৈরব ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন। আমি উঠিলাম, ভট্টিনীর বস্ত্র ঠিক করিয়া দিলাম, নাড়ী পরীক্ষা করিলাম। নাড়ী ঠিক ছিল। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার ললাটে হাত বুলাইয়া দিলাম, পদতল টিপিয়া দিলাম, হস্ততল ও ভুজদেশে আস্তে আস্তে চাপ দিয়া পুনরায় ললাটে হাত বুলাইলাম। ভট্টিনীর জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল। রক্তোৎপলতুল্য নয়নপক্ষ্মে ঈষৎ চঞ্চলতা দেখা দিল এবং চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি নিদাঘশীর্ণ জবাপুষ্পের মত লাল হইয়াও ম্লান ছিলেন, ঝঞ্ঝাবিলোড়িত কাঞ্চনপুষ্পের মত প্রফুল্ল হইয়াও ক্লান্ত ছিলেন, ধূলিমর্দিত অশোককুসুমের মত মনোহর হইয়াও ধূসর ছিলেন। ভট্টিনী আমার দিকে তাকাইলেন, চিনিতেও পারিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে এক বিবশ লজ্জার ভাব স্পষ্টই লক্ষ্য করিলাম; কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলিলেন না, কোনও ইঙ্গিতও করিলেন না। মুহূর্তের পরে তিনি পুনরায় নেত্র নিমীলিত করিলেন। আমার ব্যাকুল হৃদয়

সহস্র সহস্র স্রোতে বিগলিত হইয়া বহিয়া যাইতে চাহিতেছিল। কিন্তু আমি নিজেকে সংবরণ করিলাম। পুনরায় ধীরে ধীরে ভট্টিনীর মাথা টিপিয়া দিতে লাগিলাম। এই প্রকারে অল্পক্ষণ কাটিল। পুনরায় আমি তাঁহার মাথা উঠাইতে চেষ্টা করিলাম। নয়ন-পক্ষ্ম পুনরায় স্পন্দিত হইল। ভট্টিনী আবার চোখ মেলিলেন। তিনি বসিবার চেষ্টা করিলেন, আমি সাহায্য করিলাম।

ভট্টিনী উঠিয়া বসিলেন। তিনি কেবল একবার আমার দিকে দেখিলেন। সে দৃষ্টিতে কোনও জিজ্ঞাসা ছিল না, কোনও ভাব ছিল না, কোনও বিভাব ছিল না, না রাগ, না বিরাগ—কেবল এক শূন্য দৃষ্টি! সম্মুখে কলনাদিনী গঙ্গা বহিয়া যাইতেছিল, তীরে অপূর্ব শোভাসম্পদের মূর্ত বিগ্রহধারিণী ভট্টিনী বসিয়া আছেন—যেন কি ভুল করিয়াছেন, কি ভ্রমে পড়িয়াছেন, কি হারাইয়াছেন। স্বভাবত উদ্ধত প্রমথগণ যখন কেশাকর্ষণপূর্বক দক্ষকে যজ্ঞক্রিয়াতে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন সে এই প্রকার উদ্‌ভ্রান্ত ও বিহ্বল হইয়া গঙ্গার শরণ লইতে আসিয়া থাকিবে, ত্রিনয়নের তৃতীয় নয়ন হইতে স্ফুলিঙ্গ ঝরিতে দেখিয়া পলায়মানা চন্দ্রকলা এই প্রকার আস্তেব্যস্তে গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়া থাকিবে, অসুরনিপীড়িতা স্বর্গলক্ষ্মী এই ভাবেই কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বর্গ-মন্দাকিনীর তীরে পৌঁছিয়া থাকিবে। আহা, উপযুক্ত স্থানে ভস্মাবৃতা রতির আবির্ভাব হইয়াছে, ববাহদন্তের উপর অধিষ্ঠিতা ধরিত্রীর আসন বসিয়াছে, রাহু-ভীতা জ্যোৎস্নার পুঞ্জ কেন্দ্রিত হইয়াছে। অসুরত্রাসিতা সুধার অবতারণ হইয়াছে, পল্লবগ্রাহীদের ভয়ে ভীত সরস্বতীর নিবাস হইয়াছে, কৃপণশংকিতা লক্ষ্মীর আগমন হইয়াছে। এ অবস্থায়ও ভট্টিনীদেবীর খিন্নমনোহর মুখমণ্ডল অত্যন্ত প্রভাবশালী বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিয়ৎ-কাল পর্যন্ত তিনি একদৃষ্টে গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতে থাকিলেন। একথা বলা গঙ্গার পক্ষেও কঠিনই হইবে যে এত পবিত্র, এত নির্মল ও এত গরিমাপূর্ণ দৃষ্টি তিনি কখনও দেখিয়াছেন কি না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার গলা দিয়া কোনও স্বর বাহির হইল না। কিন্তু বালুকারাশি তপ্ত হইয়া যাইতেছিল, সেখানে আর বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা সম্ভব হইত না। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিলাম—'দেবি, আপনার শরীর ক্লান্ত, সূর্যাতপ তীব্র হইতেছে, বালুকারাশি তপ্ত হইয়া যাইতেছে। আপনার আজ্ঞা হইলে কোনও আশ্রয়ের সন্ধান করি।'

ভট্টিনী আর একবার আমার দিকে কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই দৃষ্টিতেও কোনও জিজ্ঞাসা ছিল না, যেন তাঁহার পূর্ব জীবন গঙ্গাতেই ধুইয়া গিয়াছে, যেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার মত কিছু বাকি নাই। হায় হতভাগ্য বাণ, তুমি ভট্টিনীকে কি অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছ! ভট্টিনী মুখে কিছু বলিলেন না। তিনি আর একবার গঙ্গার দিকে তাকাইলেন। দূর হইতে

সোপান-শ্রেণীর মত গঙ্গাতরঙ্গ পর পর সাজানো মত দেখা যাইতেছিল, ভট্টিনীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাহাদের উপর নিশ্চল মৎস্যের মত ভাসিতেছিল। আমি পুনরায় সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম—'দেবি, কি আদেশ হয়?' ভট্টিনী ক্ষীণ শ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন—'চলুন।'

দশম উচ্ছ্বাস

যে বিশাল শাল্মলীবৃক্ষের নীচে ভট্টিনীকে লইয়া গেলাম, তাহার কোটরে এক ছোট মত লাল পতাকা, কিছু সিঁদুরের ছাপ, আর দুই চারিটা শুকনা ফুল পড়িয়াছিল। আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে এখানে কোনও গ্রামদেবতার স্থান হইবে, কারণ সন্নিহিত অসমতল ভূমি অপেক্ষা বৃক্ষের মূলদেশ কিছু অধিক উন্নত অথচ সমতল ছিল। যখন গ্রামদেবতা আছেন, তখন গ্রামও নিশ্চয় কোথাও থাকিবে। কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যাইতেছিল, সরকণ্ড, সত্যানাশী ও কণ্টিকারির বিরল গুল্ম ভিন্ন আর কিছু দেখা যাইতেছিল না। কখনও কখনও গঙ্গার ধারার দিকে উড়িতে উড়িতে দুই একটি টিটিভ নির্জনতার প্রতিবাদ করিতেছিল; না হইলে কোনও পক্ষীই এখানে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। সুদীর্ঘ শরকান্তার মধ্যাহ্নে তপ্ত বায়ুমণ্ডলে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। ভট্টিনী অবশ অবসাদে প্রায় মূর্ছিত মত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর আমি কর্তব্যমূঢ় হইয়া দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দিগ্‌বলয় নির্মাণ করিতে-ছিলাম। মনে হইতেছিল, সমস্ত বিশ্বের চরম অবসন্নতা ওখানেই কেন্দ্রিত হইয়া আছে। অল্পক্ষণ নিঃশব্দতার মধ্যে কাটিল। শেষে ভট্টিনীই মৌন ভঙ্গ করিলেন। আমার বুঝিতে আদৌ বিলম্ব হইল না যে একটা সামান্য কথা বলিতে ভট্টিনীকে কত বড় সংকোচের সাগর পার হইতে হয়। তাঁহার গ্রীবা আনত হইয়া পড়িয়াছিল, দৃষ্টি ভূমিতে সন্নদ্ধ ছিল, শুষ্ক কিশলয়তুল্য অধর নিস্পন্দই হইয়া ছিল, যেন উহা কৌলীন্যের ভারে নুইয়া গিয়াছে, লজ্জার আবেগে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, শোভার আতিশয্যে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে, এবং অনুভাবের তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া নীচে আসিয়া গিয়াছে। ভট্টিনী বলিলেন—'নিউনিয়াও তো এদিকেই কোথাও তীরে ঠেকিয়া থাকিবে, ভট্ট!' আমি অত্যন্ত নম্রতাসহকারে উত্তর করিলাম—'হাঁ দেবী, আমিও নিউনিয়াকে খুঁজিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। কিন্তু যতক্ষণ আপনাকে কোনও সুরক্ষিত স্থানে না পৌঁছাইয়া দিই, ততক্ষণ—।' ভট্টিনী আমার কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন। মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিলেন—'আমার রক্ষার কথা ছাড়িয়া দিন।

আপনি আমাকে বাঁচাইতে পারেন না। কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারে না। আমি যাহার সঙ্গে থাকিব, তাহাকেই ডুবাইব। সর্বনাশকে সঙ্গে করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ঐভাবেই থাকিয়া আমি বাঁচিতে পারি। আমার চিন্তা ছাড়ুন। দেখুন, নিউনিয়া নিশ্চয় নিকটেই কোথাও আছে বোধ হয়।' আমার মুখ হইতে কথা সরিল না। ভট্টিনীর এমন নিরাশ মুখ আমি কখনও দেখি নাই। তাঁহার দুঃখের মধ্যেও ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁহার সঙ্গী থাকিত। কী বিকট পরিবর্তন! আমি কাতরভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। আমার চোখ জলে ভরিয়া গেল। হঠাৎ ভট্টিনীর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় আমার মুখ দেখিয়া বিগলিত হইল। মুহূর্তের জন্য একটু করুণ হাসির রেখা তাঁহার শুষ্ক অধরোষ্ঠে খেলিয়া গেল ও তাহার পর অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হায় মহাকবি, তুমি হাসিখুশিতেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছ! তুমি যদি এইরূপ করুণাপূর্ণ মোহন হাসি দেখিতে, তবে তাহা যে কি বস্তু সে কথা দুনিয়াকে বুঝাইতে পারিতে। পার্বতীর লীলাস্মিত তুমি অমর করিয়া দিয়াছ; কিশলয়-বিনিহিত পুষ্পে যে পবিত্রতা আর নির্মল বিদ্রুম-পাত্রে রক্ষিত মুক্তাফলের যে আভিজাত্য, তাহা তুমি লক্ষ্য[১] করিয়াছিলে; কিন্তু এই স্বর্গমন্দাকিনীর ধারা উঠিতে নামিতে বহিতে থামিতে তুমি দেখ নাই। এ সেই পুষ্প, যাহার বিকাশের অল্প পরেই ধারাসার বর্ষা হইয়া গিয়াছে; ইহা সেই তারকা, যাহা উদিত হওয়ামাত্র কুজ্ঝটিকায় দিগন্ত ধূসর হইয়া গিয়াছে; ইহা সেই ইন্দ্রধনু, যাহা আকাশে ওঠামাত্র ঝঞ্ঝা আসিয়া আকাশ ধূলায় ঢাকিয়া, ফেলিয়াছে। ভট্টিনী মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতেছিলেন। আমি হতবুদ্ধি হইয়া শুষ্ক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলাম!

শাল্মলী বৃক্ষের অন্য দিক হইতে কাহারও পদশব্দ পাওয়া গেল। তখনও ভট্টিনী মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতেছিলেন। আমি একটু সতর্ক হইলাম। মাথা উঠাইয়া দেখিলাম, রক্তাম্বরধারিণী, ত্রিশূলপাণি মহামায়া! মুহূর্তের জন্য আমি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতেই পারিলাম না! কিন্তু উনি প্রকৃতই মহামায়া। সেই পিঙ্গল জটাভার, সেই কাঞ্চন-রক্ত নয়ন, বন্ধুজীব-বলয়ের মত রক্তপুণ্ড্র, অষ্টমীর চন্দ্রতুল্য প্রদীপ্ত ললাটপট্ট আর বহ্নিশিখায় সংশ্লিষ্ট দমনকযষ্টির মত রক্তাম্বর-সমাবৃতা তনুলতা। আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া তিনি আশ্চর্যও হইলেন, লজ্জাও পাইলেন। তিনি না পারিলেন ফিরিয়া যাইতে, না পারিলেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে। শৈলাধিরাজতনয়ার মত তাঁহারও

---

[১] পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্মুক্তাফলং চেৎ স্ফুটবিদ্রুমস্থং।
তততোহনুকুর্যাদ্ বিশদস্য তস্য তাম্রৌষ্ঠপর্যস্তরুচঃ স্মিতস্য॥
—কুমারসম্ভব, ১।৪৪

'ন-যযৌ-ন-তস্থৌ' অবস্থা হইল। আমি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবার পর ভট্টিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—'দেবি, উঠুন, পার্বতী-তুল্য প্রভাবশালিনী সাক্ষাৎ মহামায়াস্বরূপিণী মাতা মহামায়া আমাদের সৌভাগ্য-বশে এখানে আগতা। আজ পরম মঙ্গলদিবস, গ্রহগণ আজ সুপ্রসন্ন, সবিতা আজ প্রসন্নোদয়, কর্মফল আজ উপারূঢ়। দেবি, উঠুন, ইঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হউন।' ভট্টিনীর সামলাইতে অল্পক্ষণ বিলম্ব হইল। তাঁহার কমল-তুল্য নয়ন শুকাইয়া লাল হইয়া গিয়াছিল, মুখমণ্ডল নিদাঘম্লান কেতকপুষ্পের ন্যায় অবসন্ন হইয়াছিল। আমার অনুরোধে তিনি উঠিয়া মহামায়াকে প্রণাম করিয়া মাথা নত করিয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। মহামায়া এমন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, যেন তিনি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। তিনি একবার ভট্টিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, একবার আমার প্রতি। লজ্জা, জিজ্ঞাসা, স্নেহ এই তিনটি ভাবই তাঁহার মুখে আসিয়া আসিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছিল। আমি প্রথমে তাঁহার কৌতূহল শান্ত করাই উচিত মনে করিলাম। বলিলাম—'ভগবতি, এই সেই ভট্টিনী, যাঁহার সম্বন্ধে আমি তত্রভবান্ অঘোর-ভৈরবকে নিবেদন করিয়াছিলাম। আমি ইঁহারই অকিঞ্চন সেবক।' এই পর্যন্ত বলিয়া আমি সংক্ষেপে গত কল্যের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া গেলাম। মহামায়া মন দিয়া আমার কথা শুনিলেন। তাঁহার মুখ হইতে সংকোচের ভাব সরিয়া যাইতেছিল। মন্দ মন্দ হাসির সহিত তিনি ভট্টিনীর শিরোদেশ হস্ত-দ্বারা বুলাইলেন। পুনরায় আমার দিকে তাকাইয়া একটু যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন—'সাধু, বৎস, তোমার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত, তুমি অবধূত-গুরুর প্রসাদ পাইয়াছ। তোমার স্বামিনীর বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার বিপদ তো এখনও দূর হয় নাই, বৎস!' পুনরায় একটু ভাবিয়া বলিলেন—'আজ মহানবমী, ত্রিপুরসুন্দরীর যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহার নড়চড় হইতে পারে না।' তাঁহার মুখমুদ্রা ঈষৎ কঠোরভাব ধারণ করিল, যেন তিনি নিজে নিজের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছেন। আমার মনে ভয়ের ভাব আসিল আর চলিয়া গেল; কিন্তু মহামায়া গম্ভীর হইয়াই রহিলেন। ভট্টিনীও খানিকটা ভীত হইলেন; কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের মনোভাব চাপিয়া রাখিলেন। ভট্টিনীর এই অবস্থা দেখিবার মত ছিল—ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ মুখমণ্ডলে বিস্রস্ত হইয়া গিয়াছে, বৃহৎ স্ফীত চক্ষু আনত হইয়াছে, প্রবালতাম্র অধরযুগল দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, আপাণ্ডুর কপোলমণ্ডলে রোমরাজি উদ্‌ভিন্ন হইয়া আসিয়াছে, আতাম্রচিবুক থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, বামবাহু শ্যামালতার মত ঝুলিতেছে এবং দক্ষিণবাহু কপোতকর্বুর অঞ্চলে সমাবৃত। তিনি পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া ভূমিতে দাগ কাটিতেছিলেন এবং মূর্তিমতী চিন্তার মত দাঁড়াইয়াছিলেন।

মহামায়ার চিন্তা ব্যাহত হইল। তিনি পুনরায় ভট্টিনীর দিকে তাকাইলেন। একবার নিজে চারদিকে মনোযোগপূর্বক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর হাই তুলিতে তুলিতে তুড়ি দিয়া বলিলেন—'ত্রিপুরভৈরবী! ত্রিপুরভৈরবী!' তখন তিনি অতিশয় স্নেহসহকারে ভট্টিনীকে নিজের দিকে টানিয়া লইলেন, চিবুক ধরিয়া তাঁহার মুখ উন্নমিত করিলেন, বলিলেন—'তবে এই সেই স্বামিনী! স্বামিনী হইবার যোগ্য বটে। আহা, কি অমৃতস্রাবী মুখ! চল কন্যা, আমরা অন্যত্র যাই।' পুনরায় আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—'যাও বাবা, তুমি নিউনিয়ার খোঁজ লইয়া এস, তোমার স্বামিনী এখানেই থাকিবেন। চিন্তা করিও না, তুমি অবধূতগুরুর প্রসাদ পাইয়াছ, তোমার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত।' আমি প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমি অনেক পথ চলিয়া আসিলাম। কিন্তু নিপুণিকার কোনও চিহ্ন পাইলাম না। এক একবার মনে হইতেছিল, এই প্রকারে নিপুণিকাকে খোঁজা নিতান্তই মূর্খতা। যে লোক জলে ডুবিয়াছে তাহাকে কখনও এ প্রকারে পাওয়া যায় কি? কিন্তু মনে বিশ্বাস ছিল যে নিপুণিকা অবশ্যই জীবিত আছে এবং তাহাকে পাওয়াও যাইবে। কিছু দূর চলিয়া আসিবার পর আমার মনে ভট্টিনীর জন্য চিন্তা হইতে লাগিল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার কিছু আহার হয় নাই। আমার নিজেরও হয় নাই, কিন্তু আমি তো এরূপ অনশনে থাকিতে খুবই অভ্যস্ত। আমার নিরাশ্রয় জীবনে আমি তো এই সাধনাই করিয়াছি—'করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ' তো আমার সিদ্ধই আছে। কিন্তু ভট্টিনীর কথা মনে হইতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যদি কোনও প্রকারে তাঁহার নিকট আহার্য পোঁছাইতেই পারি, তবে মহাবরাহ কোথায়? এ সময়ে অবশ্যই তাঁহার পরম উপাস্যের কথা ভাবিতেছেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে আমি স্বহস্তে তাঁহার পরম আরাধ্যকে ডুবাইয়া দিয়াছি তখন তিনি আমাকে অবশ্যই ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিবেন। হায় অভাগা বাণ, ভট্টিনীর বিশ্বাসই ছিল তোমার সবচেয়ে বড় সম্পত্তি; কিন্তু তুমি তাহাও নষ্ট করিতে চাহিতেছ! আর অগ্রসর হওয়া নিরর্থক। দূর হইতে নীল জলস্রোত সূর্যালোকে প্রতিফলিত হইতেছে। দীর্ঘ শরকান্তার ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মানবের সংস্রবে আসে নাই, মানবের স্পর্শই লাগে নাই এই সব বালুকাপুঞ্জে, আলোয় সেগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। ভট্টিনীকে ছাড়িয়া এত দূর আসা আমার ঠিক নয়। ফিরিতে হইল। আমি যখন সেখানে গিয়া পোঁছিলাম, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

ভট্টিনী ও মহামায়া শাল্মলীবৃক্ষের পূর্ব দিকে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তাঁহারা আমাকে দেখেন নাই। এতক্ষণে ভট্টিনী মহামায়ার

পরিপূর্ণ স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এমনভাবে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন, যেন অনেক দিনের হারানো কন্যা মায়ের কোলে আসিয়া গিয়াছেন। মহামায়া প্রশ্ন করিতেছিলেন, আর ভট্টিনী ধীরে ধীরে উত্তর দিতেছিলেন। কথাবার্তার প্রসঙ্গ এমন কিছু ছিল যে আমি নিঃশব্দে লুকাইয়া শুনিতে লাগিলাম। ইহা অনুচিত হইয়াছিল, তবে অস্বাভাবিক ছিল না। ভট্টিনী ও মহামায়ার মধ্যে এই প্রকারের কথা চলিতেছিল :

'তাহা হইলে ভট্টকে তোমার কেমন মনে হয়, কন্যা?'

'ভগবতি, কেমন মনে হয় তাহা আমি জানি না। নিউনিয়া বলে যে ভট্ট দেবতা; কিন্তু আমি দেবতা কি করিয়া বলি?'

'তাহা হইলে তোমার মনে যে কথা প্রথমে আসে তাহাই বল না কেন; ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলে কথা সব সময় সত্য হয় না।'

'কি বলিব আর্যে, যে দিন ভট্ট আমার সহিত প্রথম কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিন আমার নবজন্ম হইল। সেদিন সূর্য উদয়গিরির তটে মাঙ্গল্য বর্ষণ করিয়া উদিত হইয়াছিল; সেদিনকার ঊষা আমার সম্পূর্ণ জীবনকে পরম সৌভাগ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। আমি সেদিন প্রথম আমার সার্থকতা অনুভব করিলাম।'

'সার্থকতা! সে কি প্রকার, কন্যা?'

'মাতঃ, ভট্ট চকিত মৃগশিশুর মত আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন তিনি কোনও নবীন আলোক, কোনও অভিনব জ্যোতি দেখিয়াছেন। তাঁহার দীপ্ত ললাটপট্টে ভক্তির শুভ্র কিরণ বিরাজমান ছিল। তাঁহার বিমল-বিশাল নয়নে উজ্জ্বল আলোক এভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে মনে হইতেছিল বুঝি জ্বলন্ত শুক্রগ্রহ চমকিতেছিল। তাঁহার কোমল মধুর বাণীর মধ্যে এক অদ্ভুত মিষ্টতা ছিল। ভট্ট সুস্পষ্ট, নিঃসংকোচ ও অর্থপূর্ণ বাণীতে যে দুই চার কথা বলিলেন তাহা সামগানের মত পবিত্র, কিন্তু অধিক মাহাত্ম্যশালী ছিল। রাজভবনে আমার সৌন্দর্যের চাটু উক্তি আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সত্য কথা আমি এই প্রথম শুনিলাম। আমি প্রথমবার অনুভব করিলাম যে আমার ভিতর এক দেবতা আছেন, যিনি ভক্তের অভাবে ম্লান হইয়া লুকাইয়া বসিয়াছিলেন। আমি এই প্রথমবার অনুভব করিলাম যে ভগবান নারী করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন; আমি নিজের সার্থকতা চিনিতে পারিলাম।'

'এ কথা নূতন নয়, কন্যা......।'

'হাঁ মাতা নিশ্চয় নূতন কথা। এই নীল আকাশ, এই চঞ্চল বায়ু, এই নির্মল জাহ্নবীর ধারা সাক্ষী, নারীর জন্য এমন অর্থপূর্ণ গাথার পরিচয় এই ভুবনমণ্ডলে প্রথমবার হইয়াছে।'

'তবে কন্যা, তুমি সার্থকতা বলিতে কি বোঝ?'

'আমি অজ্ঞ, মাতা! কোন শব্দ কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, সেকথা আমার জানা নাই। কিন্তু ভট্টের কথা শুনিবার পর আমি প্রথম অনুভব করিলাম, আমার এই শরীর কেবল ভার নয়, কেবল মাটির ঢেলা নয়, ইহা তার চেয়ে বড়। বিধাতা যখন এ দেহ নির্মাণ করেন, তখন আমাকে দণ্ড দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি আমাকে নারী করিয়া আমার উপকার সাধন করিয়াছেন। মা, ভট্ট এই পৃথিবীর পারিজাত, এই ভবসাগরের পুণ্ডরীক, এই কণ্টকময় ভুবনের মনোহর কুসুম।'

মহামায়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মুহূর্তের জন্য পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। তাহার পর সহসা মহামায়া পরাজিতের মত বলিলেন—'কে জানে কি ব্যাপার। কন্যা, গুরু আমাকে বুঝাইয়াছেন যে নারীর সফলতা পুরুষকে বন্ধন করায়, তাহার সার্থকতা পুরুষকে মুক্ত করায়। সারা জীবন আমি এই বিশ্বাস লইয়া চলিতেছি। জপ তপ, সাধন ভজন, সকলের একই লক্ষ্য—সার্থকতা! এখন পর্যন্ত ত্রিপুরভৈরবীর সাক্ষাৎকার হইল না, পরে কি হইবে তাহা গুরু জানেন। কিন্তু তোমার সত্যদর্শন হইয়াছে। তোমার কথা সত্যও হইতে পারে।' কিছুক্ষণ ধরিয়া বিস্মৃত কথা যেন মনে করিতেছেন এইভাবে মহামায়া বলিলেন—'নারীর সার্থকতা!' আর চুপ করিয়া থাকিলেন।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানে লুকাইয়া থাকা সংগত মনে করিলাম না। যে পর্যন্ত শুনিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট। আর অধিক শুনিলে অভিমান বাড়িবে, মোহের উদ্রেক হইবে, মমতা কঠিন হইবে। এখানেই থামা ভাল। বাণভট্ট যে পুরস্কার পাইয়াছে উহা তাহার প্রাপ্যের অনেক লক্ষ গুণ। উহার অপেক্ষা বেশি চাহিলে লোভের পরাকাষ্ঠা হইবে। আমি কাশিবার আওয়াজ করিয়া ধীরে ধীরে মহামায়া ও ভট্টিনী যেখানে বসিয়াছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। শব্দ পাইয়া তাঁহারা সংযত হইলেন। ভট্টিনী শুধু একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাইলেন। তাঁহার কথা আমি কোনওরূপে শুনিতে পাইয়াছি কিনা তাহা তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু বাণ এত কাঁচা লোক নহে। সত্যমিথ্যার অভিনয় করিতে করিতেই তাহার জীবন কাটিল। হে স্বর্গের দেবাঙ্গনা, মর্তের এই অভিনেতাকে বুঝিতে ভুল করিয়াছ, কিন্তু এ ভুল দোষের নহে।

মহামায়া আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার ঝুলি হইতে কিছু ফলমূল বাহির করিয়া তিনি আমাকে দিলেন এবং বুঝাইলেন যে আমি না খাওয়ায় ভট্টিনী এখনও উপবাসী আছেন। ভোজনের পর আমাকে পুনরায়

অন্য দিকে প্রস্থান করিতে হইল। নিপুণিকাকে খোঁজা গৌণ, ভট্টিনীকে অবসর দেওয়া ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। এবার পূর্বাভিমুখে চলিলাম। বেলা তো পূর্বেই শেষ হইয়া আসিয়াছিল। প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিয়া গেলে নৃত্যগীতপরায়ণ এক দলের সঙ্গে দেখা হইল। মাদল, মুরজ, মুরলী বাজাইতেছে এমন দুই তিনজন কিশোরবয়স্ক যুবক ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষ তাহাদের মধ্যে ছিলই না। নারীগণের পরিধানে ছিল তরঙ্গায়িত উপান্তযুক্ত লালবর্ণের শাড়ী, আর তাহাদের নীল কঞ্চুকের উপর হরিদ্রাবর্ণের উত্তরীয়। তাহারা উন্মত্তের মত নৃত্য করিতেছিল। তাহাদের ঘূর্ণনবেগে তরঙ্গায়িত শাটিকাপ্রান্ত এমনভাবে ঘুরিয়া উঠিতেছিল যে, মনে হইতেছিল, বুঝি অনুরাগ-সাগরে বাত্যাচক্র চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের পদসঞ্চার তালানুগ হয় নাই। কিন্তু উহা এতই উদ্দাম ছিল যে তাহাদের হরিদ্রাবর্ণের উত্তরীয় ও নীলবর্ণের কঞ্চুকের এক ঘূর্ণমান চক্রবাল প্রস্তুত হইয়া যাইতেছিল। দীর্ঘ বেণী আস্ফালনের বেগে পৃথিবী ও আকাশকে কালো মসৃণ রেখাদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। বার বার উপর নীচে আসিতে আসিতে লাল করতল আকাশরূপ নীল সরোবরে অধোমুখ স্বর্ণকমলের শোভা ভরিয়া দিতেছিল, আর ক্ষীণ কটিপ্রান্ত ঝঞ্ঝায় বার বার ধাক্কা খাইতে খাইতে শতাবরীলতার মত দর্শককে চিন্তিত করিয়া তুলিতেছিল—না জানি কোন দিকের ধাক্কা তাহাকেও ফেলিয়া দেয়! আমি মুগ্ধ হইয়া এই উদ্দাম-মনোহর নৃত্য দেখিতেছিলাম। একবার যখন নৃত্যবেগ কিছুকালের জন্য থামিয়া গেল, তখন আমি যে যুবকটি মাদল বাজাইতেছিল তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যাহা বলিল তাহার সারাংশ এই যে গঙ্গা ও মহাসরযূর সংগমস্থলে যে বজ্রতীর্থ আছে, দেবীর পূজা করিবার জন্য সেস্থানে গিয়াছিল। আজ মহানবমী তিথি। আজ বজ্রতীর্থে দেবীপূজার বড় মাহাত্ম্য। তাহাদের গ্রাম মহাসরযূর ওপারে। আমি তাহাদের কি অভিপ্রায় তাহাও জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাদের সরদার লোরিকদেব প্রতাপশালী মল্ল। ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের উপর তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা, আর আমার মত বিদ্বান্‌কে তো ইহারা মাথায় করিয়া রাখিবে। সে যুবক তো তখনই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ দেখাইল, কিন্তু আমি দেবীদর্শনের অজুহাতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইলাম। যুবক আরও আগ্রহ করিতে করিতে বলিল যে বজ্রতীর্থের দেবীকে দর্শন করা রাত্রিতে নিষিদ্ধ, তখন সেখানে সাধকেরা আসেন, গৃহস্থের সেদিকে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আমি মনে মনে যুবকের সরলতা প্রশংসা করিতে করিতেও তাহার কথা শুনিলাম না। সত্যই তো সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। ভট্টিনীর নিকট ফিরিয়া যাওয়াও প্রয়োজন ছিল, কিন্তু না জানি কোন্ এক অদ্ভুত শক্তি আমাকে বজ্রতীর্থের

দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। যদি বলি যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যাইতেছিলাম, তাহা হইলে লোকে বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু সেই কথাটিই সত্য। আমার এক পাশ হইতে ঝড়ের মত দৌড়িতে দৌড়িতে এক রহস্যময়ী স্ত্রী বাহির হইয়া গেল। তাহার গলদেশে কপালমালা ঝুলিতেছিল, কটিতে হাড়ের কিঙ্কিণী খড় খড় শব্দ করিতেছিল, হাতের নরকপালের খঞ্জরী খন খন করিতেছিল। তাহার জটা ছিল বটবৃক্ষের প্ররোহের সমান কর্কশ, কটিবিন্যস্ত খট্বাঙ্গ-ঘণ্টার সঙ্গে লাগিয়া লাগিয়া তাহা কঠোর ধ্বনির সৃষ্টি করিতেছিল, আর কপোলে লম্বমান কড়ির মালাতে বার বার ছিটকাইয়া পড়িতেছিল। আমার পাশ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে এমনভাবেই দৌড়াইয়া গেল, মনে হইল যেন উড়িতেছে। আমি রজ্জুবদ্ধ বানরের মত আকৃষ্ট হইয়াই চলিলাম।

বজ্রতীর্থ ছিল এক বিশাল শ্মশান। নিমের তেলে ভাজা রশুনের মত চারদিকে জ্বলন্ত মৃতদেহের দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সমস্ত শ্মশানের পথ শকুন ও শৃগালের পদচিহ্নে পরিপূর্ণ ছিল। হাড় ও মাংসের ছিন্ন ছিন্ন অংশের উপর সন্ধ্যার ধূসর আলো বড়ই ভীষণ দেখাইতেছিল। জ্বলন্ত চিতার পাশে অল্প অল্প আলো ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার সম্মুখের অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া উলূকের ঘূৎকার ও শৃগালের চীৎকারে শ্মশানের বাতাবরণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এই বিকট দৃশ্যের মধ্যে ছিল করালাদেবীর মন্দির। মন্দির তো শুধু নামে। এক চত্বর, এক হবনকুণ্ড, এক যূপকাষ্ঠ—ইহার অতিরিক্ত সেখানে আর কিছু ছিল না। করালাদেবীর মূর্তি সত্যই করালী ছিল। তাহার লোল জিহ্বা যুগপৎ বিশ্বকে গ্রাস ও ঘ্রাণ করিতেছিল। তাহার গলদেশ হইতে গুল্‌ফ পর্যন্ত মুণ্ডমালা ঝুলিতেছিল। করালাদেবীর মূর্তির সম্মুখে সেই রহস্যময়ী স্ত্রী জানু পাতিয়া বসিয়াছিল, আর তাহার চেয়েও অশিব বেশধারী এক পুরুষ টাটকা চর্বি দিয়া হবন করিতেছিল। আহুতি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নির পিঙ্গল লোল জিহ্বা বিকরালভাবে লেলিহান হইতেছিল, এবং মুহূর্তের জন্য বায়ুমণ্ডল দুর্গন্ধে ও নভোমণ্ডল পিঙ্গল আলোকে পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। কুণ্ডের চারদিকে নরকপালের আধারে ভিন্ন ভিন্ন হোমের সামগ্রী রক্ষিত ছিল। আমার মস্তিষ্ক ঘৃণা ও জুগুপ্সায় ভরিয়া গেল; কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাকে কেহ যেন টানিয়া লইয়া চলিল। শেষকালে আমি যূপকাষ্ঠ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলাম। সাধকপুরুষ বিকট ফূৎকারের সঙ্গে সংকল্প পাঠ করিলেন, আর আমি চিত্রার্পিতবৎ যেমন তেমনভাবে দাঁড়াইয়া কৌতূহলের সঙ্গে

সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। সংকল্পবাক্য হইতে বুঝিতে পারিলাম যে সাধকের নাম অঘোরঘণ্ট আর সাধিকার নাম চণ্ডমণ্ডনা। সাধিকা কিছু কিছু মুদ্রা প্রদর্শন করিতে করিতে এক লাল কর্ণিকারের মালা আমার গলদেশে ফেলিয়া দিলেন। তখন তিনি সুর করিয়া ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিলেন :

চণ্ডোদ্দণ্ডনিশুম্ভমানমথনাত্যুষ্ণোষ্ণরক্তপ্রিয়া
উত্তালোদ্ধততাণ্ডবাহতনভোবিধ্বস্ততারাগণা।
পিণ্ডে ষোড়শনাড়িকার্চিতপদা ষট্চক্রবক্রাসনা
মুণ্ডস্রক্‌পরিবেষ্টিতাম্বরপটা সিদ্ধ্যৈ করালাস্তু বঃ॥

দুর্গন্ধে আমার মস্তক ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, নাসারন্ধ্র ফুলিয়া গেল, কটুধূমে চোখ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু এই বিচিত্র সাধনা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিল। ধীরে ধীরে আমার চেতনা লোপ পাইতে বসিল, কিন্তু আশ্চর্য, আমি পড়িয়া গেলাম না। জ্ঞানশূন্যের মত সব কিছু দেখিতে থাকিলাম। আকাশ হইতে বিকটাকার শ্মশানের পূতনা ও ভৈরবীরা নামিয়া আমাকে বিচিত্রভাবে প্রণিপাত ও আরতি করিতে লাগিল। ফেরুপালের চণ্ডরবের মত বিচিত্র জয়-জয়কারে দিঙ্‌মণ্ডল স্তম্ভিত হইতে থাকিল এবং বিকরালবদন পিশাচদের অস্থিকরতালে অন্ধকার দূর হইতে লাগিল। আমি সংজ্ঞাহীন, নিশ্চেষ্ট। চণ্ডমণ্ডনা পুনরায় স্তব করিতে লাগিল :

যদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটোল্লাসি প্রচণ্ডং মহঃ
যত্তদ্‌গর্ভবিভাণ্ডমণ্ডনমহজ্জ্যোতিঃ পরং জ্যোতিষাম্।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা যদ্‌যোগিভির্ধ্যায়তে
তত্তে ধাম নিরস্তবিশ্বকুহকং ভর্গঃ পরং ধীমহি॥

নানা অঙ্গন্যাসের সঙ্গে খট্টাঙ্গের পূজা হইল। অঘোরঘণ্ট আদেশ করিলেন—'যে তোমার সব চেয়ে প্রিয়, তাহার ধ্যান কর।' মুহূর্তের মধ্যে ভট্টিনীর কান্তকোমল মুখচ্ছবি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ভট্টিনীকে নির্জন শরকান্তারে ফেলিয়া বলি হইতে যাইতেছি! আমার নাসারন্ধ্র ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। সকাতরে অঘোরভৈরবকে স্মরণ করিলাম। আমার চক্ষু নিজে নিজে বন্ধ হইয়া আসিল। শ্মশানের পূতনারা আরতি করিতে থাকিলে, ফেরুদের চণ্ডরব জয়-জয়কার করিতে থাকিল, উলূকদের ঘূৎকার দিঙ্‌মণ্ডলকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। অঘোর-ঘণ্ট ও চণ্ডমণ্ডনা বিকট ফূৎকারে বায়ুমণ্ডলকে প্রকম্পিত করিতে লাগিল। উগ্র ভৈরবীরা তুমুল চীৎকার করিল, কটপূতনারা সাবধানে আমাকে ঘিরিয়া

দাঁড়াইল। চণ্ডমণ্ডনা বিচিত্র আবেশের ভঙ্গীতে উদ্দামভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল এবং অঘোরঘণ্ট ঘনঘন আহুতি ও ক্রমবর্ধমান ফুৎকারে হবনকুণ্ডটি লোলকম্পিত করিয়া তুলিল। আমি নেত্রযুগল উন্মীলিত করিলাম। সম্মুখে মহামায়া, ভাট্টিনী ও নিপুণিকা আর পিছনে পিছনে উলঙ্গ তরবারি হস্তে বিগ্রহবর্মা ও দশজন মৌখরি বীর প্রস্তরীভূত দণ্ডায়মান! ভাট্টিনী কাতর-ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। আমি অবশ্য ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। আমার শিরাগুলি আর বেশী সহ্য করিতে পারিতেছিল না। আমার মনে হইল বুঝি কর্ণমূল হইতে রক্তধারা ফুটিয়া পড়িতেছে। রক্ত দেখিয়া অঘোরঘণ্ট বিচলিত হইল। সে চণ্ডমণ্ডনাকে শীঘ্র ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিল। ওদিকে ভাট্টিনী মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভাট্টিনীকে মূর্ছিত দেখিয়া আমার উদ্বিগ্ন মস্তিষ্ক আরও বিচলিত হইল, নিপুণিকা উন্মত্তের মত বেদীর দিকে অগ্রসর হইল। তার পায়ে যেন কেহ ঝড় বাঁধিয়া দিয়াছে। মহামায়া প্রস্তরপ্রতিমার মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাট্টিনীর প্রতি তিনি তাকাইয়াও দেখিলেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে এক অদ্ভুত জ্বালাময়ী জ্যোতি বাহির হইতেছিল। তিনি স্থিরভাবে নিপুণিকাকে দেখিতেছিলেন। নিপুণিকা ঝড়ের মত আসিল। সে এক ধাক্কা দিয়া চণ্ডমণ্ডনাকে ফেলিয়া দিল এবং তাহার হাতের খট্বাংগ জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল। খট্বাংগ লইয়া নিপুণিকা বিকট নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার উদ্ধত পদসঞ্চালনে হবনকুণ্ড বিধ্বস্ত হইয়া গেল, লালপতাকা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইল, যূপকাষ্ঠ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ওঃ, কত উত্তাল সে নর্তন! তাহার এক এক পদসঞ্চারে ধরিত্রী যেন ধ্বসিয়া যাইতেছিল।' তারামণ্ডল পরস্পরে যেন গায়ে লাগিয়া যাইতেছিল, আর করালার মুণ্ডমালা খটখট শব্দ করিতেছিল। আমি মহামায়াকে দেখিতে থাকিলাম। তিনি স্থিরভাবে নিপুণিকার দিকে তাকাইয়াছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল। মনে হইল, যেন সহস্র সহস্র সূর্য এধারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল, যেন কোন বিচিত্র ধূমকেতু আমার দিকে লাফাইয়া পড়িয়াছে। আমি বিচলিত হইলাম। নিপুণিকা অজ্ঞান হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। এখন আমার পালা। আমি অঘোরঘণ্টকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যে কি প্রকার নৃত্য করিলাম, সে কথা তো মনে নাই; এইটুকু মনে আছে যে শ্মশানের কোনও অংশই আমার উত্তাল নৃত্যের পদসঞ্চার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সর্বশেষে আমি অঘোরঘণ্টকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিলাম। মহামায়া ভীমবেগে আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন আর আমাকে টানিতে টানিতে ও হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে পূর্বদিকে পলাইলেন—আরও জোরে, আরও, আরও!

গঙ্গা ও মহাসরযূর সঙ্গমস্থলে অবধূত অঘোরভৈরব এক শবের উপর আসন করিয়া ধ্যানে ডুবিয়া আছেন। আমি অত্যন্ত হাঁপাইতেছিলাম। আমাকে পিছনে এক ধাক্কা দিয়া মহামায়া চীৎকার করিলেন—'ত্রাহি, গুরো, ত্রাহি।' অঘোরভৈরব চোখ মেলিয়া কিছু আশ্চর্যের সহিত বলিলেন—'মহামায়া, মহামায়া, মহামায়া!' মহামায়া নিশ্চেষ্ট, অজ্ঞান। গুরু আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলাম—শুধু দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিলাম—'ত্রাহি!' অঘোরভৈরব আমাকে টানিয়া শবের উপর লইয়া গেলেন, আর কপালের উপর হাত বুলাইয়া দিলেন। বলিলেন—'তুই তবে এখনও বাঁচিয়া আছিস্। ত্রিপুরভৈরবীর মায়া!' পুনরায় তাঁহার ইঙ্গিতে আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা শোনাইলাম। তিনি স্থির হইয়া সব শুনিলেন। শুধু একবার মহামায়ার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। একটু ধমক দিয়া বলিলেন—'পাগলী! ভয় পাইতেছিস!' হাতে একটু জল লইয়া তিনি মহামায়ার মুখের উপর ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার একটু চৈতন্য হইল। একটু থামিয়া মহামায়াকে ধীরে ধীরে না জানি কি বলিলেন। মহামায়া সেখান হইতে করালা দেবীর স্থানের অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অবধূত কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কড়ির মত চক্ষু দুইটি একেবারেই নিশ্চেষ্ট। অল্পক্ষণ পরে আমার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'তুই কবি না?' অদ্ভুত প্রশ্ন। এই সময়ে কবিত্বের প্রয়োজন কি? আমি সকৌতূহলে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি ধমক দিলেন—'হাঁ বলিতেছিস না কেন রে হতভাগা?' মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিলাম- 'হাঁ আর্য!' বাবা এ ব্যাপারে কৌতুক বোধ করিতে করিতে বলিলেন—'পাষণ্ড! প্রথমে বলিস নাই কেন?' আমি সংকোচ করিয়া কহিলাম -'আমি জানি না, আর্য; ভট্টিনী আমাকে কবি বলিয়াছিলেন, আর আপনিও বলিতে চাহেন!' বাবা আরও ফুর্তির সঙ্গে বলিলেন—'তুই তোর ভট্টিনীর স্তুতিগান করিতে পারিস?' আমি অবিলম্বে উত্তর করিলাম—'না, আর্য!' 'কেন রে?' আমি বুঝাইয়া দিলাম যে নিপুণিকাকে কথা দিয়া ফেলিয়াছি। বাবা বলিলেন—'সাধু! তবে দেবীর স্তবগান করিতে পারিস? করালাদেবীর স্তব?' আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম—'হাঁ, আর্য!' অবধূত বলিলেন- 'অভাগা, তুই দেবীর নিকট বলি হইতে যাইতেছিলি, দেবাঙ্গনারা তোর আরতি করিয়াছিল, শিবাপাল মঙ্গলবাদ্য বাজাইয়াছিল; কিন্তু তোর ভাগ্য ছিল অপ্রসন্ন। তুই দেবীর পিপাসা শান্ত করিস নাই, এখন তাঁহার অসন্তোষ তো দূর কর। আচ্ছা, দেখ, দেবীর ব্যায়াম-মনোহর রূপের বর্ণনা কর তো।'

আর উপায় ছিল না। আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম—

বাহূৎক্ষেপসমুল্লসৎকুচতটং প্রান্তস্ফুটৎকঞ্চুকম্
গম্ভীরোদরনাভিমণ্ডলগলৎকাঞ্চীধৃতার্ধাংশুকম্।
পার্বত্যা মহিষাসুরব্যতিকরে ব্যায়ামরম্যং বপুঃ
পর্যস্তাবধিবন্ধবন্ধুরলসৎকেশোচ্চয়ং পাতু বঃ॥[২]

অবধূত ধমক দিয়া বলিলেন—'পশু তুই, হতভাগা! ইহাকে কি ব্যায়ামরম্য বপু বলে রে? আর একটা শোনা।' আমি অন্য একটা শ্লোক শোনাইলাম—

চক্ষুর্দিক্ষুক্ষিপত্যাশ্চলিতকমলিনীচারুকোষাভিতাম্রং
ভদ্রং ধ্যানানুয়াতং ঝটিতি বলয়িনো মুক্তবাণস্য পাণেঃ।
চণ্ড্যাঃ সব্যাপসব্যং সুররিপুষু শরান্ প্রেরয়ন্ত্যা জয়ন্তি
ত্রুট্যন্তঃ পীনভাগে স্তনবলনভরাৎ সন্ধয়ঃ কঞ্চুকস্য॥[৩]

অবধূত হাসিলেন। বলিলেন—'তোকে দিয়া হইবে না। ওঠ, পালা এখান থেকে।'

একাদশ উচ্ছ্বাস

আমার সমস্ত শরীর এক প্রকার অবশ জড়িমায় ভারবোধ হইতেছিল। তিন দিন তিন রাত্রি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, যখন সংজ্ঞালাভ করিলাম তখনও স্বপ্নাবেশের মায়া আমার সমস্ত অস্তিত্বকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। আমি যেন এক তরল মরুকান্তারে বৃন্তচ্যুত কাপাসের মত নামিয়া যাইতেছিলাম। আমার এমনই মনে হইতেছিল যে এই তরল কান্তারের বুঝি কোনও পারাপার নাই—দিগন্তের এক কোণ হইতে অন্য কোণ পর্যন্ত সে এক বিশাল অজগরের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। উদ্ভিদও উহাকে ছুঁইতে শংকা বোধ করিতেছে, বায়ুতরঙ্গও উহাকে বিক্ষুব্ধ করিতেছে না। মধ্যে মধ্যে সুদূর আকাশের কোণে চন্দ্রমণ্ডলের ক্ষীণ আভা দেখা দিতেছে, সেখান হইতে প্রফুল্ল শতদলের উপর বজ্রাসনে আসীন কর্পূরগৌরী আনন্দভৈরবী ধীরে ধীরে নামিতেছেন। তাঁহার অষ্টাদশভুজে বিবিধ অস্ত্র চন্দ্রমার পিঙ্গল প্রভায় ঝলমল করিতেছে, আর তাঁহার কোলের রজত-কলস গৈরিক বস্ত্রের আভায় সিন্দুর-মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছে। তাঁহার ত্রিনয়ন হইতে অমৃতস্রোত ঝরিতেছে

---

[২] চণ্ডীশতক, ৭৮
[৩] ঐ, ৭১

আর তাঁহার বিদ্রুমাংকুরবৎ রক্তিম অঙ্গুলি আমার কেশরাশিতে সঞ্চালিত হইতেছে। কিশলয়কেও লজ্জাদায়ী তাঁহার হস্ততল যখন আমার ললাটদেশ বুলাইয়া দিতেছিল, তখন আমার শত শত জন্ম কৃতার্থ হইয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে ধরণীর আকর্ষণ আমাকে নীচের দিকে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু উহার শক্তি ছিল না। যখন এই আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবলভাবে অনুভব করিলাম, তখন ঐ দিগন্তপ্রসারী তরল কান্তার চিরকালের জন্য লোপ পাইল, স্বপ্নের আবেশ টুটিল, জড়িমা চলিয়া যাইতে থাকিল আর চোখ খুলিয়া গেল। ভট্টিনী সম্মুখেই বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বড় বড় চোখ বসিয়া গিয়াছিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়াছিল, কপোলতল হইয়া গিয়াছিল বিবর্ণ। কয়দিন ধরিয়া নিশ্চয় তাঁহার নিদ্রা হইতেছিল না। তাঁহার জাগরখিন্ন রক্তবর্ণ চক্ষু ধূলিলুণ্ঠিত পলাশপুষ্পের মতো, আতপ-ম্লান বন্ধুজীব কুসুমের মতো, পিঞ্জরবন্ধ খঞ্জন শাবকের মতো দর্শককে ব্যথিত, খিন্ন, উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার চিকুরজাল ছিল বিপর্যস্ত, যেন সংকীর্ণ তরুসমূহের অন্তরাল হইতে কষ্টে নিষ্ক্রান্ত ময়ূরের বিক্ষুব্ধ বর্হভার, পুষ্করিণীর আলোড়িত শৈবালজাল, অথবা উদ্বেজিত মালতীলতার বিক্ষুব্ধ ভ্রমরপংক্তি। গঙ্গাধারার মত পবিত্র ও কৈলাসের নীলবনরাজিগামী পথের মতো মনোহর তাঁহার সীমন্তরেখা বিপর্যস্ত অলক-রাশিতে আবৃত হইয়া গিয়াছিল। সর্বদা অবগুণ্ঠনাশ্রিত কেশপাশ আজ অবগুণ্ঠনের অভাবে সংকোচের সৃষ্টি করিতেছিল। ভট্টিনী আমার পায়ের দিকে বসিয়া নির্নিমেষে আমারই দিকে তাকাইয়াছিলেন। সেই দৃষ্টি হইতে কারুণ্যধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। স্পষ্টই লক্ষ্য করিলাম, আমার চোখ মেলিতে মেলিতেই ভট্টিনীর প্রতি রোম উল্লসিত হইল, যেন শোভার সমুদ্রে হঠাৎ জোয়ার আসিল।

কিন্তু ভট্টিনী এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আমার জ্ঞান যে শীঘ্র হইবে, সে আশা তিনি হয়তো করেন নাই। তিনি একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার পারিজাতপল্লবের মত সুকুমার মনোহর কর বেগে উত্তরীয় খুঁজিতে লাগিল। এক নিমেষ কাটিতে না কাটিতে ভট্টিনীর কপোত-কর্বুর-অঞ্চল সীমন্ত রেখার উপরে আসিয়া গেল, যেন বিদ্যুল্লতা চন্দ্রমার উপর নীল মেঘ-পটলের আবরণ ফেলিয়া দিল, যেন মৃণালনাল কমলপুষ্পকে পত্র দিয়া ঢাকিয়া দিল, যেন বিদ্রুমলতা তরঙ্গ হইতে জলদেবতাকে গোপন করিয়া ফেলিল! ভট্টিনীকে ঐভাবে বসিতে দেখিয়া আমার চিত্ত অস্থির হইতে লাগিল, এক দুর্বার সম্ভ্রমবেগ আমাকে ঠেলিয়া উঠিতে বাধ্য করিল, কিন্তু তিনি আমাকে উঠিতে দিলেন না। তাঁহার স্নেহমেদুর নয়ন বাষ্পবিন্দুতে ভরিয়া গেল, ম্লান মুখমণ্ডলে লালিমার সঞ্চার হইল, সমগ্র সত্তা হইতে এক কাতর প্রার্থনা

প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আমাকে নিষেধ করিবার জন্য তিনি কষ্ট করিয়া তাঁহার কোমল করতল দিয়া আমাকে থামাইলেন। তাঁহার মুখ হইতে শুধু একটি শব্দ বিনির্গত হইল—'না।' তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া ছিল, দৃষ্টি ছিল কাতর, করতল স্বেদধারায় আর্দ্র ছিল। আমার মধ্যে তখনও উঠিবার শক্তি ছিল না। আমি চোখ বুজিলাম, ভট্টিনীর স্নেহমেদুর মুখশ্রীর ধ্যান করিতে লাগিলাম। কোথায় পড়িয়া রহিল এই মর্ত্যলোকের বাতুল কবি! লক্ষ্মী কি স্বর্গে থাকেন? এই পৃথিবীতেই তবে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভট্টিনীর চেয়ে কোন শ্রী-সম্পন্নার কল্পনা করা যাইতে পারে? এই পাণিপল্লবের নিকট স্বর্গের পারিজাতপল্লব কত তুচ্ছ কল্পনা, কাল্পনিক অমৃত কি এই করতলস্রাবী স্বেদধারা হইতে অধিক শান্তিদায়ী হইতে পারে?[১] আমার মন প্রাণ আত্মা সব কিছু যেন আনন্দস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া গেল। আমার নয়ন নিমীলিতই থাকিল। মুহূর্তের জন্য আমি মোহাবিষ্ট হইয়া থাকিলাম।

ইহার মধ্যে মহামায়া আসিয়া আমার মাথার কাছে উপবেশন করিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত আমার ভ্রূযুগলের অন্তর্বর্তী স্থানে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। এই মাতৃস্নেহের আস্বাদ আমার স্বপ্নাবেশে আনন্দ-ভৈরবীর হাত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি অর্ধচেতনের মত ঐ প্রকারে পড়িয়া থাকিলাম। মহামায়া ভট্টিনীর চোখে অশ্রু দেখিয়া সস্নেহ তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন—'আবার কাঁদিতেছিস! তুই মূর্খ। আমার উপর তোর বিশ্বাস নাই কি? ভট্টের কি হইয়াছে যে তুই এই প্রকারে কাঁদিতেছিস? আজ ইহার অবশ্যই চৈতন্য হইবে। সম্মোহনের ক্লান্তি আছে রে মেয়ে! বাহাত্তর হাজার নাড়ীর রোমকূপের ভিতর হইতে চূর্ণ করিয়া সম্মোহনের ক্রিয়া মনকে অভিভূত করে, নাগ ও কূর্ম প্রাণের গতি রুদ্ধ করিয়া দেয়, বায়ুকে নাভিকূপে গভীরভাবে বসাইয়া দেয়, আর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়কে স্থাগিন্দ্রিয়ে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার ক্লান্তি বিকট ধরনের। মোটেই চিন্তা করিস না মেয়ে, আজ ভট্টের নাড়ী সুস্থ, কলাগুলি উদ্বুদ্ধ, দ্বার রুদ্ধ। এই দেখ অলম্বুষা ও পয়স্বিনী কতখানি সুস্থ। এখন এ চোখ মেলিতেছে। নিপুণিকার এখনও দেরি আছে। প্রতিক্রিয়ার ক্লান্তি যে আরও কঠিন হয়। ঘাবড়াস না রে। ছিঃ, এতখানি ব্যাকুল হইতে হয়!'

ভট্টিনী শুধু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'না।'

মহামায়া আমার ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'আমার আশ্চর্য বোধ হয় যে ভট্টকে কি করিয়া সম্মোহনের জালে পড়িতে হইল। ইহার কুল-

---

[১] শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ।
কুতোঽন্যথা স্রবত্যস্মাৎ স্বেদচ্ছদ্মামৃতদ্রবঃ॥—রত্নাবলী, ২।৪২

কুণ্ডলিনী জাগ্রত, এ অবধূত গুরুর প্রসাদ পাইয়াছে। দেখ, মেয়ে, ভট্টের নাড়ী পাঁচটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এই দেখ কল্পিকা, ইহা হইতে সংকল্প হয়; এই বিকল্পিকা, ইহা হইতে মনে বিকল্প জন্মে; এইটি মূর্ছনা, ইহা হইতে মূর্ছা হয়; আর এই হইল মন্যা, ইহাতে মননশক্তি পায়। ভট্টের স্থীবা দুর্বল। এখন ঠিক হইয়া যাইবে। তবে অদ্ভুত শক্তি আছে নিপুণিকার নাড়ীর মধ্যে। একটা কথা বলি মেয়ে, নিপুণিকা হইল মহামায়া, তাহাকে সামান্যা নারী মনে করিস না। সম্মোহনের প্রতিক্রিয়া বড় কঠিন হয়, মেয়ে, প্রথমবার আমি দশ পলও সামলাইতে পারি নাই। উঃ!' মহামায়া যেন কোনও বিস্মৃত দিনের কথা ভাবিতেছিলেন। পুনরায় হঠাৎ বলিলেন—'কন্যা, আজ তো আমাকে যাইতে হইবে, অক্ষয়তৃতীয়ার তো আর বেশি বিলম্ব নাই। এখানে তোমার কোনও ভয় নাই। লোরিকদেব অতিশয় ধার্মিক সামন্ত। তোমার কোনও কষ্ট হইবে না। কি বলিতেছ, যাইব না?'

ভট্টিনী দৃঢ়তার সহিত সংক্ষেপে উত্তর করিলেন—'না!'

মহামায়া মৃদুস্বরে যেন নিজের মনেই বলিলেন—'পুনরায় মায়ার কঞ্চুকে ফাঁসিয়া যাইতেছি। ত্রিপুরভৈরবী, তোমার লীলার পারাপার নাই। কাল, নিয়তি, রাগ, বিদ্যা ও কলা মায়ার কঞ্চুক, কিন্তু সত্য। কে ইহাদের অতিক্রম করিতে পারে? ত্রিপুরসুন্দরীর লীলা!'

ভট্টিনী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—'আমি কি তপস্যার বিঘ্ন করিতেছি, মাতা?'

মহামায়া সস্নেহে বলিলেন—'না রে, না। আমি তো তপস্যা করি বিঘ্নেরই পূজার। বিঘ্নই তো আমার উপাস্য। তোমাদের শাস্ত্র অনুসারে তুমিও তো একটি বিঘ্ন। বিধাতা তো সুন্দরীদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বিঘ্নের রূপেই। কেন, তুমি কি নিজেকে কাহারও বিঘ্ন বলিয়া মনে কর না?'

ভট্টিনী সহজভাবে উত্তর দিলেন—'আপনারই পক্ষে কি বিঘ্ন হইতেছি না?'

'আমার পক্ষে? না, আমি নিজেই যে বিঘ্নরূপা। নাঃ, তুমি বুঝিতে পারিবে না।'

'তবে কি মাতা, নারীর জন্ম হইয়াছে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্যই?'

'ইতিহাস তো সেই কথাই বলে রে! পুরুষের সমস্ত বৈরাগ্যের আয়োজন, তপস্যার বিশাল মঠ, মুক্তিসাধনার অতুলনীয় আশ্রয়, নারীর এক বঙ্কিম দৃষ্টিতেই তো ভাসিয়া যায়। এই দৃষ্টি কি সর্বনাশা নয়?'

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ। মনে হইল, ভট্টিনী হারিয়া গিয়াছেন। মহামায়ার প্রশ্নের প্রতিবাদ করিবার জন্য আমার প্রতিটি রোম উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল, আমার সমস্ত সত্তা প্রত্যাখ্যানের জন্য আলোড়িত হইল, কিন্তু আমি পূর্ববৎ অবশ হইয়া পড়িয়া রহিলাম। ভট্টিনীর সম্মুখে আমার ধৃষ্টতা প্রকটিত হয়, এই কথা

আমি ভাবিতেও পারি নাই। মহামায়াই পুনরায় আরম্ভ করিলেন—'তাহা হইলে তুমি আমার কথা স্বীকার কর না? হাঁ কন্যা, নারীহীন তপস্যা সংসারের মস্ত বড় ভুল। এই ধর্মকর্মের বিশাল আয়োজন, সৈন্যসংগঠন ও রাজ্য-ব্যবস্থাপন—সকলই ফেন-বুদ্বুদের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কারণ ইহাতে নারীর সহযোগিতা নাই। এই সব উদ্যোগ-আয়োজন সংসারে কেবল অশান্তি সৃষ্টি করিবে।'

ভট্টিনী চকিতভাবে যেন প্রশ্ন করিলেন—'তাহা হইলে মা, মেয়েরা যদি সৈন্য-দলে ভরতি হইতে আরম্ভ করে অথবা রাজত্বের উত্তরাধিকার পায়, তবে এই অশান্তি দূর হইয়া যাইবে?'

মহামায়া হাসিলেন। বলিলেন—'তোমার মন সরল, আমি অন্য কথা বলিতেছি। আমি নারীর দেহপিণ্ড কোন মহত্ত্বপূর্ণ বস্তু বলিয়া স্বীকার করি না। তোমাদের এই ভট্টও আমাকে প্রথমবার এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল। আমি নারীতত্ত্বের কথা বলিতেছি রে! সেনাদলে যদি নারীর দেহপিণ্ড গিয়া দল ভরতি করে, তাহা হইলে যতক্ষণ উহাতে নারীতত্ত্বের প্রাধান্য না থাকিবে, ততক্ষণ অশান্তি জমিতেই থাকিবে।'

আমার চক্ষু বন্ধ ছিল, মেলিবার সাহস আমার ছিল না। কিন্তু আমি কল্পনার নেত্রে দেখিতেছিলাম, ভট্টিনীর বিশাল নয়ন বিস্ময়ে আকর্ণবিস্ফারিত হইয়া গিয়াছে। সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া তিনি বলিলেন—'আমি বুঝিতে পারি নাই।'

মহামায়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'পরম শিব হইতে দুই তত্ত্ব একই সঙ্গে প্রকট হইয়াছেন—শিব ও শক্তি। শিব বিধিরূপ আর শক্তি হইলেন নিষেধরূপা। এই দুই তত্ত্বের প্রস্পন্দ-বিস্পন্দ হইতে এই সংসার আভাসিত হইতেছে। পিণ্ডে শিবের প্রাধান্যই পুরুষ, আর শক্তির প্রাধান্য নারী। তুমি কি এই মাংসপিণ্ডকে স্ত্রী অথবা পুরুষ মনে কর? না, সরলে, তাহা নয়, এই জড় মাংসপিণ্ড নারীও নয়, পুরুষও নয়। সেই নিষেধাত্মক তত্ত্বই নারী। নিষেধরূপ তত্ত্ব স্মরণ রাখিও। যেখানে নিজে নিজেকে উৎসর্গ করিবার, নিজেকে নিজে বলি দিবার ভাবনা প্রধান, সেখানেই নারী। যেখানে কোথাও দুঃখসুখের লক্ষধারায় নিজেকে দলিত দ্রাক্ষাসম নিঙাড়িয়া অন্যকে তৃপ্ত করিবার ভাবনা প্রবল, সেখানেই আছে নারীতত্ত্ব, শাস্ত্রীয় ভাষায় 'শক্তিতত্ত্ব'। হাঁ রে, নারী নিষেধরূপিণী। সে আসে না আনন্দভোগের জন্য, আনন্দ বিতরণের জন্য আসে। আজকার ধর্মকর্মের আয়োজন, সৈন্যসংগঠন, রাজ্যবিস্তার—এসব হইল বিধিরূপ। উহাতে অন্যের জন্য আত্মবলির ভাবনা নাই। তাই উহা কটাক্ষে ভাসিয়া যায়, একটু মিষ্ট হাসিতে বিকাইয়া যায়। উহা ফেন-বুদ্বুদের মত অনিত্য, সৈকতসেতুর মত

অস্থির, জলরেখার মত নশ্বর। যতক্ষণ উহাতে অন্যের জন্য আপনা হইতেই আপনাকে ঢালিয়া দেওয়ার ভাবনা আসিবে না, ততক্ষণ উহার পরিবর্তন নাই। যতক্ষণ উহাকে পূজাহীন দিবস ও সেবাহীন রাত্রি অনুতপ্ত না করে, এবং যতক্ষণ নিষ্ফল অর্ঘ্যদান উহাকে না পীড়িত করে, ততক্ষণ উহার মধ্যে নিষেধাত্মক নারীতত্ত্বের অভাব থাকিবে এবং ততক্ষণ উহা শুধু অন্যের দুঃখের কারণই হইবে।' মহামায়া একটু থামিলেন। তিনি খানিকটা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। একটু বিশ্রাম করিবার পর নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। রোগীর শিয়রে বসিয়া অনেকক্ষণ কথা বলিতেছেন, এজন্য কিছু গ্লানিও হইল। আমার চোখের উপর আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে তিনি যেন গ্লানি মিটাইবার জন্যই বলিলেন—'ভট্ট এখন সুস্থ আছে। এখনই জাগিবে।'

ভট্টিনী কিছু বলিলেন না। আমি চোখ মেলিলাম। ভট্টিনী এবার সামলাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বড় বড় চোখে মহামায়ার ব্যাখ্যান জন্য আশ্চর্য-ভাব এখনও একেবারে যায় নাই। এখনও উড়িবার জন্য ব্যাকুল খঞ্জন-শাবকের মত তাঁহার উৎক্ষিপ্ত ভ্রূকুটি সরল হয় নাই। মহামায়া যখন ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন যে কেমন লাগিতেছে, তখন তিনি আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি সংকেতে জানাইলাম যে সুস্থবোধ করিতেছি। এখনও আমার মধ্যে কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মহামায়া ও ভট্টিনীর কথাবার্তা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আমি লোরিকদেব নামে আভীর-সামন্তের গৃহে আছি, আর নিপুণিকাও নিকটেই কোথাও শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে। এই-জন্য খুব কষ্ট করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নিপুণিকার অবস্থা কি?' মহামায়া আমাকে কথা বলিতে না দিয়া বলিলেন—'ভালই আছে।'

তিনদিন বাদে আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলাম। আভীর-সামন্ত দুধে-ঘিতে আমাদিগকে স্নানের মত করাইয়া দিল। এমন অতিথিবৎসল লোক আমি ইহার পূর্বে দেখি নাই। ইহার মধ্যে মহামায়া বিন্ধ্যাগিরির কোনও অজ্ঞাত শাক্তপীঠে চলিয়া গিয়াছেন। নিপুণিকার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, যদিও সেও অত্যন্ত দুর্বল। ভট্টিনীর স্বাভাবিক জ্যোতি পুনরায় দেখা দিয়াছে। বিগ্রহ-বর্মাও তাঁহার সৈনিক বজ্রতীর্থের নিকটেই কোথাও নৌকা থামাইয়া থাকিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিত্য আসিয়া আমার সংবাদ লইয়া যাইতেন। আমি সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রসন্নচিত্তেই ছিলাম। ভাবিতেছিলাম যে নিপুণিকা সারিয়া উঠিলে শীঘ্রই মগধাভিমুখে যাত্রা করিব। কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা ঘটিল তাহা আমার সমস্ত পরিকল্পনা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল।

আমি ভদ্রেশ্বর দুর্গের পশ্চিম প্রাচীরে দাঁড়াইয়া সূর্যাস্তের সৌন্দর্য দেখিতেছিলাম। সূর্যমণ্ডল তাহার কিরণজাল উপরের দিকে সম্বন্ধ রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন দিবসলক্ষ্মী আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে নীচের দিকে চলিয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার দ্রুত সঞ্চারিত চরণ হইতে পদ্মরাগমণির নূপুর খসিয়া পিছনে পড়িয়া আছে। সূর্যবিম্ব সারাদিন করপুটে যে কমল-পরাগ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা যেন হঠাৎ পড়িয়া গিয়া সারা আকাশ পদ্মরাগের রসে রঙগীন করিয়া তুলিল। ক্রমে পশ্চিম দিগ্‌বধূর কর্ণভূষণ রক্তোৎপলতুল্য মনোহর সূর্যদেব অস্তে গেলেন, আকাশরূপ সরোবরে সন্ধ্যারূপ পদ্মিনী প্রকাশিত হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণাগুরুপঙ্কে নির্মিত পত্রলেখার মত তিমিরলেখা দিঙ্‌মুখে পরিব্যাপ্ত হইল আর তাহা হইতে সন্ধ্যার লালিমা এমন আবৃত হইয়া গেল যে মনে হইল, ভ্রমর-ভূষিত নীলোৎপল রক্তপদ্মের সরোবরকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ধীরে ধীরে নিশাবিলাসিনীর অবতংস-পল্লবের মত শোভমান সন্ধ্যারাগ বিলুপ্ত হইয়া গেল। পারাবতেরা ভবনবলভিতে ফিরিতে লাগিল, যেন অট্টালিকাস্থ ভবনলক্ষ্মী নৈশবিহারের জন্য কর্ণে নীলকমল ধারণ করিয়াছেন। জলহারিণী রমণীদের সঞ্চরণ বন্ধ হইয়াছে এবং নূপুরের রুনু-ঝুনুর সঙ্গেই ভবনদীর্ঘিকার সারসদের ক্রেঙ্কারও শান্ত হইয়া গিয়াছে। হস্তীদের নিদ্রা আসিতে আরম্ভ হইল, এইজন্য তাহাদের গণ্ডস্থল হইতে ধারাজলের স্রুতিও শান্ত হইয়া গেল, তাই বায়ুমণ্ডল কিছু লঘু হইল, সমস্ত দিনের আতপক্লান্ত বনচারী বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। আমি উঠিয়া যাইব ভাবিতেছি এমন সময়ে এক আভীর-সৈনিক আসিয়া অভিবাদন করিল। আমি আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিছু বলিতে চাও, ভদ্র?' সৈনিক অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্ষমা চাহিতে চাহিতে বলিল—'অপরাধ মার্জনা করুন, আর্য, ব্রাহ্মণের শপথ, তাই আপনাকে কষ্ট দিতেছি।' এই বলিয়া সে এক পত্র দিল এবং প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, পত্র পড়া সম্ভব ছিল না; কিন্তু সৈনিক যে ভাবে পত্র দিয়া গেল, তাহাতে কুতূহল বাড়িল, শীঘ্র পড়িবার ব্যাকুলতায় চঞ্চল হইয়া উঠিলাম।

গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, ভট্টিনী ব্যস্ত হইয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি আসিতেই তিনি মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে বলিলেন—'এত বিলম্ব করা ঠিক নয়।' তাঁহার নেত্রদ্বয় আনত, অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত, চিবুক ভারগ্রস্ত। স্পষ্টই বুঝিলাম, আমার বিলম্বে আগমনে ভট্টিনী বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু সহজ আভিজাত্যের গৌরবে তাঁহার ক্রোধে গাম্ভীর্য আসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বাণীতে শাসনের তেজ ছিল, অধিকারের স্বর ছিল, স্নেহের মৃদুতা ছিল।

আমি সসম্ভ্রমে উত্তর করিলাম, আমি দুর্গেই ছিলাম। মুহূর্তের জন্য আমি চিন্তিতও হইলাম। এতখানি কি সহ্য হইবে! কিন্তু আমার পত্রখানি পড়িবার তাড়া ছিল। সোজা আমার বিছানায় গেলাম। সেখানে দীপ রাখা ছিল। পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। পত্র অশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। বোঝা যাইতেছিল যে গ্রাম্য ব্যক্তি কেহ তাহার প্রতিলিপি করিয়াছে, কিন্তু পত্রের ভাবার্থ বুঝিতে বাধা হয় নাই। পত্রের প্রতি পংক্তি আমার রক্তে উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। শিরায় শিরায় বিচিত্র বিলোড়ন হইতে লাগিল। মনে হইল, পুনরায় মূর্ছিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া যাইব। পত্র কয়েকবার পড়িলাম। যখন নিজেকে একটু সামলাইয়া লইতে পারিলাম তখন এক প্রহর রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পত্রে লেখা ছিল—

'স্বস্তি। পুরুষপুর হইতে সামবেদের কৌথুমীশাখার অধ্যায়ী জৈমিনি-গোত্রোৎপন্ন কান্যকুব্জ শ্রেণীর ভর্বুশর্মা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের নামে, দেবমন্দির ও বিহারের নামে, স্ত্রী ও বালকদের নামে সকল আর্যাবর্তনিবাসীদের নিকট আবেদন করিতেছে।

'ভ্রাতৃগণ, পুনরায় প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে। দেবতারাও যে আর্যভূমিতে বাস করিবার স্পৃহা করেন, সেই পবিত্র ভারতভূমির অট্টালিকাসমূহ পুনরায় ভস্ম হইবে, পুনরায় সেগুলি দিনান্তের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় ছিন্নভিন্ন মেঘপটলের মত শ্রীহীন হইয়া যাইবে। শঙ্খঘণ্টানিনাদে মুখরিত রাজপথ পুনরায় শৃগালের বিকট নাদে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। অন্তঃপুরললনাদের বিলাসপুষ্করিণী বন্য মহিষের দেহমর্দনে পুনরায় দুর্গন্ধ হইবে। সুবর্ণযষ্টির উপর নর্তনশীল ক্রীড়াময়ূরদের বর্হভার পুনরায় দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। মন্দির ও বিহারের সোপানের উপর পুনরায় বন্য বৃকগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইবে। শস্যশ্যামলা আর্যভূমি পুনরায় রক্তপাতে ও ভস্মের আবর্জনায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে।—ভ্রাতৃগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

'প্রত্যন্তদের আজ পর্যন্ত কে রোধ করিয়া রাখিয়াছেন? বিষম সমর-বিজয়ী, বাহ্লীক-বিমর্দন, প্রত্যন্ত-বাড়ব অজ্ঞাতপ্রতিস্পর্ধিবিকট দেবপুত্র তুবর-মিলিন্দ। দেবমন্দির ও বিহারের রক্ষক, স্ত্রী ও বালকের মর্যাদাদাতা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের আশ্রয়স্থল দেবপুত্র আজ বিষম শোকসাগরে নিমগ্ন। তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে দস্যুরা অজ্ঞাতস্থানে লইয়া গিয়াছে। দেবপুত্র আজ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য কালসর্পের মত নিজের বিষে নিজেই জ্বলিতেছেন। কে আছেন, যিনি দেবপুত্রকে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিবেন? কে আছেন, যিনি প্রত্যন্ত-দস্যুদের উৎপাটনে পুনরায় নিমিত্ত হইবেন?—ভ্রাতৃগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

'কে আছেন যিনি দেবপুত্রের কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন? ভ্রাতৃগণ, চেষ্টা করুন, দেবপুত্রের প্রাণাধিক কন্যার সন্ধান বলিয়া দিন। একবার পুনরায় দেব-পুত্রের বিশালবাহিনীর সৈন্যসংঘর্ষে ভুবনমণ্ডল জীর্ণ শকটের ক্রোড়দেশের মত ধূম্র হইয়া উঠুক; গৈরিক গিরিবর্ত্ম অশ্বক্ষুরের আঘাতে গিরিকুহরগুলিকে ক্রমেলকজটার মত কপিশবর্ণে রঞ্জিত করুক; মদমত্ত গজরাজের বাহিনী প্রত্যন্ত-দেশকে কৃষ্ণবর্ণ মদধারায় পরিণত রল্লক মৃগের রোমরাজিতুল্য কর্বুর করিয়া দিক; মহীতল অশ্বময়, দিকচক্রবাল কুঞ্জরময়, অন্তরীক্ষ আতপত্রময়, অম্বরতল ধ্বজবনময়, বায়ুমণ্ডল মদগন্ধময় ও ত্রিভুবন জয়শব্দময় হইয়া উঠুক।—ভ্রাতৃগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু পুনরায় আসিতেছে!

'এমন কে আছে, যে আজ আর্যাবর্তকে দস্যুদের দংষ্ট্রাজাল হইতে উদ্ধার করিবে? আজ স্কন্দের অবতার সমুদ্রগুপ্ত নাই, যাঁহার ধনুকের টংকারে যৌধেয়দের দর্পসংহার হইয়াছিল, ম্লেচ্ছদের মানভঙ্গ হইয়াছিল, মন্দির ও মঠের ধ্বংসকারীদের প্রাণ হরণ করিয়াছিল। আজ নৃসিংহপরাক্রম চন্দ্রগুপ্ত নাই, যিনি চতুঃসমুদ্রকে নিজের যশঃসৌরভে সুরভি করিয়া দিয়াছিলেন; যাঁহার হুঙ্কারমাত্রে প্রত্যন্ত-সামন্ত মাথা নীচু করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; যিনি ছিলেন বিদ্যা ও কলার সর্বস্ব, স্ত্রী ও বালকদের অভয়, দেবমন্দির ও বিহারের আশ্রয়স্থল। আজ প্রচণ্ডপরাক্রম মৌখরিবীর গ্রহবর্মাও নাই, যিনি শত্রুর পক্ষে ছিলেন কালস্বরূপ আর দীনজনের পক্ষে কল্পবৃক্ষস্বরূপ। আজ পঙ্গপাল চেয়েও সংখ্যায় বিপুল, বৃকদের চেয়ে ক্রূর, গৃধ্রদের চেয়েও নির্ঘৃণ, শৃগালদের চেয়েও হীন, কৃকলাসদের চেয়েও বহুরূপী হূণ দস্যুদের হস্ত হইতে এই পবিত্র ভূমিকে বাঁচাইবার সামর্থ্য কে রাখেন? একমাত্র দেবপুত্র তুবরমিলিন্দ।—ভ্রাতৃগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু পুনরায় আসিতেছে!

'জয় হউক সেই অজ্ঞাত-প্রতিস্পর্ধি-বিকট দেবপুত্র তুবরমিলিন্দের। জয় হউক এই আর্যভূমির। ভ্রাতৃগণ, দেবপুত্রের নয়নতারা, তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার সন্ধান কর—ইহাই একমাত্র রক্ষার উপায়। আমি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের নামে, দেবমন্দির ও বিহারের নামে, স্ত্রী ও বালকদের নামে, বিদ্বান ও তপস্বীদের নামে আর্যভূমির নিবাসীদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।—ভ্রাতৃগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আবার আসিতেছে।

'অপরন্তু, আমি অশীতিপর বৃদ্ধ। আমি সামাধ্যায়ী কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ। আমি মৌখরিদের গুরু—আমি নিজেরই দিব্য দিয়া নিবেদন করিতেছি যে, যে কেহ এই পত্র পড়িবে, সে ইহার দশটি প্রতিলিপি লিখিয়া অন্যকে দিবে। যতক্ষণ দেবপুত্রের প্রাণাধিকা কন্যার সন্ধান না পাওয়া যায়, ততদিন এই কার্য চলিতে থাকিবে।—ইতি শুভমস্তু।'

আমার উত্তেজনা তখনও শান্ত হয় নাই। কাহার সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করিব? ভট্টিনীকে এই সংবাদ না দেওয়া উচিত। নিপুণিকা দুর্বল। হায়, বাণভট্ট একাকী! আমার মধ্যে উড়িবার শক্তি থাকিলে শীঘ্র উড়িয়া দেবপুত্রের নিকটে চলিয়া যাইতাম; কিন্তু আমি উড়িতে তো পারিব না। পত্রের বিষয় আমি চিন্তা করিয়া উত্তেজিত হইয়াছিলাম, এমন সময় ভট্টিনীর স্বর শোনা গেল। জানিলাম, তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার দশা দেখিতেছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে সহজ অনুভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছিল, আর সমস্ত শরীর ঘিরিয়া এক অপূর্ব ভাবমাধুর্য উল্লসিত হইতেছিল। তাঁহার সীমন্তস্থিত অবগুণ্ঠন প্রবালশোণ নখপ্রভায় সিঞ্চিত করিতে করিতে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং আদেশ দেওয়ার ভাবে বলিলেন—'ভট্ট, পত্র পড়া ছাড়িয়া দিন, প্রসাদ-গ্রহণের সময় হইয়াছে।' প্রসাদ-গ্রহণ অর্থাৎ ভোজন। ভট্টিনী একবারও আমাকে মহাবরাহের মূর্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আমি হয়তো মূর্তি গঙ্গাজলে বিসর্জন করিয়া দিয়াছি। আমি জানিতাম যে একথায় উঁহার কতখানি ক্লেশ হইবে, কিন্তু এই কুসুমকোমল শরীরে কতখানি দৃঢ় হৃদয় আছে, এই লঘু কায়ায় কতখানি কৌলীন্য তেজ, এই অল্প বয়সে কতখানি অনুভাবশালীনতা! ভট্টিনীর আশংকা, জিজ্ঞাসা করিলে আমার কষ্ট হইবে, আর তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই; কিন্তু মহাবরাহের পূজা একদিনও বন্ধ হয় নাই, 'জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা'-র মোহন স্তব কখনও বন্ধ হয় নাই, প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হইতে আমরা কখনও বঞ্চিত হই নাই। আমি সবিনয়ে উত্তর করিলাম, এখনই যাইতেছি।

ভট্টিনী ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। মুহূর্তের পরে আমার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। এবার তিনি একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন। এক পবিত্র আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইল, যেন একই সঙ্গে শত শত আরতিদীপ জ্বলিয়া উঠিল। ভট্টিনীর মুখে অনেক দিন পরে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছে। আমার ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন চিত্ত এই সামান্য হাসিতেই অতিশয় শান্ত হইয়া গেল। উৎসাহবশে আমি একটা অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম—'কোনও আদেশ আছে কি, দেবি?' ভট্টিনী আরও প্রসন্ন ভাব দেখাইলেন। বলিলেন—'এই পত্রে এতখানি উত্তেজিত হইলেন কেন ভট্ট?' আমার মনে অজ্ঞাত আশংকার প্রাদুর্ভাব হইল। ভট্টিনী কি এই পত্র পড়িয়া ফেলিয়াছেন? আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম—'পত্রের বিষয় কিছু উদ্বেগজনক তো বটেই, দেবি! কিন্তু সেবকের অপরাধ মার্জনা করিবেন, আমি এই একটি বিষয় আপনার নিকট হইতে গোপন রাখিতে চাই।' ভট্টিনী আমার মনোভাব উপভোগ করিতে করিতে বলিলেন—'বড়ই গোপনীয় কি?' আর খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভট্টিনীর স্ফূর্তিতে আমিও আনন্দিত হইতাম; কিন্তু আমার মন যে কত উদ্বিগ্ন তাহা তিনি কি বুঝিবেন? আমি গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিলাম—'হাঁ দেবি, কিছুকাল পর্যন্ত আপনার নিকট হইতে এই সংবাদ গোপন রাখাই শ্রেয়স্কর মনে করি।' ভট্টিনী নিষ্ঠুরভাবে আরও রহস্য করিলেন—'আমি বিঘ্ন হইতে পারি! এই কথা তো?' আমি তো হতবুদ্ধি!

অল্পক্ষণ পর্যন্ত মন্দমধুর হাসিতে আমার আকুলতা বাড়াইয়া দিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুনরায় সহজ ভাবে বলিলেন—'আভীর-সামন্তের রানী আমাকেও এক প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন। আমি ইহা পড়িয়া ফেলিয়াছি। চলুন, ইহাতে উত্তেজিত হওয়ার কথা কি আছে?' আমি আশ্চর্যসাগরে ডুবিয়া গেলাম। অনেকক্ষণ ভট্টিনীর বিনোদপ্রফুল্ল মুখশ্রীর দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া বলিলাম—'ধন্য দেবি, দেবপুত্রের আপনি উপযুক্ত কন্যা। আর কে এভাবে ধীর স্থির থাকিতে পারিত? উপযুক্ত স্থলেই দেবপুত্রের স্নেহ। সমুদ্র হইতেই কৌস্তুভমণির প্রাদুর্ভাব হইতে পারে, পৃথিবী হইতেই জানকীর জন্ম সম্ভব, হিমালয় হইতেই পার্বতীর উৎপত্তি হয়, বিষ্ণুচরণ হইতেই গঙ্গা প্রবাহিত হইতে পারেন, ব্রহ্মা হইতেই ত্রয়ী বিদ্যার প্রাদুর্ভাব সম্ভব। এ সময়ে মানসিক বেগ বারণ করা দেবপুত্রের কন্যারই কার্য। আশ্বস্ত হইলাম দেবি, আর্যাবর্ত আজ কৃতার্থ, দেবমন্দির ও বিহার আজ সুরক্ষিত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের বিঘ্ন আজ অপগত, তরুণী ও বালক আজ নিশ্চিন্ত। আজ ধরিত্রী প্রসন্ন, দশ দিক্ সুনির্মল, বায়ু পবিত্র। প্রত্যন্ত-সমুদ্রে পুনরায় বাড়বাগ্নি ধুক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, দেবপুত্রের ভুজরূপ বহ্নিশিখায় আজ পুনরায় পাপদস্যুদের আহুতি হইবে। দেবি, আমি ধন্য।'

ভট্টিনী অবিচলিত চিত্তে আমার স্তুতি শুনিতেছিলেন। তাঁহার মধ্যে এক দিব্য জ্যোতি প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছিল। আমার এমন মনে হইতেছিল, স্বয়ং পার্বতী ভক্তের স্তুতি শুনিবার লোভে থামিয়া গিয়াছেন। আমি দীপ্ত শ্রদ্ধার সহিত আরও বলিতে আরম্ভ করিলাম। ভট্টিনী তিরস্কার করিলেন—'এ কি বালকের মত তরলতা, ভট্ট! আমি দেবী নই। রক্তমাংসের নারী। আমি বিঘ্নস্বরূপা; কিন্তু জানি যে আমার বিঘ্নরূপ হওয়াতেই বিশ্বের পরিত্রাণ। আপনিই তো আমাকে এ জ্ঞান দিয়াছেন ভট্ট, আর আপনিই উহা ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছেন! আমি হইলাম চন্দ্রদীধিতি—শত শত বালিকার তুল্য এক সামান্য বালিকা! আমি হইলাম আপনার ভট্টিনী—' সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। কিছু বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলেন না। শুধু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এই বলিয়া শেষ করিলেন—'আমি দেবী নই, চলুন, প্রসাদ লইবেন চলুন।'

ভট্টিনী চলিলেন, নিজের উপর বিরাগ লইয়া আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আপনি বলিতে পারেন, আমি দেবী নই; কিন্তু যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি, সেদিন হইতে আমার সমস্ত অন্তর নিজেকে নিঃশেষ করিয়া আপনারই সেবার জন্য ঢালিয়া দিতে চাহি, সমস্ত অস্তিত্ব পক্ক ও রক্তবর্ণ দাড়িম্বফলের মত আপনার জন্য ফাটিয়া পড়িতে চাহে, সমস্ত বাগ্‌ধারা উদ্বেল জলরাশির মত আপনার সত্তাকে নিমজ্জিত করিয়া লইতে চাহে—এ কি বালকোচিত তরলতা? আমি অকিঞ্চন, সাধনহীন, পথভ্রান্ত। আমার নিকট এমন কি বা আছে, যাহা দিয়া আপনার পূজা করিব? আপনি দেবী; শতবার প্রতিবাদ করুন, তথাপি আপনি দেবী—এই কলুষ-পঙ্কিল সংসার-সাগরের প্রফুল্ল পদ্মিনী, এই ধূলিধূসর বনভূমির মালতীলতা! লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বালিকা আজ আর্যাবর্তকে মহতী বিনষ্টির গহ্বরে পতন হইতে বাঁচাইতে পারে না—আপনি পারেন।—আমার ক্ষোভ আমার চেহারায় নিশ্চয় প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে; কারণ ভট্টিনী আমার দিকে ফিরিয়া অনেকবার দেখিলেন। প্রসাদ দিতে দিতে তিনি একটু আদর করিয়া বলিলেন—'কিছু মনে করিবেন না, ভট্ট!' আমি করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। ভট্টিনীর চিত্ত আজ প্রসন্ন ছিল। তাঁহার মধ্যে আজ কিছু অপ্রত্যাশিত চঞ্চলতা আসিয়া গিয়াছিল। এসময়ে তাঁহাকে একটুও চিন্তিত হইতে দেওয়া অপরাধ হইত। কিন্তু ভট্টিনী আমার উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না। বলিলেন—'কিছু মনে করিবেন না। আমাকে দেবী মনে করিয়া যদি আনন্দ পান, তবে আমি দেবী। এই বর গ্রহণ করুন।'—বলিয়া ভট্টিনী আমার থালায় তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্ন পরিবেশন করিলেন। আমি হাসিলাম, ভট্টিনীও ঈষৎ হাসিয়া ফেলিলেন।

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস

ভদ্রেশ্বর ছিল স্বস্তিকাধার দুর্গ। লোরিকদেবের রাজভবন কেন্দ্রস্থলে ছিল। আমাদের থাকিবার জন্য যে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, তাহা একেবারে পূর্বতোরণে সংলগ্ন। সেখান হইতে পরিখা পর্যন্ত কূর্মপৃষ্ঠের মত উন্নতোদর এক রাজপথ ছিল, তাহা অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ দিকে চক্রাকার হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছিল। রাজপথের দুই দিকে সমৃদ্ধ নাগরিকদের বড় বড় সৌধ। রাত্রে এই সব ভবনের বাতায়ন হইতে দীপালোকের ক্ষীণ রশ্মিই দেখা যাইত। সমস্ত পথটা যেন বিশাল অজগরের মত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। ভট্টিনীর হাতের প্রসাদ পাইয়া আমি বাহিরে আসিলাম, আর ক্ষুদ্রাকার এক স্থণ্ডিল-পীঠিকার উপরে

বসিয়া পূর্বগামী এই রাজপথ দেখিতে লাগিলাম। আকাশকে এক বিকচ কমল-সরোবরের মত লাগিতেছিল। রাত্রির অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র দুর্গ-নগর অতি মনোহর জ্ঞান হইতেছিল। আমার মনে ভর্বুশর্মার পত্রের স্মৃতি পূর্ববৎ জাগ্রত ছিল। যদিও ভট্টিনীর প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আমি কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার কর্তব্য-ভার লঘু হয় নাই। আমার এমন মন হইতেছিল যেন এ বিষয়ে নিপুণিকা আমার সাহায্য করিতে পারে। নিপুণিকাকে আমি সমস্ত কথা খোলাখুলিভাবে বলিতে পারি। ভট্টিনীর সম্মুখে আমার একপ্রকারের সম্মোহনকারী জড়িমা আসিয়া যায়। ভাবিতেছিলাম, প্রভাত হইলে এ বিষয়ে নিউনিয়ার সহিত পরামর্শ করিব। সে ভট্টিনীকে ভালমতই জানে। আমি তাঁহাকে এখনও চিনিতে পারি নাই।

ধীরে ধীরে পূর্বগগনের মঞ্চে চন্দ্রমা আরূঢ় হইলেন। সমগ্র ভুবন-মণ্ডল প্রথমে সিন্দূররাগে লাল হইয়া উঠিল, পরে আবার যেন ধবল চন্দনরসের ধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। ভবনবলভির পারাবতদের মধ্যে মুহূর্তের জন্য একটা চঞ্চলতা আসিল। তাহাদের ভস্মবৎ কর্বুরপক্ষ থাকিয়া থাকিয়া ফরফর করিতে লাগিল, তাহারা যেন অন্ধকার ঝাঁট দিয়া গেল। চামচিকার ছায়া কখনও কখনও আমার মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া মনে হইতেছিল, অন্ধকার-রূপী সেনাপতির দুই একজন সৈনিক অবসর পাইয়া এদিক ওদিক পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত বাতাবরণ শান্ত ও মনোরম হইয়া গেল। চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়া ভদ্রেশ্বর-দুর্গ যেন আরও মনোহর হইয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম, যেদিন কর্পূরধবল মহাদেবের জটাজুট হইতে শতধারে গঙ্গাজলের ধারা হিমালয়ের উপর পড়িয়াছিল, সেদিন তাহার শোভা কিছুটা হয়তো এমনি হইয়া থাকিবে—অভ্রভেদী শ্বেত শিখর যথাস্থানে তেমনি অবিচল ভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিবে, যেমন ভদ্রেশ্বরের সৌধ অট্টালিকাগুলি দেখা যাইতেছে; সর্বদা অনির্বাণ ঔষধ-মণিগুলি সেই শ্বেতধারায় এইভাবেই হয়তো জ্বলিয়া থাকিবে, যেমন এই দুর্গের প্রাসাদ-বাতায়নে প্রদীপ জ্বলিতেছে; মেখলা ঘিরিয়া সঞ্চরণশীল মেঘখণ্ড এমনভাবে সংলগ্ন হইয়া গিয়া থাকিবে এই দুর্গপ্রাসাদের তিরস্করিণীগুলি যেমন সংলগ্ন আছে, আর দরী গুহায় শয়ানা সিদ্ধবধূগণ মন্দাকিনীর নির্ঝর-শীকরে সিক্ত বায়ু ঠিক সেই মত অলসবিলাসিতভাবে উপভোগ করিয়া থাকিবেন, এই দুর্গের সুন্দরীরা আজ যেমন মধু-মদির শীতল বায়ু উপভোগ করিতেছেন।

সে রাত্রে আমার চোখে ঘুম আসিল না। আমি ভট্টিনীকে চিনিতে পারি নাই। ছোট মহারাজার বিশাল অন্তঃপুরে আবদ্ধ ভট্টিনীর পরিপাণ্ডু-দুর্বল-কপোল-সুন্দর মুখ দেখিয়াছি। চণ্ডীমণ্ডপে কুমার কৃষ্ণবর্ধনের আশ্রয় লইতে

স্পষ্ট অস্বীকার করিবার পর বাণবিদ্ধ মৃগের মত তাঁহার করুণ মুখচ্ছবি কেহ ভুলিতে বলিলেও ভুলিতে পারিব না। গঙ্গার মনোহর স্রোতে নিজের অপহরণের বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে নিরাশ সিংহিনীর মত তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষী নেত্রদ্বয় আমার মানস পটে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর শেষবার গঙ্গাপ্রবাহ হইতে বিনির্গত ক্লান্তশিথিল তাঁহার সেই মনোহর শোভা আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, যাহা বরাহদন্তে সমাসীন শ্রান্ত ধরিত্রীকে ধৈর্য ও গাম্ভীর্যে পরাস্ত করিতেছিল। কিন্তু আজ আমি ভট্টিনীকে যে রূপে দেখিয়াছি তাহা ঐ সকল হইতে পৃথক। এই সকল রূপের মধ্যে কোনও এক যোগসূত্র খুঁজিতে চাহিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। কয়েকদিন হইতে আমার এমন মনে হইতেছিল যে আমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, কর্মশক্তি শিথিল হইয়াছে, বাগ্‌ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। সংসারের বৈষম্য আমি দেখিয়াছি, এ পৃথিবীর অবোধ ব্রাহ্মণবালক আমি নই। যদিও সমস্ত পৃথিবী যাহা স্বীকার করে তাহা আমার কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয়ের মান নয়, তথাপি আমি লোকমর্যাদা বিষয়ে অনভিজ্ঞ নই। কিন্তু এদিকেও আমার চিত্ত জড় হইতে চলিয়াছে, বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হইতে যাইতেছে, মস্তিষ্ক স্থূলে হইতেছে। উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে কিরূপে অন্তর্বিকার, যাহা আমার চিত্তকে জড় করিয়া তুলিতেছে, বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিতেছে! আমার পক্ষে ইহার উত্তর পাওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিল। আজ আমি যে নিজেই নিজের সমস্যা হইয়া পড়িতেছি।

একটা কথা স্পষ্ট। ভট্টিনী ও নিপুণিকার সঙ্গে থাকিয়া আমার ভিতরে পরিবর্তন হইয়াছে। আমি তো মুখে বলি যে উহাদের রক্ষার জন্য উহাদের সঙ্গে আছি; কিন্তু আমিই তো নিজে পরম আশ্রিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া চাই। আজ হইতে অধিক পরাধীন আমি কখনই ছিলাম না। কিন্তু ভট্টিনীকে একা ছাড়িয়া আমি যাই বা কি করিয়া! এ যে বিষম সমস্যা! জানি, আমার প্রতি রোম কদম্বকেশরের মত উদ্ভিন্ন হইয়া এই পরাধীনতাকে বরণ করে, আমার সমস্ত হৃদয় গলিয়া নবনীতের মত হইয়া ইহার সম্মুখে ঢলিয়া পড়িবার জন্য আকুল হয়, আর ভিতর হইতে এক তীব্র অভিলাষ উদ্‌বুদ্ধ কোকনদের মত নিজের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া ফুটিয়া পড়িতে চায়। আমার কি হইয়া গিয়াছে? ইহাও আশ্চর্যের কথা যে আমার চিত্তে এই দ্বন্দ্ব তখনই উঠিয়াছে, যখন উহা না ওঠাই উচিত ছিল। আমি আজ ভট্টিনীর হাসি হাসি মুখ দেখিয়াছি। অধরে লীলার তরঙ্গ, কপোল-প্রান্ত বিভ্রম-তরঙ্গে চটুল হইয়া উঠিয়াছে, শ্বেত পুণ্ডরীকের মত বিশাল নয়নে লালিমা খেলিতেছে, কান্তির লহরে সমস্ত অঙ্গযষ্টি আবৃত, যেন মুক্তাছটার স্রোতস্বিনী ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে! ইহাই তো আমার পক্ষে কৃতকৃত্য হওয়ার সুযোগ। আজ তো

আমার সমস্ত জীবনই সার্থক মনে করা উচিত ছিল; কিন্তু আজই আমি এত হতবুদ্ধি কেন হইয়াছি? সত্যই, আমার যেন কী হইয়াছে!

এক এক করিয়া সমস্ত কথা আমার মনে পড়িতে লাগিল। আজ ভট্টিনী যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার অর্থ কি? তিনি হাজার হাজার বালিকার মত এক বালিকা, ইহাতে কি হইয়াছে? তিনি অস্থি মাংসে নির্মিত নারী—না হইলে, বাণভট্ট আজ এই পবিত্র দেবপ্রতিমার সম্মুখে নিজে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়াকেই নিজের সার্থকতা মনে করিবে কেন? হায়, সংসার এই অস্থিমাংসের দেবমন্দিরের পূজা করিল না! সে বৈরাগ্য ও শক্তির অহঙ্কার দিয়া বালুকার প্রাচীর নির্মাণ করিয়া চলিল! সে তাহার পরম আরাধ্যকে চিনে নাই! কিন্তু এই সব কথার মধ্যে আছে কী? আমি অনেক দেখিয়াছি। শোভা ও কান্তিকে বিভ্রম ও বিচ্ছিত্তির নিকট বিক্রীত হইতে দেখিয়া আমি যে দিন প্রথম বিচলিত হইয়াছিলাম, সেদিনের কথা মনে আসিলে আমার সম্পূর্ণ সত্তা বিদ্রোহ করিয়া ওঠে। মাধুর্য ও লাবণ্য অপেক্ষা হেলা ও বিব্বোকের সম্মান প্রতিদিনই হইতেছে, আমি এসব কথাই জানি। কিন্তু ইহাও জানি যে এই সকল আপাত-বিরোধী আচরণের মধ্যে এক সমরসতা আছে—সতত পরিবর্তমান বাহিরের আচরণের ভিতরে এক পরম মঙ্গলময় দেবতা স্তব্ধ হইয়া আছেন। সেই দেবতাকে যে দেখে নাই সে-ই যৌবনকে মত্ত গজরাজ বলে, অনুরাগকে বলে মনের অন্ধকার, সহজভাবকে বঙ্কিমলীলার নাম দেয়। মাধবীলতাকে ঘিরিয়া মধুকর-শ্রেণী যখন গুঞ্জন করিতে থাকে, তখন আমি স্পষ্টই দেখিতে পাই পুষ্পের ভিতরে সৌরভের রূপে স্তব্ধ সেই মহা দেবতাকে; নদী যখন উন্মত্ত বেগে দুই হাতে নিজের সর্বস্ব লুটাইতে লুটাইতে সমুদ্রের প্রতি দৌড়াইতে থাকে, তখন সেই মহারাগময় দেবতার সাক্ষাৎ পাই; মেঘের শ্যামল-মেদুর বক্ষঃস্থলে মুহূর্তের জন্য যখন বিভ্রমবতী বিদ্যুৎ চমকাইয়া পুনরায় লুকাইয়া যায়, তখনও আমি সেই ব্যাকুলবেদনার দেবতাকে দেখিতে ভুলি না।

হঠাৎ পিছন হইতে ভট্টিনীর ডাক শুনি—'ভট্ট, দুর্বল শরীরে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া থাকা তো উচিত নয়।' প্রথম মেঘ-গর্জন শুনিয়া মৃগশিশু যেমন চমকিত হয় তেমনি চমকিয়া উঠিয়া পিছনের দিকে তাকাইলাম। ভট্টিনীই বটে—আগুল্ফ-আচ্ছাদিত নীল আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার মনোহর মুখ শতগুণ রমণীয় দেখাইতেছিল, যেন জ্যোৎস্নারূপে ধবল মন্দাকিনীর স্রোতে বহমান শৈবালজালে জড়িত প্রফুল্ল কমল, ক্ষীরসাগরে সন্তরমাণ নীলবসনা পদ্মা, কৈলাস পর্বতে প্রস্ফুটিত সপুষ্প দমনকযষ্টি, নীল মেঘমণ্ডলে ক্ষণিকের তরে দীপ্তিমতী স্থির সৌদামিনী! তাঁহার বৃহদাকার নেত্রের শোভা নিজেই নিজের উপমা। আমি ভট্টিনীর অতর্কিত আগমনে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া

থাকিলাম। কোনও উত্তর মুখে আসিল না। শুধু সেই মৃদুল-মনোহর দৃষ্টির দিকে মুগ্ধভাবে দেখিতে থাকিলাম, যাহা ইন্দীবরের মালার মত আমাকে বন্ধন করিতেছিল, কস্তুরিকালেপের মত আমাকে স্নিগ্ধ করিতেছিল, আর মন্দার-মালার মত আমার অন্তর-বাহির সৌরভে মগ্ন করিয়া তুলিতেছিল। ভট্টিনী সেখানে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া পুনরায় নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন, কেবল আদেশের স্বরে বলিতে বলিতে গেলেন—'যান, ভিতরে গিয়া শোন!'

কে কাহার অভিভাবক—ভট্টিনী আমার, না আমি ভট্টিনীর? কে কাহার সেবায় নিযুক্ত—আমি তাঁহার সেবায়, না তিনি আমার সেবায়? আকাশের নক্ষত্র, সাক্ষী থাকিও, বাণভট্ট পথ-ভ্রান্ত অকর্মণ্য নয়, ছিন্নরজ্জু অনড্বানের মত অনর্গলচারী নয়, কেদারোৎপাটিত দুর্বাদলের মত পথের উপর বিক্ষিপ্ত হতভাগ্য নয়, বনে ফুটিয়াই ঝরিয়া পড়া বন্যপুষ্পের মত ব্যর্থজন্মা নয়, ক্ষুরক্ষুণ্ণ ধূলি-কণার মত নিরাশ্রয় নয়, মরুকান্তারে শুষ্কসলিলা নদীর মত ব্যর্থকাম নয়! হে হতজ্যোতি নিশানাথ, অখিল ভূমণ্ডলের রাগ-বিরাগের তুমি অবিসংবাদী সাক্ষী। লোক হইতে লোকান্তরে, কাল হইতে কালান্তরে, দিক হইতে দিগন্তরে তুমি যেন এই বার্তাই পৌঁছাইয়া দিও যে বাণভট্টের জীবন ব্যর্থ ছিল না। আমি আজই এই সৌভাগ্য নিজের হাতেই ডুবাইয়া দিয়া যাইব—বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। তুমি মনে রাখিও। ধীরে ধীরে নিজের শয়নকক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিলাম বেলা বাড়িয়া গিয়াছে। নিউনিয়া ঘরের বাহিরে বসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। ও এত সকালে ওখানে আসিয়াছে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের শেষ রহিল না। উহার মুখ ছিল শুষ্ক, চোখ আরও বসিয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর রক্তহীন। সে খুব যত্ন করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। সে কেন আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে যাইব এমন সময় সে নিজেই বলিয়া উঠিল—'আমি এখন ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিব, আমার চিন্তা করিও না। এক অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ে তোমার নিকট কিছু পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। যদি মনে কোন দোষ না ধর তবে বলি।' অবাঞ্ছিত কিছু শুনিব আশংকায় মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। শুধু অবাক বিস্ময়ে উহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। নিউনিয়া জানুপাত করিয়া পুনরায় আমাকে প্রণাম করিল আর অল্পকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল—'ভট্ট, কাল রাত্রে তুমি ভট্টিনীকে কোনও অন্যায় কথা বলিয়াছিলে কি?' আমি নিস্তব্ধ হইয়া গেলাম। আমি ভট্টিনীকে অন্যায় কিছু বলিতে পারি! নিপুণিকা আমাকে বেশি ক্ষণ ভাবিবার অবসর দিল না। আমার

কুতূহল আরও বর্ধিত করিয়া দিয়া বলিল—'আমি কি জানি না যে তুমি জানিয়া শুনিয়া কখনও কোনও অন্যায় কথা বলিতে পার না? দেখ ভট্ট, তুমি জান না যে তুমি আমার এই পাপ-পংকিল দেহে কেমন প্রফুল্ল শতদল উন্মীলিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি আমার দেবতা, আমি অধম নারী, তোমার নাম জপ করাই আমার কাজ। এই কলুষিত মন লইয়াও যে বাঁচিয়া আছি, সে শুধু এই জন্য যে তুমি বাঁচিবার মত বলিয়া মনে করিয়াছ। সূর্যদেব পশ্চিম দিগ্বিভাগে উঠিতেও পারেন, কিন্তু তবু তুমি ভট্টিনীকে কোনও অন্যায় কথা বলিতে পার না, একথা আমি জানি। তথাপি এমন কিছু কথা অবশ্যই হইয়া থাকিবে, যাহাতে ভট্টিনীর চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চোখ ফুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডলে উত্তেজনা, তিনি নিজের মধ্যে নিজে নাই। ভয় হইতেছে বুঝি তাঁহার প্রচণ্ড জ্বর আসিয়াছে। তুমি যদি তাঁহার বিশুষ্ক অধরোষ্ঠ দেখ, তাহা হইলে অবশ্যই কাঁদিয়া ফেলিবে। কি কথা হইয়াছিল ভট্ট?' নিপুণিকার কথা শুনিয়া আমি হতপ্রভ হইয়া গেলাম—মনে হইতেছিল, আমার অন্তরের ভিতরটা বুঝি শরৎকালের কেতক-পুষ্পের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিলাম—'নিউনিয়া, বেশি বলিও না। তুমি জান না যে আমার উপর কী কঠোর বজ্রপ্রহার করিতেছ।'

নিপুণিকা অবাক্ হইয়া আমার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে আমি উহাকে রাত্রির সমস্ত কথা শোনাইয়া দিলাম। নিপুণিকার শীর্ণ দেহ আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার শ্বেত মুখ-মণ্ডল কর্পূর-গুটিকার মত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু হইতে এমন দিব্য জ্যোতি প্রকাশ হইতে লাগিল, যেন বিবরদ্বারের নাগমণি। সে মুহূর্তকাল নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিল, যেন নানা দিক হইতে তরঙ্গিত ভাবলহরী হইতে চলিয়া আসিয়া সে গতিহীন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সে আমার দিকে চক্ষু উঠাইল। মুক্তাভরিত শুক্তিপটলের মত, তুহিনবিন্দুতে পূর্ণ পদ্মপলাশের মত, শিশিরসিক্ত পারিজাত পুষ্পের মত, অর্ধস্ফুট সিন্ধুবার কুসুমের মত, সে অশ্রুপূর্ণ নেত্র চিত্তের করুণরসে প্লাবিত করিতেছিল। সহানুভূতির বর্ষায় সিঞ্চিত করিতেছিল। অনুকম্পার ধারায় ধৌত করিয়া দিতেছিল। নিপুণিকা কি যেন ভুলিয়া গিয়াছে, কি যেন ভ্রমে পড়িয়াছে, কি যেন হারাইয়াছে এই ভাবে তাকাইয়া থাকিল, আর পুনরায় সহসা ভূমিতলে করতল রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—'আমি বুঝিয়াছি ভট্ট, আমার অপরাধ ক্ষমা করিও। তুমি আমার দোষ বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু নিজের দোষ তোমার বোঝা উচিত। আমি নিজের কথার জন্য লজ্জা পাইবার যোগ্যও নহি।

নিউনিয়ার কথা ছাড়িয়া দাও, সে বাহাত্তর ঘাটের জল খাইয়া সারিয়াছে, সে ভালো মন্দ চেনে, তাহার নিজের চিনিবার শক্তির উপর ভরসা আছে, নিজের কলুষময় মনের বিকার অন্যের উপর আরোপ করিতে পারে; কিন্তু ভট্টিনী তো বালিকা। সংসারের কটুতা সম্বন্ধে তাহার লেশমাত্র জ্ঞান নাই। সে তোমাকে বুঝিতে পারিবে না। ধিক্ ভট্ট! পুরুষের মধ্যে পৌরুষ থাকা চাই। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি ভট্টিনীকে কখনও জিজ্ঞাসা কর নাই কেন যে সে কেন গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল? তাহার অস্বাভাবিক তারল্যের জন্য কাল তাহাকে জোরে তিরস্কার কর নাই কেন?' নিপুণিকার এ সমস্ত কথার অর্থ আমি আজও বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু এই কথাগুলি আমাকে আমার অবস্থা বুঝাইয়া দিতে আশ্চর্যরকম কাজ করিল। মেঘমুক্ত আকাশের মত, কুজ্ঝটিকা-বিরহিত দিঙ্মণ্ডলের মত, শৈবালহীন সরোবরের মত আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়া গেল। আমি নিপুণিকাকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলাম—'নিউনিয়া, আমি ভট্টিনীর সেবক হইয়াই গৌরবান্বিত, অভিভাবক হইবার যোগ্যতা আমার নাই। আমি তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া ছুটি লইব। অধিক মোহগ্রস্ত হওয়া আমার ভালো লাগে না। তুমি ভট্টিনীকে বলিয়া দাও যে বানভট্ট মহান্ ভবিষ্যের নিমিত্ত হইতে সংকল্প করিয়াছে। সে কালই স্থাণ্বীশ্বরে যাত্রা করিবে।' নিপুণিকা চলিয়া গেল: লাভের আশায় ব্যবসা করিতে আসিয়া মূলধনও হারাইয়া ফেলিয়াছে, এমনই ছিল তাহার উদাস ভাব।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার আসনে বসিয়া থাকিলাম। ধীরে ধীরে সূর্যের তাপ বাড়িতে লাগিল। অজগরের ফুৎকারের মত পশ্চিমের হাওয়া সোঁ-সোঁ করিতে করিতে দিক্‌চক্রবাল দগ্ধ করিতে লাগিল, রৌদ্রের তেজে কৃকলাস মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার বর্ণ পরিবর্তন করিতে লাগিল, চটক-দম্পতি অলস-ভাবে হর্মাবলীর ছিদ্রের মধ্যে লুকাইতে লাগিল, বনসারিকা নানা বচনভঙ্গীতে নিজের দুঃখকাহিনী বলিতে লাগিল এবং গৃহধেনুদের রোমন্থনব্যস্ত জাবরের মধ্যেও আলস্যের আবির্ভাব হইল। আমি দীর্ঘকাল পর্যন্ত নির্নিমেষে স্বস্তিকাকার রাজপথের এক শাখার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলাম। এই সময় বিগ্রহবর্মা আসিয়া প্রণাম করিল ও কুমার কৃষ্ণবর্ধনের প্রেরিত দূতের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইল। তখন আমার বিস্ময়ের আর অবধি থাকিল না, যখন দূত আসিয়া বলিল যে কুমার আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে আমি মহারাজাধিরাজ হর্ষদেবের সহিত বৈরভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি!

স্থাণ্বীশ্বর যাওয়া স্থির হইয়া গেল। আমি শেষবার ভট্টিনীর নিকট বিদায় লইব, ঠিক করিলাম। সে সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী অস্ত গিয়াছেন।

পশ্চিমসমুদ্রের তীর হইতে প্রবাল-লতার মত সন্ধ্যারাগ উদিত হইয়াছিল। বিরাট্ সূর্যমণ্ডলের পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হওয়ার জন্য যে সব জলকণা উছলিয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই যেন নক্ষত্রের রূপে আকাশমণ্ডলে আট্‌কাইয়া গিয়াছে, আর হয়তো ঐ সমুদ্র হইতে উত্থিত জলধারা পরে নিকটবর্তী পশ্চিমের তটের লালিমা ধুইয়া ফেলিয়াছে। ভট্টিনী স্নান করিয়া পূজার বেদীর উপর বসিয়াছিলেন। আমি কিছুক্ষণ পর্যন্ত বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিলাম। আজ ভট্টিনী বড়ই করুণ সুরে ভগবানের বন্দনা গান করিতেছিলেন। আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নয়ন মেলিয়া আশ্চর্য হইয়া সেই মোহন গীত শুনিতেছিল। পূজা সমাপ্ত হইল। পরিক্রমা করিয়া ভট্টিনী সেই অদৃশ্য বরাহদেবতাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে ভক্তির স্নিগ্ধ শীতল লহরী উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। লঘু কৌসুম্ভবস্ত্র বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার অঙ্গ-যষ্টির লাবণ্যপ্রভা বাহিরে নির্গত হইতে লাগিল, যেন অদৃশ্য সৌভাগ্যচন্দ্রমার সূচনামাত্র শোভার সমুদ্রে জোয়ার আসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভট্টিনী যেন আবিষ্ট, অভিভূত, ঘূর্ণ ও উদ্‌ভ্রান্ত মত হইয়া জানুপাতপূর্বক বসিয়াই রহিলেন। পুনরায় ধীরে ধীরে উঠিলেন। আমাকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া পুনরায় আমার দিকে তাকাইলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল অস্বাভাবিক গুরুতা। পলক ফেলিতে বিলম্ব হইল না। একটি আসনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বসিয়া গেলেন। আমিও আসন গ্রহণ করিলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভট্টিনীর মুখ হইতে কোনও কথা বাহির হইল না। আমিও নিজের বক্তব্য বলিবার কোনও সূত্র খুঁজিতে পারিলাম না। পুনরায় ভট্টিনী করুণ-কাতর স্বরে বলিলেন—'নিপুণিকা কিছু অন্যায় বলিয়া থাকিলে তাহা মনে রাখিবেন না। সে আমাকে নিজের প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। আপনার উপর তাহার যে অপার শ্রদ্ধা, তাহার প্রমাণ তো পাইয়াছেন। কয়দিন ধরিয়া উহার মন স্থির নাই বলিয়া মনে হইতেছে। জানা যাইতেছে, তান্ত্রিক অভিচারের জন্য উহাতে কিছু বিকার আসিয়াছে। আজ সমস্ত দিন আমি উহার বিষয়ে ভাবিতেছি। মহামায়া যাওয়ার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি বৈশাখী পূর্ণিমাতে স্থান্বীশ্বরে পৌঁছাইয়া যাইবেন। সেখানে অবধূতেরও দর্শনলাভ হইবে। যদি নিপুণিকার মধ্যে কোনও বিকার দেখা দেয় তবে ভট্টকে অবশ্যই সেখানে পাঠাইয়া দিও। কাল যদি চলিয়া যান তবে কেমন হয় ভট্ট?' আমি অবাক হইয়া ভট্টিনীর দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। ভট্টিনী যে আদেশ দিলেন তাহা নিপুণিকার পরামর্শ ও কুমারকৃষ্ণের নির্দেশের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়া গেল যে আমি হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম। এ কী বিচিত্র সংযোগ! আর নিপুণিকা কি পাগল হইয়া গিয়াছে! প্রাতঃকালে তাহার আগমন, অসংগত

আলাপ, এ-সব কি উন্মাদরোগের লক্ষণ? ভট্টিনী অধিকক্ষণ ভাবিবার অবসর দিলেন না। না থামিয়াই বলিয়া গেলেন—'লোরিকদেবের রানী অন্তঃপুরে আমাদের দুইজনের স্থান করিয়া দিবেন বলিতেছিলেন; কিন্তু নিপুণিকার অবস্থা দেখিয়া সেখানে থাকা সমীচীন মনে করি না। তিনি এখানেই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। বিগ্রহবর্মাকে বলিয়া দিবেন যে সে যেন এখানেই থাকে। উহার থাকিবার ভাবনা কিছু নাই। মহাবরাহের উপর আশা রাখুন। কাল চলিয়া যান।'

আমি নিঃশব্দে মাথা নোয়াইয়া আদেশ শিরোধার্য করিলাম। কিন্তু কোথা হইতে যেন সহসা হৃদয়ে শল্য আসিয়া বিঁধিল। ভট্টিনীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! আমি যে ভাবিয়াছিলাম, আমার মন মোহমুক্ত হইয়া গিয়াছে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রম। যদি ভট্টিনীর দিক হইতে অনুমতি না মিলিত, তাহা হইলে হয়তো আমি আরও নির্বিকার থাকিতে পারিতাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিবার পরে ভট্টিনী আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বর্ষা জলে সিক্ত খঞ্জন-শাবকের মত তাঁহার সেই দৃষ্টি উপরে উঠিতে পারিল না। শীঘ্রই ফিরিয়া নীচে আসিল। ভট্টিনী একটু থামিয়া থামিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—'ভট্ট, আমি অভাগিনী। আপনিই আমাকে জীবনের সার্থকতা শিখাইয়াছেন। জানি না, কোন পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে মহাবরাহ আপনাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। আপনার সঙ্গে থাকিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আমি ভাগ্যহীনা। আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আরও দিতে থাকিব। আমি অবোধ বালিকা। নিপুণিকা আজ উন্মত্ত প্রলাপের ভিতর হইতে আমাকে আমার স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছে। কে জানে, উহার কথাই ঠিক কিনা যে, আমি আপনাকে গঙ্গায় ডুবাইবার জন্য নিজেই গঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার ক্ষণিকের জন্য মনে হইয়াছিল যে মৌখরিদের সেই নিষ্ঠুর মহারাজা বুঝি আমাকে পুনরায় বন্দী করিতে চায়। যখন বিগ্রহবর্মা আপনাকে বলিতেছিলেন যে তিনি মৌখরি, তখন আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। নির্বোধ বালিকাকে ক্ষমা করিবেন ভট্ট! নিপুণিকা বলিতেছিল যে যদি ভট্ট না থাকিত, তাহা হইলে তুমি কখনই গঙ্গার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে না। আমি আজ সমস্ত কথা ভাবিয়া দেখিতেছি, মনে হইতেছে আমার মনের কোনও অজ্ঞাত কোণে এই চিন্তা অবশ্যই ছিল যে আপনি আমাকে ডুবিতে দিবেন না—আমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। আপনি আমার দেহ মন লজ্জা শরম সমস্তই রক্ষা করিয়াছেন। ভাগ্যহীনা আমি আমার সর্বাপেক্ষা বড় হিতৈষীকে বিপদের মাঝে ফেলিয়া দিবার অপরাধে অপরাধী। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, ভট্ট!'—বলিতে বলিতে ভট্টিনী হাত জোড় করিয়া মাটিতে মাথা

রাখিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন। আমি এমন জড় হইয়া গিয়াছিলাম যে কোথাও কোনও প্রকারের সংবেদনের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারি নাই। এতখানি কাণ্ড আমার চোখের সামনে দেখিতে দেখিতে ঘটিয়া গেল, আর আমি হতসংজ্ঞ, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াই থাকিলাম! ভট্টিনী জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া আমার যেন জ্ঞান আসিল। আমি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। 'কি বলিতেছেন দেবি! নিপুণিকা উন্মাদ অবস্থায় যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহাই প্রমাণ স্বীকার করিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছেন!' ভট্টিনী চুপ করিয়া থাকিলেন। তিনি কিছুক্ষণ নিস্পন্দ দীপশিখার মত, অচঞ্চল বিদ্যুল্লতার মত, প্রফুল্ল দমনকযষ্টির মত বসিয়া থাকিলেন। পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন—'সেখান হইতে শীঘ্রই ফিরিবেন। যান।' আমি যাইতেছি, এমন সময়ে ভট্টিনী আবার ডাকিলেন। এবার তাঁহার কণ্ঠ অনেকটা পরিষ্কার। বলিলেন—'নিপুণিকার সঙ্গে দেখা করিবেন না। সময় পাইলে তাহার সখী সুচরিতার সংবাদ আনিবেন। সে ঐ দোকানের নিকটেই কোথাও থাকে। সে বড়ই ভাগ্যহীনা। আমি তাহাকে শুধু একবারই দেখিয়াছি। ভুলিবেন না।'

প্রাতঃকালে আমি স্থাণ্বীশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অনবরত অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দশদিন পরে স্থাণ্বীশ্বরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিতেই সর্বপ্রথমে সুচরিতার কথা মনে পড়িল। শুধু একবার নিপুণিকা তাহার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন সে চুপ করিয়া গিয়াছিল। ভট্টিনীর সঙ্গেও সে তাহার কথা আলাপ করিয়া থাকিবে। সে কি করিতেছে? ভাল কিছু করিতেছে না, তাহা তো স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। তাহা হইলেও বানভট্ট অবশ্য ওদিকে যাইবে। আজীবন সে নারীদেহকে পবিত্র দেবপ্রতিমা বলিয়া মনে করিয়াছে। উহা যেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক, সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু। যদিও আজ আমাকে মহা-রাজাধিরাজের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, আচার্য সুগতভদ্রকে প্রণাম করিতে হইবে, অবধূত অঘোরভৈরবের দর্শন পাইতে হইবে, তথাপি আমি সুচরিতাকে ভুলিতে পারিব না। আজ বান কি দেবপ্রতিমাকে আবর্জনায় পতিত দেখিয়া শুধু এইজন্য পাশ কাটাইয়া আসিবে যে কোনও সম্রাট বা কোনও মহাসান্ধি-বিগ্রহিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে যাইতে হইবে? না, তাহা হইবে না। কিন্তু এতটুকু তো হওয়াই চাই যে আমার কোনও আচরণে ভট্টিনীর

ভাবী মঙ্গলের ব্যাঘাত না হয়। যাহাই হউক, আমি স্থির করিলাম যে কুমার, মহারাজ ও আচার্যপাদের সঙ্গে দেখা না করিয়া কিছু করিব না।

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। এই দিন তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নির্বাণলাভও করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ নরপতির রাজধানীতে আজ যেমন উৎসব হওয়া চাই তেমনই হইয়াছিল। বীথিগুলি সুগন্ধিতে সিক্ত ছিল, পৌরভবনে মঙ্গল-পতাকার শোভা, রাজপথে সকল বাতায়ন মালতীমালায় অলংকৃত ছিল। আর পৌরজন নবীন বসন-ভূষণে সুসজ্জিত ছিল। নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেই জ্ঞান হইল যে আজ আচার্য সুগতভদ্রের ধর্মদেশনা হইবে। সম্রাট ও কুমার কৃষ্ণবর্ধন ঐদিকেই গিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র আর সব কিছু ভুলিয়া গেলাম, আচার্যপাদের ধর্মদেশনা শুনিবার লোভে আমি সেই দিকেই আকৃষ্ট হইলাম। বিহার আমার দেখা ছিল। রাজপথ শ্বেতবস্ত্রধারী নাগরিকে পূর্ণ ছিল। তাহাদের বস্ত্র, উষ্ণীষ, অঙ্গরাগ ও মাল্য, সকলই শ্বেত। মনে হইতেছিল, সকলে বুঝি রজতধারায় স্নান করিয়াছে। উপরে সৌধ-বাতায়ন হইতে যুবতীদের স্বর্ণালংকারের হরিদ্রাভ প্রভা ব্যাপ্ত হইতেছিল। নীচের শ্বেতচ্ছটার উপর সৌধ-বাতায়নের সুবর্ণচ্ছটা এমন সুন্দর মনে হইতেছিল যে যেন কৈলাস পর্বতের উপর শরৎকালের প্রভাতকালীন রৌদ্র পড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত যখন আমি বিহার পর্যন্ত পৌঁছিলাম, তখন ধর্মদেশনা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন শ্রোতাদের শংকাব সমাধান করা হইতেছিল।

বাহিরে মহারাজাধিরাজের আগমনে যত আনন্দ-উল্লাস, কোলাহল, জয়নিনাদ হইতেছিল, তাহা হইতে অনুমান করিযাছিলাম যে ভিতবেও খুব ভিড় হইয়া থাকিবে আর ঐ প্রকারেব গোলমাল চলিবে। কিন্তু যদিও বিহার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তথাপি খুব অল্পসংখ্যক লোকই ভিতরে যাইতে সাহস করিতেছিল। সভাস্থলে ভিক্ষুদেরই আধিক্য ছিল। গৃহস্থদের মধ্যে স্বয়ং মহারাজ ও তাঁহার কয়েকজন নিকটবর্তী পদাধিকারী সমাসীন ছিলেন। মহারাজের শরীরেব উপব কোনও উত্তরীয়ও ছিল না। সমস্ত শরীর সুগন্ধি অঙ্গবাগে উপলিপ্ত ছিল আব ভুজমূলে কেয়ূব ও হৃদয়ে এক মুক্তাহার ভিন্ন আর কোনও অলঙ্কারই তিনি ধারণ করেন নাই। তাঁহাকে অতিশয় শান্ত ও মনোরম দেখাইতেছিল। আচার্যের প্রতি তাঁহাব অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, আচার্যও অত্যন্ত স্নেহে তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিলেন। সমস্ত মিলিয়া সেখানে অর্ধ-সহস্র ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। অর্ধেক ছিলেন ভিক্ষু, আর অর্ধেকের মধ্যে মহারাজাধি-রাজের সামন্ত ও অন্তঃপুরেব রানীরা ছিলেন। এক সরু তিরস্করিণীর পশ্চাতে রানীদের আসন ছিল।

আমি নিঃশব্দে একদিকে বসিয়া গেলাম। আচার্য সুগতভদ্রের চিত্তে প্রসন্নভাব মনে হইতেছিল, তিনি স্মিত হাস্য করিয়া মহারাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ধীর-শান্ত ভাষায় প্রশ্ন করিলেন—'মহারাজ, আপনি এই জম্বুদ্বীপের সর্বপ্রধান চক্রবর্তী রাজা। আপনার সদ্‌বুদ্ধি হইতে প্রজাদের কল্যাণ হইবে। তথাগতের ব্যাখ্যাত ধর্মদেশনা আপনি শুনিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি মহারাজ, আপনার সন্তোষ হইয়াছে কি? আপনার মনে মৈত্রী ও করুণার ধর্মবিষয়ে কোনও সন্দেহ তো থাকিয়া যায় নাই?'

মহারাজ আচার্যদেবের নিকট প্রণত হইলেন। অল্পক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিশ্চল প্রতিমার মত ধ্যানাবস্থায় থাকিলেন। পুনরায় হাত জোড় করিয়া অনুমতি চাহিলেন—'তবে আচার্যদেবের অনুমতি আছে?'

আচার্যপাদ পুনরায় মন্দহাস্যে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন—'অবশ্য মহারাজ!'

মহারাজাধিরাজ বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলেন—'হে ভদন্ত-প্রবর, কয়দিন ধরিয়া কয়েকজন তীর্থযাত্রী যতি আমাকে ভগবান্ বুদ্ধের পূজা গ্রহণ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের উত্তর দিতে পারি নাই, আর আমার মন তাঁহাদের প্রশ্নের বিষয়ে মনন করিবার পর উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি অবিনয় মনে না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি।'

আচার্য উৎসাহের সহিত বলিলেন—'অবশ্য জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ। শংকাশল্যকে চিত্ত হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। ভগবান্ তথাগতের ধর্ম অন্ধশ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উহা যুক্তি ও বিচারের অবিরোধী, তাই উহা সদ্‌ধর্ম।'

'তাহা হইলে আচার্যপাদ, অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি যে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করিবার পরও পূজা গ্রহণ করেন কি করিয়া? দুইটি কথা হইতে পারে। প্রথম এই যে বুদ্ধ পূজা গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় লোকের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ আছে, তিনি সৃষ্টিরই অন্তর্গত, আর অন্য দশজন মনুষ্যের মত এক সাধারণ ব্যক্তি। তাহা হইলে তাঁহার পূজা নিষ্ফল হইয়া যায়, বন্ধ্য প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় কথা এই হইতে পারে যে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, লোকের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংস্রব নাই, তিনি সৃষ্টি হইতে মুক্ত। এ অবস্থায়ও তাঁহার পূজা নিষ্ফল হইবে ও বন্ধ্য বলিয়া প্রমাণ হইবে, কারণ যিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, তিনি কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না, আর এমন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজা বন্ধ্য, নিষ্ফল। হে আচার্যশ্রেষ্ঠ, আপনিই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন, আপনিই ইহার যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন।'

আচার্যের মুখমণ্ডলের উপর আবার স্নিগ্ধ-মন্দ হাসি খেলিয়া গেল। তিনি পুনরায় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—'সাধু, মহারাজ! আপনি প্রশ্নটি দ্বিধা-হীন ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন। আমি যথাবুদ্ধি এই প্রশ্নের সমাধান করিব। কিন্তু আমি আপনাকে এক প্রশ্ন করিতে চাই। অসংকোচে উত্তর দিবেন।'

'জিজ্ঞাসা করুন।'

'আচ্ছা মহারাজ, সুমহান অগ্নিরাশি জ্বলিয়া যখন নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, নিভিয়া যায়, তখন কি তৃণ-কাষ্ঠ আদি ইন্ধন গ্রহণ করে?'

'না ভদন্ত!'

'মহারাজ, সেই অগ্নি যখন উপরত-উপশান্ত হইয়া যায়, তখন কি সংসার হইতে অগ্নির প্রাদুর্ভাব একেবারে উঠিয়া যায়?'

'না ভদন্ত, ইন্ধনরূপ কাষ্ঠ অগ্নির আশ্রয়স্থান, অতএব অগ্নির কামনা যে মনুষ্য করে সে নিজের উদ্যমে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া লয়। সে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অথবা অন্য স্থান হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সেই মহান অগ্নি-রাশি উৎপন্ন করিয়া লয় এবং নিজের কাজ নির্বাহ করে।'

'এইভাবে ভগবানের কথাও বুঝিবেন। মহারাজ, মহান অগ্নিরাশি যেভাবে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ভগবানও সেই প্রকারে দশ সহস্র সংসারের উপর বুদ্ধ-লক্ষ্মী দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন। সেই মহান অগ্নি-রাশি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই প্রকারে মহারাজ, ভগবানও দশ সহস্র লোকের উপর বুদ্ধ-লক্ষ্মী দ্বারা প্রজ্বলিত হইবার পর নিরবশেষ নির্বাণ দ্বারা পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ, নির্বাণ-প্রাপ্ত অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠ আদি ইন্ধন গ্রহণ করে না, লোকহিতকারী ভগবানও সেইরূপ কিছু পরিগ্রহণ করেন না। কিন্তু মহারাজ, ইন্ধনহীন অগ্নি নির্বাণপ্রাপ্ত হইলে পর মনুষ্যেরা যেমন নিজ নিজ উদ্যমে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া নিজের নিজের কার্য সিদ্ধ করে, ঠিক তেমন ভাবেই দেব ও মনুষ্যেরা পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগতের ধাতুরত্ন হইতে স্তূপাদি নির্মাণপূর্বক শীলাদির অনুষ্ঠান করে, এবং সম্পত্তি-ত্রয় প্রাপ্ত হয়। এইভাবে মহারাজ, যদিও তথাগত কিছুই গ্রহণ করেন না, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজা সফল হইয়া থাকে, অবন্ধ্য হইয়া থাকে।'

আচার্যের স্থাপনা সহজ, মধুর ও প্রভাবশালী ছিল। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বৌদ্ধ শ্রমণ, তাঁহারা সমস্বরে সাধুবাদ দিলেন 'ধন্য মহাস্থবির সুগতভদ্র! ভদন্ত, এই স্থাপনা অদ্ভুত! আশ্চর্য, ভদন্ত, এই ধর্ম-দেশনা!' কিন্তু রাজার মুখে কোনও বিশেষ উল্লাস দেখা গেল না। তিনি কোনও চিন্তায় ডুবিয়া আছেন বলিয়া মনে হইল। আচার্যপাদ বুঝিতে পারিলেন।

তিনি বলিলেন—'আপনি কি বলেন নাই, মহারাজ, যে পূজা গ্রহণ করে না, তাহার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পূজা নিষ্ফল?'

'হাঁ, আচার্য!'

'আচ্ছা মহারাজ, প্রচণ্ড বায়ু বহিয়া যাওয়ার পর যখন উপরত-উপশান্ত হইয়া যায়, তখন তাহার বায়ুসংজ্ঞা হইতে পারে?'

'না ভদন্ত! তালবৃন্ত ও ব্যজন বায়ুর কারণ। যাহার বায়ুর প্রয়োজন, সে নিজের চেষ্টায় তাহা উৎপন্ন করিয়া নিজের তাপ প্রশমন করে।'

'তেমনই মহারাজ, শাস্তা (বুদ্ধ) দশ সহস্র লোকের উপর মৃদু-মধুর বায়ুর মত মৈত্রীরূপে বহিতে থাকেন। যেমন প্রচণ্ড বায়ু বহিবার পর উপরত-উপশান্ত হইয়া যায়, তেমনি মহারাজ, ভগবানও নির্বাণ-প্রাপ্ত হন। যেমন মহারাজ, তাপগ্রস্ত প্রাণী ব্যজনের সাহায্যে বায়ু ফিরাইয়া আনিয়া নিজেই নিজের তাপ প্রশমন করে, সেইরূপ মহারাজ, দেবতা ও মনুষ্য ভগবানের শরীর-ধাতুর সাহায্যে শীলাদির অনুষ্ঠান করিয়া নিজের ভব-তাপ দূর করিতেছে। এই প্রকারে মহারাজ, যদিও তথাগত কিছুই গ্রহণ করেন না, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজা সফল হয়, অবন্ধ্য হয়।'

'সাধু ভদন্ত! আশ্চর্য আপনার স্থাপনা, অদ্ভুত আপনার প্রতিপাদন, বিস্ময়জনক আপনার তর্কযুক্তি। আমার সমাধান হইয়া গিয়াছে।[১] কিন্তু আচার্য, তথাগত কি সর্বজ্ঞ ছিলেন? এইজন্য প্রশ্ন করি আচার্য, যে তৈর্থিক সাধুরা আমাকে বলিয়াছিলেন যে তথাগত ধ্যান করিলেই সব কিছু জানিতে পারেন, নতুবা তিনি আমাদের ন্যায় মুগ্ধ থাকেন। একথা কি সত্য, আচার্য?'

'হাঁ মহারাজ, ভগবানের সর্বজ্ঞতা ইহাতে এইভাবে ছিল যে তিনি ধ্যানে বসিয়াই সমস্ত কথা জানিতে পারিতেন। একথা সত্য। কিন্তু মহারাজ, ইহা হইতে কি ভগবানের সর্বজ্ঞতা খণ্ডিত হয়?'

'হয়, ভদন্ত।'

'তবে মহারাজ, আমি এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, ভাবিয়া উত্তর দিবেন।'

'প্রশ্ন করুন, আচার্য, আমি মন দিয়া শুনিতেছি।'

'আপনি মহারাজা, চক্রবর্তী রাজা। আপনার গৃহে অন্ন, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, শর্করা আদির কোনও অভাব নাই। যদি কোনও অতিথি আপনার গৃহে অসময়ে যায়, যখন ভোজনালয়ের পক্ব অন্ন সদ্য সদ্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তখন আপনার অতিথি সৎকারে বিলম্ব ঘটিলে কি প্রমাণ হইবে যে আপনি নির্ধন?'

'না ভদন্ত, সময়ে অসময়ে চক্রবর্তীর ভোজনাগারেও অন্ন থাকে না; কিন্তু এজন্য তাঁহাকে নির্ধন বলা যায় না।'

---

[১] মিলিন্দ পন্হো, ৪।১।২

'সেইরূপ মহারাজ, বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা সৃষ্টির প্রথম হইতে "প্রতিবন্ধ" থাকে, তখনকার মত জ্ঞানের অভাবে তিনি যে মূঢ় তাহা সিদ্ধ হয় না। তিনি ধ্যানের দ্বারাই সব কিছু জানিয়া লন। ইহাতেই তিনি সাধারণ ব্যক্তি হইতে পৃথক।'

'সাধু আর্য, আশ্চর্য ভদন্ত আপনার স্থাপনা, অদ্ভুত আপনার তর্কযুক্তি! আমার 'শংকা' দূর হইয়াছে, সন্দেহ নিরসন হইয়াছে।'[১]

কিছুক্ষণ ধরিয়া এইভাবে শংকা-সমাধান চলিতে থাকিল। পুনরায় সভা-ভঙ্গের সূচক শংখ বাজিল। মহারাজা গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার পরিচারকদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা গেল। মহারাজা বিশাল হস্তীর উপর সমাসীন হইয়া যখন চলিয়া গেলেন, তখন কুমার কৃষ্ণ আমাকে ডাকিয়া অতি সংক্ষেপে আদেশ দিলেন যে আমি যেন সন্ধ্যাকালে তাঁহার গৃহে গিয়া সাক্ষাৎ করি। যখন তিনিও চলিয়া গেলেন তখন আমি আচার্যপাদের নিকট গেলাম।

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস

মহারাজাধিরাজ আমার সহিত ভালো ব্যবহার করিলেন না। রাজসভা হইতে বাহির হইয়া আমার চিত্ত ক্ষোভ ও গ্লানিতে ভরিয়া গেল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি মিথ্যাই পৌরবীথির চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছিলাম! প্রকৃত-প্রস্তাবে তখন আমি অভিভূত ছিলাম। রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মহারাজাধিরাজ চন্দ্রকান্ত মণি দিয়া নির্মিত এক সুন্দর পর্যঙ্কের উপর এমন-ভাবে সুশোভিত হইয়া বসিয়াছিলেন যেন বজ্রভয়ে পুঞ্জিত কুলাচলের মধ্যে সুমেরু। নানা প্রকারের রত্নাভরণের কিরণে তাঁহার শরীর এমন অনুরঞ্জিত হইয়াছিল যে মনে হইতেছিল বুঝি সহস্র সহস্র ইন্দ্রধনুর দ্বারা আবৃত ব্যোম-মণ্ডলে সরস জলধর শোভা পাইতেছে। তাঁহার আসন-পর্যঙ্কের উপরে এক পট্ট-বস্ত্রের শ্বেতচন্দ্রাতপ টানানো ছিল, তাহাতে বড় বড় মুক্তাফলের ঝালর ঝুলানো ছিল। চার কোণে চার মণিময় দণ্ডে সুবর্ণশৃঙ্খল দিয়া এই চন্দ্রাতপ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুবর্ণদণ্ডে আবদ্ধ চামরকলাপ ঝলমল করিতেছিল। এক স্ফটিক মণির গোল পাদপীঠের উপর মহারাজ বামচরণ রাখিয়াছিলেন। নীলমণিনির্মিত কুট্টিম হইতে নীল জ্যোতি-রেখা নির্গত হইয়া সভামণ্ডপকে ঈষৎ নীলবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল। মহারাজ অমৃতফেনবৎ শুভ্রবর্ণ দুই দুকূল ধারণ করিয়াছিলেন, সেগুলির অঞ্চলে গোরোচনা দিয়া হংসমিথুন অঙ্কিত

[১] তুঃ—মিলিন্দ পন্‌হো, ৪।১।৩

ছিল। অতিসুগন্ধি শ্বেতচন্দনে উপলিপ্ত হওয়ায় তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল শ্বেতবর্ণের বলিয়া মনে হইতেছিল, সেই চন্দন উপলেপের উপর কমলাকারে কুংকুম উপলিপ্ত ছিল, তাহা দেখিয়া নবোদিত সূর্যকিরণের অন্তরালবর্তী কৈলাস পর্বত বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। গজমুক্তানির্মিত একখানি হার রাজাধিরাজের বক্ষঃস্থল ঘিরিয়া বিরাজিত ছিল। দুই বাহুমূলে বাঁধা ছিল ইন্দ্রনীলমণিখচিত কেয়ূর, তাহা চন্দনের সুগন্ধিতে আকৃষ্ট বলয়িত ভুজঙ্গ দিয়া শোভিত ছিল। ঈষদালম্বিত কর্ণোৎপল অত্যন্ত মনোহর দেখাইতেছিল। অষ্টমীর চাঁদের মত বিশাল ললাটপট্ট হইতে দীপ্তির মত নির্গত হইতেছিল, এবং শিরোদেশের চূড়ানিহিত বকুলমালার সুগন্ধিতে রাজসভা আমোদমগ্ন হইয়াছিল। এত বিরাট্ ঐশ্বর্য আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই বলিয়া এ সকলের এমন প্রভাব আমার উপর পড়িয়াছিল যে আমার তেজ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। মহারাজের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় করানো হইল, তখন তিনি তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন, এবং পার্শ্বেই পশ্চাদ্দিকে উপবিষ্ট মালবরাজপুত্রকে বলিলেন—'এ একজন অত্যন্ত লম্পট ব্যক্তি!'

আমার কর্ণমূল পর্যন্ত সমস্ত শিরা লাল হইয়া গেল, তীব্র মানসসন্তাপে সারা শরীর যেন পুড়িয়া গেল। মনে হইল, আমি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব। যদি বিশাল ঐশ্বর্য দেখিয়া আমি অভিভূত না হইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতাম। বস্তুতঃ আমি যখন এই ভাব কাটাইয়া উঠিলাম, তখন আমার মনে হাজার হাজার উত্তর উদ্ভূত ও বিলীন হইতে লাগিল। আমি নিজের বিষে নিজেই দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্বলিতে থাকিলাম। তখন আমার প্রাণের জন্য কোনও চিন্তা ছিল না, কিন্তু যাহা উচিত বলা যাইতে পারে এমন কোনও উত্তর দিতে পারি নাই, যাহা মহারাজাধিরাজকে বুঝাইয়া দিত যে মহারাজা হইলেই কাহারও কাহার বিষয়ে নিরঙ্কুশ বিচার করিবার অধিকার হয় না। কিন্তু ঐ সময়ে আমি মূকের মত, স্তব্ধের মত, জড়ের মত কিছুক্ষণ ধরিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। মহারাজাধিরাজ অন্যান্য কাজে লাগিয়া গেলেন। আমি যে উপস্থিত আছি সে বিষয়ে তিনি মনই দিলেন না, যে আমি একজন আছি কি নাই। ঐশ্বর্যমদ ও তেজের হানির ইহা ছিল বীভৎস প্রদর্শন। কিছুক্ষণ এই ভাবেই কাটিল। পুনরায় একবার তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। বাস্তবিক তিনিও নিজের কথার জন্য ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। আশ্চর্য এই যে সমগ্র রাজসভা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহই এই স্পষ্টতঃ প্রমাদপূর্ণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিল না। আমি খানিকটা নিজেকে সংযত করিতে পারিয়াছিলাম। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলাম—'অপরাধ ক্ষমা করুন, দেব, আপনি চক্রবর্তী রাজা। আপনার শ্রীমুখ হইতে নির্গত এই কথা পক্ষপাত-

হীন তত্ত্বজ্ঞের উপযুক্ত নয়। আপনি শ্রদ্ধাহীনের মত, অন্য নিযুক্ত ব্যক্তির মত, লোকবৃত্তান্তে অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছেন। রাজরাজেশ্বরের কি এপ্রকার নিশ্চয় করিয়া দোষারোপ করা উচিত? জানি না, কোন দুর্জন আমার বিরুদ্ধে আপনাকে কি বলিয়া রাখিয়াছেন, যাহার আধারের উপর আমাকে আত্মদোষ জানিতে না দিয়া আপনি এমন কথা বলিতেছেন? আমি সোমপায়ী বাৎস্যায়নের বিমল বংশে উৎপন্ন হইয়াছি, যথাকালে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছি, সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছি, যথাশক্তি শাস্ত্র অভ্যাসও করিয়া যাইতেছি। আমাকে কোন অপরাধের জন্য লম্পট বলা হইতেছে?'

মহারাজাধিরাজের মন একটু নরম হইল। তিনি ধীর ভাবে বলিলেন—'আমি তো এমন কথাই শুনিয়াছিলাম।' পুনরায় একবার আমার দিকে উপেক্ষার ভাবে তাকাইয়া তিনি অন্য কার্যে লিপ্ত হইলেন। না দিলেন বসিবার আসন, না করিলেন তাম্বুল-বীটিকা দিয়া সৎকার। এবার আমার ভ্রমিক্ষু মন তেজস্বী অশ্বের মত বল্গার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। মহারাজাধিরাজ আমার লম্পটতার কথা শুনিয়াছেন! আমি জানি যে ইনি লম্পটদের শরণ্য বা রক্ষক। জানি না, মৌখরিদের ছোট মহারাজার মত কতজন পাপে লিপ্ত সামন্ত ইঁহার ছায়ায় আসিয়া দুর্ধর্ষ হইয়া গিয়াছে। ইনি আমার বিরুদ্ধে শুনিয়াছেন? ভালো, কী বা শুনিয়াছেন! ইহাই তো যে আমি ছোট মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ভট্টিনীকে ছাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলাম? ইহাই আমার লম্পটতা, আর ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্যদম্ভ! ধিক্। ক্রোধে আমার অধর ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। কিছু বলিতে যাইব, এমন সময়ে কুমার কৃষ্ণবর্ধনের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল; তিনি শান্ত হইতে সংকেত করিলেন। মন্ত্ররুদ্ধ পদদলিত ভুজঙ্গের মত আমি যেমন ছিলাম, তেমনই থাকিয়া গেলাম। অল্পক্ষণ পরে মহারাজ পুনরায় আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এবার কুমার কৃষ্ণবর্ধন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন—'দেব, বাণভট্ট পবিত্র বাৎস্যায়ন বংশের তিলক, তাঁহার উপযুক্ত সম্মান হওয়া উচিত।' মহারাজাধিরাজ মৌনভাবে কুমারের কথা সমর্থন করিলেন। কুমার আমাকে চলিয়া যাইবার জন্য ইশারা করিলেন, আমি একটু ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই রাজসভা হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। আজ আমি যখন নিজের কথা ভাবিয়া দেখি, তখন এমনই মনে হয় যে যদি আমি সেদিন কিছু ঔদ্ধত্য দেখাইতাম, হঠকারিতার বশে কিছু বলিয়া বা করিয়া ফেলিতাম, তবে তাহা হইতে এক মহান্ অনর্থের সৃষ্টি হইত। সে দিন আমার অভিভূত হইয়া যাওয়া ভালই হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল মহারাজাধিরাজের সংসর্গে থাকিয়া আমি জানি যে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার হৃদয় কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সেদিন তিনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার

করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত সদয় বলা যাইতে পারে; কারণ আমার সম্বন্ধে তাঁহাকে যাহা কিছু বলা হইয়াছিল তাহা ছিল অত্যন্ত ঘৃণাকর।

যাহা হউক, সেদিন আমার মন বিক্ষুব্ধ ছিল। আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে নগরের গলিতে গলিতে প্রমত্তের মত ঘুরিতে থাকিলাম। সন্ধ্যাকালে নগর-বীথিতে প্রদীপ জ্বালাইতে আরম্ভ করিল, পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলায়ে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল, স্বচ্ছ নীল আকাশে দুই একটি নক্ষত্র চমকিয়া উঠিল। নিপুণিকার দোকান যেখানে ছিল, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই স্থানে আসিয়া পোঁছিলাম। চিনিতে আমার এতটুকু কষ্ট হয় নাই। অচিরে ভট্টিনীর কথা মনে পড়িল। সুচরিতা এখানে কোথাও থাকিত। তাহার সংবাদ লইয়া যাই না কেন? মহারাজাধিরাজের সঙ্গে আমার কোনও লেন-দেনের ব্যাপার নাই। ভট্টিনীর বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কথাও বলিতে চাহি না। কুমার কৃষ্ণবর্ধন এতই নীতিনিপুণ যে তাঁহার কথা আমার বোধগম্য হয় না। তিনি যে কি চাহেন তাহা তিনিই জানেন। আচার্য সুগতভদ্রের নিকট কিছু সাহায্যের আশা রাখি, কিন্তু তিনি তো কুমারের ভরসাতেই বসিয়া থাকিবেন। সুচরিতার নিকটে যাইতে বাধা কি? কেহ অপ্রসন্ন হইবে, সে চিন্তা নাই। কিন্তু সুচরিতা থাকে কোথায়? এখানে কে উহাকে চেনে? কাহাকেও তাহার কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত কি? এ কথা তো নিশ্চিত যে সে এখানেই কোথাও থাকে। কোনও বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করাই উচিত। কান্যকুব্জের যুবকদের আমি চিনি। তাহারা অজ্ঞকে উপহাসভাজন বলিয়া মনে করে, প্রশ্ন করিলে প্রশ্নকারীকে মূর্খ বানাইয়া আনন্দ পায়। তাই আমি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে রাস্তার উপর এক দিকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আর্য!'

'কি আয়ুষ্মন্?'

'আর্য কি এই নগরের নিবাসী?'

'দীর্ঘকাল ধরিয়া এই নগরেই বাস করিয়া আসিতেছি, ভদ্র! কিন্তু আমার নিবাস কাশীতে। এই নগরের প্রায় সমস্তই চিনি। কি জানিতে চাহেন? নবাগত কি?'

'হাঁ আর্য, কালই আসিয়াছি। আমার নিবাস মগধে।'

'কালই আসিয়াছেন? ইহার পূর্বে কখনও আসেন নাই?'

'ফাল্গুন মাসে দুই এক দিনের জন্য আসিতে হইয়াছিল, আর্য!'

বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন দেখাইল। তাঁহার বলিকুঞ্চিত কপোলপ্রান্ত মধুর হাস্যে বিকশিত হইল। বলিলেন—'তিন মাসের মধ্যে স্থাণ্বীশ্বরে অনেক

পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ঐ যে সম্মুখে বিরাট আয়োজন দেখিতেছেন, তিন মাসের ভিতরেই উহা এতখানি ব্যাপক হইয়া গিয়াছে। আজ নগরে এমন কোনও স্ত্রী নাই, যে এই বিচিত্র ধর্মাচারের ভক্তিধারায় ভাসিয়া না গিয়াছে। একদল পুরুষেও এই আয়োজনে যোগ দিয়াছে। কান্যকুব্জ বিচিত্র দেশ, আয়ুষ্মন্! কাশীতে লোকে ধর্মের নামে এভাবে প্রাণ ঢালিয়া দেয় না।'

বৃদ্ধের দুর্বলতা কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমি নিজে কাশীতে পুরাণ পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছি। এই জন্য এ বিষয়ে বৃদ্ধের কথাই প্রমাণ মনে করিবার জন্য আমার তাড়া নাই। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে মনোরম সমাচার পাইতেছি বলিয়া অল্প স্তুতি করিলাম—'কাশীর কথা অন্য প্রকার, আর্য! উহা হইল বিদ্যার পীঠস্থলী, শাস্ত্রজ্ঞানের জননী।'

বৃদ্ধ আরও উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—'আজ কয়েক মাস হইল শ্রীপর্বতের বৈষ্ণব-তান্ত্রিক বেঙ্কটেশ ভট্ট এই নগরে আসিয়াছেন।'

আমি মাঝখানে টিপ্পনী কাটিলাম—'কি বলিতেছেন আর্য! শ্রীপর্বত তো বামাচারী ও কাপালিকদের সাধনভূমি। সেখানে যে বৈষ্ণব-তান্ত্রিক সাধনাও আছে, একথা তো নূতন শুনিতেছি।'

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—'কান্যকুব্জে আসিয়াছেন, অনেক নূতন কথা শুনিবেন, ভদ্র! এই বেঙ্কটেশ ভট্ট প্রথমে উড্ডিয়ান পীঠে সৌগততন্ত্রের উপাসক ছিলেন। সেখান হইতে না জানি কি করিয়া ইনি শ্রীপর্বতে চলিয়া আসেন এবং এখন তো কান্যকুব্জকেই পবিত্র করিতেছেন। প্রথম প্রথম চপল-স্বভাবা কয়েকটি স্ত্রীই ইঁহার নিকট দীক্ষা লয়। ছোট অন্তঃপুরের নিউনিয়া নামে একজন পরিচারিকা ছিল, সেই ইঁহার নিকট প্রথম দীক্ষা লইয়াছিল। সে চট্ করিয়া কোথায় যেন অন্তর্ধান করিল। তাহার এক সঙ্গী ছিল, নাম সুচরিতা, সে এই গলিতে গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাকে এখন নগরের প্রধান ভক্তিমতী বলিয়া লোকে মানে। এখন তো এমনই অবস্থা যে সন্ধ্যা না হইতেই নগরের অন্তঃপুর নিঃশেষে উজাড় করিয়া এই আয়োজনে উপস্থিত হয়। কাংস্য-করতালের সঙ্গে সংযবক বাদ্য উন্মাদের বাতাবরণ সৃষ্টি করে, আর তাহাতে সুচরিতার গান মোহনমন্ত্রের মত সকলকে মুগ্ধ করিয়া তোলে। বেঙ্কটেশ ভট্ট যখন আবেশে নাচিয়া ওঠেন, তখন মনে হয় ভূতের রাজা বুঝি আসব পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া গিয়াছেন! আয়ুষ্মন্, ইহা বিচিত্র ধর্ম, একবার গিয়া দেখুন না।'

আমি নম্রভাবে কহিলাম—'অবশ্যই দেখিব। কিন্তু আর্য, এই সুচরিতা প্রথমে কি করিতেন?'

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন—'সমবয়সী লোকদের নিকট যথার্থ সংবাদ পাইতে পারেন, ভদ্র! আমি তো পক্ক-কেশ বৃদ্ধ।'

বৃদ্ধ এবার রসিকতা করিলেন। এবার তাঁহার মধ্যে কাশীবাসীর স্বভাব স্পষ্টই প্রকাশ পাইল। আমি মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলাম—'ক্ষমা করুন আর্য, আমি দেখিতে যাইতেছি।'

বৃদ্ধ বলিলেন—'কিন্তু আপনি তো কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছিলেন, ভদ্র!'

আমার তাড়া ছিল। 'এই সব কথাই জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, আর্য!'—বলিয়া প্রণাম করিলাম ও বিদায় হইলাম। বৃদ্ধ অনেক কিছু সংবাদ দিয়াছিলেন। আমি সোজা ঐ বিরাট পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। প্রতিমুহূর্তে ভিড় বাড়িতেছিল। সত্যই সভায় আগত ব্যক্তিদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। সকলের মুখে ভক্তি ও উল্লাসের ভাব ছিল। আচার্য বেঙ্কটেশ ভট্ট এক চন্দন-কাষ্ঠের আসনে পদ্মাসন বন্ধে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে এক প্রকার আনন্দ-গদ্‌গদ ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। আসনের ঠিক সম্মুখে এক বেদীর উপর কলশ স্থাপিত ছিল। আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, শক্তিতান্ত্রিকের শ্রীচক্র যেমন, ঠিক তেমনভাবে মাষ ও তণ্ডুল দিয়া এক ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণকে আড়া-আড়ি ভাবে বিদ্ধ করিয়া এক অধোমুখ ত্রিকোণ চক্র অংকিত আছে। ঐ চক্রের মধ্যস্থলে এক প্রফুল্ল শতদল দেখিয়া তো আমি আরও আশ্চর্য চকিত হইয়া গেলাম। আমি এতক্ষণ ভাবিয়াছিলাম যে ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ শিবতত্ত্বের প্রতীক, অধোমুখ ত্রিকোণ শক্তিতত্ত্বের। ভাগবত সম্প্রদায়ের সহিত তো ইহাদের দূর সম্বন্ধও নাই। আর এই পদ্ম তো কোনও প্রকারে সেখানে চলিতেই পারে না, কারণ পদ্মের সঙ্গে বজ্রও থাকা চাই। তেমন হইলে তো সৌগততন্ত্রই ইহাকে গ্রহণ করিত, কিন্তু ইহা তো অদ্ভুত মিশ্রণ। মগধের সাধারণ মনুষ্যেরাও এই অনুষ্ঠানের বিরোধ না করিয়া থাকিত না; কিন্তু কান্যকুব্জ বিচিত্র দেশ। এখানে লোকে বাহিরের আচারের তিলমাত্র পরিবর্তনও সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানে প্রতিদিন নূতন নূতন উপাদান মিশ্রিত হইতে থাকে। যাহা হউক, ইহা অতি মনোরম অনুষ্ঠান। আমার এইজন্য আরও আনন্দ হইতেছিল যে এই বেঙ্কটেশ ভট্ট নিপুণিকারও গুরু, আর সম্ভবত এই জাতীয় অনুষ্ঠানের আদি সঞ্চালিকাও নিপুণিকাই হইবে। কিন্তু সে কেন কখনও আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে নাই? কিছু কারণ অবশ্যই ছিল। আমি আরও মন দিয়া চক্রটি দেখিলাম, কেন্দ্রস্থলে যেখানে পদ্ম ছিল, তাহার চার দিকে সিঁদুর দিয়া এক গোল চক্র অংকিত ছিল। ইহাই কি ছিল এই সাধনার বজ্র? পদ্মের উপর স্থাপিত ছিল এক তাম্রঘট। ঘটের উপর আম্রপল্লব ছিল, আর

তাহারও উপরে এক তাম্র পাত্রে যব ভরা ছিল। এখন দীপ স্থাপনের ক্রিয়া চলিতেছিল। আচার্যের দক্ষিণে এক বৃদ্ধ পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন, আর একজন যুবতী তাঁহার নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছিল। আমি প্রথম অনুমানেই স্থির করিলাম, এ-ই সুচরিতা। পুরোহিতের দীপদান করিবার সময়ে সংকল্পবাক্য হইতে আমার অনুমান যে সত্য, তাহা সিদ্ধ হইল।

সুচরিতার আপাদমস্তক শুভ্র কৌশেয়বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত ছিল। তাহার মুখ গুরুর দিকে ফিরানো, তাই আমি দূর হইতে ঠিক ঠিক দেখিতে পারি নাই। তাহার শরীর ছিল অতিশয় কৃশ, শ্বেতবস্ত্রে আবৃত বলিয়া নারায়ণের স্মিতরেখার মত দেখাইতেছিল। তাহার প্রত্যেক কাজে এক প্রকারের গৌরব ছিল। প্রদীপন্যাসের সংকল্প পঠিত হইবার পরে সে কলশের উপর সহজেই তাহা রাখিয়া দিল না। অতি সুকুমার ভঙ্গীতে প্রদীপ উঠাইল, ত্রিপতাকা মুদ্রায় বাম করতল মুদ্রিত করিল, আর প্রদীপের উপর দক্ষিণমুখে ঘুরাইল। সব কিছুই সে করিল অতি সহজভাবে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল যে দীর্ঘ-কালের অভ্যাসের কারণ তাহার হাত আপনা আপনি ঘুরিতেছিল। বাম হাত দিয়া সে আঁচল টানিয়া গলায় জড়াইল, আর ভক্তিভরে জানু পাতিয়া বসিল। মনে হইতেছিল, গুরুপূজাই তাহার অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। গুরুর সম্মুখে বারকয়েক প্রদীপ ঘুরাইবার পর সে দাঁড়াইয়া গেল আর একবার প্রদক্ষিণান্তে সেই প্রকার জানুর উপর ভর করিয়া দাঁড়াইল। প্রদক্ষিণের সময় তাহার হাত সর্বদা প্রদীপটিও দক্ষিণমুখে ঘুরাইতেছিল।

এইবার আমি তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম। তাহার বর্ণ ছিল মলিন; কিন্তু চোখে ছিল অপূর্ব মাধুর্য। অধরে স্বাভাবিক হাসি খেলিয়া যায় যে বস্তু—যাহাকে সৌন্দর্যশাস্ত্রী 'রাগ' বলেন—তাহা এই গম্ভীর মুখশ্রীতেও প্রত্যক্ষ হইতেছিল। তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে ভক্তির লহর তরঙ্গায়িত হইতেছিল: কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝিতে পারিত যে সে 'ছায়াবতী'—কারণ তাহার প্রতি গতিবেখায় বক্রভাব ও পরিপাটী বিহিত শিষ্টাচার ফুটিয়া উঠিতেছিল। সহৃদয় ব্যক্তিরা মনোরঞ্জনের যে গুণকে 'সৌভাগ্য' বলেন, যাহা পুষ্পস্থিত পরিমলের মত রসিক ভ্রমরের আন্তরিক ও প্রাকৃতিক বশীকরণ ধর্ম, তাহা সুচরিতার গঠনে যথেষ্ট ছিল। শোভা ও কান্তি তাহার প্রতি অঙ্গ হইতে বিকীর্ণ হইতেছিল। আমার একটুও সন্দেহ ছিল না যে বর্ণ ও প্রভায় কৃপণতা করিলেও অন্যান্য শোভাবিধায়ী ধর্মে বিধাতার পক্ষপাত এই নারীরত্নের উপরই পড়িয়াছিল। এদিকের নারীদের মধ্যে প্রক্ষেপ্য ও আবেধ্য অলংকারের বড়ই প্রচলন আছে। কিন্তু সুচরিতার কর্ণদ্বয়ে এক চক্রাকৃতি কুণ্ডল ব্যতীত আর কোনও আবেধ্য অলংকারই ছিল না, প্রক্ষেপ্য অলংকার

তো সে পরেই নাই—মঞ্জীর, নূপুর, কনকমেখলা—কিছুই নয়। আরোগ্য অলংকারের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ আছে বলিয়া মনে হইতেছিল; কিন্তু তাহাতেও শুধু এক স্বর্ণহার আর মালতীমালা ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাইতেছিল না। মালতীমালার জন্য সম্ভবত সুচরিতার গায়ের রংই উচিত অলংকার। আমি মালতীমালা কখনও এত সুন্দর দেখি নাই। বারবার বরাহমিহিরের কথা মনে পড়িতে লাগিল; তাঁহার সহৃদয়তার কথায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতিই রত্নকে ভূষিত করেন; রত্ন স্ত্রীজাতিকে কি ভূষিত করিবে। স্ত্রীজাতি রত্ন বিনাও মনোহারিণী হন; কিন্তু স্ত্রীজাতির অঙ্গসঙ্গ না পাইলে রত্ন কাহারও মনোহরণ করে না।[১] আজ যদি আচার্য বরাহমিহির উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে আরও অগ্রসর হইয়া বলিতেন—ধর্মকর্ম, ভক্তিজ্ঞান, শান্তিসৌমনস্য, নারীর স্পর্শ না পাইলে কিছুই মনোহর হয় না—নারীদেহ সেই স্পর্শমণি, যাহা প্রতিটি ইটপাথরকেও সোনা করে।

মরকতশলাকার মত তন্বঙ্গী সুচরিতা দীপদানের পর জোড়হাতে গুরুর সামনে বসিয়া গেল। পুনরায় বিবিধ উপচারের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের পূজা আরম্ভ হইল। পূজা সমাপ্ত হইলে বেঙ্কটেশ ভট্ট আনন্দগদ্‌গদ স্বরে নারায়ণের স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সংঘবক বাদ্য গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল; কাংস্য, কোশী ও করতাল ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র নরনারীর কণ্ঠে নারায়ণের স্তুতি উচ্ছলিত হইল। মনে হইল আমি বুঝি অন্য জগতে আসিয়াছি। সংগীত ও বাদ্যের এই অপূর্ব মিশ্রণ আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। এ ছিল একেবারে নূতন বস্তু। ধর্মালোচনার এ ছিল অভিনব আয়োজন। বায়ুমণ্ডলের স্তরে স্তরে নারায়ণের স্তুতি মুখরিত হইতেছে মনে হইল, দিক্‌চক্রবালের প্রত্যেক কোণ সংঘবকের গম্ভীর ধ্বনিতে গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া এমনি চলিতে থাকিল। পুনরায় সকলে নিঃশব্দ হইল। গুরুর আদেশে সুচরিতা শংখ বাজাইল। আমি পুনরায় আশ্চর্যচকিত হইয়া গেলাম। আমি এ অঞ্চলে কোথাও স্ত্রীজাতিকে শংখ বাজাইতে দেখি নাই। কিন্তু এই সাধনভজন তো ছিল সর্বপ্রকারেই বিচিত্র। এইবার বেঙ্কটেশ ভট্টের নামকীর্তন আরম্ভ হইল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দীর্ঘ পূর্ণাবয়ব সুগঠিত শরীর, কপাটের মত বিপুল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, মৃদঙ্গমন্দ্র স্বর। কোনও ভূমিকা না করিয়াই তিনি

[১] রত্নানি বিভূষয়ন্তি যোষা ভূষ্যন্তে বনিতা ন রত্নকান্ত্যা।
চেতো বনিতা হরন্ত্যরত্না নো রত্নানি বিনাঙ্গনাঙ্গসঙ্গাৎ॥
—বরাহমিহির, বৃহৎ সংহিতা, ৭৪।২

বলিলেন—'নারায়ণের চরণারবিন্দ দুই তিনজন পাপীকে উদ্ধার করিতে পারে; কিন্তু তাঁহার নাম সমস্ত লোকের দুঃখ নিঃশেষে দূর করিবে ব্রত লইয়াছে।' আমার নিকট এই উপদেশ বিচিত্র। কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

> স্বিদ্বান্ সমুদ্ধর্তুমলং বভূব পদারবিন্দাশ্রয়ণং মুরারেঃ।
> অশেষসংক্লেশশমং জনানাং নিত্যং বিধত্তে বসুধাম নাম॥[১]

পুনরায় ভাবাবিষ্টের মত হইয়া কোন এক বিশেষ সুরে 'নারায়ণ, নারায়ণ' গাহিতে গাহিতে নাচিয়া উঠিলেন। পুনরায় সংঘবক গম্‌গম্ করিয়া উঠিল, কাঁস্য, কোলী ও করতাল ঝন্‌ঝন্ করিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠে ঐ সুরে নারায়ণের নাম জপিতে লাগিল। গুরুর সেই অদ্ভুত ভাব-বিহ্বল অবস্থা। বাস্তবিক পক্ষে, তিনি দুই একবার অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সুচরিতা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত হাত জোড় করিয়া বসিয়া থাকিল। এই ভজন চলিল অনেকক্ষণ ধরিয়া, সর্বশেষে সুচরিতার গান। আহা, সংগীতের এইরূপ শীতল মন্দাকিনীও এই মর্ত্যলোকে আছে! সমস্ত জনমণ্ডলী জড়ের মত স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে ঐ মধুর ধারায় স্নান করিতে থাকিল। গান সমাপ্ত হইলে সকলে যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল। ধীরে ধীরে ভিড় কম হইতে লাগিল। গুরুকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ততা শিষ্যদের মধ্যে দেখা গেল। সুচরিতা শেষ পর্যন্ত সভামণ্ডপেই থাকিল। সকলে বিদায় হইয়া গেলে, কয়েকজন সেবকের উপর ঐ মণ্ডপের দ্রব্যসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া সেও বাহির হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া আমি তাহার নিকট গেলাম।

সুচরিতা যখন তাহার গৃহদ্বারে পৌঁছিয়াছে, তখন আমি সাহস করিয়া ডাকিলাম 'শুভে, যদি অনুচিত না মনে করেন তবে আমি কিছু নিবেদন করি।' সে তখনই ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমার নিকটে আসিয়া বলিল—'কিছু সেবা করিতে পারিলে তো, আর্য, আমি ধন্য হইয়া যাই। কি আজ্ঞা?' সুচরিতার সমস্ত শরীরই ছিল ছন্দে গড়া। তাহার বস্ত্র, তাহার পদ-বিক্ষেপ, তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার দৃষ্টি - সব কিছুই ছিল ছন্দোময়। তাহার এই কথার মধ্যেও বীণার মত ঝঙ্কার ছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিলাম। অল্পক্ষণ পরে সে-ই আবার বলিল—'কি কাজ রহিয়াছে, আর্য! আমি অবহিত আছি।' পুনরায় সেই ঝঙ্কার। আমার রোম—রোম পুলকিত কদম্বকেসরের

[১] অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কুতঃ পুনস্তচ্চরণারবিন্দপরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা॥ ভাগবত, ২।৭।১৪

মত উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। বিলম্ব করা অনুচিত হইবে ভাবিয়া বলিলাম—'আমি বিদেশী, শুভে! যদি কিছু অনুচিত বলি তো ক্ষমা করিবেন। ছোট অন্তঃপুরের নিপুণিকা নামে পরিচারিকাকে কি আপনি জানিতেন?'

সুচরিতার বড় বড় কালো চোখ মুহূর্তের মধ্যে ধূসর হইয়া গেল। সে আমাকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল, আর শঙ্কা ও অবিশ্বাসের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? কাহাকে খুঁজিতেছেন? ইহাই আমার বাড়ি। ইহা ছাড়া অধিক কোনও কথা আমি আপনাকে বলিতে পারি না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' শংকার কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম। নম্রতাপূর্বক উত্তর করিলাম—'শুভে, এইটুকু পরিচয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনি সুচরিতা দেবী, আর আপনার নিকটই আমি এই সংবাদ লইয়া আসিয়াছি যে আপনার সখী নিপুণিকা জীবিত আছে। তাহার নিজের উপর যে কার্য-ভার লইয়াছিল তাহা অনুষ্ঠানে সে সফল হইয়াছে। আমার উপর এইটুকু বলিবার ভার ছিল। ইহার পরে আপনি যাহা বলেন, আমি আমার বলিবার যাহা ছিল তাহা বলিয়া ফেলিয়াছি। এখন বিদায় লইতেছি।' এই পর্যন্ত বলিয়া আমি নম্রভাবে মাথা নোয়াইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলাম। সুচরিতা অল্প কিছুক্ষণ পর্যন্ত চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। পুনরায় ধীরভাবে আমাকে ডাকিল—'ভদ্র, আপনি অপ্রসন্ন হইয়া যাইতেছেন কী? শুনুন।' আমি পূর্ববৎ বিনম্রভাবে বলিলাম—'এমন কে পাষণ্ড আছে যে আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইতে পারে, দেবি? আপনার অবিশ্বাস ও আশঙ্কার কারণ আমি বুঝিতে পারি।' সুচরিতা এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিল—'আর্যের নাম জানিতে পারি?' আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—'দেবি, লোকে আমাকে বাণভট্ট বলিয়া জানে, কিন্তু আমার প্রকৃত নাম দক্ষভট্ট। আমি মগধ হইতে আসিতেছি।' নাম শুনিয়াই সুচরিতা গলায় আঁচল জড়াইয়া জোড় হাতে প্রণাম করিল। কাতর-ভাবে বলিল—'আর্য, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। অজ্ঞজনের অপরাধ সজ্জনেরা মনে রাখেন না। আপনার নাম শুনিয়াছি। যদি আজ্ঞা হয় তবে ভিতরে গিয়াই এ বিষয়ে আর্যকে জিজ্ঞাসা করি।' আমি সম্মত হইলাম।

সুচরিতার গৃহ ক্ষুদ্রায়তন, কিন্তু খুবই সুরুচির পরিচায়ক। দ্বারদেশ হইতে রাজমার্গ পর্যন্ত গোময়ে উপলিপ্ত ভূমি খটিকচূর্ণের অভিরাম মণ্ডলী-দ্বারা সুশোভিত ছিল। চৌকাঠের উপর নারায়ণের মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। আর তাহা ঘিরিয়া মনোহর মালতীমালা সুন্দর করিয়া টানানো ছিল। দুই পার্শ্বে ছোট ছোট বেদিকার উপর মঙ্গলকলশ সুসজ্জিত ছিল, আর ঘরের উপর সৌভাগ্যপতাকা ঢেউ খেলিতেছিল। সে বড় আগ্রহ ও প্রেমের সঙ্গে আমাকে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তাহার কোন

ব্যবহারে সংকোচ বা ইতস্ততের ভাব ছিল না; তথাপি এক সহজ সৌকুমার্যের জন্য সমস্ত কিছু অতিশয় কমনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল। ঘরের ভিতরে দ্রব্যাদি খুব অল্প ছিল, কিন্তু উহাদের এমন ভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল যে শোভা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। ক্ষুদ্র এক কক্ষে দুইখানি তৃণাস্তরণ পাতা ছিল। পূর্বদিকে গোপাল বাসুদেবের মনোহর মূর্তি, আর তাহার পার্শ্বে ধূপবর্তিকা জ্বলিতেছিল। ঘরে এক দাসী ছিল, সে প্রদীপাদি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। সুচরিতা স্বাভাবিক সরল মৃদু হাসির সহিত আমাকে এক তৃণাস্তরণে বসিতে অনুরোধ করিয়া নিজে দ্বিতীয় আসনে উপবিষ্ট হইল।

অল্পক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকার পর সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল 'ও অভাগী তবে এখনও বাঁচিয়া আছে!' সুচরিতার প্রত্যেক আচরণে এক সহজ আভিজাত্যের গৌরব ছিল। তাহার বসায়, কথায়, এমনকি নিঃশ্বাস ফেলায় পর্যন্ত এক প্রকারের মহনীয়তা ছিল। আমি এক দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে নিজের মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে সে পুনরায় আরম্ভ করিল -'আর্য, আজ আমার পরম ভাগ্য যে আপনার দর্শনলাভ হইল। নিপুণিকার নিকট আপনার কথা অনেক শুনিয়াছি। সে আপনার নাম না করিয়া সাধারণের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তাও চালাইতে পারিত না। অনেকদিন হইতে আমার মনে সাধ ছিল যে আপনার দর্শনলাভ করি; কিন্তু আমাদের তেমন ভাগ্য হইবে কোথা হইতে। আজ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমার অবিনয়পূর্ণ আচরণে আপনার ক্লেশ হইয়াছে। এখানে রাজার শাসন বড় সতর্ক, আর্য! রাজার দিক হইতে নিপুণিকার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। হায় অভাগী!' এই কথা বলিয়া সে পুনরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মুহূর্তকাল পরে সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি তাহাকে কোথায় দেখিলেন, আর্য?' আর নিজে দীর্ঘায়ত কৃষ্ণবর্ণ নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি সংক্ষেপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইয়া দিলাম। সে কখনও বিস্ময়ে কখনও আনন্দে মগ্ন হইতে থাকিল। সমস্ত কথা শুনিবার পর সে বাসুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞভাবে দৃষ্টিপাত করিল। পুনরায় আমার দিকেও অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকাইয়া বলিল -'আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পাইয়াছি।' আবার অতি সংকোচে প্রশ্ন করিল 'নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করিতে আর্যের কোনও আপত্তি হইবে না তো?' আমি উল্লাসভরে উত্তর দিলাম, 'কোনও আপত্তি হইবে না, দেবি, ব্রাহ্মণ প্রস্তুত।' মুহূর্তের মধ্যে সুচরিতার খিন্ন গম্ভীর মুখ সরল হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে প্রসাদের আয়োজন করিবার জন্য উঠিয়া গেল। আমি ঘরে একা বসিয়া রহিলাম।

আমি মন দিয়া বাসুদেবের মূর্তিটি দেখিলাম। যে শিল্পী এই মনোহারিণী মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয় একজন বড় দরের নিপুণ কলাকার ছিলেন। বিদ্যুৎপ্রতিকার আধারের উপর ত্রিভঙ্গ মূর্তি; একই পাথর কাটিয়া নির্মিত। বিষ্ণুমূর্তির ইহা ছিল সম্পূর্ণ নূতন বিধান; কারণ ত্রিভঙ্গ রূপ শৃঙ্গার রসের ব্যঞ্জক। এ পর্যন্ত আমি এ প্রকারে প্রস্তুত বিষ্ণুমূর্তি দেখি নাই। বাসুদেবের গলায় মালার মত একটা কিছু দেখা যাইতেছিল। সম্মুখে এক অষ্টদল পদ্মের ভিতরে ঐ প্রকারের ঊর্ধ্বমুখ ও অধোমুখ ত্রিকোণ অংকিত ছিল, সায়ংকালীন উপাসনার সময় কলশ-স্থাপনের জন্য অংকিত যন্ত্রে যেমন দেখিয়াছিলাম। পদ্মের ভিতরে বজ্র ছিল আর বাহিরে চতুর্দ্বার। অংকনের ভঙ্গীও ছিল বড় মনোহর। আমি আরও একটু কাছে গিয়া যাহা দেখিলমা, তাহাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। এই যন্ত্রের ভিতরে নানারূপ বীজ বিন্যাসের পর কাম-গায়ত্রী লেখা ছিল। একবার ঐ বাসুদেবের দিকে তাকাইতে-ছিলাম একবার এই গায়ত্রীর দিকে। কী বিচিত্র মিশ্রণ! ইহা কি কামের মূর্তি? তাহা তো হইতে পারে না। আমি কি দেখিতেছি—বিষ্ণুমূর্তি আর কাম-গায়ত্রী—ওঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।° আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম না। মন দিয়া বাসুদেবের মূর্তিটি দেখিতে লাগিলাম। আমি যখন এই প্রকার আশ্চর্য ও বিস্ময়ে উল্লসিত হইয়া বসিয়াছিলাম, ঠিক তখনই সুচরিতা গৃহে প্রবেশ করিল। সে স্নান করিয়া ফিরিয়াছিল। সদ্যঃস্নানে তাহার কান্তি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ কপোল বেষ্টিত করিয়া সুশোভিত হইতেছিল। পীত কৌশেয় বস্ত্রে আবৃত তাহার অঙ্গযষ্টি সুবর্ণশলাকাবৎ মনোহর দেখাইতেছিল। তাহার হাতে বাসুদেবকে নিবেদন করিবার জন্য কিছু সামগ্রী ছিল। রূপার থালায় সে সামগ্রী সাজানো ছিল। গোলাকার উজ্জ্বল থালা হাতে তাহাকে সপুষ্পা চন্দ্রমল্লিকার মত দেখাইতেছিল। তাহার দক্ষিণ হস্তে ছিল এক তাম্রময় ভৃঙ্গার—সে মূর্তিমতী ভক্তির মত, বিগ্রহবতী শোভার মত, প্রত্যক্ষ আবির্ভূতা লক্ষ্মীর মত, অনুরাগবতী সন্ধ্যার মত হৃদয়কে এক অপূর্ব রসে সিক্ত করিতেছিল। আমাকে এ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কিছুটা লজ্জিত হইল। আমিও ঈষৎ লজ্জা পাইলাম। পুনরায় আমি আসিয়া ধীরে নিজের আসনে উপবেশন করিলাম। সুচরিতা ভক্তিপূর্বক সামগ্রীগুলি বাসুদেবের চরণে রাখিয়া দিল, গলায় আঁচল জড়াইয়া জানুপাতপূর্বক প্রণাম করিল, আর কিছুকাল ধ্যানগদ্গদ হইয়া ঐ প্রকারে থাকিল। সে নির্নিমেষে

° পরবর্তী কালের বৈষ্ণবদের মধ্যে কোনও কোনও সম্প্রদায় আজও কামগায়ত্রী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন।

বাসুদেবের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। মনে হইতেছিল যে বাসুদেব সেই নীল কমলমালার মত ভক্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। সুচরিতার ভক্তিসমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হইয়া গেল। না পড়িল কোনও মন্ত্র, না গাহিল কোন স্তব, না হইল অন্য কোনও বিধির অনুষ্ঠান, শুধু মানস-নিবেদনের সঙ্গে এই পূজা সমাপ্ত হইল। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহাতে এক বিচিত্র গরিমা ভরা ছিল।

সুচরিতা যখন পাদ্য অর্ঘ দিয়া আমাকে আসনে বসাইল, তখন আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—'শুভে, অন্যরূপ কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা কথা জানিতে চাই।' সুচরিতা প্রীতি ও উৎসাহের সহিত বলিল—'আমি অজ্ঞ, আর্য, কিন্তু যদি কিছু সেবা করিতে পারি তাহা হইলে ইতস্ততঃ করিব না। কি আদেশ, বলুন।' সুচরিতার কালো বড় বড় চোখ উৎসুকতায় ভরা। আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এই বাসুদেবের মূর্তি পূজা আরাধনার বিষয়ে জানিতে চাই। দেবি, আমি আজ সন্ধ্যা হইতেই ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার মনে সন্দেহের পর সন্দেহ জমিয়া যাইতেছে, সমাধান কিছু দেখিতেছি না।' সুচরিতার চক্ষু এক বিচিত্র আনন্দজ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল—'আমিও বুঝিতে পারিতেছি না আর্য, কিন্তু এইটুকু জানি যে আজ হইতে তিন মাস পূর্বে আমি নিজেকে পাপলিপ্ত মনে করিতাম। এখন আমার মনের এই বিকল্প দূর হইয়া গিয়াছে। আপনি আমার গুরুদেবকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি ঠিক ঠিক বুঝাইয়া দিতে পারিবেন।' সুচরিতার কথায় আমি কোনও উত্তর দিলাম না। শুধু অবাক হইয়া তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ সে অভিভূতের মত বসিয়া থাকিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—'মানবদেহ শুধু দণ্ড ভোগ করিবার জন্যই গঠিত হয় নাই, আর্য। ইহা বিধাতার সর্বোত্তম সৃষ্টি। ইহা নারায়ণের পবিত্র মন্দির। প্রথমে এই কথাটা বুঝিতে পারিলে এত পরিতাপ ভুগিতে হইত না। গুরু আমাকে এখন এই রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহা নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় কলুষ মনে করিতাম, উহা আমার সবচেয়ে বড় সত্য। আর্য, লোকে কেন নিজের সত্যকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারে না?'

সুচরিতার দৃষ্টি নীচের দিকে নত হইয়াছিল। সে আমার জন্য আসন ও আচমনীয় প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার আনত নয়ন আরও সুন্দর মনে হইতেছিল। শুধু একবার সে চোখ উঠাইয়া আমার দিকে দেখিল। আমি আরও শুনিবার জন্য উৎসুক ছিলাম। তাহার কথা আমার মনে আদৌ ঢুকিতেছিল না; কিন্তু তাহার প্রতিটি শব্দে এমন এক গুরুতা ছিল যে আমি উহা গভীর শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদার সঙ্গে শুনিতেছিলাম। সে তাহার প্রশ্নের

উত্তর চাহে নাই। উত্তর তাহার মিলিয়া গিয়াছিল। 'এ শরীর নরকের সাধন, ইহা মনে করা ভুল, আর্য। ইহাই বৈকুণ্ঠ। ইহা আশ্রয় করিয়া নারায়ণ নিজের আনন্দলীলা প্রকট করিতেছেন। আনন্দ হইতেই এই ভুবনমণ্ডল উদ্ভাসিত। আনন্দ হইতেই বিধাতা সৃষ্টি উৎপন্ন করিয়াছেন। আনন্দই তাহার উদ্গম, আনন্দই তাহার লক্ষ্য। লীলা ভিন্ন এই সৃষ্টির আর কি প্রয়োজন হইতে পারিত আর্য? হায় গুরো, প্রথমে এই কথা আমি বুঝিলাম না কেন?'—সুচরিতার প্রফুল্ল মুখ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কথা বলিয়াই সে আনন্দ পাইতেছিল; কিন্তু তাহার প্রতিটি শব্দ ছিল আমার পক্ষে দুর্বোধ্য। আমার এমন মনে হইতেছিল যে উহার শব্দের অন্তরালে আরও কিছু আছে যাহা উহাকে অভিভূত করিতেছে। আসন সাজাইয়া সে আমাকে উহাতে বসিতে বলিল। আমি নীরবে তাহার আদেশ পালন করিলাম।

প্রসাদের মধ্যে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন ছিল। সুচরিতার পরিবেশনেও এক নিজস্ব সৌকুমার্য ছিল। কল্পতরুর কিশলয় হইতে অভীষ্ট ফল যখন খসিয়া পড়ে, তখন তাহা বুঝি এমনই মনোহর হয়। প্রসাদ দিয়া সে জোড়হাতে বসিয়া থাকিল। তাহার চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া ছিল। তাহাতে ছিল অলৌকিক তৃপ্তি। আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—'নারায়ণের প্রসাদ পাইয়া আজ কৃতার্থ হইলাম, দেবি! নারায়ণও এই উপায়ন পাইয়া নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইয়া থাকিবেন।' সুচরিতার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ ছিল। তাহাকে বলিবার জন্য কিছু আয়াস স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু তাহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল হইতে আনন্দ উল্লসিত হইতেছিল। আর্দ্র হাসির সঙ্গে সে বলিল—'আর্য, নারায়ণ মানুষের বাহিরে থাকেন না তো? আপনি প্রসন্ন হউন, তবে নারায়ণ নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইবেন। আপনি তো নারায়ণেরই রূপ, আর্য।' আবার সে অকারণে অন্যমনস্ক হইয়া গেল। অশ্রুসিক্ত নয়নে বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজে নিজেই বলিতে লাগিল—'মন বড় পাপী, গুরুদেব, কবে সে মানুষকে নারায়ণের রূপে দেখিব?' মুহূর্তের জন্য সর্বহারার মত থাকিয়া সে আমার দিকে মুখ ফিরাইল— অধরের উপর সরল স্মিত রেখা খেলিয়া যাইতেছিল, কপোল-প্রান্ত স্ফুরিত হইতেছিল, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। আমার দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—'আর্য, ভট্টিনীর কি করিবেন?' আমি কি উত্তর দিব, বুঝিতে পারিলাম না। বাতাবরণ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় এমন পরিব্যাপ্ত ছিল যে মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল— 'নারায়ণই করিবেন, দেবি, আমি তো নিমিত্ত মাত্র।' সুচরিতা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—'হাঁ আর্য, নারায়ণই এই তরণীর কর্ণধার। আমরা তো তুফান দেখিয়া মিছাই হায় হায় করিতে পারি। আর্য, মন কেন বুঝিতে পারে না যে কেহ কোনও কার্যের জন্য দায়ী নহে? কেন সে বাসুদেব থাকা সত্ত্বেও অনর্থক এত

চিন্তা করে?' আবার সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল। আমি বিদায় লইবার জন্য অনুমতি চাহিলাম। অনুমতি দিতে সুচরিতার কষ্ট হইল, কিন্তু সে কিছু বলিল না। সে বহির্দ্বার পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিল। বিদায়-নমস্কারের পর কাতরস্বরে বলিল—'কাল সূর্যাস্তের পূর্বে আর্যের দর্শন লাভ করিতে পারিব না?' আমি উৎসাহের সঙ্গে বলিলাম 'অবশ্যই, দেবি।' এই কথা বলিয়া আমি কুমার কৃষ্ণবর্ধনের অতিথিশালাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আমার মন অনবরত সুচরিতার বিষয়েই ভাবিতেছিল। আমি এখনও তাহার পুরা পরিচয় লইতে পারি নাই; কিন্তু যেটা পাইয়াছিলাম তাহাতে সহজেই বুঝিয়াছিলাম যে সে শ্রদ্ধাভাজন মহিলা। কিন্তু কাশীর সেই বৃদ্ধ কি বলিতে চাহিয়াছিল? সুচরিতার বিষয়ে স্থাণ্বীশ্বরের ভ্রান্ত ধারণা কি ছড়াইয়া পড়িয়াছে? কিছু বুঝিতে পারি নাই। অল্পক্ষণ পরে আমি আমার বিশ্রামস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম যে অত্যন্ত আবশ্যক পত্র লইয়া কুমারের দূত অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছে।

এক ক্ষৌমবস্ত্রের পুঁটুলিকায় তিনখানি পত্র জড়ানো ছিল। আমি সাবধানে পুঁটুলিকা খুলিলাম। ভিতরে কর্পূরকাষ্ঠের মনোহর পাটী ছিল। তাহার চারিদিকে লাক্ষারস দিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছিল কল্পলতা। মধ্য ভাগে ছিল মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষদেবের মুদ্রা। আমি বিস্ময়ে ও কৌতুকে অভিভূত হইয়া গেলাম। পাটীর নীচে ভূর্জপত্রের পঞ্চভঙ্গী পত্রিকা। পাঁচ ভাঁজ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম পত্রিকা মিত্রতা স্থাপনের জন্য লেখা হইয়াছে। আমি উহা অতিশয় আগ্রহের সহিত খুলিলাম। উহা ছিল মহারাজাধিরাজের আদেশপত্র। উহাতে আমাকে তাঁহার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করা হইয়াছিল, আর আমি সম্রাটের হস্তে তাম্বুলবীটিক পাইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কাল প্রাতঃকালে সভাপণ্ডিতের বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া ছিল। পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি থাকিল না যে আমি সম্রাটের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হইবার সম্মান পাইতে পারিয়াছি! আজ সম্রাট্ যাহাকে 'লম্পট' বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, সেই কাল হইতে সম্রাটের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি হইতে পারিবে! আমি বিস্ময় ও কুতূহলের সহিত দ্বিতীয় পত্রটি খুলিলাম। ইহাতে চারটি ভাঁজ ছিল। আমি প্রথমে একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম, চার ভাঁজের পত্র তো অধীনস্থ সামন্তের পদগৌরব বাড়াইবার জন্য লেখা হয়। আমি আবার কবে মহারাজাধিরাজের সামন্ত ছিলাম! কিন্তু পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহা ভদ্রেশ্বর দুর্গের সামন্ত লোরিকদেবের নামে। সম্রাট্ তাঁহাকে চরণাদ্রির পূর্বে ও গঙ্গার উত্তরতটস্থ প্রদেশের প্রধান সামন্ত করিয়া নিজের অনুগ্রহ

দেখাইয়াছেন, এবং সম্রাটের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বাৎস্যায়নবংশীয় বাণভট্টের যথোচিত সম্মান ও সাহায্য দানের জন্য আদেশ দিয়াছেন। ইহা ছিল দ্বিতীয় প্রহেলিকা। তৃতীয় পত্র খুলিলাম। ইহার উপর ছিল কুমারের মুদ্রা। তিনি মহাসান্ধিবিগ্রহিকের আসন হইতে সম্রাটের বিশ্বস্ত সভাসদ বাৎস্যায়নবংশীয় পণ্ডিত বাণভট্টকে প্রয়োজনীয় কার্যে কাল প্রাতঃকালে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমার বুঝিতে দেরি হইল না যে কুমার কোন ভারী কূটনীতির চাল চালিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন, এবং আমি তাহাতে নিমিত্ত হইতে চলিয়াছি। কিন্তু আমার একটুও ভয় হইল না, প্রসন্নতাও হইল না। আমি প্রথমবার অনুভব করিতে পারিলাম যে বাণভট্টের চরিত্র যতই হীন হউক না কেন, ভট্টিনীর সেবার সুযোগ পাওয়ায় সে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মহৎ হইয়া গিয়াছে। ইহা হর্ষের কারণ নয়, বিষাদেরও নয়। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলাম, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিদ্রিত হইলাম।

প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া কুমারের আবাসস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। তিনি পূর্ব হইতেই আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সমাদর ও সম্মানের সঙ্গে তিনি আমাকে আসন দিলেন। ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'মহারাজাধিরাজের আদেশ তো আপনি পাইয়া গিয়াছেন, না ভট্ট?' আমি বিনীতভাবে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। কুমার বলিলেন—'এই কার্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমাকে অনেক মিথ্যা কথা রচনা করিতে হইয়াছে; কিন্তু আপনি ইহা খারাপ মনে করিবেন না। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা আর্যাবর্তকে বিনাশের গর্ত হইতে রক্ষা করিবে। বৃকের মত নিষ্ঠুর ও পিপীলিকার চেয়েও অধিক সংঘবদ্ধ প্রত্যন্তদস্যু সীমান্তপ্রদেশে পুনরায় একত্র হইতেছে। পুনরায় আর্যাবর্তের দেবমন্দির ও বিহার, বৃদ্ধ ও বালক, সাধু ও স্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ সংহারকারীর শিকার হইবে। আজ গুপ্তদের প্রতাপ অস্তমিত, দুর্মদ যৌধেয় উৎপাটিতদন্ত ব্যাঘ্রের মত হীনদর্প, মৌখরিদের বিক্রমানল নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে, শুধু কান্যকুব্জের সাম্রাজ্যই আজ এই ধ্বংস হইতে আর্যাবর্তকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু দেখুন ভট্ট, একবার যদি দস্যুরা গিরিবর্ত্ম লঙ্ঘন করিয়া সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদের গতি রুদ্ধ করা কঠিন হইয়া যাইবে। এই বিষম সংকট হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র আশার স্থান ভট্টিনীর পিতা। তিনি এখন খিন্ন ও হতোৎসাহ, স্থাণ্বীশ্বরের বৌদ্ধ নরপতির প্রতি অসন্তুষ্ট, আর মৌখরিদের গুরু ভর্বুশর্মার প্রভাবে পড়িয়া আছেন। আমি দেখিতেছি যে আপনারই হাতে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অস্ত্র। সম্রাটের

ভগিনীর উপযুক্ত সম্মানের সহিত ভট্টিনীকে কান্যকুব্জে রাখা যাইবে। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা, এই রাজবংশের কোনও গৃহে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। বলুন ভট্ট, ইহার কি উপায়?' আমি অল্পক্ষণের জন্য অভিভূতের মত তাকাইয়া রহিলাম। কুমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই পুনরায় আরম্ভ করিলেন—'আপনি মৌখরিকুলরাজলক্ষ্মী মহারানী রাজশ্রীর কথা জানেন, নয়?' আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। কুমার বলিলেন—'ভট্টিনী তাঁহার অতিথি হইবেন। এই নিন নিমন্ত্রণ পত্র।' ইহা বলিয়া কুমার রৌপ্যনির্মিত পটোলিকায় চীনাংশুক-সমাবৃত পত্র আমার হাতে দিলেন। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন—'ইহার পর আপনি যেরূপেই হউক ভট্টিনীকে এখানে লইয়া আসুন। তিনি যাহাই চান, সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে আপনি তাহা স্বীকার করিতে পারেন। আপনি কালই যাইতে পারেন। ফিরিয়া আপনাকেও পুরুষপুরে যাইতে হইবে। সমস্ত কিছু সতর্কতা ও শীঘ্রতার সহিত করিতে হইবে। ভট্ট, আর্যাবর্তকে মহতী বিনষ্টি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আপনার এতটুকু অসতর্কতায় লক্ষ লক্ষ নিরীহ জনের প্রাণনাশ হইতে পারে। আজ আপনি মহারাজাধিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করুন।' কুমার আমাকে কথা কহিতেই সময় দিলেন না, তাঁহার কথাগুলি এমন মাপা-জোখা, ওজনকরা, ভাবুকতাহীন ও পরিষ্কার যে মাথা নোয়াইয়া স্বীকার করিতে হইল। কুমার উপসংহার করিতে করিতে বলিলেন 'তবে উঠুন ভট্ট, বিলম্বে অনর্থ ঘটিতে পারে।'

চতুর্দশ উচ্ছ্বাস

প্রথম দিনের তাম্বুল-বীটক বড়ই মহার্ঘ হইল। মহারাজাধিরাজ সিংহাসনে আসীন হইবার পূর্বেই রাজসভায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। তখন রাজসভায় ছিল অসংযম ও চাপল্যের রাজ্য। কোনও সামন্ত পাশা খেলিবার জন্য ঘর কাটিতেছেন, কেহ দ্যূতক্রীড়ায় মাতিয়াছেন, কেহ বীণা বাজাইতেছেন, কেহ বা চিত্রফলকে রাজার প্রতিমূর্তি আঁকিতেছেন, আর কেহ কেহ বা মত্ত হইয়া আছেন অন্ত্যাক্ষরী, মানসী, প্রহেলিকা, অক্ষরচ্যুতক প্রভৃতি কাব্যবিনোদে। কেহ কেহ রাজার রচিত কবিতা ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোনও কোনও বিদগ্ধ রসিক চামরধারিণী ও অন্যান্য বারবনিতাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যাপৃত। কেহ কেহ এমনই ধৃষ্ট যে সভার মধ্যে রমণীদের কপোলে তিলক রচনা করিতেছিলেন।[১] রাজ-

[১] কাদম্বরী পূর্বভাগ, রাজসভা বর্ণনার সহিত তুলনীয়।

সভার প্রথমবার সভ্য হইয়া আসিয়া লোকের মনে এই সকলের কি প্রভাব পড়ে, তাহা কেবল অনুমান করা যাইতে পারে। সমস্ত সভাই উচ্ছৃংখলতার মূর্ত বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবশ্য সভ্যেরা এই পর্যন্ত সাবধান ছিলেন যে তাঁহাদের প্রতিটি কার্যে যেন সূচিত হয় যে শুধু তাঁহারাই মহারাজাধিরাজের অনুগত ভক্ত। তাঁহাদের অসাবধানতার মধ্যেও সভায় চাটুকারিতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল।

যে মুহূর্তে মহারাজাধিরাজ প্রধান আধিকরণিক (ন্যায়াধীশ) ও কুমার কৃষ্ণবর্ধনের সহিত সভায় উপস্থিত হইলেন, সেই মুহূর্তেই সভা সংযত ও নিয়মানুসারে শৃংখলাযুক্ত হইয়া গেল। ঘনপটহনিনাদ ও তুমুল শংখনাদের মধ্যে বারংবার উচ্চারিত বন্দীদের জয়নিনাদে বায়ুমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। লাক্ষারসে রঞ্জিত ও সুগন্ধি কালাগুরুতে ধূপিত চামরব্যজনধারিণীদের হালকা শাটিকা ফর ফর করিয়া উঠিল। তাঁহাদের মৃণালতন্তুর মত কোমল ভুজাবলীতে ধৃত কঙ্কণবলয় ঝনঝন করিয়া উঠিল। দ্রুত উত্থানের জন্য সামন্তদের কেয়ূর ও অংগদ পরস্পরের সংঘর্ষে কটকট করিয়া উঠিল। মাংগল্যমন্ত্রের উচ্চারণকারী পুরোহিতদের মধ্যে এমন একটা চঞ্চলতা আসিল যে একজন তো নিজেরই উত্তরীয়ে আটকাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। মংগলদ্রব্যধারিণী বিলাসিনীদের মেখলাদামের ঘুঙুরের মধুর ধ্বনি শুনিয়া ভবনদীর্ঘিকায় সারস এমন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল যে তাহাদের ক্রেঙ্কারশব্দে সভায় কোলাহলের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। মহারাজাধিরাজ আসনগ্রহণ করিতেই জয়নিনাদ থামিয়া গেল, মাংগল্যশংখ মৌনাবলম্বন করিল, বন্দীদের স্তুতিগান শান্ত হইল, পুরোহিতদের আশীর্বাদ অক্ষতবর্ষণের সংগে সংগে উপরত হইল, সভায় অদ্ভুত শান্তি ছাইয়া গেল—শুধু থামিয়া থামিয়া চামরধারিণীদের বাচাল কঙ্কণ তাহার রুনুঝুনুর দ্বারা মধ্যে মধ্যে এই শান্তি ভংগ করিয়া তাহা উপভোগ্য করিয়া তুলিল। আমি শুধু একবার মহারাজাধিরাজের কৃপাদৃষ্টির প্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। তাম্বুলবীটক পাইবার কাজটিতে বড় গোলমাল ছিল। আমার মনে হয়, যথাযথ অভিনয় করিতে না পারায় আমি সভ্যজনের উপহাসভাজন হইয়াছিলাম।

সভার কার্য আরম্ভ হইল। প্রধান আধিকরণিক (ন্যায়াধীশ) বিশেষ বিশেষ ব্যবহারে নিজের কৃত সিদ্ধান্তে মহারাজাধিরাজের সম্মতি গ্রহণ করাইতে লাগিলেন। অতি অল্প ক্ষেত্রেই মতভেদ হইল। দুই তিনবার ধর্মশাস্ত্রের অধিকারী পণ্ডিতদের মত চাওয়া হইল। এক আধ ক্ষেত্রে এমনও হইল যে কুমার কৃষ্ণবর্ধনের সংগে দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা চলিল। কথাবার্তা খুব ধীরে ধীরে হইতেছিল। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু

এইটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে কুমারকৃষ্ণ খানিকটা ক্লান্ত ছিলেন ও প্রধান অধিকরণিকের বলিকুঞ্চিত মুখমণ্ডলে কঠোরতার ভাব দেখা যাইতেছিল। মহারাজাধিরাজ প্রথম হইতে একই মুদ্রা ধারণ করিয়াছিলেন—না হাসি, না ক্রোধ, না ক্লান্তি। ব্যবহারপ্রকরণ শেষ হইয়া গেলে কুমারের সহিত মহারাজাধিরাজের মন্ত্রণা আরও কিছুক্ষণ চলিল। কিন্তু ন্যায়াধীশের সহিত ধর্মশাস্ত্রী পণ্ডিত যখন উঠিয়া গেলেন, তখন এই মন্ত্রণাও থামিয়া গেল। এখন আসিল গায়ক, বিদ্বান্, বিদূষক, ভাট ও স্তুতিগায়কদের পালা। কবিরাও স্বরচিত নূতন শ্লোক শুনাইলেন। মহারাজা সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। কাহাকেও মিষ্ট বাক্যালাপে, কাহাকেও বা তাম্বূলবীটিক দানে, কাহাকেও নিজের কোনও আভূষণ দিয়া তিনি সকলের আশীর্বাণী লাভ করিলেন। এ সময়ে সভায় চাটুবাদ ও স্তোকবাক্যের বাহুল্য চলিতেছিল। কুমার কৃষ্ণবর্ধনের ইঙ্গিতে আমিও আশীর্বাদ দিবার জন্য উঠিলাম। অতিকষ্টে আমি এক আর্যা শুনাইলাম। এ বাতাবরণ আমার পক্ষে বড়ই ক্লান্তিজনক মনে হইতেছিল। আমি ঐ আর্যায় চাটুকারিতার সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। আর্যা সমাপ্ত করিয়া আমি যখন মহারাজাধিরাজকে আশীর্বাদ করিবার জন্য করতল উঠাইলাম, তখন আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নিপুণিকাকে কথা দিয়াছিলাম যে আমি কোনও জীবিত ব্যক্তি সম্বন্ধে স্তুতিকবিতা রচনা করিব না। এ কী হইল! তবে কি আমি এ জগতে মাত্র আর সহস্র দিবস বাঁচিয়া থাকিব! আমি খানিকটা এমনই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম যে উত্তরাপথের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্ শ্রীহর্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি সে কথাও মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু কুমার আমাকে বাঁচাইয়া দিলেন। তিনি আমার আর্যার এক অংশের অনুবৃত্তি করিতে করিতে পরিহাস করিয়া বলিলেন -'স্বর্গের কথা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হওয়া উচিত নয়, ভট্ট!' সমস্ত সভা হাসিয়া উঠিল। মহারাজাধিরাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকিলেন। সভাসদগণের মধ্যে যাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহারাও মহারাজকে হাসিতে দেখিয়া বার বার হাসিতে লাগিল। আমি কিছুটা সামলাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। এবার মহারাজাধিরাজ অতিশয় স্নেহের ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'আপনি সৎ কবি, দেখিতেছি।' আমি মাথা নোয়াইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিট ও বিদূষকদের গ্রাম্য রসিকতার অশোভন প্রদর্শন চলিতে থাকিল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

এই সময়ে সভাভঙ্গের শঙ্খ বাজিল। মহারাজাধিরাজ উঠিলেন, আর কংকণ, বলয়, নূপুর, কেয়ূর ও অঙ্গদের কলস্বনের সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের জয়নিনাদ আবার মুখর হইয়া উঠিল। ক্রমে বিলাসিনীদের কুঙ্কুমগৌর বদনের

কৃত্রিম স্মিত রেখা বিলুপ্ত হইয়া গেল, সভাসদের চাটুবাক্যবিলসিত হাসি শান্ত হইয়া গেল, সভাসদের কেতক-ধূপিত উত্তরীয় সংকুচিত হইতে লাগিল, আর বিদূষকদের চটুল রসিকতা ক্লান্তির গম্ভীরতায় ডুবিয়া গেল। আমি যেন রুদ্ধদ্বার গৃহগর্ভ হইতে বাহিরে আসিলাম। রাজসভার একঘেয়ে হাওয়ায় আমি পিষিয়া গিয়াছিলাম। আমি সবেগে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে একজন ব্যক্তি পিছন হইতে ডাকিল—'শুনুন ভদ্র!' পিছন ফিরিয়া আমি তাঁহার প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিলাম। ইনি ধাবক। তিনি রাজসভায় অতিশয় সুন্দর কবিতা শোনাইয়াছিলেন। তাহা পড়িবার ভঙ্গী ছিল তাঁহার নিজস্ব। জানা যাইতেছিল যে তিনি মহারাজের প্রিয়পাত্র। তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমি প্রসন্ন ভাব দেখাইলাম। ধাবক হাসিয়া বলিলেন—'যখন রাজসভায় আসিয়াই গিয়াছেন, তখন আমাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করিলে কি করিয়া চলিবে।' আমি সবিনয়ে বলিলাম—'আর্য, আমাকে অকারণে লজ্জা দিতেছেন।' কিন্তু ধাবক রসিক লোক ছিল। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্ধুত্ব জমাইয়া লইল। অনেকক্ষণ এদিক ওদিকের কথা বলিতেছিল। বিদায় হইবার সময় বলিয়া গেল—'আপনি মহারাজার অন্তরঙ্গ সভার উপযুক্ত পাত্র, আপনি অবশ্যই নিমন্ত্রণ পাইবেন।' আমি উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য অনুরোধ করিলাম, তখন কান্যকুব্জ জনোচিত পরিণত রসিকের হাসি হাসিয়া ধাবক আমার স্কন্ধদেশ নাড়িয়া বলিল—'শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন, দাদা!'—আর আমাকে কিছু না বলিয়াই একদিকে চলিয়া গেল। আমি খানিকটা ক্লান্ত হইয়া বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হইলাম।

সারা দিন বড় কষ্টে অতিবাহিত হইল। পশ্চিম মরুভূমির তপ্ত বায়ু ত্রিভুবনের সমস্ত আর্দ্রতাকে যেন শুকাইয়া লইতেছিল। তাহা প্রচণ্ড দাবাগ্নির মত বনভূমির নীলিমাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল, কান্যকুব্জের সমস্ত জলাশয় শুকাইয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া তুলিতেছিল। মনে হইতেছিল যে সূর্য-মণ্ডল হইতে কোনও ধূমহীন অগ্নিশিখা অবিরাম পৃথিবীতে বর্ষণ হইতেছে। সূর্যাস্ত হইতে এক ঘণ্টার অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু স্থাণ্বীশ্বরের রাজপথ তপ্তবায়ু ও তির্যক্ সূর্যকিরণে ঝন্‌ঝন্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিতেছে। অজগর সর্পের ফুৎকারের চেয়েও ভীষণ বায়ুতরঙ্গ বিশাল প্রস্তরহর্মের উত্তপ্ত দেওয়ালে লাগিয়া যাত্রীদের উপরে ছড়াইয়া পড়িতেছে আর তাহার উপর বিকট ঘূর্ণিবায়ু হইতে উত্থিত ধূলিতে আচ্ছন্ন আকাশ এমন মনে হইতেছিল যে পথে বাহির হওয়া সাহসের কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি আমি বাহির হইয়া

পড়িলাম। সুচরিতার নিমন্ত্রণের এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল, যাহা অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল। আমি যখন তাহার বাসভবনের নিকট গিয়া পৌঁছিলাম, তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার কিরণজাল সম্বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। পশ্চিম সমুদ্রের তীরে তাঁহার ক্লান্তশীর্ণ মুখের লালিমা ছাইয়া রহিয়াছিল আর বায়ুর তীব্রবেগ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। আমি সেই উৎকণ্ঠিত চকোরের মত সুচরিতার গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, যে সারা দিন সূর্যাতপে তপ্ত হইয়া সূর্যাস্তকালে এই আশায় পূর্বদিগন্তে তাকাইয়া থাকে যে প্রাণ ভরিয়া চন্দ্রমাকে দেখিতে পারিবে। কিন্তু চন্দ্রমার দর্শনলাভ হইল না। সুচরিতার গোময়োপলিপ্ত অঙ্গনভূমি ধূলিময় হইয়াছিল—মনে হইতেছিল, বহু লোক কোনও অজ্ঞাত আশঙ্কায় এখানে বৃথা দৌড়িয়া আসিয়াছিল,—ক্ষীর-সাগরশায়ী নারায়ণকে বেষ্টন করিয়া যে মালতীমালা ঝুলিত, তাহা বাসি ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল এবং বলিদেহলী অশুভকর শূন্যতায় আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করিয়াছিল। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অন্য রাত্রির তুলনায় কাল রাত্রিতে অবশ্যই কিছু বিশেষ ঘটিয়া থাকিবে। আমি লম্পট হইতে রাজপুরুষ তথা সম্রাটের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছি, আর সুচরিতা ভক্তিমতী দেবী হইতে পরিবর্তিত হইয়া না জানি কি হইয়া গিয়াছে! আমার হৃদয় এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? এমন সময় স্মরণ হইল, গতকল্যের সেই কথামণ্ডপে গিয়া দেখি না কেন? মণ্ডপ অল্প দূরেই ছিল। আমি সেখানেই চলিলাম।

মণ্ডপে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি বসিয়াছিল। দুইচারিজন ইতস্তত ঘুরিতেছিল। কিন্তু কোলাহল দূরে থাকুক, একটু শব্দও কোথাও হয় নাই। সকলের মুখমণ্ডল গম্ভীর ছিল, উত্তেজনার ভাব স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছিল। তথাপি সমস্ত সভাস্থল শান্ত ও নিস্তব্ধ। শুধু সভাপতি অতি সংযত ভাষায় কিছু বুঝাইতেছিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে কোনও সভ্য উঠিতেছিল, আর সংক্ষেপে তাহার বক্তব্য বলিয়া নীরবে নিজের আসনে আসিয়া বসিতেছিল। সংযমের মাত্রা এত অধিক ছিল যে সেখানকার লোকেরা যন্ত্রের মত কাজ করিতেছে মনে হইতেছিল। বাহিরে দণ্ডায়মান এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুচ্চস্বরে বলিলেন—'আজ সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে সুচরিতা দেবী ও আর্য বিরতিবজ্রকে বন্দী করা হইয়াছে, নগর প্রতীহারের লোকেরা আর্য বেঙ্কটেশ ভট্ট ও পরমহংস অঘোরভৈরবকে নৌকায় বসাইয়া না জানি কোথায় লইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত বৌদ্ধ নরপতির আদেশে হইয়াছে। এ তো স্পষ্টই শান্ত ও নিরীহ প্রজার ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ। স্থাণ্বীশ্বরের পদাধিকারী বিদ্বানেরা এখন

তাঁহাদের কি কর্তব্য তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কান্যকুব্জের লোকদের সংযম প্রসিদ্ধ। তাহারা যখন ফূর্তি করে তখন মনে হয় যে বুঝি উহাদের মত চপল মনুষ্য জগতেই নাই, কিন্তু যখন তাহারা সংযত হয় তখন তাহাদের গাম্ভীর্য সমুদ্রের মতই দুরধিগম্য। এই সভায় সেই সংযমের বাতাবরণ ছিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া শাস্ত্রার্থ আলোচনা চলিতেছিল। তাহার পর বৃদ্ধ সভাপতি মেঘগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—'স্বস্তি, আর্যসভাসদগণ, আমি এই সভায় উপস্থিত শাস্ত্রপারংগত পণ্ডিত এবং শীল ও আচারে প্রসিদ্ধ আর্য নাগরিকদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি। আর্য সভাসদগণ, বড় দুর্যোগ উপস্থিত। আচার্য ভর্বুপাদের প্রচারিত পত্র স্থান্বীশ্বরের প্রত্যেক নাগরিক পড়িয়া ফেলিয়াছেন। দুর্দমনীয় ম্লেচ্ছবাহিনী গিরিবর্ত্ম পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। উত্তরাপথের নগর ও গ্রাম, দেবমন্দির ও বিহার, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, বৃদ্ধ ও বালক, কন্যা ও বধূ আজ যে কোনও প্রতাপশালী রাজশক্তির আশ্রয়েই সুরক্ষিত হইয়া থাকিতে পারেন। এই সময়ে প্রজাদের মধ্যে রাজশক্তির প্রতি অসন্তোষ থাকা সর্বনাশের কারণ হইবে। সভার সিদ্ধান্ত এই যে আর্য বিরতিবজ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার পিতৃঋণ শোধ না করিবার অভিযোগ মিথ্যা ও শাস্ত্রবহির্ভূত। সুচরিতা ও তাঁহার সম্বন্ধ শাস্ত্রের অনুকূল, ঐ দুইজনের বিরুদ্ধে গার্হস্থে ফিরিয়া আসার অভিযোগ আনা নিন্দনীয়। সুচরিতা যে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা চিরাচরিত ভক্তিমার্গের অনুকূল। স্থান্বীশ্বরের বিদ্বন্মণ্ডলী তাহার অসাধারণ সংযমনিষ্ঠা ও নিরতিশয় চিন্মুখী সমর্পণবৃত্তির জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। আর্য বেঙ্কটেশপাদ ও অবধূত অঘোরভৈরবের মত আত্মারাম ভগবদ্‌ভক্তের নির্বাসনে আমরা ক্ষুব্ধ। কিন্তু এই দুঃসময়ে রাজব্যবস্থায় কোনও প্রকারের শৈথিল্য যাহাতে না আসে সেই ভাবিয়া আমরা স্থির করিয়াছি যে দশজন পণ্ডিতের এক সংস্থা গিয়া মহারাজ যাহাতে এই অন্যায়ের প্রতিকার করেন তাহার চেষ্টা করিবে। সভার বিশ্বাস, মহারাজাধিরাজ আমাদের প্রার্থনায় অবশ্য কর্ণপাত করিবেন। আর্য সভাসদগণ, কোনও প্রকারের উত্তেজনা এ সময়ে বিনাশের কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। আমি এই প্রস্তাবে আপনাদের অনুমতি চাহিতেছি। আর্য সভাসদ্‌গণের মৌনই সম্মতিলক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।' সভাপতি নীরব হইলেন। অল্পক্ষণ পর্যন্ত একটা জড়ের অবস্থা থাকিল। মনে হইল, সভা প্রস্তাবটি নীরবে মানিয়া লইল।

অকস্মাৎ সভার এক প্রান্ত হইতে এক পিঙ্গল জ্যোতির আবির্ভাব হইল, যেন শরৎকালের শুভ্র মেঘের ভিতর হইতে সহসা সৌদামিনী চমকিয়া উঠিল। ইনি ছিলেন মহামায়া ভৈরবী। আপাদধূসর গৈরিক বস্ত্রের ভিতর তাঁহার ক্রোধতাম্র মুখমণ্ডল সান্ধ্য মেঘের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের দীপ্তির প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার সিন্দুরলিপ্ত ত্রিশূল এমন ভয়ংকর ও মনোহর আকার ধারণ করিয়াছিল যে মনে হইতেছিল ইহা বুঝি গৈরিক অধিতাকায় স্থাপিত ক্রুদ্ধ ধূর্জটির ত্রিশূল। মহামায়া কঠোর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন -'আর্য সভাপতি, আমি সভাকে সম্বোধন করিয়া দুই চারি কথা বলিতে চাই। আমি অবধূত অঘোরভৈরবের শিষ্যা মহামায়া ভৈরবী। আমাকে অনুমতি দিন।' সভাপতি ইতস্তত করিতেছিলেন এমন সময়ে অঘোরভৈরবের তুমুল জয়নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে সভা ভৈরবীর প্রস্তাব অনুমোদন করিল। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া সভাপতি অনুমতি দিতে দিতে বলিলেন— 'ভগবতি, দুঃসময় উপস্থিত, সভা সময়োপযোগী কিছু শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।' মহামায়া তীব্র স্বরে বলিলেন 'আর্য সভাসদ্‌গণ, আমি অবধূত অঘোরভৈরবের শিষ্যা মহামায়া। আপনারা মনে করিবেন না যে আমার গুরুর অপমান করা হইয়াছে বলিয়া আমি ক্ষুব্ধ। অবধূতপাদ মান অপমানের পারে। মান সেই ব্যক্তির হইবে, যে তাঁহাকে সম্মান করিবে; অপমানও সেই ব্যক্তিরই হইবে, যে তাঁহাকে অপমান করিবে। এই জন্য আর্য সভাসদগণ, মহামায়া যাহা কিছু বলিতে যাইতেছে, তাহা তাঁহার অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া নয়। অঘোর-ভৈরব সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। আমি আপনাদের সভার এই প্রস্তাবের অভিনন্দন করি যে আর্য বিরতিবজ্র ও আয়ুষ্মতী সুচরিতা নির্দোষ। কিন্তু আমি মহারাজাধিরাজের নিকট প্রার্থনা করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছি। আমি সন্ন্যাসিনী। আমি স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্টের পথ বরণ করিয়া লইয়াছি। আমি মৃত্যুতে ভয় পাই না। আপনারা আমার মাথা উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সত্য কথা বলিবার পথ আটকাইতে পারেন না। আপনারা যদি আচার্য ভর্বুপাদের পত্রের ফলিতার্থ লইয়া আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন না। সেই পত্র পৌরুষহীনতার নগ্ন প্রচারক। সে পত্র আর্যাবর্তের ভাবী পরাজয়ের অগ্রদূত। আপনাদের প্রস্তাব ঐ মনোবৃত্তিরই পোষক। আপনারা বলিতেছেন, উত্তরাপথের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, বৃদ্ধ ও বালক, কন্যা ও বধূ কোনও প্রচণ্ড রাজশক্তির ছায়া না হইলে বাঁচিতে পারে না। আর্য সভাসদ্‌গণ, উত্তরাপথের লক্ষ লক্ষ যুবকেরা কি কংকণবলয় ধারণ করে? তাহারা কি বৃদ্ধ ও বালক, কন্যা ও বধূ, মন্দির ও বিহার রক্ষার জন্য নিজের নিজের প্রাণ দিতে পারে না? এই দেশের বিদ্বানদের মধ্য হইতে স্বতন্ত্র

সংগঠনবুদ্ধি কি লোপ পাইয়াছে? আচার্য ভর্তৃপাদের পত্র পড়িয়া আমার কণ্ঠ রোষে ও লজ্জায় শুকাইয়া যায়। এই উত্তরাপথে লক্ষ লক্ষ নিরীহ বধূ ও কন্যার অপহরণ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় কি চলিতেছে না? যদি দেবপুত্র তুবরমিলিন্দের হৃদয় একটুও সংবেদনশীল হইত, তাহা হইলে আজ হইতে বহু পূর্বেই তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকিতে হইত। নিরীহ প্রজাদের মেয়েরা কি তাহাদের নয়নের তারা ছিল না? রাজা ও সেনাপতিদের কন্যা হারাইয়া যাওয়াই কি সংসারের দুর্ঘটনা? আর আর্য সভাসদ্‌গণ, আমার দিকে তাকাইয়া দেখুন। আমি আপনাদের দেশের লক্ষ লক্ষ অবমানিত, লাঞ্ছিত ও অকারণ-দণ্ডিত কন্যাদের মধ্যে একজন। এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের প্রধান আশ্রয় যে সামন্ত ও রাজাদের অন্তঃপুর, সে কথা কে না জানে? আপনাদের মধ্যে কাহার অজ্ঞাত যে মহারাজাধিরাজের চামরধারিণী ও করঙ্ক-বাহিনীরা এই প্রকারে অপহৃত ও বিক্রীত কন্যা? আর্য সভাসদ্‌গণ, এই সব অভাগিনীদের কি পিতা ছিল না? তাহারা কি মাতার নয়নতারা ছিল না? তাহাদের জনকজননীর হৃদয়ে নিজের সন্তানের জন্য যে স্নেহভাবনা ছিল, তাহা কি কোনও সম্রাটের স্নেহভাবনার চেয়ে কম? ধিক সেই উত্তরাপথের বিত্তবান ও শীলবান নাগরিকদের, যাহারা এই সব রাজাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে! জিজ্ঞাসা করি, মহারাজাধিরাজ যদি আপনাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনারা কি করিবেন? আপনাদের মধ্যে কাহারও নিকট কি অজ্ঞাত আছে যে মহারাজাধিরাজ নিজে শুদ্ধস্বভাবের হইয়াও এমন শত শত সামন্তকে আশ্রয় দিয়াছেন যাহাদের প্রতাপ শুধু কন্যাহরণেই প্রকাশ পাইয়াছে! আর্য সভাসদ্‌গণ, যদি অসত্য বলিয়া থাকি তবে এই ত্রিশূল দিয়া আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলুন।' এই পর্যন্ত বলিয়া মহামায়া মুহূর্তের জন্য থামিয়া সভার দিকে তাকাইলেন। তাঁহার চোখ হইতে স্ফুলিঙ্গ ঝরিতেছিল। সভা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। মহামায়া পুনরায় সিংহিনীর মত গর্জন করিয়া বলিলেন— 'অমৃতের পুত্রগণ, মৃত্যুর ভয়ের নাম মায়া, রাজভয় দুর্বল চিত্তের বিকল্প। প্রজারাই রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছবাহিনীর সম্মুখীন হও। দেবপুত্র ও মহারাজাধিরাজের আশা ছাড়। সমস্ত উত্তরাপথের মান তোমাদের হাতে। অমৃতের পুত্রগণ, আর্য বিরতিবজ্র ও আরুন্ধতী সুচরিতার বন্দীদশা, লক্ষ লক্ষ নিরীহ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের রক্ষার জন্য হয় নাই, হইয়াছে মহারাজাধিরাজ অথবা তাঁহার কোনও আশ্রিত সামন্তের মুখ রক্ষার জন্য। এ অন্যায় প্রথম নয়, শেষও নয়। ইহা হইল দুর্বহ সম্পত্তিমদের চিরাচরিত রূপ। এজন্য ন্যায়ের নিকট প্রার্থনা ব্যর্থ। অমৃতের পুত্রগণ, ধর্মের রক্ষা অনুনয়বিনয়ে হয় না; শাস্ত্রবাক্যের সংগতি করাইলেও হয়

না; ধর্মরক্ষা হয় নিজেকে বলি দিলে। ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিতে শেখ, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে শেখ, ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে শেখ। অমৃতের পুত্রগণ, মৃত্যুর ভয় মায়া!'

সহস্র কণ্ঠে দীর্ঘদীর্ঘায়িত স্বরে প্রতিধ্বনি হইল—'মৃত্যুর ভয় মায়া!' সেই মহাধ্বনি স্থাণ্বীশ্বরের দুর্ভেদ্য প্রস্তরভিত্তি বিদীর্ণ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিল। লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া আকাশবিদীর্ণকারী এক শব্দই গুঞ্জন করিতে লাগিল—'মৃত্যুর ভয় মায়া!' বিরাট পটমণ্ডপের পক্ষে সেই স্ফীত জনসম্মর্দকে ধারণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মহামায়া ত্রিশূল উঁচু করিয়া জনতাকে শান্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর সেই গগনভেদী মহাশব্দের নিকট নগণ্য। ভিড় রাজপথ, গবাক্ষ, বৃক্ষ ও ধ্বজদণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে সর্বত্র এই প্রবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে সভায় সাক্ষাৎ ত্রিশূলধারিণী পার্বতীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন, অধর্মাচারী রাজাকে ধ্বংস করিয়া দাও। নাগরিকেরা মহামায়ার বাণীকে কোথা হইতে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে। শুধু একটা স্বর থাকিয়া থাকিয়া বায়ুমণ্ডলকে কম্পিত করিতে লাগিল—'অমৃতের পুত্রগণ, মৃত্যুর ভয় মায়া!' সহস্র কণ্ঠে ইহার সহস্র রূপ ব্যাখ্যা হইল। বৃদ্ধ সভাপতি মহামায়ার প্রতি তাকাইয়া সকাতরে প্রার্থনা করিলেন—'ভগবতি, আর্যে, আপনার কথা সত্য; কিন্তু ক্ষুব্ধ প্রজা এই অগ্নিবাণীর অযোগ্য পাত্র। আপনি ইহাদের শান্ত করুন। আচার্য ভর্বুপাদের পত্র সাময়িক উপচারের জন্য, উহা তো শাশ্বত ধর্মের সংবাদ লইয়া আসে নাই। ভগবতি, আর্যে, ইহা কি সত্য নয় যে এ সময়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া জনসংগঠন করিতে করিতে এতখানি সময় লাগিয়া যাইবে যে ম্লেচ্ছবাহিনী এই দেশকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া কপোত-কর্বুর ভস্মে পরিণত করিয়া দিবে? আর্যে, প্রজাদের মধ্যে অসময়ে বুদ্ধিভেদ জন্মানো অনুচিত হইয়াছে।' মহামায়া বেগে জনতা বিদীর্ণ করিয়া এক উচ্চ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিদ্যুচ্ছটার মত তাঁহার জ্যোতি তখন বক্ররেখার রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়া জনতা জয়নিনাদ করিল। ত্রিশূল উঠাইয়া মহামায়া আদেশের স্বরে বলিলেন—'অমৃতের পুত্রগণ, শান্ত হও।' সমস্ত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত, অভিভূতের মত, যন্ত্রচালিতের মত শান্ত হইয়া গেল। মহামায়া পুনরায় বলিলেন—'অমৃতের পুত্র, সংযমে কার্য সম্পন্ন কর। তোমাদের বিদ্বান নাগরিকেরা মহারাজাধিরাজের নিকট হইতে ন্যায় বিচার পাইবার আশায় প্রার্থী হইবার সংকল্প করিয়াছে। আজ তাহাদিগকে সুযোগ দাও। কিন্তু অমৃতের পুত্রগণ, ন্যায়বিচার পাইয়া গেলেও সমস্যার সমাধান হয় না। রাজপুত্রদের

বেতনভোগী সেনা দুর্ধর্ষ ম্লেচ্ছবাহিনীর সামনে দাঁড়াইতে পারিবে না। কি ব্রাহ্মণ আর কি চণ্ডাল, সকলকেই নিজ নিজ বধূ ও কন্যার মানমর্যাদা রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি। অমৃতের পুত্রগণ, বড়ই দুঃসময় উপস্থিত। রাজা, রাজপুত্র ও দেবপুত্রের আশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার নিশ্চিত পরিণাম হইল পরাভব। প্রজাদের মধ্যে মৃত্যুর ভয় ছাইয়া গিয়াছে, ইহা অশুভ লক্ষণ। যদি তোমরা আর্যাবর্তকে বাঁচাইতে চাও, তবে প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত হও। ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া কোনও জাতির পেশা নয়, উহা মনুষ্যমাত্রের উত্তম লক্ষ্য। অমৃতের পুত্রগণ, ন্যায় বিচার যেখানেই পাওয়া যায় সেখান হইতেই তাহা বলপূর্বক গ্রহণ কর। যদি তোমরা বুঝিতেই না পার যে ন্যায়বিচার পাওয়া মনুষ্যের ধর্মসিদ্ধ অধিকার, আর তাহা না পাওয়া অধর্ম, তবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অমৃতের পুত্রগণ, ম্লেচ্ছবাহিনী এই প্রথমবার আসে নাই, এবার তাহাদের আগমন শেষবারের মতও নহে। তোমরা যদি আজ তুবরমিলিন্দ ও শ্রীহর্ষদেবের আশায় বসিয়া থাক, তাহা হইলে সম্ভবত আজ এই বিপত্তি দূর হইবে, কিন্তু কাল দূর হইবে না। তুবরমিলিন্দ ও শ্রীহর্ষদেব সর্বদা থাকিবেন না; কিন্তু তোমাদের থাকিতে হইবে। অমৃতের পুত্রগণ, আমি ভবিষ্যৎ দর্শন করিতেছি। রাজা, মহারাজা ও সামন্তগণ স্বার্থের দাস হইতে যাইতেছে। প্রজা হইয়া যাইতেছে ভীরু ও কাপুরুষ। বিদ্বান ও চরিত্রবান নাগরিকদের বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়া যাইতেছে। ধর্মাচরণে এই জন্য ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে যে রাজা অন্ধ, প্রজা অন্ধ, বিদ্বানেরা অন্ধ। এ বড় অমঙ্গলের লক্ষণ। অমৃতের পুত্রগণ, আমি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া চীৎকার করিতেছি, এ অমঙ্গলের লক্ষণ। নিজে নিজেকে বাঁচাও, ধর্মের উপর দৃঢ় নির্ভর কর, ন্যায়ের জন্য মরিতে শেখ, ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল পর্যন্ত এক হইয়া যাও—প্রস্তরশিলার মত দুর্ভেদ্য এক। ইহাই বাঁচিবার উপায়। অমৃতের পুত্রগণ, রাজপুত্রদের বেতনভোগী সেনার আশা ছাড়িয়া দাও, মৃত্যুর ভয় মায়া।'—জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া গেল। সহসা মহামায়া সেখান হইতে সরিয়া সবেগে কোথায় যেন বাহির হইয়া গেলেন। দিঙ্মূঢ় নাগরিকেরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সকলে শুধু ইহাই অনুভব করিল যে অপ্রত্যাশিত একটা কিছু অবশ্য ঘটিবে।

দেখিতে দেখিতে ঘটনাপ্রবাহ কোন দিক হইতে কোন দিকে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে পশ্চিম গগন লাল ও হরিদ্রাবর্ণ হইয়া কয়েকবার বর্ণ পরিবর্তন করিয়াছে, মধ্যগগন হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গালেপী অন্ধকার, কৃষ্ণাঞ্জনতুল্য সকল

গ্রাস করিতেছে, এমন পূর্বদিকের উদয়গিরির তটে অস্তমিত চন্দ্রমার গূঢ়-পান্ডুর কিরণমালা ছিটাইয়া পড়িতেছে। আমি এই পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম যে কোনও অজ্ঞাত অপরাধের জন্য আর্য বিরতিবজ্র ও সুচরিতা বন্দী আছেন; কিন্তু কী যে তাঁহাদের অপরাধ তাহা এখনও আমার বুদ্ধিতে আসিল না। মহামায়াই বা কেন উপস্থিত বিষয়ে অবহেলা করিয়া প্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়া এক বড় বক্তৃতা দিলেন, ইহাও আমার বুদ্ধির বাহিরে থাকিল। এই ব্যাপারে আমার কোনও কর্তব্য থাকিতে পারে কি না, এ কথাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। অশ্বারোহী সৈনিকেরা জনসম্মর্দের প্রত্যেক গতি সতর্কতার সহিত দেখিতেছিল, এবং যে কোনও সময় তাহাদের তীক্ষ্ণফলক কুন্তের সাহায্যে বিদ্রোহ প্রশমিত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। মহামায়ার আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে জনতা হতভম্ব হইয়া গেল; ঘটনাচক্রের তীব্র গতিপরিবর্তনে আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইলাম। এই সময়ে চন্দ্রমার উদয়গূঢ় রশ্মিতে পূর্বদিক পান্ডুর হইয়া গিয়াছিল। আমি তখনও সেই মনোহারিণী শোভা দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। সমস্ত পূর্ব আকাশ প্রিয়সমাগমজনিত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। উঁচু উঁচু বৃক্ষের শিখায় পীতাভ রশ্মিগুলির সোনালী জাল বোনা হইয়াছিল, আর দিগন্তের পরপ্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘাকার সুবর্ণশলাকায় খচিত নীল নভোমন্ডল অদ্ভুত শোভায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় মনে হইল কে যেন আমাকে জোরে ঠেলিতেছে। চাহিয়া দেখি, ধাবক। ধাবকের জীবন চটুল জীবন্ত পরিহাসের রূপে গঠিত ছিল। চন্দনের অঙ্গরাগে উপলিপ্ত তাহার বক্ষঃস্থলে মালতীদাম সুশোভিত ছিল, ভুজমূলে বকুলপুষ্পের মনোহর বলয় অতি সুকুমার ভঙ্গীতে সজ্জিত ছিল, সম্বৃত ধূপিত কেশের পশ্চাদংশে দুর্লভ জাতীকুসুমের গুচ্ছ বড়ই অভিরাম দেখাইতেছিল। তাম্বুলচর্বণে সে বড়ই নির্দয়তার পরিচয় দিয়াছিল। না সে দয়া দেখাইয়াছিল মুখের উপর, না তাম্বুলপত্রের উপর। কিন্তু এতগুলি তাম্বুলপত্র মিলিয়াও তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে নাই। সে মুখকে উপরের দিকে উঠাইয়া অধরোষ্ঠকে আকাশের সমানান্তর করিয়া কথা বলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু নির্বোধ অনর্গল কবিত্ব-ধারা এমন করিয়াই বর্ষণ করিতেছিল যে মনে হইতেছিল উহা বুঝি কোনও ঊর্ধ্বমুখ ধারাযন্ত্র! আমার স্কন্ধদেশ নাড়িয়া দিয়া তাম্বুলরসসিক্ত বাণীতে সে বলিল, 'চাঁদ দেখিতেছেন কি আর্য! কাহাকেও মনে পড়িয়াছে কি?' তাহার পরিহাসে আমি চমকিয়া উঠিলাম, কারণ সত্যই ভট্টিনীর কথা আমার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল। কিন্তু ধাবক থামিতে জানিত না। সে বলিয়াই চলিল—'সত্য কথা বলি, বন্ধু! আমি যখন প্রাচীতে উদয়গিরিতটান্তরিত নিশানাথকে দেখি, তখন জোর করিয়াই

এমন কোনও উদাসিনী প্রিয়ার স্মৃতি জাগিয়া ওঠে যাহার প্রিয় তাহার হৃদয়ের অন্তরালে বসিয়া আছে আর বিয়োগব্যথায় তাহার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে[২]। আপনার কেমন লাগে?' আমি তাহার কথার রসগ্রহণ করিতে করিতে বলিলাম—'অনুভবের কথা বলিতেছেন সখা, না কল্পনার কথা?' ধাবক আবেগের সহিত বলিল—'অনুভব আপনার, কল্পনা আমার। কেমন সখা, এই অংশটুকু তো আমার প্রাপ্য। শুনুন, আমি আপনাকে একথাও শিখাইয়া দিব, যে কথা আপনি দেখা হইলে সেই উদাসিনী প্রিয়াকে বলিবেন। আমি বড় বড় লোককে শিখাইয়াছি, গুরু! এবিষয়ে মহারাজাধিরাজ পর্যন্ত আমার চেলা!' আমি তাহার রস অনুভব করিতে করিতে বলিলাম—'শিখাইয়া দিন, সখা!' ধাবক বলিল—'উতলা হইতেছেন কেন, কাল শিখিয়া লইবেন। এখনও কুমারকৃষ্ণের দূত হইয়া আপনাকে খুঁজিতে আসিয়াছি। এ নগরে যাহারা যাহারা আপনাকে চেনে তাহাদের সকলকেই আপনার সন্ধানে পাঠানো হইয়াছে। সুচরিতা তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছে যে আপনি তাহাকে চেনেন আর আপনার উপর তাহার অগাধ শ্রদ্ধা। কুমারের আদেশ, আপনি অবিলম্বে রাজকীয় বন্দীশালায় গিয়া তাহাকে রাজ্যের অনুকূল করিয়া লউন। আপনি সেখানে বিনা বাধায় যাইতে পারিবেন, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শীঘ্র করুন, নতুবা অনর্থ হইয়া যাইবে।'

ধাবক আমাকে চিন্তার সময়ও দিল না। দূর হইতে দুন্দুভির শব্দ শোনা গেল। তাহার উদ্দেশ্য শোনাইয়া সে বলিল—'কুমার কৃষ্ণবর্ধন শান্তি ঘোষণা করিতেছেন। অবধূত অঘোরভৈরব ও আর্য বেঙ্কটেশপাদকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। আজ এই বিসদৃশ আচরণের বিষয়ে মহারাজাধিরাজ, কুমার কৃষ্ণ ও প্রধান বিচারপতির মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া মৃদু গুঞ্জনে পরামর্শ চলিতেছিল।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি আচরণ, বন্ধু?' ধাবক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—'আচরণ আর কি, বুদ্ধি দেউলিয়া হইয়াছে। এই যে বিরতিবজ্র, সে এক সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। এমন ভালো মানুষ, না জানি কি বুঝিয়া অঘোর-ভৈরব ও বেঙ্কটেশ ভট্টের থাবার মধ্যে ফাঁসিয়া গেল। বেঙ্কটেশ ভট্ট কেমন এক অদ্ভুত দুরাচারী লোক বলিয়া মনে হইতেছে—কি জানি ভাই, আমি তো ধর্মসাধনার নামগন্ধও জানি না। তা এই ভালো মানুষটি বিরতিবজ্র ও সুচরিতাকে একসঙ্গে নবীন সাধনমার্গে দীক্ষিত করিয়াছে। এখন এই ব্যাপারে এখানকার পাষণ্ডী বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুভূতি (যাহাকে বৃথাই মহারাজাধিরাজ মাথায় চড়াইয়াছেন) এত চটিয়াছেন যে তাঁহার চেলা ধনদত্ত শ্রেষ্ঠীকে উসকাইয়া

---

[২] তুলনীয়: উদয়গিরিতটান্তরিতমিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথম্।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী॥ —রত্নাবলী, ১।২৫

এক জালপত্র তৈয়ারি করিয়াছেন। ধনদত্ত বলিতেছে যে বিরতিবজ্রের পিতা তাহার নিকট একসহস্র দীনার ঋণ লইয়া মারা গিয়াছে। যত দিন বিরতিবজ্র সন্ন্যাসী ছিল তত দিন সে এই ঋণ হইতে মুক্ত ছিল; কিন্তু যেহেতু সে এখন সুচরিতার সঙ্গে গার্হস্থ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সেই হেতু তাহাকে সুদসমেত ঋণ শোধ করিয়া দিতে হইবে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে ইহাই। ইহাতে আপনার কি করণীয় তাহা আপনিই জানেন। আমি তো আপনাকে বন্দীশালা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া অন্য কোনও দিকে চলিয়া যাইব।' আমি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু আরও জানিবার ইচ্ছায় ধাবককে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এই মহামায়া ভৈরবীটি আজ কি অনর্থই না করিল, সখা!' ধাবক হাসিয়া বলিল—'এ রাজধানী, বন্ধু, অনেক কিছু দেখিতে পাইবেন। মহামায়াকে এখানে খুব কম লোকেই চেনে। আমি কিছু কিছু জানি। ও মহারানী রাজশ্রীর সপত্নী।' আমি যেন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলাম, চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'সপত্নী?' ধাবক ধমক দিয়া বলিল—'চীৎকার করিতেছেন কেন, এনগরে রানীদের সপত্নীদের বিশাল জঙ্গল আছে—জঙ্গল!' আমি ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলাম—'তবে কি মহারাজাধিরাজও

' কথা শেষ হইতে না হইতে ধাবক দুই কানে হাত রাখিয়া বলিল—'শান্তং পাপম্, শান্তং পাপম্! এই নগরে শুদ্ধাচারী ব্যক্তি তিন জন আছেন—মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষদেব, মহারাজ্ঞী রাজশ্রী, আর .।' ধাবক থামিয়া আমার দিকে তাকাইল, যেন কিছু বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভাগ্যবান তৃতীয়টি কে, সখা?' ধাবক অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল—'মহাকবি ধাবক,' আর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। ধাবক আরও যেন কি বলিতে বলিতে চলিল; কিন্তু আমি মহামায়ার চিন্তায় এমনই ডুবিয়া ছিলাম যে কিছুই শুনিতে পারি নাই। মহামায়া কি তবে রাজশ্রীর সপত্নী? আজ তিনি নিজেকে এদেশের লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিতা অপমানিতা কন্যাদের মধ্যে একজন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কি রহস্য হইতে পারে? হায়, সে কী দুর্বার মনোবেদনা, যাহা মহামায়াকে রানী হইতে সন্ন্যাসিনী করিল! ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! মহামায়া ছিলেন প্রচণ্ড প্রতাপশালী মৌখরিকুলের রাজলক্ষ্মী। এই পড়ন্ত বয়সেও তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে যে তেজ ঝরিতেছিল, তাহাই ধাবকের কথার প্রমাণ। তা ধাবক ঠিকই বলিতেছিল। আজ মহামায়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা বহু বৎসরের সঞ্চিত কটুতার মূর্ত প্রতীক। সিংহিনীর আত্মা যেমন ছিল তেমনই আছে, শুধু বেশ পরিবর্তন হইয়াছে। বলিয়া গেল যে মহামায়া বুঝি কোনও পতিতা নারী, আরও পতিত হইয়া কিন্তু এই ধাবকও অদ্ভুত লোক। ও কেমন কবি! এত বড় কথা ও এমনভাবে গিয়াছে। কিন্তু ধাবকের মুখ কেমন নির্বিকার! আশ্চর্য!

বন্দীশালার নিকটে পেঁৗছাইয়া ধাবক বলিল—'নিন সখা, দরজা খোলা আছে। আপনি কুমারের আদেশ পালন করুন, আমি চলি।' বন্দীশালা ছিল প্রস্তরনির্মিত এক সুদৃঢ় ভবন, তাহার উচ্চতা এত কম ছিল যে কেহ তাহার ভিতরে সহজে দাঁড়াইতে পারিত না। সমস্ত ভবন এক বিরাট বিবরের মত লাগিতেছিল। দরজায় এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তাহার ভয়ংকরতা আরও বাড়াইয়াছিল। প্রহরীরা একবার আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমি এক বড় আঙিনায় উপস্থিত হইলাম। এই আঙিনার চার দিকে ছোট ছোট গুহাকৃতি কুঠরি ছিল। তাহাদের মধ্যে একটির দ্বারদেশে আমাকে লইয়া যাওয়া হইল। দরজা খুলিবার পর চন্দ্রমার জ্যোৎস্নায় সেই ক্ষুদ্রায়তন গৃহ উদ্ভাসিত হইল। তাহাতে আলো বা হাওয়া যাওয়ার কোনও পথ ছিল না। কুট্টিমভূমি প্রস্তরে বাঁধানো ছিল; কিন্তু এক প্রকার দুর্গন্ধে সমস্ত কক্ষ অসহ্য মত মনে হইতেছিল। তাহার ভিতরে সুচরিতা নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত পদ্মাসনবন্ধে বসিয়াছিল। দরজা খোলার শব্দে তাহার ধ্যানভঙ্গ হইয়া থাকিবে। শুধু গ্রীবা ঈষৎ বাঁকাইয়া সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্রহরী আমার নাম বলিয়া পরিচয় দিল। সুচরিতার চক্ষু আশ্চর্যে বিস্ফারিত হইয়া গেল! প্রহরী প্রকৃতই যে সত্য কথা বলিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল। মুহূর্তে তাহার মুখমণ্ডল আনন্দালোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। তরল এক সৌন্দর্যধারায় সমস্ত কুট্টিম যেন প্লাবিত হইয়া গেল। সুচরিতা উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, উঠিতে পারিল না। তাহার সেই কাতরতা আমার হৃদয়কে বিশেষভাবে ব্যথিত করিল। আহা, কেমন করুণ-মনোহর মুখ! মন্দ হাসি অধরের উপর খেলিয়া যাইতেছিল। বিবশতার জন্য চক্ষু দুইটি আনত, এবং পাছে চোখের জল পড়ে সেই ভয়ে সে আমার দিকে সোজা না তাকাইয়া অপাঙ্গে তাকাইয়াছিল। ব্যাকুল কেশজাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, স্কন্ধ আন্দোলিত করিয়া সে তাহার অসংযত রূপকে ঈষৎ সংযমিত করিতে প্রয়াস করিতেছিল। সীমন্তশোভী অবগুণ্ঠন পৃষ্ঠভাগে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হস্তদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকায়—তাহা যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে পারে নাই। তাহার সেই করুণ মনোভাব প্রহরীর পাষাণ হৃদয়ও বুঝিতে পারিয়াছিল। সে অবিলম্বে এক বৃদ্ধাকে ডাকিয়া আনিল। সে তাহার সীমন্ত আবৃত করিয়া দিল। সুচরিতা অতি কষ্টে অধরে হাসি টানিয়া বলিল—'অস্থানে আর্যকে প্রণাম করিতেও লজ্জা বোধ করি। অবিনয় ক্ষমা করিবেন, ইহাও নারায়ণের দেওয়া প্রসাদ।' শুধু এক মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ বিবর্ণ হইল; কিন্তু শীঘ্রই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া সে বলিল—'যাহাতে তিনি আনন্দ পান, তাহাই

কর্তব্য।' পুনরায় মুহূর্তের জন্য অভিভূত অবস্থায় সে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল, শুধু থাকিয়া থাকিয়া অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছিল, যেন কোনও অদৃশ্য ব্যক্তির সঙ্গে অজ্ঞাত ভাষায় কিছু বলিতেছে। আমার হৃদয় সহস্র-সহস্র ধারায় সেখানে ছাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কি করিয়া বলিব, দেবি, বাণভট্ট আপনার সকল কষ্ট নিজের উপর লইবার জন্য প্রস্তুত? হায়, ইহাও কি সম্ভব? কোন কূটনীতি এই পদ্মপুষ্পকে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে, কোন পাপবুদ্ধি এই নবনীতপিণ্ডকে মুঞ্জতন্তুতে জড়াইয়াছে, কোন কলুষময় জীব এই মালতীমালা তপ্ত অঙ্গারের উপর ফেলিয়া দিয়াছে? কেমন করিয়া বলিব, দেবি, আপনার এই কষ্ট ও বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিজের উপর না লইলে এই অকিঞ্চনের জীবন ভার বোধ হইবে? এই বিষয়ে বাণভট্টের কি শক্তি থাকিতে পারে? কিন্তু সুচরিতা নির্বিকার ছিল। সে নারায়ণের প্রসাদ মনে করিয়াই এসমস্ত দুঃখকষ্ট সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে।

সে সময় চন্দ্রমা কিছুটা উচ্চ গগনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। মনে হইতেছিল, মহাবরাহ ধরিত্রীকে দন্তে রাখিয়া সহসা ক্ষীরসাগর হইতে বাহির হইয়াছেন, এবং সমস্ত ভুবনমণ্ডল সেই ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ক্ষীরধারার প্লাবনে ক্ষীরময় হইয়া গিয়াছে। সুচরিতার সেই ক্ষুদ্র বন্দীগৃহ এই ধবল ধারায় এমন মনে হইতেছিল, যেন ক্ষীরসাগরের ভিতরে কোনও জলকুক্কুট সন্তরণ করিতেছে। সেই ধবলিমার ভিতর সুচরিতাকে তুষারশোভী কৈলাসের শৃঙ্গদেশে সমাসীন পার্বতীর মত মনোহর দেখাইতেছিল। আমি সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলাম—'দেবি, অবিনয় ক্ষমা করুন, আমি সমস্ত ব্যাপারটি আদ্যোপান্ত জানিবার ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছি। আমি কিছু ভালো করিবার নিমিত্তমাত্র হইতে পারি। যদি অনুগ্রহ হয় তবে কৃতার্থ হইব।' সুচরিতার শীর্ণ মনোহর মুখমণ্ডল পুনরায় একবার আনন্দের দীপ্তিতে চমকিয়া উঠিল, সে বলিল—'আর্য, আমাকে অকারণ লজ্জা দিতেছেন। আমি অকিঞ্চন। আমাকে রানীদের মত সম্মান দিয়া সম্বোধন করার কি প্রয়োজন? আমার কোনও কিছুই গোপন নাই। পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম, আমার দ্বারা যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আমি নারায়ণে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। তাহা নিখিল বিশ্বের নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। আর্য, আমার কোনও কিছুই গোপন করিবার নাই। আজ্ঞা দিন, কি বলিব?' আমি পুনরায় অনুকম্পার সুরে বলিলাম 'এই ব্যাপারের মূল কি, আর বিরতিবজ্রের ব্যাপারে আপনাকে কেন বন্দী করা হইল, এ সমস্ত জানিতে চাহি দেবি!' সুচরিতার অধরে এক লঘু হাস্যের রেখা খেলিয়া গেল। তাহার চক্ষু নীচের দিকেই নত ছিল; কিন্তু ভ্রূকুটিগুলির মধ্যে আকুঞ্চন এবং প্রসারণ ক্রিয়া বরাবরই চলিতেছিল। সে আমার দিকে তাকাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জা তাহাকে পলক

ফেলিতেই দিতেছিল না। সে ধীর ভাবে বলিল—'আর্য, তবে আদ্যোপান্তই শুনিতে চাহিতেছেন?' আমি সবিনয়ে উত্তর করিলাম—'যতখানি শুনিবার অধিকারী হইতে পারি, ততখানি সমস্তই শুনিতে চাই।' সুচরিতার আনত নয়নে এক অপূর্ব রসমাধুরী তরঙ্গিত হইতেছিল। মাথা নাড়িয়া পুনরায় একবার কেশপাশ সংযমিত করিয়া সে বলিল—'শুনুন।'

সুচরিতা ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—'আমার নিজের কাহিনী মধ্যভাগ হইতেই শোনাইতে হইবে। বাস্তবিক, আমার শৈশব আমার অজ্ঞাতেই কাটিয়া গিয়াছে। আমার না আছে মায়ের কথা স্মরণ, না পিতার কথা। অতি অল্প বয়সেই আমার বিবাহ দিয়া আমার অভিভাবকেরা তাঁহাদের কর্তব্যভার লঘু করিয়া লইয়াছিলেন। শ্বশুরকুলে আমি শুধু আমার শাশুড়ীকেই জানিতাম। আমার বিবাহের পূর্বেই শ্বশুর মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, আর আমার আসিবার অল্প দিন পরেই পতিদেবতা মোক্ষলাভের আশায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। আমি এতই অবোধ ছিলাম যে এই সকল ঘটনাব কোনও অর্থই বুঝিতে পারি নাই। শাশুড়ী তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া আমাকে পালন করেন। ক্রমে একদিন আমি অকারণ নিজে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলাম। যেমন বসন্তকালে মধুমাস, মধুমাসে পল্লবরাজি, পল্লবরাজিতে পুষ্পসম্ভার, পুষ্পসম্ভারে ভ্রমরমালা, আর ভ্রমরাবলীতে মদাবস্থা না ডাকিলেও চলিয়া আসে, তেমন করিয়াই আমার দেহে যৌবনের পদার্পণ হইল। আমার শাশুড়ী তীর্থযাত্রার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন, আর আমি নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে এক অন্তর্নিহিত অভাবের অবহেলায় ঝুলিতে থাকি। আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল স্থান্বীশ্বরে। শাশুড়ী শেষ বয়সে সেখানেই থাকিতে লাগিলেন। ইহার পূর্বে তিনি তীর্থযাত্রার জন্য কাশী গিয়াছিলেন। একদিন কাশীর পার্শ্ববর্তী জনপদ দিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় শাশুড়ী দেখিলেন যে এক অতি সুন্দর ও প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ যুবক কথকতা করিতেছেন। তাঁহার মোহন ভঙ্গী, শ্রুতিমধুর পদবিন্যাস, মনোহারী উপস্থাপনাতে জনপদে ধর্মবিষয়ে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার হইল। আমরাও কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। যখন কথা শেষ হইল, তখন আমার শাশুড়ী যথারীতি সেই তরুণ পণ্ডিতকে আমার হস্ত দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, তাঁহার পুত্র কবে ফিরিয়া আসিবে? আমি আপনাকে সত্যই বলিতেছি আর্য, সেদিন আমার অস্তিত্ব সীমা ছাড়াইয়া উদ্বেল হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, লজ্জাবেগের কারণ করতলে স্বেদধারা বহিতে লাগিল। আমি প্রথম অনুভব করিলাম যে আমি নিজের মধ্যে নিজে অপূর্ণ আছি। এমন একটা অভাব আমার অন্তস্তলকে স্পর্শ করিল যাহা জীবনের শ্রেষ্ঠ বর বলিয়া স্বীকার করিলাম। সেই ব্রাহ্মণ

কুমার স্নেহযুক্ত করতল বেশি দেখিল না, শুধু মন্দ হাসির সঙ্গে সহজভাবে বলিল—'দেবি, তুমি অখণ্ড সৌভাগ্যবতী', আর পুনরায় আমার শাশুড়ীকে আশ্বাস দিতে লাগিল। সেই দিন আমার হৃদয়ে আশার এক ক্ষীণ অঙ্কুর জন্মিল। আমি যেন নবজন্ম লাভ করিলাম; কারণ সেই দিন প্রথমবার বুঝিতে পারিলাম যে আমি পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র এক মাংসপিণ্ড নহি, যদিও চারিদিকের দুর্বার আক্রমণে ভিতরে সঙ্কুচিত হইয়া আছি; আপনি বিশ্বাস করিতেছেন তো আর্য ?'

আমি সুচরিতার এই অনাবশ্যক প্রশ্নের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। হয়তো অনেকে তাহার এই কাহিনীতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকিবে, অথবা ও হয়তো নিজেই আমার উপর আস্থা রাখে না। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল বারাণসী জনপদে সেই বৃদ্ধার কথা, যে পরম আগ্রহে তাহার বধূর হাত দেখাইয়াছিল, এবং জানিতে চাহিয়াছিল, কবে তাহার আদরের ধন ফিরিয়া আসিবে। সেই বধূই কি সুচরিতা? সুচরিতা এক মুহূর্ত আমার দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—'তাহার পর আর্য, ব্রাহ্মণ-যুবার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই ফলিয়া গেল। আমি অখণ্ড সৌভাগ্যবতী প্রমাণিত হইল। সেই কাহিনী আর্যকে শোনাইতেছি। শাশুড়ীকে লইয়া কান্যকুব্জের দিকে ফিরিতেছিলাম। তখন চৈত্র মাস। সরোবরে নূতন পদ্মফুল ফুটিয়াছিল। আম্রের কোমল কলিকা উৎসুক চিত্তকে আরও উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল, মদমত্ত কামিনীদের গণ্ডূষজলসেচনে বকুলবৃক্ষে ফুল ধরিতেছিল। কালেয়ক কুসুমের কুট্মলের উপর মধুকরকুলের কালিমা বিছানো ছিল। কিশোরীদের দলে বামপদের নূপুরময় চরণতাড়নায় অশোককে পুষ্পিত করিবার প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছিল। সহকার তরুর উপর ঝঙ্কারমুখর ভ্রমরগণের আক্রমণ শেষ হইয়াছিল। অবিরল-নিপতিত কুসুমরেণুর ধবলিমায় ধরিত্রী আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পুষ্পমধুপানে মত্ত ভ্রমরীগণ লতার হিন্দোলায় ঝুলিতেছিল। উৎফুল্ল লবলীর পল্লবে লীয়মান কোকিল তাহার কাকলীতে প্রেমিকহৃদয়ে স্পন্দন জাগাইতেছিল। অনঙ্গদেবের শস্ত্রাগারে লক্ষ লক্ষ নূতন অস্ত্র সংগৃহীত হইয়া গিয়াছিল। আমি চিত্রকূটের এক সরোবরতটে স্নান করিবার জন্য শাশুড়ীর সঙ্গে গিয়াছিলাম। যে স্ত্রী সরোবরে স্নান করে তাহার সৌভাগ্য যুগান্ত পর্যন্ত অচল থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সরোবর ছিল এক ঘনচ্ছায় বৃক্ষসংকুল প্রদেশে। তাহার তটদেশে জীর্ণ পত্র ও পুষ্প রাশি রাশি সঞ্চিত ছিল। ভ্রমরভারে উৎফুল্ল পুষ্পের পরাগ ঝরিয়া হইয়া তটদেশকে সোনালী করিয়া তুলিতেছিল। সমস্ত সরোবর নানা প্রকারের কুমুদ, কমল, উৎপল ও শতদলে পরিপূর্ণ ছিল। সরোবরের এক প্রান্তে এক ক্ষুদ্র আম্রকানন ছিল, তাহার মঞ্জরী-দণ্ডগুলি উন্মত্ত কোকিলেরা

নখাগ্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, আর সেইজন্য সেগুলি হইতে নিরন্তর মধু ঝরিত। অন্যপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র চন্দন বীথিকা ছিল, তাহার তরুকাণ্ডগুলির উপর সর্প জড়ানো ছিল, সেসব সর্প সর্বদা পর্বতচারী ময়ূরদের কেকাধ্বনিতে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। সরোবরের তীরবর্তী বৃক্ষগুলির নীচে যে কুসুমরেণু ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর কলহংসমিথুন বিশ্বস্তভাবে বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের পদচিহ্নে বহুধা বিকীর্ণ সে রেণুপটল চিত্রখচিত বাসন্তী দুকূলের মত বনস্থলীরূপী অরণ্যসুন্দরীর শোভা শতগুণে বর্ধিত করিতেছিল। আমার শাশুড়ী জলস্পর্শ করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কিছু প্রার্থনা করিলেন, তাহার পর তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া জপ করিতে লাগিলেন! আমি কিছুক্ষণ সরোবরের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম। পুনরায় মনে হইল, এই আম্রবন আর এই চন্দনবীথিকা এমনভাবে লাগানো হইয়াছে যে অবশ্যই মানুষের কুশল করস্পর্শ ইহাতে ঘটিয়াছে। একথা ভাবিয়া আমি ধীরে ধীরে সেই আম্রকাননের দিকে অগ্রসর হইলাম। মনে এক অকারণ কৌতূহল জন্মিয়াছিল। আর্য, এই দগ্ধহৃদয় বড়ই অসম্ভব রকমের আশাবাদী; মনে হইতেছিল কেহ বুঝি আমাকে বলপূর্বক ঐদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, যেন আমি যাহার অভাবে ভোলা হইয়া ভ্রান্ত হইয়া উন্মনা হইয়া গিয়াছি, সেই বস্তুর সন্ধান নিশ্চিতরূপে সেখানে পাইব। কী দেখিলাম, আম্রকাননের ভিতর হইতে এক তরুণ তাপস স্নানার্থী হইয়া সরোবরের দিকে আসিতেছেন! এ কী দেখিলাম, আর্য! শিবের তৃতীয় নয়নের বহ্নিশিখায় আপন মিত্রকে ভস্ম হইতে দেখিয়া বসন্তই কি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন, না মহাদেবের শিরস্থিত চন্দ্রই কি তাঁহার মণ্ডল পূর্ণ করিবার জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, না স্বয়ং কামদেবতাই শিবকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে এই কঠোরচর্যা আরম্ভ করিয়াছেন? অতিশয় তেজস্বিতার জন্য সেই মুনিকুমারকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তিনি চঞ্চল বিদ্যুৎপুঞ্জের মধ্যে বর্তমান, অথবা গ্রীষ্মকালীন সূর্যমণ্ডলের ভিতর প্রবিষ্ট, অথবা অগ্নিশিখার মধ্যে শোভা পাইতেছেন। প্রদীপের আলোর মত পিঙ্গল বর্ণের ঘন তরল দেহপ্রভায় তিনি সম্পূর্ণ বনকে পিঙ্গল বর্ণের ছটায় উদ্‌ভাসিত করিতেছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ নয়ন দুইটি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে বনের সমস্ত হরিণ মিলিয়া বুঝি তাঁহাকে নিজেদের নয়নশোভা দান করিয়াছে। তাঁহার কেশবিহীন মুণ্ডিত মস্তকের নীচে বৈরাগ্যের বিজয়কেতনের মত তিনটি তির্যক্‌রেখা তরল দেহ-ছটায় ভিতর হইতে যেন ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। তিনি লোহিত বর্ণের কৌশেয় বস্ত্রের এক বিচিত্র চীবর পরিধান করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল বুঝি নবযৌবনের রাগ হৃদয়ের মধ্যে আঁটিতে পারা যায় নাই,

এই জন্য ঐ বস্ত্র পর্যন্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, তাঁহার উত্তরোষ্ঠের উপর ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ মসী-রেখা দেখা যাইতেছিল, তাহা মুখপদ্মের মধুলোভে উপবিষ্ট ভ্রমরাবলীর মত মন মুগ্ধ করিতেছিল। তাঁহার এক হস্তে বৃন্তসমন্বিত বকুল-ফলের আকারে কমণ্ডলু ছিল, অন্য হস্তে লাল লাল ক্ষুদ্র জপমালা ছিল, তাহা মদনদহনের শোকে কাতর রতিদেবীর সিন্দুরে উপলিপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। আগুল্‌ফ রক্ত চীবরে সমাচ্ছাদিত সেই তরুণ তপস্বীকে দেখিয়া আমি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। ব্রহ্মচর্যের বিজয়পতাকা, ধর্মের যৌবনকাল, বাগ্‌দেবীর বেশবিন্যাস, সর্ববিদ্যার স্বয়ংবৃত পতি, সমস্ত জ্ঞানের মিলনতীর্থ, শোভার সমুদ্র, গুণের আকরভূমি, কীর্তির কৈলাস, কান্তির স্রোতস্বতী, প্রেমের উদ্‌গম-বিহার—ইঁনি কে?'

'আর্য, আপনি নারায়ণের বিগ্রহ। আপনাকে সত্য বলিতেছি, সেদিন আমার হৃদয়ে শত শত যুগের কবি রাগরঞ্জিত গান গাহিয়া উঠিলেন। যেন তাঁহারা শত শত জন্মে মুখরিত হইয়া বলিতে চাহিতেছেন যে এখানেই আমার জীবনের সার্থকতা। বিধাতার সৌন্দর্যভাণ্ডার কি বিরাট! শুনিয়াছিলাম, ভগবান কুসুমসায়ককে নির্মাণ করিবার পর তাঁহার ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আবার এই অপূর্ব সৌন্দর্যরাশি গঠন করিবার উপাদান তিনি কোথা হইতে পাইলেন! নিশ্চয়ই সে ভাণ্ডার অপূর্ব, তাহা বিরাট! তখন বিস্ময়ের আতিশয্যে আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, পলক ঊর্ধ্বগতি হইয়া গিয়াছিল। নির্নিমেষ নয়নে আমি আগ্রহপূর্ণ হইয়া সেই রূপমাধুরী পান করিতে থাকিলাম। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমার জন্মজন্মান্তর যেন কৃতার্থ হইল। আমি যেন কিছু কামনা করিতে করিতে, সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে করিতে, মনে প্রাণে তাঁহার রূপরাশিতে বিলীন হইয়া যাইতে যাইতে, শরণাগতা হইয়া যাইতে যাইতে, স্তম্ভিতা-চিত্রলিখিতা-উৎকীর্ণা-সংযতা-মূর্চ্ছিতা-বিধৃতার মত, নিরুদ্ধচেষ্ট হইয়া গেলাম। জানি না, কি একটা জড়তা আমার সমস্ত দেহাবয়ব নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিল, ইন্দ্রিয়ব্যাপার রুদ্ধ করিয়া দিল, নয়নপক্ষ্মকে অচঞ্চলতা দিয়া গেল, মনকে অপরিচিত অননুভূত মধুর-রসে ডুবাইয়া দিল। আমি ঠিক বলিতে পারি না তাঁহাকে এইভাবে দেখিবার জন্য কোন্ কথা আমাকে প্রেরণা জোগাইল—তাঁহার সৌন্দর্যসমৃদ্ধি, আমার চঞ্চলচিত্ত, আমার নবযৌবন, অনুরাগ, না অন্য কিছু? আমি তখন তাঁহাকে এতই আগ্রহে কেন দেখিতেছিলাম যে আমি নিজেই সে কথা জানিতাম না। আমার আশ্চর্য মনে হয় আর্য যে আমি সেখানে কাষ্ঠপ্রতিমার মত কি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার চক্ষু আমাকে টানিয়া তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিতেছিল, হৃদয় যেন সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, অনুরাগ যেন পিছন হইতে ধাক্কা দিতেছিল, আর

আমি হতভাগিনী এই সকল বিবিধ আকর্ষণের ঘাতপ্রতিঘাতে স্থির কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ স্তব্ধ হইয়া থাকিলাম। পুনরায় আমার মনে আশঙ্কা হইল, আমি কি কোনও ভয়ানক পাপচিন্তার বশ হইয়া পড়িলাম! কোথায় সেই দেদীপ্যমান তেজ ও তপস্যার আধার, আর কোথায় প্রাকৃতজনসুলভ অনুরাগ! একি মনোজন্মা দেবতার উৎপাত, না পূর্বজন্মের কোনও দুর্বার যোগ উপস্থিত হইয়াছে! আমি বুঝিয়াও কেন এই প্রকার রাগোৎসুক হইয়া রহিয়াছি! এক ঘটী ধরিয়া চিন্তা করিয়া আমি নিজেকে শান্ত করিতে পারিলাম। সেখান হইতে সরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম, সহজভাবে প্রণাম করিতে চেষ্টা করিলাম। তখনও আমার দৃষ্টি তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে সরিয়া যাইতে পারে নাই। নয়নপক্ষ্ম তখনও নিস্পন্দ ছিল, আমার ঈষদুল্লসিত কর্ণপল্লব নামমাত্র কপোল-দেশ হইতে সরিয়া গিয়াছিল, কেশভার স্কন্ধদেশে পূর্ববৎ লম্বিত ছিল, কর্ণের কুণ্ডল তখনও স্কন্ধদেশে ঝুলিতেছিল।—ছিঃ আর্য, নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে!'

সুচরিতা নিজের কাহিনী সহজ ভাবেই বলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু এই পর্যন্ত আসিয়া তাহার কণ্ঠে কিছু জড়তা আসিয়া গেল। চন্দ্রমার ধবল জ্যোতি-ধারা সোজাসুজি তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। তাহার মুখ ঐ শ্বেত আবরণে যতখানি উদ্‌ভাসিত ছিল, ততখানি আবৃতও ছিল। কিন্তু এবার যে লালিমা তাহার মনোহর মুখের উপর সহজে খেলিয়া গেল, তাহা এই শ্বেত আবরণেও লুকানো গেল না। জাহ্নবীধারায় প্রতিফলিত রক্তোৎপলের মত, সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভিতর হইতে পরিদৃশ্যমান দীপশিখার মত, শরতের মেঘে অন্তরিত বালসূর্যের প্রভার মত সেই লালিমা অধিকতর রমণীয় হইয়া দৃশ্যমান হইল। শুধু এক মুহূর্তের জন্য তাহার দৃষ্টি আনত হইল, পর মুহূর্তেই সে সজাগ হইয়া গেল। বলিল—'কেন এমন হয়, আর্য? ইহা কি পূর্বজন্মের বন্ধন, না পরজন্মের কারণ? যে প্রচণ্ড দুর্বার শক্তির ইঙ্গিত মাত্রে লজ্জার আজন্মলালিত বন্ধন এভাবে শিথিল হইয়া যায়, তাহা কি পাপ? আর্য, তাহাকে রাক্ষসী শক্তি কেন মনে করে? আমি যত লোককে এ কাহিনী শুনাইয়াছি, তাহারা সকলেই বুদ্ধিমানের মত মাথা নাড়িয়া আমাকে পাপীয়সী বলিয়া বুঝিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি নিজে নিজের এই অকারণ-আরোপিত পাপ-চিন্তার চিতাগ্নিতে জ্বলিতেছি। বৈরাগ্য কি এতই বড় যে প্রেমের দেবতাকে তাহার নয়নাগ্নিতে ভস্ম করাইয়া কবি গৌরব অনুভব করেন?' সে কিছুক্ষণ আমার উত্তরের আশায় তাকাইয়া রহিল। আমি সংক্ষেপে বলিলাম—'প্রশ্ন ভাগ করিয়া উত্তর দিতে হয়, দেবি! আপনি দুইটি কথা একত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কালিদাস প্রেমের দেবতাকে বৈরাগ্যের নয়নাগ্নিতে ভস্ম করান নাই, বরং তপস্যার

মাধ্যমে সৌন্দর্য দিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছেন। পার্বতীর তপস্যা হইতে সত্য প্রেমের দেবতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাহা ভস্ম হইয়াছিল, তাহা আহার-নিদ্রার সমান, জড় শরীরের বিকারী ধর্মমাত্র। তাহা দুর্বার ছিল, কিন্তু দেবতা ছিল না। দেবতা দুর্বার হয় না দেবি, আপনার প্রশ্ন দুই ভাগ করিয়া বলিতে হইবে। আমি আপনার সমগ্র কাহিনী পুরোপুরি শুনিতে চাই।' সুচরিতা চকিত মৃগশাবকের মত আশ্চর্য-বিস্ফারিত নয়নে আমাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—'কি বলিলেন আর্য, শিবকে কি পার্বতী একমাত্র দেবতার রূপে আরাধনা করেন নাই? তাঁহার ব্রত কি জড় শরীরধর্মের পাপ-আকর্ষণ মাত্র ছিল? ব্রজসুন্দরীরা নিখিলানন্দসন্দোহ মুকুন্দের বিগ্রহমাধুরীর প্রতি যে আকর্ষণ দেখাইয়াছে, তাহার নাম কি প্রেম ছিল না? পুনরায় বলি, তবে কেন বলা হইয়াছিল যে ব্রজসুন্দরীদের প্রেমই কাম আর কামই প্রেম?* পার্বতীর সেই আসক্তি কি শুধু এক বাহ্য জড়ধর্ম? মুহূর্তের মধ্যে আমার সম্মুখে পার্বতীর তপস্যানিরত বেশ বিদ্যুতের ছটার মত খেলিয়া গেল, কালিদাসের অপূর্ব বর্ণনানৈপুণ্যে প্রতিফলিত সেই মূর্তি মনে পড়িল, যাহা শিলার উপর শয়ন করিত, যাহা ছিল অনিকেত, রৌদ্রবর্ষা ঝড়তুফানে যাহা স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। শুধু মহারাত্রিই তাহার বিদ্যুন্ময়ী দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে চমকাইয়া সেই মহাতপস্যার সাক্ষী হইয়া আছে।* পার্বতীর সেই অবস্থার সহিত সুচরিতার এই অবস্থার কতখানি সমতা আছে, কতখানিই বা বৈষম্য আছে! আমি স্নেহতরল কণ্ঠে বলিলাম—'পার্বতী সত্যই শিবকে নিজের সর্বস্ব বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, দেবি! কিন্তু দোষ হইয়াছিল শিবের দিক হইতে। তিনি নিজের চিত্তবিকারের হেতু দশদিকের মধ্যে খুঁজিয়াছিলেন। চেতনের সংস্পর্শে আসিয়া জড়প্রকৃতির বিকারই তো চিত্ত, শুভে!* কিন্তু সমস্ত কাহিনীটি শুনিবার জন্যই আমার আগ্রহ।'

সুচরিতা বলিল - 'আর্য আপনি চতুর ও প্রিয়ভাষী, অর্ধ কাহিনী শুনিয়া নির্ণয় করা জড়বুদ্ধির লক্ষণ, সকলে আমার কাহিনীর অর্ধভাগই শুনিয়াছেন। আর এই অসম্পূর্ণ কাহিনী এই নগরে নানা ভাবে বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু আপনি পুরোপুরি সমস্ত শুনিতে চাহিতেছেন। নিপুণিকা অর্ধেক কথাই জানে; কিন্তু সে সন্দেহ করে নাই। আমার আচরণ পাপ বলিয়া মনে করে

* অনেক পরবর্তী গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র নিম্নলিখিত কথার সহিত তুলনীয়:
'প্রেমৈব ব্রজরামাণাং কাম ইত্যভিধীয়তে।'

* শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈর্মহাতপঃ সাক্ষ ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ॥—কুমারসম্ভব, ৫।২৫

* হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্—কুমারসম্ভব, ৩।৬৯

নাই। তাহার সহৃদয়তা ছিল। আর্য, আমি আপনাকে সব কথাই শুনাইতেছি। যখন আমি এভাবে নিজেই নিজের সংযমের রশ্মি টানিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন আমার শাশুড়ী অনেকক্ষণ আমাকে ফিরিতে না দেখিয়া আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঐ দিকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই রক্তচীবরধারী মুনিকুমারকে দেখিয়াই কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'ওরে আমার ধন, আমার অমিতকান্তি!' আর অর্ধমূর্চ্ছিতের মত হইয়া তপস্বীর নিকট আছাড় খাইয়া পড়িলেন। মুনিকুমারের বৈরাগ্যকঠোর মুখের উপর করুণ ভাবের রেখা দেখা দিতে লাগিল। তিনি একদিকে কমণ্ডলু রাখিয়া দিয়া ধীরভাবে মায়ের মাথা কোলে লইয়া মাথা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। অত্যন্ত মৃদু-কোমল কণ্ঠে বলিলেন—'আর্যে, সংযত হউন, অনর্থক কেন উদ্বিগ্ন হইতেছেন?' মাতা করুণ নেত্রে পুত্রের দিকে দেখিলেন—বলিলেন, 'পুত্র, আমি অভাগিনী কাঁদিয়া মরিতেছি, তুই আমাকে ছাড়িয়া কি এমন ধর্ম করিতেছিস? এই দেখ, তোর বিবাহিতা স্ত্রী। হতভাগা, স্বর্গে তোর কি এমন অপ্সরা মিলিবে যাহার জন্য তুই এমন মণিকাঞ্চনপ্রতিমা ছাড়িয়া তপস্যা করিতেছিস?' মাতার এই কথায় আমি যতখানি হতবুদ্ধি হইলাম ততখানি লজ্জিতও হইলাম। এও কি একটা কথা! তপস্বী কিন্তু গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাঁহারা তেজোব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে নির্বিকার ভাব পূর্ববৎই থাকিয়া গেল। মাতা কাতরকণ্ঠে নিজের দুঃখময় কাহিনী শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। পুত্র ধীরভাবে শুনিয়া বলিলেন—'সংসার দুঃখময়, আর্যে!' সে এক বিচিত্র অবস্থা। সমস্ত জীবনের নৈরাশ্য ও কষ্টের সাক্ষাৎ প্রতিমা মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের করুণ কাহিনী শুনাইতেছেন, আর পুত্র নির্বিকার ভাবে উপদেশ দিয়া যাইতেছেন, যেন তিনি নিজের মাতাকে চিনিয়াও চিনিতেছেন না, যেন তাঁহার মাতাও অন্যান্য শত শত আর্যার মতই একজন সাধারণ আর্যা! আমার নারীত্ব এই ভাব সহ্য করিতে পারিল না; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারিলাম না। লজ্জায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। শেষে মাতাই অন্য রূপ ধারণ করিলেন—'ওরে মূর্খ, শেখানো কথাই বলিতেছিস! এ ধর্মাচরণ ভণ্ড, যাহা নিজের মাতাকে চিনিতেও লজ্জা অনুভব করায়। এই দুঃখের সংসারকে আরও দুঃখময় করিয়া তোর কি সুখের রাজপথ প্রস্তুত হইবে? তোর পথ স্বার্থের পথ, ধিক তোর পৌরুষকে!' তপস্বীর চিত্ত গলিল। তিনি একবার আমার দিকে দেখিলেন, আবার মায়ের দিকে চাহিলেন। মাতা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধমক দিয়া বলিলেন—'তাকাইয়া কি দেখিতেছিস, অভাগী, এই তোর স্বামী, এই তোর দেবতা। আর, এর চরণতলে নিজেকে শেষ করিয়া দে। ভাগ্যহীনা, কেন মরিস না, আমি মরিয়া তোকে শিখাইয়া দিব যে মরণ কাহাকে বলে। এই তোর পাণি গ্রহণ

করিয়াছিল। এই তোর ভরণপোষণ করিবে। আর, তুই ইহার শরণ নে। আমি চলিয়া যাইতেছি। অনেক কাঁদিয়াছি। আজ আমি আমার হারানো ধন ফিরিয়া পাইয়াছি। আমি এবার ভুল করিব না। ইহাই আমার শেষ।' এই পর্যন্ত বলিয়া মাতা সবলে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিলেন আর কর্তিতমূল বৃক্ষের ন্যায় তপস্বীর কোলে পড়িয়া গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে আমি অন্ধকার দেখিলাম। 'মা গো' বলিয়া আমিও মাতার চৈতন্যহীন দেহের উপর পড়িয়া গেলাম।

অল্পক্ষণ পরে আমার জ্ঞানসঞ্চার হইলে দেখিলাম, তপস্বীর তেজঃপূর্ণ মুখমণ্ডলের উপর বিকারের ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার বড় বড় নয়নরূপ কোষা হইতে মুক্তাফলের ধারার মত অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি লজ্জিত, শোকার্ত, হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জড়বৎ রহিলাম। তপস্বী তাঁহার চীবর দিয়া মাতার শিরোদেশে বীজন করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পপূর্ণ। আমার দিকে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন—'শুভে, ধৈর্য ধারণ কর, এই কমণ্ডলুতে সামান্য কিছু জল লইয়া এস।' আমার জন্ম যেন সার্থক হইয়া গেল। আমি কোনও উত্তর না দিয়াই সরোবর হইতে জল লইয়া আসিলাম। মাতার নেত্রে ও মস্তিষ্কে বারিসিঞ্চনের পর তিনি পুনরায় চীবর দিয়া বীজন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে পুনরায় আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনতনয়নে বলিলেন—'দেবি, মাতার পদতল করতল দিয়া ভাল করিয়া ঘর্ষণ কর।' আমি আজ্ঞা পালন করিলাম। কিছুকাল শুশ্রূষার পর মাতা চক্ষু মেলিলেন। এইবার তপস্বীর ব্রত ভঙ্গ হইল, সংযমের বাঁধ ভাঙিল, দীর্ঘকাল ধরিয়া মুখস্থ করা কথা ফুরাইয়া গেল। বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—'মা, ও মা!' মাতার স্নেহোচ্ছল হৃদয় এইবার উছলিয়া উঠিল। নিজের ক্ষীণ ভুজলতা দিয়া তপস্বীর স্কন্ধদেশ বাঁধিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন—'হাঁ পুত্র, মা বলিয়া ডাক। আমার আদরের ধন, আমার হারানো মাণিক, আমার অমিতকান্তি! তোর পিতা স্বর্গে তোর এই রুক্ষ-জটিল রূপ দেখিয়া আমাকে খুবেই ভর্ৎসনা করিবে, ধন! আমি আর বেশি দিন বাঁচিব না। ডাক, একবার মা বলিয়া ডাক। আমি তোর কোলে সুখনিদ্রায় শুইতে চাই।' তপস্বী এবার আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না! তিনি কাঁদিয়া পড়িলেন—'না মা, আমি তোমার কোলেই ফিরিয়া আসিব, একবার গুরুর নিকট হইতে আজ্ঞা লইতে দাও।' মাতার মুখ লাল হইয়া গেল। পুনরায় করুণরসের মধ্যে বীররসের সহসা প্রকাশ হইল। গর্জন করিয়া বলিলেন—'পাষণ্ড সে ভণ্ড, যে মায়ের চেয়েও নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গুরুগিরি জাহির করে। তুই আমার, আমার রক্তমাংসের টুকরা, অন্য কে তোর গুরু?' মায়ের দুর্বল শরীর এই উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিল না। তিনি পুনরায়

অজ্ঞান হইয়া গেলেন। এবার আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া পড়িলাম—'হায় মা, এখন কে আমার সহায় হইবেন?' তপস্বী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'অস্থির হইও না ভদ্রে, মায়েকে বাঁচানো তো আমারই হাতে।' তিনি কিছুটা তৎপরতার সহিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আমাকেও নানা প্রকারে সেবা করিতে আদেশ দিতে থাকিলেন। অল্পক্ষণ পরে মাতা যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন, তখন তিনি অকম্পিত স্বরে বলিলেন—'মা, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।' মা স্নেহবিহ্বল হইয়া তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল হইতে দুগ্ধধারা বহিতে লাগিল। তপস্বীকে তিনি দুই বৎসরের শিশুর মত কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। বলিলেন—'সত্য বলিতেছিস, ধন আমার? আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবি?' তপস্বী সহজভাবে বলিলেন—'নিশ্চয় করিব, মা!' মা বলিলেন—'তবে ইহার হাত ধর। একবার মিথ্যাচার করিয়াছিস, আর যেন করিস না।' তপস্বী একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন, একবার পৃথিবীর দিকে। পুনরায় আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'কল্যাণি, তুমি মাতার আদেশ তো শুনিয়াছ?' আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। তপস্বী বলিলেন—'আমি মাতার আদেশে তোমার হাত ধরিতে চাই। তুমি কি জীবনে আমার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত আছ?' আমি কোনও উত্তর দিলাম না। লজ্জার ভারে আমার গ্রীবা এমনই ঝুঁকিয়া পড়িল যে মনে হইল বুঝি ভাঙিয়া পড়িল, আর উঠিবার নামটি নাই। মা সস্নেহে বলিলেন—'কন্যা, হাত বাড়াইয়া দাও!' আর অমনি আমার পাণিগ্রহণ হইয়া গেল! মা প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ করিলেন আর পুত্রকে বলিলেন—'এখন চল পুত্র, আমার সঙ্গে চল।' পুত্র মায়ের চরণে মাথা রাখিয়া অস্ফুটবচনে বলিল—'একবার গুরুর আদেশ লইবার আজ্ঞা দাও, মাতা।' আজ্ঞা পাওয়া গেল। তিনি চলিয়া গেলেন। তাহার পর কি হইল, তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তিনি আমার এখানে ফিরিয়া আসিলেন, আর আমাকে অবধূত অঘোরভৈরবের নিকট লইয়া গেলেন। পূজনীয় অবধূতের আদেশেই আমরা দুইজন আমাদের বর্তমান গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছি। কিন্তু আর্য, স্বামী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন আর মাকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার পূর্বেই মা স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি পৃথিবীর অর্ধেক কাহিনীই বলিতে পারি, মাতার অভাবে অর্ধেক বাকি রহিয়া গিয়াছে। কাল সহসা এই অর্ধেক কহিনী যে সত্য তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠী ধনদত্ত আমার স্বামীকে চিনিতে পারিয়াছে। এই ব্যাপার হইতে প্রমাণ হয় যে অর্ধেক কাহিনীও বাকি থাকিবে না।'

সুচরিতা তাহার কাহিনী বলিয়া আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া থাকিল, যেন কোনও কিছু শুনিবার অপেক্ষা করিতেছে। আমার মনে তখন কিন্তু অন্য চিন্তা। আমি অবধূত অঘোরভৈরবের নিকট প্রথম সমাগত বিরতিবজ্রকে স্মরণ করিতেছিলাম। আজ আমি বুঝিতে পারিলাম সেই শান্ত-স্নিগ্ধ মুখশ্রীর ভিতর কতখানি ব্যথা ছিল। সমস্ত বেদনা, অনুতাপ ও অনুশোচনা অতিক্রম করিয়া নির্ধূম অগ্নিজ্যোতির সমান যে অবিকৃত তেজ সেই মনোরম মুখশ্রী হইতে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা নিশ্চয় সমুদ্রগম্ভীর হৃদয় সূচিত করিতেছিল। আমি সুচরিতার বিষয়েও ভাবিতেছিলাম। কতখানি সহজভাব, কেমন অকৃত্রিম ব্যবহার! আহা, কাঞ্চনপদ্মধর্মী শরীরেই মৃদুতা ও শক্তি একত্র থাকিতে পারে। মুহূর্তকাল থামিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম—'দেবি, ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না, জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে অর্ধেক কাহিনী গোপন রাখিয়া আপনি তাহা বিকৃত হইতে দিলেন কেন?' সুচরিতা নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়াই উত্তর করিল—'অর্ধেক কাহিনীই আমার নিজের সত্য, আর্য! পরবর্তী ঘটনা না ঘটিলেও ঐ পর্যন্ত যে সত্য সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ থাকিত না। বাকি অর্ধেক কাহিনী মাতার সাক্ষ্যের অপেক্ষা রাখিত। আপনি যত সরলভাবে এই উত্তরার্ধ বিশ্বাস করিয়াছেন, অত সরলভাবে আর কেহ বিশ্বাস করিত না।' আমি একটু সংকোচের সঙ্গেই প্রশ্ন করিলাম, 'দেবি, আপনি উত্তরার্ধের অর্ধেক অবগত আছেন, অর্ধেক আমি অবগত আছি! আপনি ইহার মধ্যে কিছু গোপন করেন নাই তো?' সুচরিতার সহজ মনোহর নয়নে হাসির ভাব তরঙ্গিত হইয়া গেল, তিনি বলিলেন—'আমি শুনিয়াছি আর্য যে আপনি নর্মকুশল। আচ্ছা, আমি কি গোপন করিয়া গিয়াছি!' আমি সুচরিতার উৎসুক নেত্রে নিজের নয়ন মিলাইয়া লইলাম। হাসিয়া বলিলাম—'শুনুন শুভে, আর্য বিরতিবজ্র অবধূত অঘোরভৈরবকে বলিয়াছিলেন, একদিন হঠাৎ গুরু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কৌলসিদ্ধ অবধূত অঘোরভৈরবের নিকট যাও। আমি ইহার সাক্ষী আছি। আমি সেদিন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, আজ বুঝিতেছি। আর্য বিরতিবজ্র গুরুকে সমস্ত কথা বলিয়া থাকিবেন, গুরু শিষ্যকে ব্রতভঙ্গ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। শিষ্য হয়তো ব্যাকুল হইয়া থাকিবেন। কিন্তু সহজসিদ্ধ গাম্ভীর্যের জন্য গুরুর উপদিষ্ট নিয়ম পালন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু—' আমি মুহূর্তের জন্য থামিয়া সুচরিতাকে দেখিয়া লইলাম। তাহার নর্মচটুল ভাবের পরিবর্তন হইয়াছিল, সে গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। বলিল—'হাঁ, বলুন আর্য, আমি নূতন করিয়া শুনিতেছি।' আমি হাসিয়া বলিলাম—'হাঁ দেবি, আর্য বিরতিবজ্রকে গুরু কোনও সরোবরের নিকটে দেখিয়া থাকিবেন, সেখানে বসন্তকালের জন্মভূমির

মত সহকারলতার এক নিবিড় কুঞ্জ হইবে, তাহা যেন পুষ্পে পুষ্পময়, মধুকরে ভ্রমরময়, কোকিলে পরভৃতময়, আর ময়ূরে ময়ূরময়ের মত মনে হইতেছিল। সেখানে গুরুর সব উপদেশ ভুলিয়া সে চিত্রলিখিতের মত, প্রস্তরে উৎকীর্ণের মত, স্তম্ভিতের মত, প্রাণহীনের মত, প্রসুপ্তের মত, যোগসমাধির অবস্থার মত, নিশ্চল হইয়াও ব্রত হইতে স্খলিত হইয়া থাকিবে। গুরু বিস্মিত হইয়া তাঁহার নৈরাত্ম্যবিষয়ে উপদেশের এই পরিণতি দেখিয়া থাকিবেন, শূন্যসমাধির এই পরিণতি তাঁহার মস্তিষ্কে কখনও হয়তো প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই শূন্য-সমাধি কি করিয়াই বা থাকে! হৃদয়বাসিনী প্রিয়াকে দেখিবার জন্য তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় এমন করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে যে তিনি অসহ্য বিরহ-বেদনা হইতে বাঁচিবার চেষ্টাই করিতেছেন। এইভাবে হয়তো তাঁহার সমস্ত শরীর বিরাট শূন্যের আকার ধারণ করিয়াছে ; নিষ্পন্দ-নিমীলিতনয়নে হৃদয়দাহী প্রেমাগ্নি ভিতরে ধূমায়িত হইতে থাকিবে, তাহা হইতে অজস্র বারিধারা হয়তো ঝরিতে থাকিবে, দীর্ঘ নিঃশ্বাসবায়ুতে লতাকুসুম কাঁপিতে থাকিবে, তাহার কুসুমরেণু দিঙ্‌মণ্ডলে বিকীর্ণ হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় গুরু তাঁহাকে হঠাৎ হয়তো ডাকিয়া থাকিবেন। যখন আর্য বিরতিবজ্র গুরুর কথা শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিলেন, তখন হয়তো বৃক্ষগুলি কুসুমরেণু ছিটাইয়া মনোভব দেবতার বশীকরণচূর্ণের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, অশোকপল্লব মৃদুস্পর্শে নিজের রাগ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, বনলক্ষ্মী নবরাজ্যে প্রবেশ করিতে উন্মুখ যুবরাজের মত সেই অপূর্ব মনোহর কিশোর তাপসের ললাটে মধুবিন্দুর অভিষেক করিয়াছে, আর বসন্তকাল কোকিলের সংগীতে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, চম্পক-কলিকার প্রসাদে ও সহকার-মঞ্জরীর মাঙ্গল্যে তাহার অভিনন্দন করিয়াছে। আপনি কি, দেবি, সেই দিন ইহার কোনও চিহ্ন দেখেন নাই? আমার নিকট হইতে কিছু গোপন করিতেছেন না তো?' সুচরিতা চোখ নীচু করিয়া লইল, আর হাসির তরল ধারায় তরঙ্গিতবৎ হইতে গিয়া বলিল—'আর্য, আপনি তো পরিহাস করিতেছেন!' অল্পক্ষণ ধরিয়া সুচরিতা নিঃশব্দে নিজের মধ্যে কি যেন তোলাপাড়া করিতে লাগিল। অবসর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'এই ব্যাপারে ধনদত্ত যে ঋণের কথাটা উঠাইয়াছে তাহা কি সত্য?' সুচরিতা ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল—'ওকথা একেবারেই অসত্য, আর্য! আমার শাশুড়ি এবিষয়ে কিছু আলোচনা করেন নাই। আর আমার স্বামী যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তো বরাবর এখানে ছিলামই, ধনদত্ত কখনও এই ঋণের কোনও উল্লেখ করে নাই কেন? আর আর্য, বিরতিবজ্র গৃহস্থ হইয়া গিয়াছেন, ইহা অতি বড় অসত্য। তিনি যাহা কিছু করিতেছেন সকলই গুরুর অনুমতিক্রমে। পৃথিবী তাঁহাকে যাহাই মনে করুক, কিন্তু তিনি প্রথমে যাহা

ছিলেন এখনও তাহাই। গুরুর আদেশে তিনি সাধনমার্গ পরিবর্তন করিয়াছেন। এখনও তিনি পূর্বের মতই ধর্ম লইয়া আছেন।'

আমি মধ্য পথে থামাইয়া বলিলাম—'তাহা হইলে দেবি, আপনি কি এই ব্যাপারের জন্য মহারাজাধিরাজের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া আছেন?' সুচরিতা হাসিয়া বলিল, 'ফেন-বুদ্বুদের মত নিরন্তর উদ্ভূয়মান ও বিলীয়মান এই সকল নশ্বর জীবের মধ্যে মহারাজই বা কি, আর শেঠই বা কি! আমি মহারাজাধিরাজের উপর প্রসন্নও নই, অপ্রসন্নও নই। আর্য, ইঁহার চেয়ে বড় মহারাজার শরণ পাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমি অপ্রসন্ন হইব কেন, তিনি অন্যায় করিয়াছেন, ইহার হিসাব তিনিই করিবেন। আমার তো যে সুখ বা দুঃখ লাভ হইবে, তাহা দিয়াই নারায়ণের পূজা করিব। এই হাতকড়িও তাঁহারই অর্ঘ্যরূপে উপহার।' আমি বিনীতভাবে বলিলাম—'দেবি, আপনার প্রতি এই আচরণের ফলে নগরমধ্যে বড় গোলমাল হইতেছে। রক্তপাতের ভয়ংকর সম্ভাবনায় রাজ্যাধিকারী চিন্তিত হইয়া গিয়াছেন। আপনি মহারাজাধিরাজের সাহায্য করিতে পারিবেন কিনা তাহা জানিতে চাই। সাহায্য চাই শান্তিস্থাপনের জন্য, প্রজাদের মধ্যে বিশ্বাস পুনরায় আনিবার জন্য। দেবি, দস্যুদের দুর্দান্তসেনা গিরিবর্ত্মের অপর পারে একত্র হইতেছে। এসময়ে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ থাকিলে মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা।' সুচরিতা সবিস্ময়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল -'এ তো নূতন কথা শুনিতেছি, আর্য! এতদিন তো প্রজারা আমার জন্য ভ্রূক্ষেপও করে নাই। এই নগরে আমি বরাবর নিন্দাভাজন হইয়াই আছি। আমি এই নগরের বিড়ম্বিত রসিকদের মন রাখিয়া চলিতে পারি নাই বলিয়া তাহারা আমার নামে অনেক কিছু অপবাদ রটনা করিয়াছে। প্রজাদের মধ্যে এই বিদ্রোহের ভাব সহসা কি করিয়া জাগিয়া উঠিল?' আমি নিজেও আশ্চর্য হইলাম। এবিষয়ে যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিলাম। সুচরিতা প্রসন্ন হইয়া বলিল---'বুঝিলাম, আর্য! আমাব ও আমার স্বামীর নিরীহ নির্দোষ আচরণে রাজকার্যে যে প্রকার বাধা পড়িয়াছে, প্রজাদের শান্তিতেও সেই প্রকার বাধাই পড়িয়াছে। আর্য, ইহা তো গেল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থের সংঘাত, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। ধনদত্তের গুরু ভদন্ত বসুভূতি বৌদ্ধধর্মকে জয়ী করিয়াই ছাড়িবেন, আর পরমস্মার্ত আচার্য মেধাতিথি—যিনি অদ্যকার সভার গুপ্ত সূত্রধার—তিনি সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমাপ্ত করিয়া তবে বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। মনুষ্য চুলায় যাক, ইহাদের নিজ নিজ ধর্মের জয়ঢাক বাজাইতে হইবে। একের পিছনে রাজশক্তি, অন্যের হস্ততলে প্রজার বিদ্রোহ! বিরতিবজ্রের বৌদ্ধ হইতে বৈষ্ণব হওয়াই যেন সংসারের সবচেয়ে বড় ঘটনা! এই জয়-পরাজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনুষ্যের সর্বনাশ হইয়া যাক না কেন! কিন্তু আমি

জিজ্ঞাসা করিতেছি আর্য, ইহার মধ্যে কোন্ পক্ষ লইতে হইবে? মহারাজাধিরাজের দিক হইতেই কি এই বহ্নিশিখায় ইন্ধন জোগাইবার কার্য প্রথমে হয় নাই? আপনি জানেন না আর্য, ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল অনেক পূর্বে। যখন আর্য বিরতিবজ্র নূতন ধর্মে দীক্ষা লইলেন, তখন স্থাণ্বীশ্বরে ধর্মান্দোলন সহসা প্রবল আকার ধারণ করিল। বিদ্বানদের অনুরোধে ও নগরশ্রেষ্ঠীদের প্রসাদে বিশাল পটাবাস নির্মাণ করা হইল, সেখানে আমার গুরুকে নিমন্ত্রণ করা হইল। গুরুর সিদ্ধান্ত এই যে ঘোর পাপীকেও তিনি তাঁহার বাণী শুনাইয়া দিতে সঙ্কোচ করিবেন না। তিনি সহজেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। কিন্তু আর্য বিরতিবজ্র বাহিরে আসা পছন্দ করিলেন না। গুরুর অনুরোধে শুধু আমাকে সেখানে থাকিতে অনুমতি দিলেন। বরাবর এই চেষ্টা করা হইল যে বৌদ্ধ আচার্য বসুভূতির সঙ্গে আমার গুরুর সংঘর্ষ উপস্থিত করা হউক, কিন্তু আমার গুরু মহাদেবের অবতার, তিনি নিজের ভজন-পূজন লইয়াই থাকিতেন। তাঁহার কার্য সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি এক মুহূর্তও থাকিতেন না, আর ভজন আরম্ভ হইবার এক মুহূর্ত পূর্বে মাত্র উপস্থিত হইতেন। এ সমস্ত হইল নিতান্তই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের ঈর্ষাগ্নি, ইহাতে প্রজা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, রাজা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, এমন সময় আসিয়াছে যখন সমগ্র আর্যাবর্ত তাহার তরুণ, বালক, অনাথ ও বৃদ্ধের সহিত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। যে প্রজারা বিদ্রোহ করিয়াছে তাহারা অজ্ঞ, অন্ধ, অভাজন!'

সুচরিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। মুহূর্তের জন্য মৌন থাকিয়া সে পুনরায় বলিল—'দীর্ঘ সাধনাও আর্যা মহামায়ার মনের গ্লানি পুড়াইয়া ফেলিতে পারে নাই। বাস্তবিক, মনের গ্লানিও মানুষের পক্ষে সত্য। তাহা স্বীকার করিয়াই মানুষ সার্থক হইতে পারে। চাপিয়া রাখিলে তাহা মানুষকে নষ্ট করিয়া ফেলে। যতক্ষণ সমস্ত দোষগুণ নির্বিকার চিত্তে নারায়ণকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া না হয়, ততক্ষণ তাহারা ভার-মাত্র।' আমি সুচরিতার এই কথা আধাআধি বুঝিলাম, কিন্তু বিলম্বে অনর্থ হইতে পারে বলিয়া মধ্যপথেই বাধা দিয়া বলিলাম—'তবে দেবি উপায় কি?' সুচরিতা সহজভাবে বলিল—'মহারাজাধিরাজের হস্তেই উপায় আছে। ভজনপূজনের আমাদের যে জন্মগত অধিকার আছে তাহা তিনি ফিরাইয়া দিন। একথা আমি মহারাজার দৃষ্টিতেই বলিতেছি। আমার পক্ষে তো সে পূজাও যেমন এ পূজাও তেমনি। আমার অধিকার আমার নিকট হইতে কে কাড়িয়া লইতে পারে?'

আমি সুযোগ বুঝিয়া প্রশ্ন করিলাম—'দেবি, তাহা হইলে আপনি কি

এই শর্তে আমার সঙ্গে যাইবেন না?' সুচরিতা উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন—'অবশ্য আর্য!'

আমি শ্রদ্ধাবনত গ্রীবা আরও নামাইয়া সেই মহীয়সী দেববালাকে প্রণাম করিলাম। হায় মহাকবি, তুমি চতুরস্রশোভী শরীরকে নবযৌবনের দ্বারা এভাবে বিভক্ত হইতে দেখিয়াছিলে, যেন তুলিকা দ্বারা উন্মীলিত চিত্র অথবা সূর্যকিরণে উন্মিষিত অরবিন্দ!* কিন্তু সেই সর্বতোবিসারি মনকে কোথায় দেখিলে, যাহা নবযৌবনের প্রথম উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ডানন্দ-সন্দোহ পরম জ্যোতির দীপ্তিতে এতখানি ভাস্বর হইয়া গিয়াছে? কে বলে যে যৌবন অন্ধ ও দুর্ললিত? উহাতে অপূর্ব উন্নতিবিধানের গুণও তো আছে! সুচরিতা আমাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া গেল। বলিল—'আর্য, আমাকে অপরাধী করিতেছেন!' আর সেই নিগড়বদ্ধ অবস্থাতেও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সে তাহার অপরাধের ক্ষালন করিল! উত্তেজনার স্বরে বলিল—'আমাকে লজ্জা দেওয়ার কি কারণ দেখিলেন আর্য? অভ্যাসদোষে কিছু বেশি বলিয়া নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এই তো? ক্ষুদ্রতার বন্ধন বড় কঠিন, আর্য, শীঘ্র ছাড়ে না। আমার পতিদেবতা একবার যে শেখানো বুলি বলা বন্ধ করিয়াছেন, তাহা এখন পর্যন্ত বন্ধই আছে, আর আমি ভাগ্যহীনা এখনও শেখানো বুলি বলিতে বলিতে চলিয়াছি! কিন্তু অনুতাপই বা কেন করিব, আমি এমনি আছি, ভাল কি মন্দ, নিন্দিতা কি অপমানিতা, যাহা আছি, তাহাই আছি। আমি নারায়ণপদে উৎসৃষ্ট পুষ্প-বৃন্তের মত গন্ধহীন হইয়াও সার্থকজন্মা। আমার অভিমানরূপ অপরাধ ধরিবেন না, আর্য!' আমি নম্রতার সহিত উত্তর করিলাম—'আপনার জন্ম সার্থক, দেবি, আপনার শরীর ও মন সার্থক, আপনার জ্ঞান ও বাণী সার্থক, সবচেয়ে বড় কথা এই যে আপনার প্রেম সার্থক। আপনাকে প্রণাম করিয়া, ভবসাগরে উদ্দেশ্যহীনভাবে যে অকর্মণ্য জীব ভাসিয়া যাইতেছে তাহার জীবনও সার্থক হইবে। আপনি সতীত্বের সীমা, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা, নারীধর্মের অলংকার।' সুচরিতা মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'আপনি তো কবিতা রচনা করিতেছেন, আর্য!'

আমি ইহার ব্যঙ্গার্থ বুঝিতে পারিলাম। বিরতিবজ্রের কাল্পনিক মূর্তি রচনা করিয়া আমি সুচরিতার স্নেহমৃদু হৃদয়ে যে আনন্দের ঢেউ বহাইয়াছি তাহার স্মৃতি তাহার মন হইতে দূর হয় নাই। তাহার আশংকা হইয়াছিল

---

* কালিদাসের নিম্নলিখিত শ্লোক তুলনীয়:
উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন॥—কুমারসম্ভব, ১।৩২

যে আমি বুঝি আবার কাল্পনিক সৌন্দর্যমূর্তি গড়িতে না আরম্ভ করিয়া দিই। যাহাকে সে মনোজন্মা দেবতা বলিতেছিল, তাহা আমি বরাবর জড় শরীরধর্ম মনে করিয়া আসিয়াছি। আমার ভ্রম তাহার এই কথাতে দূর হইল যে বিরতিবস্তু পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। আমি কত নীচের স্তরে বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলাম! আর এখন যে উহার সতীত্বের স্তব করিতে যাইতেছি, এখনও কি সেই অপূর্ব শক্তিশালী মনোজন্মা দেবতাকে চিনিতে পারিয়াছি যিনি মুহূর্তের মধ্যে দুইটি হৃদয় একত্র বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন? আমি সংশয় দূর করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে বলিলাম—'না দেবি, আমি নিজের ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে যে সত্য তাহার কথাই বলিতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিব, তাহা শুনিলে আপনি আশ্চর্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।' সুচরিতা উৎসুক হইয়া বলিল—'কি আর্য?' সুচরিতার সহজ মনোহর মুখের ঔৎসুক্য কিছুকাল বর্ধিত করিয়া আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—'আমি ভালো ভবিষ্যদ্বক্তা। কাশীজনপদের সেই ব্রাহ্মণ যুবা, যে আপনার চিত্ত অকারণ ঔৎসুক্যে ভরিয়া দিয়াছিল, সে আমি।' সুচরিতার নয়নপল্লব আশ্চর্যাতিশয্যে যেন আকাশে উড়িয়া গেল—তাহার ঔজ্জ্বল্য যেমন ছিল, তেমনই রহিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে এই অবস্থাতেই থাকিল। পরে আত্মসংবরণ করিয়া সে মূর্ধানিষক্ত নিগড়বদ্ধ করতল ভূমির উপরে রাখিয়া ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিল।

পঞ্চদশ উচ্ছ্বাস

ভদ্রেশ্বর দুর্গের সমীপবর্তী দুর্গম শরবন দেখা দিল। রজতপট্টের মত সুদূরবিসারিদীপ্তি বালুকাপ্রান্তরকে আবৃত করিয়া সেই শূন্য শরকান্তার এমন করিয়া বিরাজ করিতেছিল যে মনে হইতেছিল, বুঝি জ্বলন্ত ধরিত্রীর সহস্র সহস্র জিহ্বা আকাশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া বাত্যালুণ্ঠিত বালুকারাশি উদ্‌গতধূম অগ্নিকুণ্ডের মত চিত্তকে ভয়ভ্রান্ত করিতেছিল—নীচ হইতে উপর পর্যন্ত কোথাও শীতলতার নামমাত্র ছিল না। আমি অনবরত কয়েক দিন ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী হইয়া চলিয়া আসিতেছি। একবার ভট্টিনীর চিন্তাকাতর মুখ মনে পড়ে, পরক্ষণেই সুচরিতার প্রসন্ন রূপ। এক ভদ্রেশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্য মুখখানি স্থাণ্বীশ্বরের দিকে। স্থাণ্বীশ্বরের ঘটনাগুলি দর্পণে প্রতি-বিম্বের ছায়ার মত সর্বত্র স্পষ্ট দেখিতেছিলাম। সুচরিতাকে কারাগার হইতে

যত্ন করিয়া যখন আমি বেঙ্কটেশ ভট্টের নিকট লইয়া আসি তখন সেখানে অবধূতপাদ প্রথম হইতেই সমাসীন ছিলেন, মহামায়াও উপস্থিত ছিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সুচরিতা নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া এক কোণে বসিয়া পড়িল, আমিও তাহার দেখাদেখি সেইরূপ করিলাম। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ। অবধূতপাদ মহামায়াকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতেছিলেন। আমি যখনই সেই কথাগুলি মনে করি তখনই আমার সমগ্রশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। না জানি এখন কি ঘটিবে! বাহিরে সকলই জ্বলিয়া যাইতেছে, কালদেবতার বিকট ভ্রূকুটি কাহাকেও ছাড়িতে চাহে না। ভদ্রেশ্বরের সৌধশিখর দেখিয়া ভট্টিনীর চিন্তাই আমার চিত্তে প্রধান হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল পরে আজ ভট্টিনীকে দেখিতে পারিব। কিন্তু আমাকে রাজকার্যও করিতে হইবে। যদিও হৃদয় ভট্টিনীর নিকটেই প্রথমে যাইবার জন্য উতলা হইতেছিল, তথাপি আমি প্রথমে লোরিকদেবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসাই উচিত মনে করিলাম। ভদ্রেশ্বরের সৌধশিখর দেখা গেল, কিন্তু আমার পক্ষে তো উহা কোনও অদৃশ্য দেবতার অঙ্গুলিরই মত। উহারা সব ভট্টিনীকেই দেখাইতেছে। এই ভীষণ রৌদ্রে, ঝনঝনায়মান শরকান্তারে, বাত্যালোল তপ্ত বায়ুতেও ভট্টিনীর কথা স্মরণ হইতেই হৃদয়ে এক প্রকার শীতলতা অনুভব না করিয়া পারিলাম না, যেন সেখানে কোনও চঞ্চলতার উদ্‌গম হইল। চন্দ্রমরীচি অংকুরিত হইয়া গেল, চন্দনলতা পল্লবিত হইয়া উঠিল। আমার সমস্ত শরীর উদ্‌ভিন্নকেশর কদম্ব-পুষ্পের মত রোমাঞ্চিত হইল। সম্মুখে ক্ষীণধারা মহাসরযূ দেখা দিল।

মহাসরযূতে স্নান করিয়া আমি সোজা লোরিকদেবের নিকটে গেলাম। আমাকে দেখিয়া সেই সহৃদয় আভীর-সামন্তের চক্ষে জল আসিয়া গেল। অতিশয় সমাদরের সঙ্গে তিনি আমাকে প্রণাম করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টিনীর কুশলসংবাদও তিনি সেইরূপ প্রেম ও আদরের সঙ্গে শোনাইলেন। তাঁহার কণ্ঠ গদ্‌গদ হইয়া গিয়াছিল। বলিলেন, 'ভট্টিনী এই বন্ধ্য ভবকাননের কল্পলতা, আর্য! এরূপ দেবদুর্লভ স্বভাব জানি না কোন তপস্যার ফল। আপনি যে উঁহাকে এখানে থাকিতে দিয়াছেন এজন্য আমি প্রীত, কৃতজ্ঞ, বশীভূত। যান, তিনি আপনাকে দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইবেন। তাঁহার নেত্র দীর্ঘকাল ধরিয়া উপবাসী আছে, তাঁহাকে দর্শন দিন।' আমি বিনীতভাবে আভীর-সামন্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলাম, তাঁহার অনুমতি পাইয়া মহারাজাধিরাজের পত্র তাঁহাকে দিলাম। মুহূর্তের জন্য তিনি আশ্চর্যের সহিত আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে ধীরভাবে বলিলেন—'এখন যান।' এইভাবে লোরিকদেবের নিকট পত্র পৌঁছাইয়া দিবার পর আমি অবিলম্বে ভট্টিনীর নিকট গেলাম। লোরিকদেব নিজে পড়িতে জানিতেন না। তিনি

পত্রখানি রাখিয়া দিলেন এবং তখনই তাঁহার মন্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এদিকে ভট্টিনী মহারানী রাজ্যশ্রীর পত্র পড়িয়া শুধু একবার আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে দেখিলেন ও মাথা নীচু করিলেন। তাঁহার বন্ধুজীব পুষ্পের মত রক্তাধর মুহূর্তে আতপম্লান কেতকপুষ্পের মত বিবর্ণ হইয়া গেল এবং বড় বড় মনোহর চক্ষু বারিসিক্ত খঞ্জনশাবকের মত নিস্পন্দ হইল। অনেক দিনের পর আমাকে দেখিয়া যে সহজ আনন্দধারা তাঁহার সমস্ত অঙ্গযষ্টি ঘিরিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল তাহা একেবারে শান্ত হইয়া গেল। যেন উত্তরঙ্গিত আনন্দসিন্ধু সহসা হিমঝঞ্ঝার আবর্তে পড়িয়া হিম হইয়া গেল। তাঁহার উত্তরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতে হইতে থামিয়া গেল, ভালপট্ট ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া শান্ত হইল, চিবুকদেশ ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া সমস্ত ঘরখানি এক প্রকারের করুণ-মনোহর শোভায় আর্দ্র করিয়া দিল। আমার ইহা বুঝিতে একটুও দেরি হইল না যে আমার কোনও মহা অপরাধ অবশ্যই হইয়া থাকিবে। আমার সমস্ত শরীর সাধ্বস জন্য ঘর্মবারিতে ভিজিয়া গেল; আমি অপরাধীর মত, অবজ্ঞাতের মত, ঘৃণিতের মত তাঁহার সম্মুখে কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ভট্টিনীর আমার উপর দয়া হইল, তিনি নিজে নিজেকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিপুণিকা আসিয়া পৌঁছিল। নিপুণিকার শরীর তখনও দুর্বল ছিল, তাহার শরীর বিবর্ণ, আমার আগমনের সংবাদে সেই পাণ্ডু দুর্বল শরীরে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। স্পষ্টই মনে হইল, অনেক কিছু শুনিবার আশা লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ভট্টিনী ও আমার অবস্থা দেখিয়া সেও দাঁড়াইয়া গেল। ধীরে ধীরে ভট্টিনীর দিকে সে অগ্রসর হইল। আমাকে সে নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া ভট্টিনীর নিকটে পতিত রজত-পটোলিকার পত্র দেখিতে লাগিল। তাহার কৌতূহল শান্ত করিবার জন্য আমি সংক্ষেপে পত্রের ইতিহাস বলিলাম। নিপুণিকার মুখের উপর নানা ভাব খেলিয়া গেল। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে সে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ধারা নির্গত হইল। সে এক নিঃশ্বাসে না জানি কত কি বলিয়া গেল। সর্বশেষে পদাহত সিংহিনীর মত গর্জন করিয়া মাথা নাড়িয়া সে বলিল—'ধিক্ ভট্ট, তুমি কেমন করিয়া ভট্টিনীর অপমান করাইতে রাজী হইয়া গেলে! কান্যকুব্জের লম্পটদের আশ্রয় রাজা কি ভট্টিনীর সেবককে নিজের সভাসদ করিবার স্পর্ধা রাখে? কোন বুদ্ধিতে তুমি মৌখরিদের রানীর নিমন্ত্রণ উৎসাহের সহিত বহিয়া আনিলে? ধিক্ ভট্ট, তুমি কি অত্যন্ত সহজ কথাও বুঝিতে পার না? এই পত্র টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার শক্তিও কি তোমার ছিল না?'—বলিতে

বলিতে ভাবাবেগে সে সত্যই সেই পত্র ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার আঙ্গুলগুলি এত জোরে চলিতেছিল যে মনে হইতেছিল, অবিলম্বে সে বুঝি মৌখরিদের প্রত্যেক বংশধরকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে চায়। ভট্টিনী নিপুণিকাকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। তিনি অতিশয় প্রেমভরে তাঁহার ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'না বোন, এমন কথাও বলিতে হয়! ভট্ট আমাদের অভিভাবক। তাঁহার সব কিছু করিবার অধিকার আছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য ও সমস্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা সবই আমাদের মানিয়া লওয়া উচিত। তুমি তোমার ভট্টিনীকে এত কি মনে কর বোন! ছি, এতখানি উত্তেজিত হইতে হয়!' নিপুণিকা ভট্টিনীর কোলে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিয়া গণ্ডস্থল ধুইতে লাগিল।

এইবার ভট্টিনী আমার দিকে ফিরিলেন। তিনি পূর্ব হইতেও অধিক করুণার দৃষ্টিতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বলিলেন, 'নিপুণিকার অপরাধ ক্ষমা করিবেন ভট্ট, ও বড় দুর্বল হইয়া গিয়াছে, সহজেই উত্তেজিত হয়, উহার স্নায়ুমণ্ডল বড়ই দুর্বল হইয়া গিয়াছে।' কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিপুণিকার ললাটে হাত বুলাইতে লাগিলেন, যেন রাহুগ্রাস হইতে বহির্গত চন্দ্রমণ্ডলে কল্পলতা কিশলয়-সুধা লেপন করিতেছে। নিপুণিকা ধীরে ধীরে অবসন্নই হইয়া পড়িল, তাহার নেত্র নিমীলিত হইল, মনে হইল বুঝিবা সে একেবারে শুইয়া পড়িয়াছে। ভট্টিনী তাহার ললাটদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন--'আজকাল এই রকমই হইতেছে। উত্তেজিত হয় আর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াও যায়। আচ্ছা ভট্ট, আপনি কি মহামায়া মাকে ইহার অবস্থার বিষয়ে বলিয়াছিলেন?' আমি এতক্ষণ লজ্জাসাগরে ডুবিতে ডুবিতে ও উঠিতে উঠিতে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। ভট্টিনী বুদ্ধি করিয়া আমার মন অন্য দিকে আকর্ষণ করিলেন। আমার সেই ওষধির কথা মনে পড়িল যাহা অপরাজিতা পুষ্পের রসে মিশাইয়া নিপুণিকাকে দিবার জন্য অবধূত আমাকে দিয়াছিলেন। আমি ভট্টিনীকে ঔষধ দিলাম। কিন্তু সাহস করিয়া চোখ উঠাইয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিলাম না। আমার অবস্থা দেখিয়া ভট্টিনী অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। আমার মন অন্যদিকে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি নানাভাবে নিপুণিকার সেবা করিতে আদেশ দিতে লাগিলেন। শয্যা প্রস্তুত করা হইল, বীজন করা হইল, শীতল জল সিঞ্চন করা হইল, শেষে নিপুণিকাকে নীরবে সেখানেই রাখিয়া আঙ্গিনায় যাওয়া স্থির করা হইল। আমি নীরবে ভট্টিনীর আদেশ পালন করিয়া গেলাম কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও নিপুণিকার কঠোর ধিক্কারবাক্যের আঘাত ভুলিতে পারিলাম

না। আমার নিজের প্রমাদ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিলাম। আমি এ কি করিলাম! কেন আমার বুদ্ধি এত জড় হইয়া গিয়াছিল! হায় অভাগা বাণ, তুমি ভট্টিনীর মানরক্ষার্থ নিজেকে বিপদের মুখে ফেলিলে না কেন? যখন মদগর্বিত কান্যকুব্জেশ্বর তোমাকে লম্পট বলিয়াছিল তখন তুমি ভট্টিনীর উপযুক্ত উত্তর দেও নাই কেন? ধিক্, ভাগ্যহীন তোমাকে ধিক্! মৌখরিদের রানীর নিমন্ত্রণ তোমার কান্যকুব্জেশ্বরের সম্মুখে পায়ে করিয়া দলিত করা উচিত ছিল। কিন্তু আমার সমস্ত আত্ম অভিমান তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? হায়, আমি ভট্টিনীকে অপমানিত হইতে দিলাম, আমার পাপের কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুষানলে পুড়িলেও এই পাপের ক্ষালন হইবে না।

আঙ্গিনায় আসিয়া ভট্টিনী হাসিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি দেখাইতে চাহিলেন যে তাঁহার মনে কোন দুঃখ নাই, গ্লানি নাই, লজ্জা নাই। তাঁহার প্রফুল্লকমলবৎ মুখের উপর এই প্রযত্নকৃত হাসি বড়ই সুন্দর লাগিতেছিল। এই হাসিতে আমার হৃদয় আরও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আহা, এই দেবদুর্লভ মহিমা আমি লাঞ্ছিত হইতে দিয়াছি! আমি এই কমলকোমল হৃদয়ে আঘাত লাগিতে দিয়াছি! আমার হৃদয় গলিয়া এই দেবীর চরণে ঢলিয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, বাক্‌শক্তি লোপ পাইল, অবিরল অশ্রুধারায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইল, লজ্জা ও অনুতাপে সমস্ত শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। দশ দিক্ শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি বসিয়া পড়িলাম। ভট্টিনী আমার নিকটে আসিয়া অতিশয় স্নেহে আমার ললাটে হাত দিলেন, পুনরায় আবেগময়ী ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—'আপনিও উত্তেজিত হইতেছেন ভট্ট, নিপুণিকার কথায় এতখানি বিচলিত হইয়া গেলেন? উঠুন, দেখুন, আপনার এই অভাগিনী ভট্টিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আপনি কোনও অপরাধ করেন নাই। আপনি কান্যকুব্জেশ্বরের সভাসদ হইয়াছেন, তাহা হইলে আমার অপমান ইহাতে হইল কোথায়? অনর্থক কেন বিচলিত হইতেছেন?' আমার জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। জানু পাতিয়া বসিয়া আমি শুধু এই পর্যন্তই বলিতে পারিলাম—'দেবি, আপনি সকলই ক্ষমা করিতে পারেন, সকলই ভুলাইতে পারেন, কিন্তু অভাগা বাণ কি করিয়া শান্তি পাইবে?'

ভট্টিনীর মুখের উপর এক বিচিত্র কাতরতা দেখা গেল। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, কিন্তু চক্ষু অনেক কিছু কহিয়া যাইতেছিল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া উহাতে এত প্রকার রোমাঞ্চ হইতেছিল যে সিক্ত কদম্বকোরক যেন সূর্যাতপে শুকাইয়া যাইতেছে। আমি আবার ব্যাকুল হইয়া বলিলাম—'দেবি, আমি অনুতাপের সাগরে ডুবিয়া গিয়াছি, কর্তব্য দেখিতে

পাইতেছি না। নিপুণিকা সত্যই বলিয়াছে। মৌখরিদের নিমন্ত্রণ আমার তখনই পায়ে দলিয়া ফেলা উচিত ছিল। যে ভট্টিনীর সেবক হইবার গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে সম্রাটের সভাসদের আসন গ্রহণ করা তাহার শোভা পায় না। কিন্তু দেবি, জানি না কোন শক্তির দুর্বার আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। কোন মুখে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিব?'

ভট্টিনী নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল উদয়-গিরির তটান্ত-লগ্ন চন্দ্রমণ্ডলের মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—'আমি এমন মনে করি না যে আপনি কুমার কৃষ্ণের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিলেন। আপনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা কুমারের অনুরোধেই করিয়াছেন। নিপুণিকা বোঝে না, কিন্তু আমি তো বুঝি। আপনি কুমারের নিকট কৃতজ্ঞ কেন? আমারই জন্য না? ভট্ট, আপনাকে অপরাধী মনে করিবার পূর্বে আমার খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রাণবায়ু বাহির্গত হওয়াই ভাল। আপনি আমার অপমান কোথাও হইতে দেন নাই। নিপুণিকার স্নায়ু দুর্বল বলিয়া সে যা-তা বলিতেছে। আপনি যাহা করিবেন, আমার পক্ষে তাহাই বিধি হইবে। ভট্ট, আমাকে মুখরা হইবার দোষ হইতে রক্ষা করুন। বিশ্বাস করুন, আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই আমার পক্ষে ধর্ম হইবে। উঠুন ভট্ট, আমাকে রক্ষা করুন, এতখানি লজ্জার ভার আমি বহিতে পারিব না।' মুহূর্তে আমার জড়তা দূর হইল। কুজ্‌ঝটিকা সরিয়া গেলে দিঙ্‌মণ্ডল যেমন প্রসন্ন হইয়া যায়, অন্ধকার দূর হইলে পূর্ব দিগঞ্চল যেমন নির্মল হইয়া যায়, মেঘমালা কাটিয়া গেলে শারদ গগন যেমন অমলিন হইয়া যায়, আমার মন তেমনই প্রসন্ন হইল। ভট্টিনীর দৃষ্টিতে আমি এক অপূর্ব মাধুরী দেখিলাম। মনে হইল, আমার জন্মজন্মান্তর বুঝি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। সেই দৃষ্টি যেন আমাকে অভিনব রসে সিঞ্চন করিতে করিতে, স্নেহধারায় প্লাবিত করিতে করিতে এক অননুভূত জগতে টানিয়া আনিল। আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম আর শুধু এইটুকু বলিতে পারিলাম—'দেবি, ভট্টিনী!' তাহার পরেই আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। আমি সাহস করিয়া সজলনয়নে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু এক করুণ অথচ মনোহর অপাঙ্গদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া চক্ষু নত করিলেন।

তখন ভগবান মরীচিমালী পশ্চিমসাগরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, ধরিত্রী হইতে আকাশ পর্যন্ত লাল কিরণের জাল বিছাইয়া দিয়াছেন, ভবনদীর্ঘিকার সারস নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া যাইতেছে, ক্রীডাময়ূর বাসযষ্টির প্রতি উৎসুকভাবে দেখিতেছে, জল তুলিতে আগত সুন্দরীদের নূপুরধ্বনির মন্থরতা স্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর নভোমণ্ডল হইতে এক প্রকারের ক্লান্তি ধীরে ধীরে নামিয়া সারা জগতে ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভট্টিনীর মুখ

লজ্জায় আরক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার কপোলপার্শ্বে এক বিচিত্র ঔজ্জ্বল্য দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, তাঁহার বঙ্কিম নয়নপাতে এক অদ্ভুত নৃত্যভঙ্গী আসিয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকালসঞ্চিত মনোবেদনা দূরে হইয়া যাওয়ায় যে নির্মল আনন্দধারা সেই মনোরম মুখের উপর ছুটিতে চাহিতেছিল, তাহা সর্বদা সহজ অনুভূতির তরঙ্গে পরিবর্তিত করা হইতেছিল। আহা, ভট্টিনীর সেই শোভা দেখিবার জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। প্রফুল্ল দমনকযষ্টিতুল্য সেই অঙ্গলতা অনুভাব ও লজ্জার আঘাত-প্রত্যাঘাতে এমন নড়িতেছিল যে উহা বুঝি আকাশ-গঙ্গার আবর্তে পতিত পারিজাতলতা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার দিকে তাকাইতে পারিতেছিলেন না। পরে ধীরে ধীরে গিয়া এক স্থণ্ডিলপীঠিকার উপর বসিয়া পড়িলেন। একবার তাঁহার সীমন্ত বাসন্তী উত্তরীয়ের অঞ্চল দিয়া ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন আর ধীরে ধীরে আমার দিকে দৃষ্টি উঠাইলেন। সে দৃষ্টি ছিল বড়ই মর্মভেদিনী। ভট্টিনী পুনরায় একবার মৃদু হাসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারিলেন না। মনে হইল বুঝি শারদীয় নভো-মণ্ডলে সহসা বিদ্যুচ্ছটা আবির্ভূত হইয়া বিলীন হইয়া গেল, শোভাসমুদ্রে একটি মাত্র তরঙ্গ উঠিয়া শান্ত হইয়া গেল। আমি জোড়করে জিজ্ঞাসা করিলাম—'দেবি, সেবক এই ক্ষমা লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে, কিন্তু মনে মনে লজ্জার ভাব এখনও কাটে নাই। যদি অনুগ্রহ হয় তবে জানিতে চাই, মহারানী রাজ্যশ্রীর পত্র পড়িয়া আপনি বিষণ্ণ হইয়া গেলেন কেন? সেবকের উপর কৃপা বা কোপ সর্বদাই প্রকাশ করা উচিত। যদি আমার কোনও অপরাধ না-ই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার মুখ ম্লান হইয়া গেল কেন?' ভট্টিনী অনেকক্ষণ আমার প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলেন, যেন তাঁহার মন কোথাও হারাইয়া গিয়াছে, হৃদয়ে গ্রাহিকা-সংবেদনা শক্তি বুঝি আর অবশিষ্টই নাই, স্নেহের স্রোত শুকাইয়াই গিয়াছে, অন্তরের স্পন্দন যেন একেবারে থামিয়া গিয়াছে। তাঁহার রক্তবর্ণ মুখ মুহূর্তের মধ্যে পারিজাতের গর্ভপটলের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি নূতন আশংকায় আবার শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু ভট্টিনী পুনরায় নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। দৃষ্টি নত হইল, অধরোষ্ঠ স্পন্দিত হইয়া থামিয়া গেল। নাসিকাদণ্ড ঈষৎ সঙ্কুচিত হইল, অত্যন্ত আর্দ্র-কণ্ঠে তিনি বলিলেন—'আমাকে অবধূতের আশ্রয়ে লইয়া চলুন। তিনি না থাকিলে সুচরিতার ঘরে থাকিব।'

ভট্টিনীর দুইটি প্রস্তাবের একটিও আমার পছন্দ হইল না। কিন্তু এ সময়ে প্রতিবাদ করা উচিত নয় মনে করিয়া আমি নীরবেই থাকিলাম। ভট্টিনী আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি উঠিতে উঠিতে বলিলেন—'অথবা যে কোনও স্থানে উপযুক্ত মনে করেন। কিন্তু আমি মৌখরি বা কান্যকুব্জেশ্বরের রাজ-

বংশের আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারি না।'—এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি অবিলম্বে নিপুণিকার নিকট চলিয়া গেলেন। আমি সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তখন রাত্রি দুইঘটিকা পার হইয়া গিয়া থাকিবে। ঘন অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল এমন অবলিপ্ত ছিল যে মনে হইতেছিল কেহ বুঝি কৃষ্ণ অঞ্জনের প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছে। আমার মনে অনেক চিন্তা আসিয়া আসিয়া চলিয়া গেল। আমি কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় বাহিরে সহস্র সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি শোনা গেল। আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই যে কি উৎসবের আয়োজন হইতেছে। একটু বাহিরে গিয়া ব্যাপারটা দেখি ভাবিয়া অগ্রসর হইব, এমন সময় ভট্টিনী ডাকিলেন। নিপুণিকার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। ভট্টিনী তাহাকে ধীরে ধীরে আদর করিয়া কিছু বুঝাইতে ছিলেন। ও কাঁদিতেছিল। আমাকে দেখিয়া ও উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু ভট্টিনী তাহাকে উঠিতে দিলেন না। তাহার চক্ষু সহস্রধারায় নিজের মনোব্যথা বহাইতে লাগিল। আমি নিকটে গিয়া ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন লাগিতেছে, নিউনিয়া!' উত্তরে তাহার বড় বড় দুই চক্ষু হইতে আরও বেগে জল ঝরিতে লাগিল। ভট্টিনী আদর করিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'প্রসন্ন হও নিউনিয়া, ভট্ট সুচরিতার সংবাদ শোনাইবেন।' নিপুণিকার মুখের চেহারা নিমিষে বদলাইয়া গেল। তখনই তাহার মধ্যে বিচিত্র শক্তি আসিল। বলিল—'ভট্ট, তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল? কেমন আছে সে হতভাগিনী?' আমি বলিলাম—'হতভাগিনী সে নয়, সে অখণ্ড সৌভাগ্যবতী। তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন।' নিপুণিকার চক্ষু বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া গেল। বলিল—'সত্য!' আমি তাহার কথায় আনন্দিত হইয়া বলিলাম -'সত্য।'

এই সময়ে জয়ধ্বনি একেবারে ভট্টিনীর বাসগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিল। মন দিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শত শত স্ত্রী-পুরুষ অতিশয় উল্লাসের সহিত দেবপুত্র তুবরমিলিন্দের জয় ঘোষণা করিতেছে। ভট্টিনী কিছুটা আশ্চর্যে কতকটা কৌতূহলে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময়ে এক দাসী আসিয়া জানাইল যে মহাসামন্ত লোরিকদেব তাঁহার রানী ও অনুচরদের সঙ্গে আসিয়া দ্বারে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে পূজার উপকরণ, তিনি অবিলম্বে ভট্টিনীর দর্শনরূপ অনুগ্রহ পাইতে চাহেন। ভট্টিনী মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হইয়া গেলেন। পুনরায় স্বাভাবিক স্বরে আদেশ দিলেন—'দেখুন ভট্ট, ব্যাপারটা কি। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।' আমি ত্বরায় আদেশ পালন করিলাম। দ্বারে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

শত শত উল্কার আলোয় এক বিশাল জনতা নৃত্য-গীত-বাদ্যে দিঙ্‌মণ্ডল

মুখরিত করিতেছিল। সকলের অগ্রে অশ্বারোহণে লোরিকদেব, তাঁহার পিছনে ঐভাবে অশ্বারোহণে মন্ত্রী ও রাজপুরোহিত। তাঁহাদের পিছনে পালকিতে চড়িয়া লোরিকদেবের রানী ছিলেন। তাহারও পিছনে মল্লদের এক প্রকাণ্ড দল। তাহারা নানা ভাবে ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করিতেছিল। এই কৌশল এক দিকে যেমনই উদ্দাম ছিল, অন্য দিকে তেমনই সংযত। একই সঙ্গে শত শত মল্ল নানা শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিকট ভঙ্গিমায় অঙ্গত্রোটন, নাটন, উন্মোটন, বিকুঞ্চন ও সন্তোলনের ক্রিয়া দেখাইতেছিল। তাহাদের অবিরল তালোট্টঙ্কন থাকিয়া থাকিয়া দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ধনুষ্কাংস্য ও যষ্টিকোশিয়র ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে শূন্য প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। উদ্দাম অঙ্গবিকুঞ্চনে দর্শকদের চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছিল, বার বার এমন মনে হইতেছিল যে একের অঙ্গত্রোটন অন্যের বিকুঞ্চনের সঙ্গে ঠেকিয়া যাইবে, কিন্তু আশ্চর্য তখনই হইত যখন এই সমস্ত ছন্দোহীন বিশৃঙ্খল ব্যায়াম-ব্যাপার একই সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল, সমস্ত মল্ল যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া এক অদ্ভুত বিরতি-নিনাদ করিতেছিল আর মুহূর্তে জনসমূহের এক দিক হইতে অন্য দিক পর্যন্ত দেবপুত্র তুবরমিলিন্দের জয়নির্ঘোষ মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। ভট্টিনীর গৃহদ্বারে মল্লদল পূর্ববৎ ব্যায়ামে ব্যাপৃত থাকিলেও বিচিত্র সংযমের সঙ্গে গোলাকারে দাঁড়াইয়া গেল। আর তাহার মধ্যে পঞ্চাশ জোড়া স্ত্রীপুরুষ তাহারই সমান অন্তর রাখিয়া গোলাকারে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের হাতে ছিল ছোট ছোট কাষ্ঠ-খণ্ড। লোরিকদেব ঘোড়া হইতে নামিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী ও পুরোহিতও নামিয়া পড়িলেন। লোরিকদেবের ইঙ্গিতে সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে ভট্টিনীকে সেখানে লইয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, 'আর্য, দেবপুত্রনন্দিনীকে আমরা যতক্ষণ না জানিতাম, ততক্ষণ আমাদের যতই অপরাধ হউক, তাহা ক্ষমার্হ। এখন যখন আমরা জানিয়াছি তখন তাঁহার সমাদরে মুহূর্ত বিলম্ব করাও অসহ্য। আপনি কান্যকুব্জেশ্বরের পত্র আমাকে দিয়াছিলেন, সেই পত্র হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে দেরি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।' আমি তাঁহার কথা ভট্টিনীকে শোনাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া ভাবিতে থাকিলেন। পরে বলিলেন—'আপনি কি বলেন, যাইব?' কিছু না ভাবিয়াই আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল—'অবশ্য, দেবি!'

ভট্টিনী আসিতেই লোরিকদেব কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া অভিবাদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শঙ্খধ্বনি। দেখিতে দেখিতে দেবপুত্রনন্দিনীর জয়ধ্বনিতে দশ দিক কাঁপিতে লাগিল। ভদ্রেশ্বর দুর্গের কুহর

হইবেন? তাহা অসম্ভব। আমাকে কোন না কোন পথ বাহির করিতেই হইবে। এই চিন্তা করিতে করিতে আমি দ্বারদেশের বাহিরেই বসিয়া ছিলাম। উপরে বৃশ্চিক রাশি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া যাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে মঙ্গল গ্রহের লাল তারকা দেখা যাইতেছিল। বৃশ্চিকের আসনে মঙ্গল গ্রহ এক বিচিত্র ভয়ের ভাব সৃষ্টি করিতেছিল। কী সে বিচিত্র যোগ! তবে কি শাস্ত্রে যে বলিয়াছে, বৃশ্চিক রাশিতে মঙ্গলের সংক্রমণে ধরিত্রী রক্তকর্দমে পিচ্ছিল হইয়া যাইবে, তাহা সত্য? আবার কি আর্যাবর্তের পুণ্যভূমিতে বৃকের বিকরাল তাণ্ডব আরম্ভ হইবে? মনে মনে ভগবান নৃসিংহকে স্মরণ করিলাম, যাঁহাকে দেখিবামাত্র অসুররাজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পাটলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।[১] বৃশ্চিকস্থ মঙ্গল তাঁহারই ভীষণ নেত্রের ছায়া। হয়তো মেদিনী মানবরক্তে পিচ্ছিল হইয়া যাইবে, শস্যক্ষেত্র কর্পূরভস্মে রূপান্তরিত হইবে, জনপদের অধিবাসীরা দস্যুদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখায় আহুতি হইয়া যাইবে, রাশি রাশি নর-কঙ্কালে পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে দুর্লঙ্ঘ্য -বিকরাল কালের তাণ্ডব আর্যাবর্তকে ঘূর্ণিত হাহাকারের মধ্যে ফেলিয়া দিবে।

হে ভগবান্, এই রক্তস্রোত কি বন্ধ করা যাইতে পারে না? রাজা ও সামন্তদের হঠকারিতার চক্রে ইহার মধ্য হইতে বাঁচিবার উপায়ও কি পিষিয়া যাইবে? অবধূত অঘোরভৈরব মহামায়াকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—'তুমি ত্রিপুরভৈরবীর লীলা বন্ধ করিতে পারিবে না, মহাকালের নৃত্য থামাইতে পারিবে না। শূলপাণির মুণ্ডমালা রচনায় বাধা দিতে পারিবে না—কারণ তুমি সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুরভৈরবীর সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া দাও নাই। যেদিন তুমি নিজে তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারিবে সেদিন এই লীলা যেদিকে চাও মোড় ফিরাইতে পারিবে। নির্বোধ, ত্রিপুরসুন্দরীকে যতখানি দিবে ততখানিই তোমার নিজের সত্য হইবে। সত্যই কি জনসাধারণের দুঃখ তুমি নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছ? আমি বলিতেছি মহামায়া, সত্যবাদিনী হও, মায়া ছাড়। তুমি অমৃতের পুত্রদের আহ্বান করিয়াছ, সত্যই কি তুমি অমৃতের পুত্রী হইতে পারিয়াছ? তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা করিয়াই দেখাইতে পার যে তুমি নিজে নিজেকে নিঃশেষ ভাবে তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া দিবে। বাক্যবীর হওয়া তো নিজেই নিজের অপমান করা। যদি ত্রিপুরভৈরবীর লীলা অনারূপ দেখিতে চাও তো স্বয়ং ত্রিপুরভৈরবী হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। দুঃসময় আসিতেছে।' মহামায়ার কোনও পরিবর্তন হইল না; তিনি উত্তর করিলেন—'আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।' অবধূত তাহাতে কোপ করিয়া

[১] জয়ত্যুপেন্দ্রঃ স চকার দূরতো বিভিৎসয়া যঃ ক্ষণলব্ধলক্ষ্যয়া।
দৃশৈব কোপারুণয়া রিপোরুরঃ স্বয়ং ভয়াদ্ভিন্নমিবাস্রপাটলম্ ॥—কাদম্বরী, ১০

বলিলেন—'মিথ্যা একথা, একথা ভণ্ডামির পরিচয়। তোমার আশীর্বাদের জন্য সারা জগৎ ব্যাকুল। তুমি মহাশক্তির প্রতীক, আমি তোমাকে ত্রিপুরভৈরবীর রূপে দেখিয়া কৃতার্থ হইব। সমস্ত জীবন আমি নারীর উপাসনা করিতেছি। আমার সাধনা অপূর্ণ থাকিয়া গেল। তুমি বিশুদ্ধ নারী হইয়া আমার উদ্ধার কর—বিশুদ্ধ নারী—ত্রিপুরভৈরবী!' মহামায়া গলায় আঁচল দিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন আর ত্রিশূল খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—'আদেশ শিরোধার্য, গুরুদেব।' তাঁহার চক্ষু হইতে বিচিত্র জ্যোতি ঝরিতে লাগিল, মুখমণ্ডল মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। গুরু মেরুদণ্ড ঋজু করিলেন, ভ্রূকুটি ঊর্ধ্বে রাখিলেন, আর অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই তেজোমণ্ডিত আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মহামায়া প্রতিমার মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। গুরু যখন দৃষ্টি সরাইয়া লইলেন তখন মহামায়া বেগে একদিকে বাহির হইয়া গেলেন। আমার আজও সেকথা স্মরণ করিতে রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই যে অবধূতপাদের কথার অর্থ কি। ধরিত্রী কি রক্তস্নান হইতে রক্ষা পাইবে না, আরও গভীরভাবে ডুবিয়া যাইবে? আর, মহামায়া কি সত্যই ত্রিপুরভৈরবী হইবেন? সত্যই কি মহাকালের নৃত্য থামিয়া যাইবে? কোথায় আছ ত্রিপুরসুন্দরী, এই ঘৃণা ও জুগুপ্সার জগৎ কেন সুন্দর করিয়া দিতেছ না, কেন তুমি বিকরাল তাণ্ডব হইতে ধরিত্রীর উপর মহা প্রলয়ের খেলাই খেলিতে থাকিবে? কোথায় রুদ্রাণী তোমার সেই দক্ষিণ মুখ, সেই সুকুমার ভাব, সেই প্রশমনকর হাস্য, সেই মনোরম ভঙ্গিমা, যাহা কাতর জগৎকে শান্তি দিতে পারিবে, ব্যাকুল বিশ্বকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে, ধরণীকে রক্তস্নান হইতে বাঁচাইতে পারিবে! আমি মনে মনে এই কথাগুলি আলোচনা করিতেছি এমন সময়ে দেখি ভট্টিনী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় জলপূর্ণ, কণ্ঠ বাষ্প-গদগদ, মুখমণ্ডল লাল আভায় উদ্ভাসিত। তবে ইহাই কি ত্রিপুরসুন্দরীর দক্ষিণ মুখ! দক্ষিণ মুখ!—যাহাতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, অনুরাগের আভার উল্লাস দেখা দিতেছে, স্নেহের স্নিগ্ধতা চমক দিতেছে! আহা, ভুবনমোহিনীর এই কি সেই রূপ যাহা পূজা করিবার জন্য অবধূতগুরু আমাকে এতখানি শিখাইয়াছিলেন! এই কুরঙ্গের মত ভীত-চপল নেত্র, শরৎচন্দ্রের মত আহ্লাদকারী মুখ, বিম্বফলের মত আতাম্র অধরোষ্ঠ, চন্দন গন্ধে আমোদিত অঙ্গ, করুণাপ্রসিক্ত মনোহর দৃষ্টি, যাহা অন্তঃকরণকে মোহিত করিয়া দেয়—ইহাই তো ভুবনমোহিনীর রূপ। গুরুই আমাকে সেই ধ্যানমন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছিলেন—

কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্।
দৃশা গলৎকারুণিকাপ্রয়ান্তঃ সম্মোহয়ন্তীং ত্রিজগন্মনোজ্ঞাম্॥

হইবেন? তাহা অসম্ভব। আমাকে কোন না কোন পথ বাহির করিতেই হইবে। এই চিন্তা করিতে করিতে আমি দ্বারদেশের বাহিরেই বসিয়া ছিলাম। উপরে বৃশ্চিক রাশি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া যাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে মঙ্গল গ্রহের লাল তারকা দেখা যাইতেছিল। বৃশ্চিকের আসনে মঙ্গল গ্রহ এক বিচিত্র ভয়ের ভাব সৃষ্টি করিতেছিল। কী সে বিচিত্র যোগ। তবে কি শাস্ত্রে যে বলিয়াছে, বৃশ্চিক রাশিতে মঙ্গলের সংক্রমণে ধরিত্রী রক্তকর্দমে পিচ্ছিল হইয়া যাইবে, তাহা সত্য? আবার কি আর্যাবর্তের পুণ্যভূমিতে বৃকের বিকরাল তাণ্ডব আরম্ভ হইবে? মনে মনে ভগবান নৃসিংহকে স্মরণ করিলাম, যাঁহাকে দেখিবামাত্র অসুররাজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পাটলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।[১] বৃশ্চিকস্থ মঙ্গল তাঁহারই ভীষণ নেত্রের ছায়া। হয়তো মেদিনী মানবরক্তে পিচ্ছিল হইয়া যাইবে, শস্যক্ষেত্র কর্বুরভস্মে রূপান্তরিত হইবে, জনপদের অধিবাসীরা দস্যুদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখায় আহুতি হইয়া যাইবে, রাশি রাশি নর-কঙ্কালে পথ হইয়া যাইবে দুর্লঙ্ঘ্য- বিকরাল কালের তাণ্ডব আর্যাবর্তকে ঘূর্ণিত হাহাকারের মধ্যে ফেলিয়া দিবে।

হে ভগবান্, এই রক্তস্রোত কি বন্ধ করা যাইতে পারে না? রাজা ও সামন্তদের হঠকারিতার চক্রে ইহার মধ্য হইতে বাঁচিবার উপায়ও কি পিষিয়া যাইবে? অবধূত অঘোরভৈরব মহামায়াকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন- 'তুমি ত্রিপুরভৈরবীর লীলা বন্ধ করিতে পারিবে না, মহাকালের নৃত্য থামাইতে পারিবে না। শূলপাণির মুণ্ডমালা রচনায় বাধা দিতে পারিবে না—কারণ তুমি সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুরভৈরবীর সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া দাও নাই। যেদিন তুমি নিজে তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারিবে সেদিন এই লীলা যেদিকে চাও মোড় ফিরাইতে পারিবে। নির্বোধ, ত্রিপুরসুন্দরীকে যতখানি দিবে ততখানিই তোমার নিজের সত্য হইবে। সত্যই কি জনসাধারণের দুঃখ তুমি নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছ? আমি বলিতেছি মহামায়া, সত্যবাদিনী হও, মায়া ছাড়। তুমি অমৃতের পুত্রদের আহ্বান করিয়াছ, সত্যই কি তুমি অমৃতের পুত্রী হইতে পারিয়াছ? তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা করিয়াই দেখাইতে পার যে তুমি নিজে নিজেকে নিঃশেষ ভাবে তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া দিবে। বাক্যবীর হওয়া তো নিজেই নিজের অপমান করা। যদি ত্রিপুরভৈরবীর লীলা অন্যরূপ দেখিতে চাও তো স্বয়ং ত্রিপুরভৈরবী হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। দুঃসময় আসিতেছে।' মহামায়ার কোনও পরিবর্তন হইল না; তিনি উত্তর করিলেন—'আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।' অবধূত তাহাতে কোপ করিয়া

[১] জয়ত্যুপেন্দ্রঃ স চকার দূরতো বিভিৎসয়া যঃ ক্ষণলব্ধলক্ষ্যয়া।
দৃশৈব কোপারুণয়া রিপোরুরঃ স্বয়ং ভয়াদ্ভিন্নমিবাস্রপাটলম্ ॥—কাদম্বরী, ১৩

বলিলেন—'মিথ্যা একথা, একথা ভণ্ডামির পরিচয়। তোমার আশীর্বাদের জন্য সারা জগৎ ব্যাকুল। তুমি মহাশক্তির প্রতীক, আমি তোমাকে ত্রিপুরভৈরবীর রূপে দেখিয়া কৃতার্থ হইব। সমস্ত জীবন আমি নারীর উপাসনা করিতেছি। আমার সাধনা অপূর্ণ থাকিয়া গেল। তুমি বিশুদ্ধ নারী হইয়া আমার উদ্ধার কর—বিশুদ্ধ নারী—ত্রিপুরভৈরবী!' মহামায়া গলায় আঁচল দিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন আর ত্রিশূল খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—'আদেশ শিরোধার্য, গুরুদেব।' তাঁহার চক্ষু হইতে বিচিত্র জ্যোতি ঝরিতে লাগিল, মুখ-মণ্ডল মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। গুরু মেরুদণ্ড ঋজু করিলেন, ভ্রূকুটি ঊর্ধ্বে রাখিলেন, আর অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই তেজোমণ্ডিত আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মহামায়া প্রতিমার মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। গুরু যখন দৃষ্টি সরাইয়া লইলেন তখন মহামায়া বেগে একদিকে বাহির হইয়া গেলেন। আমার আজও সেকথা স্মরণ করিতে রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই যে অবধূতপাদের কথার অর্থ কি। ধরিত্রী কি রক্তস্নান হইতে রক্ষা পাইবে না, আরও গভীরভাবে ডুবিয়া যাইবে? আর, মহামায়া কি সত্যই ত্রিপুরভৈরবী হইবেন? সত্যই কি মহাকালের নৃত্য থামিয়া যাইবে? কোথায় আছ ত্রিপুরসুন্দরী, এই ঘৃণা ও জুগুপ্সার জগৎ কেন সুন্দর করিয়া দিতেছ না, কেন তুমি বিকরাল তাণ্ডব হইতে ধরিত্রীর উপর মহা প্রলয়ের খেলাই খেলিতে থাকিবে? কোথায় রুদ্রাণী তোমার সেই দক্ষিণ মুখ, সেই সুকুমার ভাব, সেই প্রশমনকর হাস্য, সেই মনোরম ভঙ্গিমা, যাহা কাতর জগৎকে শান্তি দিতে পারিবে, ব্যাকুল বিশ্বকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে, ধরণীকে রক্তস্নান হইতে বাঁচাইতে পারিবে! আমি মনে মনে এই কথাগুলি আলোচনা করিতেছি এমন সময়ে দেখি ভট্টিনী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় জলপূর্ণ, কণ্ঠ বাষ্প-গদ্‌গদ, মুখমণ্ডল লাল আভায় উদ্‌ভাসিত। তবে ইহাই কি ত্রিপুরসুন্দরীর দক্ষিণ মুখ! দক্ষিণ মুখ!—যাহাতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, অনুরাগের আভার উল্লাস দেখা দিতেছে, স্নেহের স্নিগ্ধতা চমক দিতেছে! আহা, ভুবনমোহিনীর এই কি সেই রূপ যাহা পূজা করিবার জন্য অবধূতগুরু আমাকে এতখানি শিখাইয়াছিলেন! এই কুরঙ্গের মত ভীত-চপল নেত্র, শরৎচন্দ্রের মত আহ্লাদকারী মুখ, বিম্বফলের মত আতাম্র অধরোষ্ঠ, চন্দন গন্ধে আমোদিত অঙ্গ, করুণাদ্রসিক্ত মনোহর দৃষ্টি, যাহা অন্তঃকরণকে মোহিত করিয়া দেয়—ইহাই তো ভুবনমোহিনীর রূপ। গুরুই আমাকে সেই ধ্যানমন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছিলেন—

কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্।
দৃশা গলৎকারুণিকাম্রয়ান্তঃ সম্মোহয়ন্তীং ত্রিজগন্মনোজ্ঞাম্॥

হায়, ইহার চেয়ে বেশি 'ত্রিজগন্মনোজ্ঞা' শোভা কি হইতে পারে? কতখানি অন্তরের সংবেদনী দৃষ্টি, কত অমৃতস্রাবী বাগ্‌ধারা, কেমন উদার চরিত্র, কেমন নির্মল আত্মা! ভুবনমোহিনীর এই রূপ যে দেখিয়াছে তাহার দেখিবার আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। আমি গদ্‌গদভাবে ভট্টিনীর দিকে তাকাইয়াই রহিলাম, দেখিতেই লাগিলাম। ভট্টিনী অনুযোগের স্বরে বলিলেন—'পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, কিছু প্রসাদও গ্রহণ করেন নাই। চলুন, ভিতরে যাই।' আমি নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের মত ভট্টিনীর পিছনে পিছনে চলিলাম। কোন্‌ টানে ধরা পড়িয়াছি!

ষোড়শ উচ্ছ্বাস

প্রাতঃকালে যখন নিদ্রাভঙ্গে উঠিলাম, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শন নিপুণিকার সঙ্গে হইল। সে সদ্য সদ্য স্নান করিয়া আসিয়াছিল—তাহার চুল তখনও ভিজা ছিল। তাহার আপাণ্ডু-দুর্বল মুখ এতই সুন্দর দেখাইতেছিল যে মনে হইতেছিল বুঝি প্রভাতকালীন চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চাতে সজল জলধর লাগিয়া আছে। শুভ্র শাড়ীতে বেষ্টিত তাহার তন্বী অঙ্গলতা প্রফুল্ল কামিনী-গুচ্ছের মত অভিরাম দেখাইতেছিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইলেও তাহার খঞ্জন-চটুল চক্ষু বড়ই মনোহর লাগিতেছিল। আজ তাহার অধরে স্বাভাবিক হাসি খেলিতেছিল। আমাকে উঠিতে দেখিয়া সে অতি আদরের সহিত আমাকে প্রণাম করিল। আমাকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়া সে নিজেই বলিয়া উঠিল- 'তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ, না ভট্ট? তুমি মহান, আমি তুচ্ছ, তুমি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিয়া থাকিবে। কিন্তু আমি তোমাকে এখনও ক্ষমা করি নাই। তুমি মৌখরিদের রানীর নিমন্ত্রণ আনিয়া নিজেকে হীন করিয়াছ, ভট্টিনীকেও হীন করিয়াছ। আমি কাহারও অপমান সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু আমার অত্যন্ত গ্লানি এইজন্য হইতেছে যে তুমি আসিতে না আসিতেই আমি কঠোর বাক্য বলিয়াছি। আমার তখন জ্ঞান ছিল না, আমার হৃদয় দুর্বল হইয়া গিয়াছে, আমি কোনও কিছুই সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু আমি কাল যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা সবই সত্য।' নিপুণিকার চক্ষু হইতে আজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্থানে স্মিতধারা ঝরিতেছিল, তাহার চেহারায় তেজের স্থানে চপলতার আসন ছিল, তাহাকে প্রসন্ন ও গ্লানিশূন্য দেখাইতেছিল। আমি সস্নেহে বলিলাম—'আমার ভুল হইয়াছিল, নিউনিয়া, আমি পথ পাইতেছিলাম না। তুমি আমাকে কর্তব্য বলিয়া দাও। এখন আমার ত্রুটিগুলির হিসাব দিয়া

কি লাভ?' নিপুণিকার মুখের উপর স্বাভাবিক মাধুর্য আবার খেলিতে লাগিল। সে মৃদুহাসির সহিত বলিল—'তুমি ভুল করিবে, আর পথ বলিয়া দিব আমি?' আমি কথার সূত্র ধরিয়া বলিলাম—'এ তো নূতন নয়, নিউনিয়া।' নিপুণিকার চোখে এক উল্লাসের ভাব দেখা গেল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল—'জটিল বটুর কথা মনে আছে তো?' আর আঁচলে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ মুখ হাসিতে লুটোপুটি খাইতে লাগিল। তাহার আঁচলের উপর সেই মনোহর সরু সরু আঙ্গুলগুলি খানিকক্ষণ কাঁপিতে লাগিল, যাহাদের উপযোগিতা দেখিয়াই আমি নিপুণিকাকে মণ্ডলীতে লইয়াছিলাম।

মুহূর্তের মধ্যে বিদিশার জটিল বটুর কথা মনে পড়িয়া গেল। সে নিত্যই আমার সঙ্গে হাঙ্গামা করিত যে আমি যেন তাহাকে আমার নাটকমণ্ডলীতে গ্রহণ করি। তাহার ললাট বৃহৎ ও প্রশস্ত, চক্ষু বিদীর্ণ দাড়িম্বফলের মত ও রক্তাভ, কণ্ঠস্বর কর্কশ ও তীব্র ছিল। এমন কোনও চরিত্র পাইতেছিলাম না তাহাকে দিয়া যাহার অভিনয় করাই। সে কিন্তু কিছুতেই দমিল না, অবিচল হইয়া তাহার প্রার্থনায় দৃঢ় রহিল। মণ্ডলীর সকলেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল, শুদ্ধ আমার সংকোচের জন্যই তাহারা উহাকে সহিয়া যাইতেছিল। একমাত্র নিপুণিকাই তাহাকে রাগাইত না; শুধু আমার দিকে তাকাইয়াই সে তাহার লোভ সংবরণ করিত। এই ঔদাসীন্যকে জটিল অনুরাগ বলিয়া মনে করিত। তাহার দাড়ি এক গোছা সম্মার্জনীশলাকার মত মনে হইত, মুখের উপরে শ্মশ্রু এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যেন পাথরের উপর হইতে শরগুল্ম বাহির হইয়া আসিয়াছে। সে সর্বদাই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইত। একদিন আমার মণ্ডলীতে অভিজ্ঞানশাকুন্তলের অভিনয় করা হইতেছিল। সেদিন সকল সম্ভ্রান্ত নগরবাসী আসিবেন, স্বয়ং যুবরাজ ভট্টারকও অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইবেন, এমন কথা ছিল। ঐ দিন মারীচের ভূমিকায় দেবরাজের অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল, সে সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভাবিলাম, জটিল বটুকে এই ভূমিকায় নামাইয়া দিই। বিশেষ কিছু করিবার নাই, সমস্ত দিন তাহাকে চক্ষু বুজিয়া চুপচাপ বসিবার অভ্যাস করাইলাম। সন্ধ্যার পর অভিনয় আরম্ভ হইল। যুবরাজ ভট্টারক আসিয়াছিলেন। অভিনয় খুব সুন্দর হইতেছিল। নিপুণিকা সানুমতীর ভূমিকায় নামিয়াছিল। তাহার মনোহর অঙ্গলতা সেদিন মালতী-কুসুমের অভিরাম মালায় বড়ই কমনীয় মনে হইতেছিল। তাহার কবরীতে লম্বিত অশোকপল্লব ও কর্ণ হইতে দোদুল্যমান আগণ্ডবিলম্বিত-কেশর শিরীষ পুষ্প তাহার শোভাকে শতগুণ বর্ধিত করিয়াছিল। সে ঐ বেশে মত্তবারণীর ঠিক পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতেছিল। শেষ অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ

হইয়া গেল। আমিও ঘটনাক্রমে নিপুণিকার পাশেই দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতে লাগিলাম। জটিল বটু মারীচের ভূমিকায় মঞ্চের উপর উঠিল। সে অদ্ভুত ক্রিয়া সব আরম্ভ করিল। থাকিয়া থাকিয়া সে দর্শকদের দিকে তাকাইতেছিল, যেন লোকে তাহার অভিনয় পছন্দ করিতেছে কিনা তাহা সে জানিতে চায়। আবার পিছনে ফিরিয়া নেপথ্যের দিকেও তাকাইতেছিল। এক মুহূর্তও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। আমার সমস্ত শেখানো পড়ানো একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। দর্শকদের মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিতে লাগিল। আমি ব্যাকুল হইয়া বলিলাম—'সব যে নষ্ট হইয়া গেল, নিউনিয়া!' নিপুণিকা আমাকে দেখিয়া মুহূর্তের জন্য চিন্তিত হইল, পুনরায় বলিল—'কিছুই নষ্ট হয় নাই ভট্ট, তুমি মারীচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত থাক। আমি ইহাকে সামলাইতেছি।' এই কথা বলিয়া সে পুত্তলিকার মত নাচিতে নাচিতে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইল। বাম হাত তাহার কটিদেশে, চঞ্চল-পদক্ষেপে উদ্ধত নর্তনে রঙ্গমঞ্চ ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। মূর্খ জটিল উঠিয়া দাঁড়াইল। নিউনিয়া ডান হাতে তাহার দাড়ি ধরিয়া আবদারের স্বরে বলিল—'নাগর আমার, নাচিবে না?' মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাতাবরণ হাস্যময় হইয়া উঠিল। জটিল বটু টানাটানি শুরু করিল, কিন্তু নিউনিয়া তাহার দাড়ি ছাড়ে না। প্রত্যেক লাফালাফির সঙ্গে সঙ্গে সে রহস্যব্যঞ্জক কথা বলে আর মনোহর ভঙ্গীতে তাল দেয়। এই বিচিত্র প্রহসন অনেকক্ষণ চলিল। নানা কৌশলে নিপুণিকা জটিল বটুকে নিজের পায়ে পড়াইল, কোমর বাঁধিয়া নাচাইল, মাথার চুল রঙ্গমঞ্চের উপর ঘসাইল, এই প্রকারে যে দৃশ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছিল তাহাকে মনোরম প্রহসনের রূপ দিয়া জটিলকে টানতে টানিতে রঙ্গভূমি হইতে বাহির হইয়া গেল। শত শত নাগরিককণ্ঠের উচ্চ অট্টহাস্য ও দীর্ঘ দীর্ঘায়িত সাধুবাদে রঙ্গভূমি টলমল করিতে লাগিল। যুবরাজ ভট্টারক সহৃদয় ছিলেন। সমস্ত অবস্থা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিজের বহুমূল্য উত্তরীয় প্রসাদের চিহ্নরূপে দান করিয়া তিনি নিপুণিকাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহার পর এই অট্টহাস্যের পৃষ্ঠভূমিতে মারীচাশ্রমের শান্ত সুখদ দৃশ্য আরও জমিয়া উঠিল। সেদিন নিপুণিকা আমাকে লজ্জা হইতে বাঁচাইয়াছিল। সেদিনের সেই মনোরম দৃশ্য মনে করিয়া আজ নিপুণিকার হাসি বাঁধ ভাঙ্গিয়া উছলিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। আমিও হাসি আটকাইতে পারিলাম না। হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে খাইতে বলিলাম--'হাঁ নিউনিয়া, ভুল করি আমি, আর পথ বাহির কর তুমি!' অনেকক্ষণ ধরিয়া সে নিজেই চিন্তার তরঙ্গে দুলিতে থাকিল। পরে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—'ঠাট্টা করিতেছি না ভট্ট, আমি সত্যই রাস্তা বাহির করিতে আসিয়াছি। শোনো, আমার কথা রাখো।'

নিপুণিকা যদিও গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল তথাপি এখনও তাহার গণ্ডস্থল প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা ধারণ করিয়াছিল, এখনও তাহার চঞ্চল নয়নের সরসতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, এখনও তাহার অঞ্চল মুখখানি ঢাকিয়া ছিল, এখনও তাহার উত্তরোষ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার মধুর মূর্তি বড়ই মোহন বলিয়া মনে হইতেছিল, যেন উহা শরচ্চন্দ্রিকার জমাট রূপ, দুগ্ধসাগরের ঘনীভূত আভা, সুধাভাণ্ডের সংযমিত পরিচ্ছন্নতা। সে দৃষ্টি নত করিয়া আর এমনভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল যে মনে হইল, বুঝি প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করিয়া করিয়া দেখিয়া লইতেছে। আমার প্রতি সে বেশিক্ষণ তাকাইল না। বলিল—'ভট্টিনী স্থাণ্বীশ্বর যাইবেন, কিন্তু সেখানে তিনি কাহারও অতিথি হইবেন না। তাঁহার নিজের স্বাধীন রাজ্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। লোরিকদেবকে তুমি এই কথায় রাজি করাও যে তাঁহার এক সহস্র মল্লসৈন্য ভট্টিনীর সেবায় নিযুক্ত হইবে। স্বাধীন দেশের রানী তাঁহার নিজের রাজ্যে যেমন থাকেন, স্থাণ্বীশ্বরে ভট্টিনী সেইভাবে থাকিবেন। এই অভাগিনীও সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। স্থাণ্বীশ্বরের মহারাজাধিরাজেরও এই অধিকার থাকিবে না যে ভট্টিনীর সেবিকার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন। নিউনিয়াকে স্থাণ্বীশ্বরের আইন অনুযায়ী যদি উৎপীড়ন করা যায়, তবে সেখানে রক্তের নদী বহিয়া যাইবে। প্রথম বলিদান দিতে হইবে কান্যকুব্জেশ্বরের সভাপণ্ডিত বাণভট্টকে। তুমি কি প্রস্তুত, ভট্ট, এক সামান্য দাসীর জন্য নিজের প্রাণ লইয়া বাজি খেলার সাহস তোমার আছে কি?' এই বার সে আমার দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কণ্ঠস্বর আরও কিছু উচ্চ করিয়া বলিল—'ভট্ট, কোন অপরাধের উপর লম্পটের আশ্রয় কান্যকুব্জের রাজা আমাকে ফাঁসি দিতে চান? আমার সেই অপরাধের উপর নির্ভর করিয়াই তো উনি দেবপুত্র তুবরমিলিন্দের সঙ্গে মৈত্রী করিতে চান? আমার মত অসহায় নারীকে দণ্ড দিতে উদ্যত উঁহার কঠোর ভুজদণ্ড কি ম্লেচ্ছবাহিনী হইতে নিজের প্রজাদের বাঁচাইতে পারে না? সত্যই কি তুমি বিশ্বাস কর আর্য যে এই নির্বীর্য শাসনতন্ত্রের সঙ্গে দেবপুত্রের সৈন্যদলের মিলন হইলেই আর্যাবর্ত রক্তস্নান হইতে রক্ষা পাইবে? আর্যাবর্তের সমাজের মূলে ঘুন ধরিয়াছে। উহাকে সর্বনাশ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। জিজ্ঞাসা করি আর্য, ক্ষুদ্র সত্য কি মহান্ সত্যের বিরোধী হয়?' নিপুণিকা উত্তর পাইবার আশায় আমার দিকে তাকাইল। আমি এ প্রশ্নের কোনও প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না, সহজভাবে উত্তর দিলাম—'সত্য অবিরোধী হয় বলিয়াই তো শুনিয়াছিলাম।' নিপুণিকা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'আর্য, তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার সত্য। তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। আমার শপথ, তুমি সত্য সত্য বল, আমি কোন্ পাপের ফলে নিদারুণ দুঃখের

আগুনে আজীবন জ্বলিতেছি? নারী হইয়া জন্মিয়াছি, ইহাই কি আমার সমস্ত অনর্থের মূল? তুমি এই ক্ষুদ্র সত্যের সঙ্গে রাষ্ট্রজীবনের মহান্ সত্যের কোনও বিরোধ তো দেখ নাই? বৃহত্তর সত্যের নামে মিথ্যার তাণ্ডব কি চলিতেছে না? কেমন করিয়া আশা কর আর্য, যে দেবপুত্রের প্রবল ভুজদণ্ড এই সমাজকে বিনাশের গর্ত হইতে রক্ষা করিবে? মহাকালী অবাধে এই দেব-ভূমির উপর নৃত্য করিবেন, আরও নৃত্য করিবেন, প্রলয়ের ঘূর্ণিবায়ুতে এই সব কিছু তুলাখণ্ডের মত উড়িয়া যাইবে, বিচ্ছিন্ন অদৃশ্য খণ্ডপাপের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব। নিপুণিকা সামান্য অপমানিতা নারী। সমাজের কুৎসিত রুচির মধ্যে তিলে তিলে সে আপনাকে আহুতি দিয়াছে, তাহার এই কথা হৃদয়াগ্নির অতল গহ্বর হইতে বাহির হইতেছে। তোমরা প্রলয় ঝড় রোধ করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস করিতেছ। কিন্তু আর্য, আমার ইচ্ছা, একবার যদি তুমি সম্রাটের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া এই মহাসত্য উচ্চে সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও। যদি সেই স্বর অল্পমাত্রায়ও সেইখানে পৌঁছায় তাহা হইলে হয়তো বা মহাকালের ক্রোধাগ্নি প্রশমিত হইতেও পারে। বড়ই দুঃখ, আর্য, এই বিরাট্ অন্তঃস্পন্দন-হীন আবর্জনাস্তূপের উপর এই সাম্রাজ্যের নয়নলোভন রথযাত্রা চলিয়া যাইতেছে। এই আবর্জনাস্তূপের আমি এক নগণ্য কণিকামাত্র। আমি যাহাতে নিজেই নিজের অগ্নিতে ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত জঞ্জাল ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারি তাহার যোগ্য আমাকে করিয়া দাও। আমি তোমার হস্তাবলম্বন চাই। নারী-জন্মলাভ করিয়া শুধু লাঞ্ছনা ভোগ করাই সার নয়। তুমিই আমাকে আনন্দের জ্যোতিষ্কণিকা দিয়াছিলে। তুমিই আমাকে তেজের স্ফুলিঙ্গ দাও, আর্য!'

আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া এই কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলাম। এ কি প্রলাপ? এই অভাগী কি আবার স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্য কথার ফোয়ারা ছুটাইতেছে? যদি ইহা প্রলাপ হয় তাহা হইলে এরূপ সত্যপূর্ণ প্রলাপ এই প্রথমবার শুনিতেছি। আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া এক প্রশ্ন অন্তস্তলের অসীম গভীর হইতে গুঞ্জন করিতেছিল- ক্ষুদ্র সত্য কি মহান সত্যের বিরোধী? তাহাই তো দেখিতেছি। সাধারণ লোক যে কর্মের জন্য লজ্জিত হয়, সেই কর্মের জন্যই বড়লোক সম্মানিত হন। নিপুণিকার মধ্যে কি ঘোর পরিবর্তন হইয়াছে। ও আজ হইয়াছে পরিবর্তনের জ্বলন্ত উল্কা। ও কি করিবে? সমাজের অগ্নিশিখা তো নিত্যই ব্যক্তিদের আহুতি গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু পথ কোথায়? নারীর চেয়ে বড় অমঙ্গলের আর কি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার চেয়ে দুর্দশা আর কাহার? নিপুণিকা আমার নিকট হইতে কি আশা করে? অবধূতপাদের সাধনা এইজন্য অপূর্ণ যে তিনি বিদগ্ধ নারীর সহযোগিতা পান নাই, আর নিপুণিকার বলিদানের আকাঙ্ক্ষা

এই জন্য অপর্ণে যে সে পুরুষের হস্তাবলম্বন পায় নাই! কোনটি সত্য? আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি, নিপুণিকার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া পড়িতেছে। আবার কি সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে? আমি কি উত্তর দিব তাহা ভাবিতেছি এমন সময় নিপুণিকা কর্তিতপক্ষ পক্ষীর মত আমার পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। আমি হাহাকার করিয়া উঠিলাম। শব্দ শুনিয়া ভট্টিনী দৌড়িয়া আসিলেন। পূজাবেদী হইতে তিনি সোজা উঠিয়া আসিয়াছিলেন।

নিপুণিকা অজ্ঞান অবস্থাতেও জোর করিয়া আমার পা ধরিয়া ছিল। সে বড় দৃঢ় বন্ধন। ভট্টিনীকে দেখিয়া আমি সাধুসর্বশে উঠিতে যাইব কিন্তু সেই বন্ধন আমার চেষ্টাকে বাধা দিল। ভট্টিনী করুণস্বরে বলিলেন—'ভট্ট, ঐ বন্ধন ছাড়াইও না, উহাতে ও শান্তি পাইবে!' আমি অর্ধোত্থিত অবস্থায় থামিয়া গেলাম। ভট্টিনী নীচে বসিয়া পড়িলেন ও তাহার ভিজা চুলে আঙ্গুলে বুলাইয়া দিলেন। আমিও কষ্টে সৃষ্টে নীচে বসিলাম। নিউনিয়ার হাত আমার পায়ে সেই প্রকার শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে। সংক্ষেপে ভট্টিনীকে নিপুণিকার উত্তেজিত কথাগুলির সারমর্ম বলিলাম। তিনি কিছু বলিলেন না। তাহার অধোলম্বিত ললাটে তাঁহার কিশলয়কোমল করতল দিয়া টিপিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার বড় বড় চোখ অশ্রুবিন্দুতে ভরিয়া গেল। ভট্টিনীর নয়নজলে আমার হৃদয় গলিতে আরম্ভ করিল। কি করিব, যাহাতে এই নয়নে কখনও অশ্রুসঞ্চার না হয়? কেমন করিয়া কি বলিব যাহাতে ভট্টিনীর কোমল হৃদয় ব্যথাতুর না হইতে পারে? ভট্টিনী তাঁহার আঁচল হইতে ঔষধ বাহির করিলেন এবং অতি সুকুমার ভাবে তাহার চোখে ও ললাটে প্রলেপ দিতে লাগিলেন। অল্প উপচারের পর সে চোখ মেলিল। ভট্টিনীকে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে সকাতরে বলিল—'ভট্টিনী, আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না তো? আমি কান্যকুব্জের লম্পটদের আশ্রয়দাতা রাজাকে ভয় করি না।' ভট্টিনী সস্নেহে ভর্ৎসনা করিলেন—'ছি বহিন, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কি বাঁচিতে পারি?'' নিপুণিকার পাণ্ডুর গণ্ডমণ্ডল দরবিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া গেল।

নিপুণিকা আবার উঠিয়া বসিল। সে কিছু বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু ভট্টিনী বলিতে দিলেন না। অনেকক্ষণ সে মাথা নীচু করিয়া ভট্টিনীর পার্শ্বে বসিয়া থাকিল, অনেকক্ষণ তাহার আর্দ্র কেশে ভট্টিনীর অঙ্গুলি ঘুরিতে লাগিল। অনেকক্ষণ আমি নিজেরই চিন্তার জালে জড়াইয়া রহিলাম, অনেকক্ষণ সেই স্তব্ধ নীরবতা ঐ ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিল।

আবার নিপুণিকাই ভট্টিনীকে বলিল—'ভিতর হইতে বাহির পর্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছে আর্যে, আমাকে আরও একটা কথা ভট্টকে বলিতে দিন। আমার অন্তস্তল পুড়িয়া যাইতেছে, আমি জ্বলিয়া মরিয়া যাইতে চাই।

আমার জন্ম হইবার সময় আসিয়াছে।' ভট্টিনী তাহার মুখের উপর আঙ্গুল রাখিয়া চুপ করাইতে করাইতে বলিলেন—'শুধু একটা কথায় তোমাকে তোমার বক্তব্য শেষ করিতে হইবে।' নিপুণিকা নিরাশ হইয়া বলিল—'তবে এখন বলিব না।' ভট্টিনী বলিলেন-'সেই ঠিক।' আর তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। আমি চিন্তাকুল হইয়া সেখানেই বসিয়া থাকিলাম।

এক বৃদ্ধা দাসী আসিয়া সংবাদ দিল যে ভট্টিনী স্নান করিতে বলিয়াছেন, কারণ শীঘ্রই আভীররাজ লোরিকদেব আমার সঙ্গে দেখা করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন মধ্যাহ্নের পূর্বেই ধরিত্রীর উপর অংশুমালীর তীক্ষ্ম কিরণ উত্তপ্ত রজতশলাকার মত ছড়াইয়া ছিল, মহাসরযূর তটপ্রদেশ ঘিরিয়া অনেকদূর বিস্তৃত সৈকতপুলিনে দারুণ তাপ সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল, দূরস্থিত অশ্বত্থবৃক্ষের উপর হইতে শ্রুত বন্য পারাবতের ফুৎকার ভিন্ন কোথা হইতেও কোনও শব্দ আসিতেছিল না। তৃষ্ণার্ত কৃকলাস শরমূল ছাড়িয়া জলের সন্ধানে বৃথাই পীড়িত হইতেছিল, অত্যন্ত ক্ষীণধারা মহাসরযূ পাবদরেখার মত দেখা যাইতেছিল, ধূসর আকাশ-মণ্ডল তাণ্ডবক্লান্ত ধূর্জটির ভস্মাচ্ছাদিত জটার মত দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, আর বায়ুমণ্ডলের প্রত্যেক স্তরে ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস স্তব্ধ থাকিয়া বিচিত্র আশংকা উৎপন্ন করিতেছিল। স্নানাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া যখন লোরিক-দেবের সভায় পৌঁছিলাম, তখন মধ্যাহ্নের শংখ বাজিয়া গিয়াছিল। আমাকে বলা হইল, লোরিকদেব ভোজনের পরে অপরাহ্ণকালে তাঁহার বিশ্রামকক্ষেই আমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

অপরাহ্ণকালে যখন লোরিকদেবের বিশ্রামকক্ষে পৌঁছিলাম, তখন বড় আশ্চর্য লাগিল। আমি তো মনে মনেই ভাবিয়াছিলাম, লোরিকদেবের প্রাসাদের বিশাল বহিঃপ্রকোষ্ঠে শুকসারী, লাও-তিত্তির, কুক্কুট-ময়ূর প্রভৃতি পক্ষীদের কলরব গুঞ্জন করিতে থাকিবে, গোময়োপলিপ্ত অজিরভূমির সম্মুখের দরজায় মালতীমালা ঝুলিতে থাকিবে, পার্শ্ববর্তী বলিবেদিকার উপর অভিরাম শাল-ভঞ্জিকা ন্যস্ত বা উৎকীর্ণ হইবে, শয়নকক্ষে স্যন্দন, দেবদারু বা হরিচন্দনের শয্যা ও অসিতের প্রতিশীর্ষিকা থাকিবে, তাহাতে মাঙ্গলিক দণ্ডপত্র শোভা পাইবে, শয্যার শিয়রে কূটস্থানের উপর তাঁহার ইষ্টদেবের মনোহর মূর্তি সজ্জিত থাকিবে, পার্শ্বদেশেই কোনও বেদীর উপর মাল্যচন্দন উপলেপন রক্ষিত থাকিবে, যদি তিনি কিছু বেশি শিল্পবিনোদী হন তাহা হইলে গজদন্তের উপর বীণা তো নিশ্চয় রাখা থাকিবে, আর তাহা বলয়াকারে ঘিরিয়া কুরুণ্টক

পুষ্পের মালাও ঝুলিতে থাকিবে। শয্যা হইতে কিছু দূরে সরিয়া গান্ধার দেশের কোনও আস্তরণ বিছানো থাকিবে, সহৃদয় বিট-বিদূষকের মনোরঞ্জনের জন্য তাম্বুল ও সৌগন্ধিক পুটিকা আর মাতুলুঙ্গত্বক্ ও সিক্থ-করণ্ডকও থাকিবে। বাৎস্যায়ন শত শত বৎসর পূর্বে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের জীবন-চর্যা দেখিয়া যে ব্যবস্থার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ সমগ্র ভরতখণ্ডের অভিজাতজনের আদর্শ হইয়া গিয়াছে। আর্যবর্তের ধনীদের রুচি এই আদর্শের প্রতি চলিয়াছে। কিন্তু লোরিকদেবের বিশ্রাম কক্ষ একেবারেই ভিন্ন ছিল। প্রস্তরভিত্তিতে গজদন্তের স্থানে কয়েকটি লোহকীলক ছিল, তাহার উপর ধনুষ্কংসা ও মুদ্গর রাখা ছিল। বীণার তো সেখানে নামগন্ধও ছিল না। লোরিকদেবের কাষ্ঠশয্যার উপর ঊর্ণাস্তরণ বিছানো; না কোথাও তাম্বুল, না সৌগন্ধিক পুটিকা বা দ্যুত-ফলক। তাঁহার বিশাল বলিষ্ঠ দেহের ছন্দের সঙ্গে সমস্ত কক্ষের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য। চার কোণে ধূপবর্তিকা জ্বলিতেছিল। কূটস্থানে বালবাসুদেবের গোবর্ধনধারী মূর্তির পাদদেশে কর্পূরদীপ প্রজ্বলিত। ঘরে পূর্ণমাত্রায় সুরুচি বিদ্যমান; কিন্তু জানিয়া বুঝিয়া সৌকুমার্যকে দূরে রাখা হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া লোরিকদেব অতি সমাদর করিয়া উঠিলেন, আসন দিয়া সম্মানিত করিলেন আর দুর্লভ গন্ধরাজপুষ্পের সুন্দর স্তবক উপহার দিলেন। পুনরায় তাঁহার কাষ্ঠশয্যায় উপবেশন করিলেন।

কোনও ভূমিকা না করিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন—'ভট্ট, আপনি দেবপুত্র-নন্দিনীর পরিচয় আমাকে না দিয়া কান্যকুব্জেশ্বরকে কেন দিলেন?' আমিও ভূমিকা না করিয়াই উত্তর দিলাম—'আমি ভট্টিনীর বিনীত সেবক। তাঁহার আদেশ ছিল যে আমি যেন কাহাকেও তাঁহার যথার্থ পরিচয় না দিই। আমি কান্যকুব্জ-রাজকেও তাঁহার কোনও পরিচয় দিই নাই। তিনি কুমার কৃষ্ণবর্ধন হইতে জানিয়াছেন। কুমার ভট্টিনীর পরিচয় জানিতেন। কেন ও কি ভাবে তিনি জানিতেন, তাহা আমি এখন বলিতে পারি না।'

লোরিকদেবের কুঞ্চিত ভ্রূকুটির মধ্যে সহজভাব ফিরিয়া আসিল, ললাট-দেশের ধনুরাকারের বলিগুলি সরল হইয়া আসিল, আকৃষ্ট গণ্ডকুণ্ডিকা তিরোহিত হইয়া গেল, তাঁহার চক্ষে সহজ বিশ্বাসের ভাব ফিরিয়া আসিল। তিনি একটু থামিয়া ধীর সংযত ভাষায় বলিলেন—'দেখুন ভট্ট, আমার শিরায় শিরায় গুপ্তদের অন্নে রক্ত, আমি আঠারো বৎসর বয়সে গুপ্তসেনাদলের সৈনিক হইয়াছি। আমি সিন্ধু ও কুভার অপর পার পর্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজ উড়াইয়াছি। এখন আমার বয়স ষাটের উপরে। আপনি কি আশা করেন যে এই প্রৌঢ় বয়সে আমাদের অন্নদাতাকে দুর্বল দেখিয়া কল্যকার অর্বাচীন লোককে

রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিব? তাহা অসম্ভব। যদি আমাকে অধীনতা স্বীকার করিতেই হয় তবে সেই গুপ্তদেরই অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। কান্যকুব্জের রাজাকে আমি চরণাদ্রি দুর্গের পূর্ব ভাগে কোনও প্রকারেই আসিতে দিব না।' তাঁহার চক্ষে ক্রোধের ভাব দেখা দিল; কিন্তু পুনরায় আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিতে শুরু করিলেন—'গিরিবর্ত্মের অপর পার হইতে বড়ই ভীষণ সংবাদ আসিয়াছে। ভট্ট, কান্যকুব্জের এই দুর্বল শাসন সেই সংকটকে দূর করিতে পারে না। দেবপুত্র তুবরমিলিন্দের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলেই এই ধর্মাচারহীন শাসন বলবান হইয়া যাইবে না। হায়, এই সময়ে গুপ্তকুলে কোনও শক্তিশালী বালকও বাঁচিয়া নাই। স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্তদের প্রতাপানল শান্ত হইয়া গিয়াছে। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলনেই শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভট্ট, আপনি স্বপ্নেও এ ধারণা মনে স্থান দিবেন না যে অযোগ্য রাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন হইলেই দেবপুত্র তুবরমিলিন্দ শক্তিশালী হইয়া যাইবেন। দেখুন, আমি কূটনীতি জানি না, আপনারা নানা শাস্ত্রের অভ্যাসে যেমন নিজের বুদ্ধি শাণিত করিয়াছেন সেরূপ করিবার সুযোগ আমি কখনও পাইই নাই। অশ্বের পৃষ্ঠেই বিশ্রাম করিয়াছি, ধাবমান অশ্বগণের পায়ের খট্ খট্ শব্দের মধ্যেই রাত্রিযাপন করিয়াছি, নীতিপটু হইবার গর্ব আমার একেবারেই নাই। আমি সহজ কথা সহজ ধরনেই বুঝিতে পারি। সত্য ও অসত্যে মিলন হইতে পারে না। আর্যাবর্তের সমাজে অনেক স্তর হইয়া গিয়াছে, ইহা ভগবানের রচিত বিধান নয়। ইহা অসত্য। গিরিবর্ত্মের ওপার হইতে যে ম্লেচ্ছবাহিনী আসিতেছে, তাহারা এই মিথ্যাকে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। আমি নিজের চোখে যাহা দেখিয়াছি তাহাই আপনাকে বলিতেছি। প্রবলপ্রতাপশালী গুপ্তসম্রাটেরা এই মিথ্যা সামাজিক স্তরভেদের সঙ্গে সঙ্গে উদাত্তভাবনার সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা ছিল ভুল। গোবিন্দগুপ্ত এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তুবরমিলিন্দও বুঝিয়াছেন, কিন্তু গুপ্তসম্রাটেরা ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা উৎসন্নে গিয়াছেন। এমনই হওয়ার ছিল। আর্য গোবিন্দগুপ্তের পরামর্শেই আমি নিজের এই আভীর-বাহিনীতে স্তরভেদ হইতে দিই নাই। আমার দশ সহস্র মল্ল ভিতরে বাহিরে এক। যখন কোনও গুপ্তসম্রাটকে ম্লেচ্ছসেনার সম্মুখীন হইতে হয় তখন এই আভীরসেনা তাঁহার কাজে আসে। আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর বলিতেছি ভট্ট, দেবপুত্রের সৈন্যের সঙ্গে যদি কাহারও মিত্রতা হইতে পারে তবে তাহা গুপ্তদের এই আভীরসেনারই হইতে পারে। কান্যকুব্জের সেনা দেবপুত্রের পক্ষে ভারই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আপনি আমার কথা তো বুঝিতে পারিতেছেন, না ভট্ট?'

আমি বিনীতভাবে মাথা নাড়িলাম। লোরিকদেব আবার বলিলেন—'সমস্ত আর্যাবর্ত রক্তকর্দমে পিচ্ছিল হইতে যাইতেছে, কান্যকুব্জের কুটিল নীতি এই সময়ে এই দেবভূমিকে মহতী বিনষ্টি হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। আমি কোনও অভিমানের বশে কিছু বলিতেছি না। সমস্ত দেশের কল্যাণের জন্য আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি। ভট্টিনীকে কান্যকুব্জের রাজার হাতে কখনও পড়িতে দিবেন না।' এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি আমার দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমি নম্র অথচ দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলাম—'আভীররাজ, আপনার স্পষ্ট ও উদার পরামর্শের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। সারা জীবন উচ্ছৃঙ্খল অনড্বানের মত খেয়ালে কাটাইয়াছি। আমার না আছে কূটনীতির জ্ঞান, না আছে যুদ্ধবিগ্রহের সহিত পরিচয়। আমি প্রমাদ ও অবস্থাবৈগুণ্যে রাজনৈতিক চক্রান্তের মধ্যে ফাঁসিয়া গিয়াছি। কিন্তু আপনি এইটুকু বিশ্বাস করিবেন যে আমার হাত হইতে ভট্টিনীকে কালও টানিয়া লইতে পারিবে না। ভট্টিনী যেখানেই থাকুন রানী হইয়াই থাকিবেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার অন্তঃপুরেই আমি তাঁহাকে স্বতন্ত্র রানী বলিয়াই মনে করি।' লোরিকদেব হাসিলেন। সে হাসির স্পষ্ট তাৎপর্য, তুমি বড় নির্বোধ। কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। অল্প ক্ষণ মৌন থাকিয়া তিনি বলিলেন—'আমি নিজের দশসহস্র মল্ল ভট্টিনীর সেবার জন্য দিয়া দিতেছি। উনি তাহাদের যে ভাবে চাহেন সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। আমি চাই যে উহারাই পুরুষপুর পর্যন্ত দেবপুত্রনন্দিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। এ প্রস্তাবে আমার নিজের কোনও স্বার্থ নাই। যদি কিছু স্বার্থ থাকে তবে তাহা হইল এই যে আমি গুপ্তদের শত্রুর স্কন্ধে এই পবিত্র ভূমির রক্ষার ভার দিতে চাহি না; আমি তাহাদের আর কোনও কার্যেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। গুপ্তসম্রাট্ তাঁহাদের সঙ্গে কথা রাখিতে দিয়াছেন, তাহা রক্ষা করা আমার কর্তব্য। ভাবিয়া দেখুন ভট্ট, সমস্ত দেশের কল্যাণ ইহাতে আছে কিনা।'

আমি সত্যই বড় চিন্তায় পড়িলাম। কুমার কৃষ্ণকে কি উত্তর দিব? ইহাও কি সম্ভব যে কান্যকুব্জের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এত বিরাট্ সৈন্যবাহিনী বাহির হইয়া যাইবে, অথচ সংঘর্ষ হইবে না? আর সংঘর্ষ হইতে কি সর্বনাশের পথ আরও প্রশস্ত হইয়া যাইবে না? ভট্টিনীর ভবিষ্যৎও কি অনিশ্চিত হইয়া যাইবে না? লোরিকদেব সরল, কিন্তু মহারাজাধিরাজের বিষয়ে উনি কিছু ভুল কথা বলিয়া গিয়াছেন। ষষ্টি বৎসরের বদ্ধবৈর সহজে শিথিলও তো হয় না। উপায় কি?

আমি সবিনয়ে উত্তর করিলাম যে আমাকে ভট্টিনীর অনুমতি লইবার সুযোগ দেওয়া হউক। লোরিকদেব প্রসন্ন হইয়া অনুমতি দিলেন।

লোরিকদেবের বিশ্রামকক্ষ হইতে যখন বাহিরে আসিলাম, তখন আমার মস্তিষ্ক নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিল। স্পষ্টই দেখিতেছিলাম, আর্যাবর্তের পবিত্র দেবভূমি নরকংকালে পরিপূর্ণ শ্মশান হইতে যাইতেছে। এই সর্বনাশের পথ বন্ধ করিয়া দিবার যে অস্ত্র বিধাতা সংযোগ ও ভাগ্যের ফলে আমার হাতে দিয়া দিয়াছেন তাহা প্রয়োগের ব্যাপারে আমি যে একেবারেই অনভিজ্ঞ তাহা প্রমাণ হইয়া যাইতেছে। একে একে অতীতের সমস্ত ঘটনা মনে পড়িতে লাগিল, নিপুণিকার সহিত হঠাৎ দেখা হওয়া, ছোট মহারাজার অন্তঃপুরে স্ত্রীবেশে গিয়া ভট্টিনীর উদ্ধারসাধন, ঘটনাচক্রে ভদন্ত ও অবধূতের সহিত সাক্ষাৎ, এবং কুমার কৃষ্ণবর্ধনের সহিত পরিচয়। এসব কি পূর্বচিন্তিত বিধির বিধান? এত সব ঘটনা কি করিয়া একত্র হইল? এ বড় বিচিত্র কথা! মনে হইতেছিল ইহা বুঝি কোনও নিপুণ কবির রচিত আখ্যায়িকা। অবধূত-পাদ প্রথমদিনই আমার সমগ্র অস্তিত্ব ভরিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে ভট্টিনীই আমার দেবতা। আজ ঘটনাচক্রে আমার সিদ্ধিই সাধন হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতেও কোনও আলোক রেখা দেখিতেছিলাম না, কিন্তু সিদ্ধিকে সাধন মনে করা তো অপরিণত চিত্তের অপরিপক্ক কল্পনা। ইহাকে রূপ গ্রহণ করিতে দিলে প্রমাদ হইবে। ইহাতে সমস্ত সংসারের কল্যাণ হইতে পারে কিন্তু আমার সর্বনাশ নিশ্চিত। একদিকে আর্যাবর্তের কল্যাণ, অন্য দিকে আমার সর্বনাশ। কোনটি বাছিব? অবধূত অঘোরভৈরবের কথা মনে পড়িল, তিনি বিরতিবজ্রকে বলিয়াছিলেন -'দেখ বিরতি, সত্য অবিভাজ্য। তোমাদের বৌদ্ধদার্শনিকেরা সংবৃত সত্য (ব্যবহারিক সত্য) আর পরমার্থ সত্য বলিয়া তাহা বিভক্ত করিবার দম্ভে ঘুরিয়া বেড়ায়, যেন এই দুইটি পরস্পরবিরোধী। যাহা আমার সত্য, তাহা যদি বস্তুতঃ সত্য হয় তাহা হইলে উহা সমস্ত জগতের সত্য, ব্যবহারের সত্য, পরমার্থের সত্য, ত্রিকালের সত্য।' অবধূতপাদের একথা বলিবার তাৎপর্য কি হইতে পারে? একটা কথা আমি হস্তামলকের মত স্পষ্ট দেখিতেছিলাম। আমি নিজের সত্যকেই কার্যে পরিণত করিতে পারি, সমস্ত জগতের কল্যাণ যে চাহিলেও নিজের ভিতরে আনিতে পারি না। ভট্টিনীকে আমি রাজনীতির ক্রীড়নক হইতে দিব না। ভট্টিনী আমার রাজরাজেশ্বরী, তাঁহার সামনে মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষই বা কি, আভীররাজ লোরিকদেবই বা কি? আমার কর্তব্য তো একই। রাজরাজেশ্বরীর অকুণ্ঠ সেবা। প্রাণ থাকিতে কাহাকেও এই কর্তব্যের পথে বাধা দিতে দিব না। আজ আভীররাজ যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমার কর্তব্যের কি কোথাও বিরোধ আছে? তাহাও তো দেখা যাইতেছে না। কুমার বলিয়াছিলেন, 'যেমন করিয়াই হউক, ভট্টিনীকে এখানে লইয়া আসুন।' আমি ভট্টিনীকে রাজরাজেশ্বরী করাইয়া

লইয়া যাইব, এক সহস্র আভীর-অস্ত্র তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তাঁহার ইঙ্গিতমাত্র তাহারা নিজ নিজ প্রাণ আহুতি দিবে—ইহাতে বিরোধ কোথায়? ভট্টিনীর সেনা কান্যকুব্জের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে, ইহাতে যে বাধা দিবে সে আমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয়তো আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিব। আমি মরিয়া গেলে ভট্টিনীর কি হইবে? ধিক্ ভণ্ড বাণ! আবার তুমি নিজেকে ভট্টিনীর রক্ষক বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিলে! ভট্টিনী সিদ্ধি, তাঁহার সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিবারই তোমার অধিকার।

এই প্রকার শত শত চিন্তায় হাবুডুবু খাইতেছি এমন সময় পিছন হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে সম্বোধন করিল—'আর্য, আমাদের ভুলিয়াই গিয়াছেন!'

পিছন ফিরিয়া দেখি, মৌখরিবীর বিগ্রহবর্মা। শ্রদ্ধাতিশয্যে সে ঝুঁকিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। আমি আশীর্বাদ দিয়া তাহার ও তাহার সৈনিকদের কুশলসংবাদ জানিতে চাহিলাম। সে যথোচিত উত্তর দিয়া বলিল—'আর্য, আভীরসেনার দশসহস্র মল্লের দিকে চাহিয়া মৌখরিদের দশজন সৈনিককে উপেক্ষা করা উচিত হইবে না। আমরা মহারানী রাজশ্রীর অকিঞ্চন সেবক, কিন্তু যদি কেহ চক্ষু রক্তবর্ণ করে তাহা হইলে আমরা তাহার উপযুক্ত উত্তর জানি। অত্যন্ত কষ্টে আমাদের সৈনিকেরা আপনার আদেশের অপেক্ষায় নিজেদের সংযত রাখিয়াছে, না হইলে যখন আমরা সংবাদ পাইলাম যে আভীররাজ কান্যকুব্জেশ্বরকে গালি দিতেছেন তখন সেইখানে রক্তের নদী বহিয়া যাইত। আর্য, আমরা মন্ত্র ও ওষধিতে রুদ্ধবীর্য কালসর্পের মত সময় কাটাইতেছি। আদেশ পাইলে এই দশটি লোল সর্পজিহ্বা ভদ্রেশ্বরের মদগর্বিত সৈনাদের খাইয়া ফেলিবে।' এই পর্যন্ত বলিয়া বিগ্রহবর্মা কোষ হইতে তাহার বিকরাল তরবারি বহির করিল।

আরও বিপদ! আমার মাথায় শ্রমবিন্দু দেখা দিল। বিগ্রহবর্মাকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—'হে নরব্যাঘ্র! এখন ছোট ছোট কথায় শক্তিক্ষয় করা উচিত নয়। মৌখরিগুরু আচার্য ভর্বুপাদের শপথ-যুক্ত পত্র পড়িয়াছ তো? দুরন্ত ম্লেচ্ছবাহিনী গিরিসংকটের ওপারে একত্র হইতেছে, সেখানেই হইবে মৌখরিদের বীর্যপরীক্ষা। তুমি এখন কান্যকুব্জেশ্বরের নির্দেশে নিখিল রাজরাজেশ্বরী দেবপুত্রনন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হও। যতক্ষণ তোমাদের পুনরায় অন্যত্র নিযুক্ত করা না হয় ততক্ষণ তোমাদের উঁহা রক্ষা করা ছাড়া আর কোনও কর্তব্যই নাই। আভীরসেনা এই কার্যে তোমাদের সাহায্যই তো করিবে। দেখ নরবীর, আর্যাবর্তকে সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে

হইবে। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য নিজেকে বলি দাও; বলি দিবার এমন সুযোগ আর মিলিবে না।' বিগ্রহবর্মা নত হইয়া প্রণাম করিল। তাহার তরবারি কোষবদ্ধ করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল—'সকলের চেয়ে মহান উদ্দেশ্য হইল অন্নদাতার সম্মানরক্ষা। কিন্তু আপনার আদেশই আমার পালনীয়। শুধু এইটুকু ভুলিবেন না যে ভট্টিনীর রক্ষার প্রধান ভার আমার উপর।' বিগ্রহবর্মা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

তখন আকাশের পশ্চিম দিগন্ত লাল হইয়া আসিয়াছিল, এক আধখানি বিচ্ছিন্ন মেঘ সেই গাঢ় লালিমাতে সর্বাঙ্গলিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, যেন মহাকাল তাঁহার অকুণ্ঠ ইঙ্গিতে ইহাই বলিতে চাহিতেছিলেন যে আর্যাবর্তের বিচ্ছিন্ন প্রযত্ন এই প্রকার রক্তধারায় মাথা পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। অস্তায়মান সূর্যের দুই চারিটি কিরণ দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া ভুল হইতেছিল, বুঝি বা উহা রক্তস্নান হইতে সদ্য বিনির্গতা মহাকালিকার নৃত্যকালে বিকীর্ণ জটা; সমস্ত আকাশ উদ্‌গতধূম্র অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলিতেছিল, বৃক্ষগুলির উচ্চশাখার উপরে খণ্ডীকৃত লোহিত বর্ণের দীপ্তি ভয়ঙ্কর আশঙ্কা উৎপন্ন করিতেছিল, যেন আগুনের ভয়ে পলায়মানা বনদেবীদের চরণের অলক্তকেরই সেই লালিমা। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত এই রক্তিম শোভা না জানি কোন ভীষণ ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে, ত্রিপুর-ভৈরবীর এই ধ্বংসলীলার সাক্ষী কি আমিই হইতে যাইতেছি? ভবিষ্যতে কি হইতে চলিয়াছে?

সপ্তদশ উচ্ছ্বাস

নিপুণিকার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া আমি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। উহার সঙ্গে যে সব দিন একত্র কাটাইয়াছি তাহা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। প্রথম যখন ও আমার নিকটে আসে তখন ওর বয়স বড় জোর ষোল বৎসর হইবে। সে খুব ভয় পাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। আমার সম্মুখে আসিয়া সে এমন ভয় ও লজ্জা পাইয়াছিল যে না পারে তাকাইতে, না পারে কিছু বলিতে। সেদিন আমি উহার সঙ্গে কোনও কথা বলি নাই। উহাকে আশ্রয় দিলে বিপদের আশংকা ছিল, তবু আমি উহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম। সে খুব কাঁদিতেছিল। আমার তাহাকে দেখিয়া এত দয়া হইয়াছিল যে সেদিন সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতেই পারিলাম না। তখন ছিল মোহন বসন্ত ঋতু, সহকার-মঞ্জরীর কেশরে দিগন্ত ছিল পরিব্যাপ্ত, মধুপানে মত্ত ভ্রমর এখানে ওখানে

ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, পুষ্প ও পল্লবের ভারে বৃক্ষলতা ছিল অবনত, মলয়ানিলের মন্দ মন্দ হিল্লোল লতাগুল্মের পুষ্পস্তবকে ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল, মদমত্ত কোকিল অকারণেই মানবচিত্ত ঔৎসুক্যে কম্পিত করিতেছিল, বনভূমি লতার উন্মদনর্তনে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, শোভা ও সৌহার্দের এই পৃষ্ঠভূমিতে নিপুণিকার কাতর মুখ দেখা দিল। আমার মন সারাদিন হাহাকার করিতে লাগিল। উহার কিবা বয়স! এই সুকুমার বয়সে না জানি কোন্ মর্মন্তুদ দুঃখ এই কোমল বালিকাকে এমন সাহসিক কর্মে উদ্বুদ্ধ করিল! সেদিন আমি প্রথমবার অনুভব করিলাম, মনুষ্যের সামাজিক সম্বন্ধের মূলেই কোথাও মহা দোষ থাকিয়া গিয়াছে। সে দোষ কী? আমি অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা বুঝিতে পারি নাই। নিপুণিকা পরেও অনেক কম কথা বলিয়াছিল। সে যতটা অনায়াসে বলিয়া যাইত ততটা জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত মনে করিতাম। তখন হইতে তাহার সহিত আমার ঐরূপই ব্যবহার। প্রসন্ন হইয়া যখন কিছু বলিত তাহা শুনিয়া লইতাম। বেশি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও হইত না, সার্থকতাও কিছু থাকিত না। অতি করুণ অবস্থার মধ্যে আমি এইটুকু অনুভব করিলাম, স্ত্রীজাতির দুঃখ এত গভীর যে কথা তাহার দশম ভাগও বুঝাইতে পারে না; সহানুভূতির দ্বারা সেই মর্মবেদনার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। নিপুণিকা কাল বলিয়াছিল আমার দিব্য, আর্য, তুমি সত্য সত্য বল, আমার কি এমন পাপ চরিত্র যে জন্য আজীবন দুঃখের নিদারুণ অগ্নিকুণ্ডে জ্বলিতে থাকিব? নারী হইয়া জন্মিয়াছি, ইহাই কি আমার সকল অনর্থের মূল নয়? এই কথা কয়টির মধ্যে কি যে মর্মান্তিক দুঃখ তাহা আমিই জানি। নিপুণিকার মধ্যে এত গুণ যে সে সমাজ ও পরিবারের পূজার পাত্র হইতে পারিত, কিন্তু হয় নাই। এতদিন ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে আছি, তাহার চরিত্রে কোথাও আমি কোনও মলিনতা দেখি নাই। তাহার হাসিমুখ, সে কৃতজ্ঞ, মোহিনী, লীলাবতী—এসব কি দোষ? আমার মন বলিতেছিল, দোষ আর কোনও বস্তুতে আছে, যাহা এই সকল সদ্‌গুণকে দোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। সে বস্তু কি? নিশ্চয় কোনও প্রকাণ্ড অসত্য যাহা সমাজে সত্যের নামে বাসা বাঁধিয়া আছে। নিপুণিকার মধ্যে সেবার ভাব এত অধিক যে আমার আশ্চর্য মনে হয়। সে আমার সেবা এত প্রকারে ও এত মাত্রায় করিয়াছে যে তাহার প্রতিদান জন্মজন্মান্তরেও দিতে পারিব না। নিপুণিকা স্বয়ং আমাকে বলিয়াছে যে আমার প্রতি তাহার মোহ ছিল, আমার এক অসতর্ক হাসিতে তাহা বড়ই আহত হইয়াছিল। নিপুণিকার মত সেবাপরায়ণা, চারু-স্মিতা, লীলাবতী ললনার প্রতি যে পুরুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি উচ্ছ্বসিত না হইয়া উঠে, জড় পাষাণপিণ্ডের অধিক তাহার মূল্য নাই। নিপুণিকা

আমাকে যে দিন জড় বলিয়াছিল সে দিন তাহার মোহ কি সত্যই কাটিয়া গিয়াছিল? সে পূর্বে কখনও আমার প্রতি তাহার অনুরাগ দেখায় নাই, কিন্তু তাহার প্রত্যেক ভাবে ভঙ্গীতে, প্রত্যেক সেবার কর্মে এক নীরব উল্লাস সর্বদা ব্যক্ত করিত যে এই সকল ক্রিয়াকলাপের অত্যান্ত গভীরে অন্য কোনও বস্তু আছে। আজও সেই বস্তু যেখানকার সেখানেই আছে। শুধু তাহার উপরকার স্তরের ফেন দূরে হইয়া গিয়াছে। আজও তাহার হৃদয়মন্দিরের অতি নিভৃত কক্ষে কোনও দেবতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন যিনি নিশ্চয়ই আমার মৌনপূজাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আমার মনকে নিপুণিকার দর্শন একেবারেই উদ্বেল করিয়া তোলে নাই—একথা বলিলে অসত্য হইবে। আমি তাহার মানসী মূর্তির কতখানি আরাধনা করিয়াছি তাহা আমার অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু আমি তো আমার দৌড় জানি। ভগবান্ আমাকে সংযম করিবার শক্তি দিয়াছেন। হায়, নিপুণিকার জীবন দুঃখের আগুনেই জ্বলিয়া গেল। আমি তাহার কি সেবা করিতে পারি! আজ আমারই প্রাণরক্ষার জন্য সে সম্মোহনের প্রতিক্রিয়ার বলিবেদীর উপর নিজেকে আহুতি দিয়াছে। মনে হইতেছে যে সে ভট্টিনীকে তাহার পূর্ব আকর্ষণের কথা বলিয়া দিয়াছে, না হইলে ভট্টিনী কেন বলিলেন যে আপনার পা ছাড়াইয়া লইবেন না, ও শান্তি পাইবে। ছিঃ, কি লজ্জার কথা! আমার মন বলিতেছে যে নিপুণিকার মোহ এখনও কাটে নাই। কোথাও কোনও ফুলকি এখনও জ্বলন্ত রহিয়া গিয়াছে! হায়, এখন পর্যন্ত ও মুগ্ধাই আছে! আর আমি? আমি যখন নিজেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তখন করতলগত আমলকফলের মত স্পষ্ট বোঝা যায় যে আমার আরাধনা বন্ধ্যা হইয়া রহিয়াছে, ইহাতে কোথাও কোনও ফলফুলের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। প্রত্যেক কর্তব্যের কোন না কোন মানসিক উৎস থাকে। কেহ যশোলিপ্সায়, কেহ অর্থার্জনের ইচ্ছায়, কেহ ভক্তির কামনায় নিজের কর্তব্য নির্ধারিত করে। আমি আমার নাটকমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিলাম কেন? ছয় বৎসর ধরিয়া ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইলাম কেন? আমার এই কর্তব্যের কোনও মানস উৎস আছে কি? নিপুণিকার প্রতি কোনও মোহ আমার মনের ভিতরে থাকিয়া গিয়াছে কি? হায়, নিপুণিকা যখন বলিয়াছিল যে আমার ধূমায়িত হওয়া থামিয়া গিয়াছে, আমি এখন জ্বলিয়া উঠিব, তখন তাহার চিত্ত কতখানি উৎক্ষিপ্ত ছিল! ভট্টিনী তখন হইতে কোনও ব্যাকুল আশংকায় সংজ্ঞাহীন আছেন, তাঁহার বাষ্পলুপ্ত চক্ষু আমার সমস্ত সত্তা গলাইয়া ফেলিতেছে! এখানে আসার পর তিন দিন গেল, ইহারই মধ্যে আমি কত কি দেখিলাম। ভট্টিনী আজ বড় কাতর স্বরে বলিয়াছেন যে সৌরভহ্রদের নিকটবর্তী কোনও সিদ্ধ শিব মন্দিরে প্রণিপাত করিলে সম্মোহনের সমস্ত বিপদ নাকি

দূরে হইয়া যায়, তিনি এমন কথা শুনিয়াছেন। আমি যখন তাঁহাকে বলিলাম যে অবধূতপাদের দেওয়া ঔষধের উপর বিশ্বাস রাখাই কল্যাণকর, তখন তাঁহার বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল। আমি বেশি কিছু না বলিয়া সৌরভ-হ্রদে নিপুণিকাকে লইয়া যাইব বলিয়াই ভরসা দিয়াছি। ভট্টিনীর চোখে জল দেখিলে আমার অন্তস্তল যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়, অধরোষ্ঠ যেন শুকাইয়া যায়, মস্তক স্বেদে আর্দ্র হইয়া যায়, আর শ্বাসপ্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আমি কত অবশ!

ভট্টিনীর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখিতেছি। মনে হইতেছে একটা কিছু অঘটন ঘটিবার আশংকায় তাঁহার ভিতরটা শুকাইয়া গিয়াছে। সে মর্মন্তুদ আলোড়ন উপর হইতে একেবারেই দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কার্যেই এক প্রকারের অন্যমনস্কতা, মনের মধ্যে কোথাও উৎকণ্ঠার ঝঞ্ঝা অবশ্যই বহিতেছিল, যাহা তাঁহার সহজ ব্যবস্থিতবুদ্ধির ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিতেছিল। আমার নিকটে নিপুণিকার বিষয়ে যখনই তিনি কথা বলিতে আসিতেন তখনই মনে হইত তিনি বুঝি নিজের বক্তব্যই ভুলিয়া গিয়াছেন। খানিকক্ষণ নির্ণিমেষে আমার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভট্টিনীকে এতক্ষণ ধরিয়া নির্ণিমেষ ভাবে দেখিতে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। যখন আমি তাঁহার বক্তব্য জানিতে আগ্রহ দেখাইলাম, তখন তিনি এমন চমকাইয়া গেলেন, যেন কেহ কাঁচা ঘুমে উঠাইয়া দিয়াছে। সে সময় তাঁহার সৌন্দর্য হইল দেখিবার মত—'অযত্নবিস্রস্ত চিকুররাজির ভিতর সেই ঈষদার্দ্র মুখমণ্ডল শৈবালজালবেষ্টিত শীকরসিক্ত প্রফুল্ল শতদলের মত মনোহর মনে হইল। কিন্তু কাতরতার জন্য শিথিলিত ভ্রূ-লতা মনোজন্মা দেবতার ভগ্নচাপের মত ভীমকান্ত শোভা বিস্তার করিতেছিল। তাঁহার পাটল-কোণ অধর শুকাইয়া আসিয়াছিল, আর আমার মনে অদ্ভুত এক আশংকার ভাব উৎপন্ন করিতেছিল। ভট্টিনীর কপোল-পালিতে না ছিল উল্লাস, না ছিল বিকাশ, না ছিল কোনও স্ফূর্তি। সমস্ত বাহ্যবিকার যেন ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, সমস্ত অন্তঃস্ফুরণ অন্য কোনও গভীর কেন্দ্রে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই শোভার সরোবরে কোথাও তরঙ্গ নাই, চাঞ্চল্য নাই, ধরাতলের উপর শুধু এক গাম্ভীর্য অটুট ভাবে বিরাজ করিতেছে। হায়, সে কী এমন দুঃখ যাহা ভট্টিনীর অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে?

সৌরভহ্রদ[১] ভদ্রেশ্বর দুর্গ হইতে বেশি দূরে ছিল না। ভট্টিনীর ইচ্ছা জানিয়া আভীর-সামন্ত নিপুণিকার জন্য শিবিকা ও আমার জন্য অশ্বের

[১] সম্ভবত বর্তমানের সুরেহা ঝিল, বালিয়া জেলা, উত্তর প্রদেশ।

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচরও দিয়াছিলেন।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন এক প্রহর বেলা হইয়াছে। এই মনোহর হ্রদ দেখিয়া নিপুণিকার বড়ই আনন্দ হইল। আমারও ইহা দেখিয়া খুব শান্তি হইল। মনে হইতেছিল, প্রলয়কালে যখন সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলের সন্ধিবন্ধন স্খলিত হইয়া গিয়াছিল, তখন আকাশমণ্ডলই পৃথিবীর উপরে উল্টাইয়া এই হ্রদে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, অথবা পুনরায় আদিবরাহের দন্তে উদ্ধৃত ধরিত্রীর রন্ধ্রই বারিপূরিত হইয়া এই বিশাল সরোবরে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত সৌরভ হ্রদ নিজেই নিজের শোভার উপমা। এই ভীষণ জ্বালাবর্ষী গ্রীষ্মাতপের সময়ও উৎফুল্ল কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লার হৃদয়শীতলকরা শোভা বিচ্ছুরিত করিতেছিল, বিকশিত পুণ্ডরীকের মধুবিন্দু জলের উপর ছড়াইয়া ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকাশ্বারা হ্রদতলকে রঙ্গীন করিতেছিল, অলিকুলমালায় সৌগন্ধিক পদ্ম আচ্ছাদিত হইয়াছিল, পদ্ম-মধুপানমত্ত কলহংসবধূদের কোলাহলে সারা সরোবর মুখরিত হইতেছিল, উন্মদ সারসের কণ্ঠক্রেঙ্কারে বায়ুমণ্ডল বিদ্ধ হইতেছিল, বহু জলচরের চটুল সঞ্চারে তাহার তরঙ্গবীচিও বাচাল হইতেছিল, বায়ুলহরীতে আলোড়িত সরোবরের তরঙ্গমালা উপরে উঠিয়া উঠিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, আর দূর পর্যন্ত তাহা হইতে বিকীর্ণ শীকরবিন্দু হইতে বর্ষাকালের দৃশ্য উপস্থিত হইয়া যাইতেছিল। সমস্ত হ্রদ এমনভাবে সুগন্ধে পরিপূর্ণ ছিল যে থাকিয়া থাকিয়া ভ্রম হইতেছিল, কোথাও বুঝি স্নানাবতীর্ণ বনদেবীদের কেশলগ্ন পুষ্পের সৌরভেই এতখানি গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে নাই তো! শ্বেত কুমুদের মধ্যে শ্বেত কলহংস এমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছিল যে যতক্ষণ তাহারা তাহাদের প্রিয়তমাদের নিকটে ডাকিবার জন্য চীৎকার না করিয়াছিল ততক্ষণ তাহাদের উপস্থিতির সম্ভাবনাও জানা যাইতেছিল না। ঈষৎপাণ্ডুর কিঞ্জল্কসমূহ সরোবরটি আচ্ছাদিত করিয়া এমন কমনীয় শোভা বিস্তার করিতেছিল যে ছায়ারূপে অবতীর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের তরঙ্গধৌত অমৃতধবলিমা বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হইতেছিল, তটের উপান্তভাগে অবস্থিত বৃক্ষদের পল্লবপুটের বায়ু দিয়া বীজন করিবার পর সরোবরের তরঙ্গ এমন ভাবে খেলিতেছিল যে মনে হইতেছিল বুঝি জলদেবীদের অদৃশ্য শিশু লীলাপূর্বক সন্তরণ করিতেছে।[১] এই মনোরম সরোবর দেখিয়া উৎকণ্ঠিতের চিত্ত বিশ্রাম পাইতে পারে, বিরহীর হৃদয়ও শান্ত হইতে পারে, উন্মত্তের মস্তিষ্কও নির্মল হইতে পারে, উত্ত্যক্ত মনুষ্যও শান্তি পাইতে পারে। সুদূরপ্রসারিত

[১] তুলনীয়—কাদম্বরী কথামুখের পম্পাসরোবরের বর্ণনা

বনপনসের দল, বন্যবদরীদের গুল্ম, খদিরবৃক্ষের ঝাড়, তিন্তিড়ী তরুগুলি সরোবরের শোভা আরও বাড়াইতেছিল। যখন পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত উত্তপ্ত বায়ু অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে ত্রিলোকের সমস্ত আর্দ্রতা শুষ্ক করিয়া লইয়া যাইত আর দাবাগ্নি হইতেও অধিক ভীষণ হইয়া বনরাজির নীলিমা ভস্ম করিতে থাকিত, যখন বিকরাল ঝটিকায় উড্ডীয়মান ধূলিতে সারা আকাশ ধূসর হইয়া যাইত এবং প্রচণ্ড মার্তণ্ডের খরতর কিরণ পৃথিবী হইতে হরিৎ আভা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইত, সেই ভয়ংকর কালেও সৌরভহ্রদ তাহার চারিদিকের বনবৃক্ষগুলি নীল ও মসৃণ করিয়া রাখিত। এখানে আকাশ শরতের মেঘমুক্ত নভোমণ্ডলের কথা মনে করাইয়া দিতেছিল, উত্তপ্ত পশ্চিমবায়ু শিক্ষিত শার্দূলের মত নিজের স্বভাব ভুলিয়া গিয়াছিল। নিপুণিকার এই শোভা বড়ই মনোহর মনে হইতেছিল। সে প্রাণ ভরিয়া এই মন্দিরের মাধুরী পান করিল।

স্নানের পর যখন আমরা শিবমন্দিরের দিকে চলিলাম তখন হ্রদের শীকরসিক্ত বায়ু আমাদের মনপ্রাণ শীতল করিয়া দিল। মুহূর্তের জন্য ভ্রম হইল, বুঝি আমরা কৈলাসপাহাড়ে আসিয়া গিয়াছি! আহা, এই কি সেই বায়ু যাহা কৈলাসনির্ঝরের শীকর আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল, ভূর্জপত্র স্খলিত করিয়া দিয়াছিল, নন্দীব রোমন্থফেনের স্পর্শে নিজেকে ধন্য করিয়াছিল, হরজটাবিহারিণী ভগবতী মন্দাকিনীর জল পান করিয়াছিল, পার্বতীর কর্ণপল্লব আন্দোলিত করিয়াছিল, রুদ্রাক্ষের পুষ্পবেণুতে নিজেকে সুরভিত করিয়াছিল! নমেরুপল্লবের বীজনে যাহা মহাদেবের ক্লান্তি দূর করিয়া দিয়াছিল! সম্ভবতঃ এই শিবসিদ্ধ দেবায়তনে লোকসমাগম ক্বচিৎ কদাচিৎ হইত। দূর পর্যন্ত এই যে মরকত-হরিত বনরাজি বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা মনোহর হারীত পক্ষিগণের সুন্দর শব্দে রমণীয়, যাহার কুটমল সঞ্চরণশীল ভ্রমরদের নখরাঘাতে জর্জরিত, যেখানে আজও উন্মত্ত কোকিল বন্য সহকারের পল্লব ঠোকরাইতেছে, যাহা উন্মদ ভ্রমরব্যূহের মধুর গুঞ্জনে বাচাল হইয়া আছে, যেখানে অচকিত চকোর-তরুণ মরিচাঙ্কুরের স্বাদ লইতেছে, যাহার চম্পাদের পিঞ্জরপরাগে কপিঞ্জল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গেল; যেখানে ফলভারে নিপীড়িত দাড়িম্ববৃক্ষের নীড়ে কলবিঙ্কদম্পতী কেলিকলহে ব্যস্ত; যেখানে বন্য কপোত-পোত একে অন্যের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের নিজের ক্ষুদ্র পক্ষ হইতে কুসুমধূলি ঝাড়িয়া ফেলিতেছে; যেখানে শুকসারিকায় কর্তিত ফলের বল্কল বনভূমিকে সুরভিত করিয়া রাখিতেছে, যাহার অধিবাসী তরুণ মদমত্ত পারাবত তাহার পক্ষক্ষেপে পুষ্পস্তবকগুলি চারদিকে বিস্রস্ত করিতেছে—এই মধুর-মনোহর শোভার খনি বনরাজিতে মনুষ্যসঞ্চার খুবই কম বলিয়া মনে হইতেছে। ভগবান শূলপাণি

তাঁহার থাকিবার জন্য কেমন সুন্দর বন নির্বাচিত করিয়াছেন! নিপুণিকা আজ বড়ই প্রসন্ন, সে যেন উড়িয়া চলিতেছে। মনে হইতেছিল তাহার জীবন সার্থক হইল। হ্রদতট হইতে সিদ্ধায়তন পর্যন্ত হরিৎ তৃণশাদ্বলের এমন মনোরম আস্তরণ দেখিয়া বসিয়া পড়িবার বাসনা স্বাভাবিক। বড়ই আয়াসে আমি নিজেকে সংবরণ করিলাম। প্রথমে ভগবান শূলপাণিকে প্রণিপাত, পরে প্রদক্ষিণ, তাহার পরে অন্য কাজ। আমরা সোজা মন্দিরে গেলাম। চারটি স্তম্ভের উপর স্ফটিকের ক্ষুদ্রাকার মণ্ডপ, তাহার নীচে ত্রিলোকগুরু মহাদেবের চতুর্মুখী লিঙ্গ, মুক্তাধবল প্রস্তরে নির্মিত। নিপুণিকা ভক্তিগদ্‌গদ্ হইয়া সেই দিব্যমূর্তির চরণতলে সদ্য সদ্য উদ্ধৃত এগারটি আর্দ্র পদ্ম দিয়া প্রণাম করিল। মনে হইতেছিল, মদনবিরহবিধুরা স্বয়ং রতিদেবী বুঝি ত্রিনয়নের কোপ প্রশমন করিবার জন্য প্রণত হইয়াছে। নিপুণিকার রোমে রোমে কৃতজ্ঞতার জ্যোতি নির্গত হইতেছিল। মহাদেবের চরণে অর্পিত সেই জলবিন্দুস্রাবী কমলগুলি দেখিয়া আমার মন বিগলিত হইয়া গেল। উহারা ঊর্ধ্ববিপাটিত চন্দ্রদলের মত, তাণ্ডববিহারী মত্ত ধূর্জটির বিকট অট্টহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরার মত, তাণ্ডববিধ্বস্ত বাসুকি নাগের ফণাসকলের মত, পাঞ্চজন্য শংখের সহোদরের মত, ক্ষীরোদসাগরের হৃদয়পদ্মের মত, ঐরাবত-প্রদত্ত মুক্তাময় মুকুটের মত, মহাদেবের মূর্তির শোভা বাড়াইয়া দিল। তাঁহার সম্মুখে জানুপাতপূর্বক অবনতমস্তকে নিপুণিকা স্বর্গমন্দাকিনীর ধারার মত দ্রষ্টার মনে শত শত পবিত্র ঊর্মি সঞ্চালিত করিতেছিল। মহাদেবকে প্রণাম করিবার সময় আমার মন এই পবিত্রভাব মূর্তি, ভক্তির স্রোতস্বিনী, শ্রদ্ধার নির্ঝরিণী, অনুরাগের খনি, সেবার উৎসধারাকে নীরবে প্রণিপাত না করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রদক্ষিণ করিবার পর বহির্দ্বারদেশে নিপুণিকা স্থগিতবৎ, স্তব্ধবৎ, হৃতসর্বস্ববৎ পুনরায় একবার থামিল। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল, চক্ষু ছিল বাষ্পাকুল, মুখমণ্ডল ছিল পুলকিত, অনেকক্ষণ ধরিয়া সে চতুর্মুখী শিবমূর্তিকে কৃতজ্ঞনেত্রে দেখিল। পুনরায় ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিল। আমিও আমার অন্তিম প্রণাম নিবেদন করিয়া হ্রদতটের দিকে অগ্রসর হইলাম। সিদ্ধায়তনের অল্প দূরেই এক বিশাল বকুলবৃক্ষ ছিল। আমরা দুইজনে সেইখানেই কিছুক্ষণের জন্য বসিয়া থাকিলাম।

কতক্ষণ নীরব থাকিবার পর নিপুণিকাই মৌন ভঙ্গ করিল। বলিল— 'আর্য, আমার জন্মজন্মান্তর কৃতার্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, আমার হৃদয়ের জ্বালা শান্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাকে বার বার বলিয়াছি যে আমার জন্ম নিরর্থক নয়, আজ সে কথা যত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি পূর্বে কখনও ততটা বুঝি নাই। ঐ দূরে কমলিনীপত্রে শায়িত

নিশ্চল নিস্পন্দ বলাকা দেখিতেছি, আর মনে হইতেছে যেন মরকতপাত্রে রক্ষিত শংখশুক্তি! আমার মন আজ হইয়াছে সেইপ্রকার নিশ্চল, সেইমত নির্মল নির্বিকার।' আমি প্রসন্ন হইয়া বলিলাম—'অতিশয় প্রীত হইয়াছি নিউনিয়া, তোমার শান্তিতে আশ্বস্ত হইলাম।' নিপুণিকার চক্ষুতে ক্ষণিকের মধ্যে লীলার রেখা খেলিয়া গেল, বলিল, 'তোমার অপ্রসন্ন হওয়া উচিত ছিল ভট্ট, তুমি যদি ইহা শুনিয়া উদাস হইয়া যাইতে তো আমার চিত্তের কল্মষ আরও দূর হইয়া যাইত।' নিপুণিকার লীলাবতী মূর্তি মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া আসিল, তাহার অনুপম নেত্র স্মিতধারায় স্নান করিতে লাগিল। আমি তাহার এই কথার রহস্য বুঝিতে বুঝিতে বলিলাম—'আমার দীর্ঘ কালের ঔদাস্য কি তোমার বিকারকে থামাইতে পারিয়াছে নিউনিয়া! আজকার ঔদাস্যে কি বা গড়িবে, আর কি বা ভাঙ্গিবে!' নিপুণিকার পাণ্ডুর কপোল অনুরাগের লালিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার কুয়াসাভরা চোখে প্রেমবিকার তরঙ্গিত হইল, ললাট-পট্ট সাত্ত্বিক-ভাবে স্বেদযুক্ত হইল, সে এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকাইয়া চোখ নামাইয়া লইল। অল্পক্ষণ পরে সে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল—'হাঁ আর্য, তোমার ঔদাসীন্যই আমার পক্ষে মূল্যবান নিধি ছিল। আমি যখন তোমাকে উদাস দেখিতাম তখন ইহাই বুঝিতাম যে আমার জন্ম সার্থক, তুমি এই গন্ধহীন পুষ্পকে চরণ পর্যন্ত পৌঁছিতে দিতে অযোগ্য মনে কর নাই। সেই রাত্রে তোমার হাসি আমার হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু উহা ছিল আমার ভুল। তুমি নাটকমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া আমার বিকারকে সত্য করিয়া দিয়াছিলে। হায়, আমি কত দুর্লভ বস্তুতে লোভ করিয়াছিলাম! আমি ছিলাম তাহার অনুপযুক্ত। ছয় বৎসরের প্রায়শ্চিত্তে আমি সেই মোহ কাটাইতে পারিয়াছি। ভগবান পুরস্কার-স্বরূপ আবার আমাকে তোমার আশ্রয়ে আনিয়াছেন। কিন্তু যে বিকার সত্য তাহা কি করিয়া দূর হইবে? তুমি সেদিন অভিযোগের স্বরে বলিয়াছিলে, আর্য বেঙ্কটপাদের নিকট দীক্ষা লওয়ার কথা আমি তোমাকে বলি নাই কেন। ও দীক্ষা যে অসত্য ছিল, আর্য! যেদিন তোমাকে দেখি, সেইদিনই আমি উহা ভুলিয়া গেলাম। আমি চিত্তবিকারকে নারায়ণের চরণে অর্পণ করার সাধনায় ব্যর্থশ্রম হইলাম। সুচরিতা সফল হইয়াছে, সে ধন্য। কিন্তু তোমাকে পাইয়া আমি নিজের বিকারকেই সিদ্ধির সোপানরূপে গ্রহণ করিয়াছি; তথাপি ভট্ট, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লোভ হয়।' নিপুণিকার চোখে একই সঙ্গে লজ্জা ও আগ্রহের আবির্ভাব হইল। আমি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলাম—'কি জানিতে চাও, নিউনিয়া!' তাহার চক্ষু নত হইল, সরু সরু আঙ্গুল দিয়া এক দূর্বাদল খুঁটিতে লাগিল, আঁচলখানি অকারণেই সীমন্ত হইতে উপরে টানিল, আর গদ্‌গদভাবে বলিল—'তোমার ঔদাস্যের কোনও সুফল কি এই অভাগিনীর প্রাপ্য

ছিল, ভট্ট?' আমি আদর করিয়া উত্তর দিলাম—'অবশ্যই ছিল নিউনিয়া, আমি কি সত্য সত্যই জড় পাষাণ-পিণ্ড!' নিপুণিকার মুখমণ্ডল অনুরাগদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠস্বরের জড়িমা কাটিয়া যাইতেছিল। আমার প্রতি সজল নয়নে দেখিতে দেখিতে সে বলিল—'আমি কৃতার্থ আর্য, আমার নিষ্ফল জীবনের ইহাই পরম সার্থকতা। ইহার অধিক কিছুর জন্য আমার লোভও নাই, যোগ্যতাও নাই। আর্য, আমি বড়ই পাপিনী, কারণ অন্যের সুখে আমার ঈর্ষা হয়। আমি সেবাধর্মেও ব্যর্থ, নারীধর্মেও ব্যর্থ। হায়, তুমি যদি আমার পাপের জ্বালাপোড়া দেখিতে পারিতে। সৌরভেশ্বরকে দেখিয়া যদি এই পাপের আগুন শান্ত হইয়া যায় তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া যাই। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করিও আর্য।'

নিপুণিকা এসব কি বলিতেছে!

এক প্রহর দিন থাকিতে আমরা সেখান হইতে যাত্রা করিয়া, ভগবান মরীচিমালী তাঁহার লোহিত কিরণজাল সংবরণে কৃতকার্য হইবার পূর্বেই পুনরায় ভদ্রেশ্বর দুর্গে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভট্টিনী ব্যাকুলভাবে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বড়ই স্নেহে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদের শ্রম খানিকটা দূর হইলে ভট্টিনী আমাকে ডাকিয়া এক পত্র দিলেন। পত্রটি ছিল কুমার কৃষ্ণবর্ধনের। অতি সংক্ষেপে তিনি তাঁহার ভগ্নী কুমারী চন্দ্র-দীধিতিকে স্নেহসম্ভাষণ জানাইয়াছেন, এবং মহারাজাধিরাজের এই কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে তিনি তাঁহার অপরিচিতা ভগিনীকে অভ্যর্থনা করিয়া ধন্য হইবেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন যে, যে শর্তেই ভট্টিনী আসিতে চাহেন সেই শর্তেই তাঁহাকে আনা হউক। ইহা পড়িয়া আমার আশ্চর্য লাগিল যে কুমার আভীররাজকেও সকল প্রকারে প্রসন্ন করিয়া অনুকূল করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিয়া দিয়াছেন যে গিরিসংকটের পরপারে যে ম্লেচ্ছবাহিনী একত্র হইয়াছে তাহা বর্ষাকাল কাটিতেই পিপীলিকার সারির মত নামিয়া আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিবে, তাহার গতি কেবল আভীরসেনাই রোধ করিতে পারে। তাঁহার প্রিয় ভগিনী কুমারী চন্দ্রদীধিতির নিকট তাঁহার অনুরোধ এই যে তিনি আভীররাজকে যেন তাঁহার সৈন্যদল এই পুণ্যকর্মে নিয়োগ করিতে বলেন। আমাকে তো স্পষ্টই লিখিয়াছেন, যদি আভীররাজ সামন্ত হইতে সম্মত না হন তাহা হইলে তাঁহাকে মিত্ররাজার রূপেই নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। সর্বশেষে অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া তিনি ইহাও লিখিয়া দিয়াছেন যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (তখনকার দিনে কাশীতে মীমাংসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত) উড়ুপতি ভট্টকেও অবশ্য যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।

উপসংহারে ইহা লিখিতেও ভুলেন নাই যে কুমারীকে যে পাওয়া গিয়াছে এই সংবাদ দেবপুত্রের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং আচার্য ভর্বুপাদই কুমারীকে দেখিবার জন্য দুই চার দিনের ভিতরে উপস্থিত হইতে পারেন, এইজন্য ভদ্রেশ্বর হইতে প্রস্থান করিতে দেরি যেন না হয়। শেষকালে তিনি ভগিনী কুমারী চন্দ্রদীধিতির স্নেহভালবাসা পাইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন। সমস্ত পত্রখানি কূটনীতির বিচিত্র জাল। কেহই বাদ যায় নাই, প্রত্যেককেই ফাঁসাইবার চেষ্টা আছে, আর তাহাও ওজন-করা ভাষায়। কোথাও উচ্ছ্বাস নাই। অধিকন্তু লেখকের সহৃদয়তা ও উদারভাব প্রতিটি শব্দ হইতে দেখা দেয়। পত্রখানি পড়িয়া আমি বেশ চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। এমন না হয় যে আবার কোনও জালে আটকাইয়া পড়ি। এখন আমি কিছু সাবধান হইয়া গিয়াছিলাম।

ভট্টিনী খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করিবার পর বলিলেন—'কি ভাবিতেছেন ভট্ট?' আমি তাঁহার দিকে তাকাইলাম। বলিলাম—'দেবি, ভট্টিনী, আপনার আদেশই আমার পালনীয়। আমি শুধু ভাবিতেছি আবার কোনও জালে না ফাঁসিয়া যাই।' নিপুণিকা আমাকে তিরস্কারের সুরে বলিল—'কেমন জাল, ভট্ট, স্পষ্ট কথাকে তুমি অস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছ। আভীররাজের সেনার সঙ্গে ভট্টিনী স্বাধীন-রাজ্যের রানীর মত ফিরিবেন। মহারাজাধিরাজের আগ্রহ থাকিলে একশত বার ভট্টিনীকে দর্শনের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আসিবেন। ভট্টিনীর মর্যাদার বিরুদ্ধে পাতাটি নড়িলেও রক্তনদী বহিয়া যাইবে। আর কেহ না মরিলে অন্তত তুমি আমি তো অবশ্যই এই কার্যে বলি হইয়া যাইব। ইহাতে ভয় কোথায়? আমি ভট্টিনীর মর্যাদার কষ্টিপাথর হইয়া চলিব। তুমি প্রাণ দিতে পশ্চাৎপদ হও কেন?' আমি শান্তভাবে বলিলাম—'মরা দরকার হইলে বাণভট্ট অবশ্যই মরিবে, কিন্তু তাহার পূর্বে কেন মরে?' ভট্টিনী যেন কিছু শোনেনই নাই। বলিলেন—'যদি স্থান্বীশ্বর যাইতেই হয় তো চলুন। বিলম্বে প্রয়োজন কি? যদি আচার্য ভর্বুপাদ সেখানে পৌঁছিয়া থাকেন তবে অবশ্যই এদিকে চলিয়া আসিবেন। তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার বড়ই কষ্ট হইবে। আভীররাজের একসহস্র সৈন্য এখন পর্যাপ্ত। কুমার আমার ভাই, তাঁহার স্নেহ আমার অমূল্যনিধি, কিন্তু তাঁহার রাজাদেশ আমার পক্ষে মাননীয় নয়। আমি আভীর-রাজকে কোনও কথাই বলিতে প্রস্তুত নহি। তিনি আমার উপর যে কৃপা করিয়াছেন তাহা কেবল তিনিই করিতে পারেন। তিনি নিজের কর্তব্য নিজেই নির্ণয় করিয়া লইবেন।' ভট্টিনীর এই দ্বিধাহীন, সংকোচহীন, স্পষ্ট আদেশে আমার দেহে যেন প্রাণ আসিল। আজ পর্যন্ত ভট্টিনী এত স্পষ্ট আদেশ এত স্পষ্ট ভাষায় কখনও দেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার কর্তব্য স্থির করিয়া

লইয়াছেন। কিন্তু এই কর্তব্যের উৎস কি? ভট্টিনী আমাকে দ্বিধা ও অসামঞ্জস্য হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহা স্থির করিয়াছেন, না তাঁহার দুঃখদগ্ধ হৃদয়ে পিতৃদর্শনের উৎকণ্ঠা প্রবল হইয়াছে? এপর্যন্ত ভট্টিনীর আদেশ 'আদেশের' মর্যাদা পাইবার যোগ্য হইত না, তাহাতে থাকিত এক প্রকার দীনতার ভাব। এবার উহাতে প্রভুতা আছে, মর্যাদাজ্ঞান আছে, সংকল্পের চিন্তা আছে। এই কুসুমকোমল হৃদয় কত গম্ভীর! কোথায় আছ মহাকবি, তুমি তোমার কল্পনার দৃষ্টিতে পার্বতীর যে শুভ্রবেশ দেখিয়াছিলে, তাহার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ আজ পৃথিবীতে বিরাজমান। সৌকুমার্যের আর গাম্ভীর্যের এমন মণিকাঞ্চন-যোগ কোথায় পাওয়া যাইবে? আজ নারায়ণের কল্যাণভাবনা, মহাদেবের তপোনিষ্ঠা, দেবরাজের ঐশ্বর্য, সুরগুরুর নির্মল মনীষা, মদনদেবতার জয়-লালসা, পার্বতীর দৃঢ়মানিতা আর সরস্বতীর সম্পূর্ণ শুচিতা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভট্টিনী আজ আর্যাবর্তকে ত্রাণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ নিরীহ প্রাণীর জন্য মমতা তাঁহার নবনীতকোমল হৃদয়কে অবশ্যই গলাইয়াছে। উপর হইতে একটুও ধূম দেখা যাইতেছে না, কিন্তু এই অতল গম্ভীর হৃদয়ে অবশ্যই হাহাকারের জ্বালা জ্বলিতেছে। ভট্টিনী স্থান্বীশ্বরে যাত্রা করিতে প্রস্তুত!

স্থান্বীশ্বর! এখানেই সেই ভণ্ড রাজকুল, যেখানে ভট্টিনীর মত শত শত তরুণীকে মনুষ্যের পাশবতার সম্মুখে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ভট্টিনী সেখানেই পুনরায় যাইতেছেন! তাঁহার অঙ্গের প্রতিরোমে কি সেই লম্পট রাজকুল ভস্ম করিয়া দিবার মত আগুন বাহির হইতেছে না? কোথাও না কোথাও সেই জ্বালা তো অবশ্যই আছে। ভট্টিনী অত্যন্ত গম্ভীর, হয়তো তিনি আমাকে বেশি সমস্যার মধ্যে ফেলিতেও চান না, কিন্তু তিনি কি এ বিষয়ে কিছুই ভাবিতেছেন না? নিপুণিকা যে বার বার মরিতে চায় তাহা কি জন্য? ইহাই কি তাহার রহস্য? বাণভট্ট এই ছোট রাজবাড়িকে কখনও ক্ষমা করিবে না। কুটনীতির কুটিল ভুজঙ্গীও তাহাকে নিজের স্পষ্ট কর্তব্যের পথ হইতে দূরে হটাইতে পারিবে না। মদমত্ত ছোট রাজবাড়ি নিজকর্মের প্রতিফল অবশ্য পাইবে। স্থান্বীশ্বর যাত্রার এই এক মঙ্গলময় পরিণাম হইবে। ভট্টিনী কাল অবশ্যই সেখানে যাত্রা করিবেন।

এখন কিছু ভাবিবার নাই। বর্ষাকাল তো আসিবেই। যতক্ষণ আকাশ মেঘমালাতে, পৃথিবী নবীন জলধারায়, দিগ্‌বলয় বিদ্যুল্লতায়, বায়ুমণ্ডল বারিকণায় ভরিয়া না যায় ততক্ষণ যাত্রা নিরাপদ। শীঘ্রই মালতীফুল ফুটিবে, কদম্বের কেশর হইবে, কুমুদের কুটমল হইবে, ময়ূর নাচিতে আরম্ভ করিবে, মেঘ ও বিদ্যুৎ চোখ নাচাইতে শুরু করিবে। তখন ভট্টিনীকে শিবিকা ও

গোপকটের উপর দৌড় করানো উচিত হইবে না। এই শুভ অবসর, এখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। নিপুণিকার স্বাস্থ্য আমাদিগকে আরও চার পাঁচ দিন থামিতে বাধ্য করিল। নিপুণিকা যখন কিছু সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন দশহরার দিন এক সহস্র আভীরমল্ল দেবপুত্রনন্দিনীর জয়নিনাদে পৃথিবী কম্পিত করিল। ভট্টিনীর শিবিকা ঘিরিয়া দশজন মৌখরিবীরের করাল তরবারি চমকিয়া উঠিল। নিপুণিকার জন্য স্বতন্ত্র পালকি সজ্জিত করা হইল। বিগ্রহবর্মা তাহার নিজের আগ্রহে দেবপুত্রনন্দিনীর সর্বাপেক্ষা নিকটে থাকিবার অধিকার পাইল। ভট্টিনীর বিশালবাহিনী স্থান্বীশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল।

অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস

স্থান্বীশ্বর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ভট্টিনীর স্কন্ধাবার সজ্জিত হইল। কুমার কৃষ্ণবর্ধন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব যত্ন ও আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন যে মহারাজাধিরাজ দ্বারা যে উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে তাহাতে তিনি যোগ দিন, কিন্তু ভট্টিনী দৃঢ় শান্তকণ্ঠে অস্বীকার করিলেন। কেবল অন্যথা শংকা দূর করিয়া দিবার জন্য আমাকে উৎসবসভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিলেন। ভট্টিনী প্রসন্ন ছিলেন। কুমারের সঙ্গে কথাবার্তা হইয়া যাওয়ার পর তাঁহার মনের অনেক বিকার পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। ভট্টিনী একথা জানিয়া বড় প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে বাভ্রব্য কুশলে আছেন, আর মহারানী রাজ্যশ্রীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন। মনে হইতেছিল, ভট্টিনীর চিত্ত হইতে বুঝি এক দীর্ঘ শল্য বাহির হইয়া গিয়াছে। কুমার তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে ছোট মহারাজার সম্পত্তি রাজকোষে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং এই লম্পট সামন্ত ভট্টিনীর যেমন ইচ্ছা তেমন দণ্ড পাইবে। কুমার ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, 'মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনের ভগিনীর প্রতি অশিষ্ট আচরণের উচিত দণ্ড এই দুর্মদ সামন্তকে অবশ্য দেওয়া হইবে।' কুমার আসিয়া যাওয়ায় শুধু ভট্টিনী নয়, নিপুণিকাও আশ্বস্ত হইল। তিনি তাহার সহিত দেবপুত্রনন্দিনীর সখীর উপযুক্ত ব্যবহারই করিলেন। সব মিলাইয়া কুমার কৃষ্ণের জয় হইল। শিষ্টাচার ও মধুর ভাষণ তাঁহার অমোঘ অস্ত্র বলিয়া প্রমাণিত হইল। ভট্টিনী কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে কুমারের প্রতি চাহিলেন ও নীরব রহিলেন। তাঁহার সহজ ভাবে কুমারও প্রভাবিত হইলেন। ভাইভগিনীর এ মিলন অপূর্ব।

ভট্টিনীর মন ছিল প্রসন্ন; তাঁহার লাবণ্যময় মধুরচ্ছবি এই সহজ আনন্দের আভায় উৎফুল্ল মালতীলতার মত অভিরাম হইয়া গিয়াছিল। মানসিক আনন্দও কী অদ্ভুত রসায়ন! ভট্টিনীর শোভা আজ শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল—অধরের রক্তিমা আরও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, চোখের সেই স্নিগ্ধ শোভা যাহা তরুণ কেতকপত্রকেও লজ্জিত করিতেছিল তাহা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। মধুকপুষ্পের কলির সমান কপোলের মোহন কান্তি আরও মধুর হইয়া উঠিয়াছিল, কম্বু-বিড়ম্বনকারী গ্রীবার শোভা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আহা, বাতুল কবি বৃথাই কল্পনাজালে জড়াইয়া ছটফট্ করিতেছিলেন। তিনি আর কোথায় রমণীয়তার ভাণ্ডারের অধিদেবতাকে, সৌন্দর্যের মুগ্ধ নিকেতনকে, শোভার উদ্বেল সমুদ্রকে দেখিয়াছেন! ভট্টিনীকে প্রসন্ন দেখিয়া আমার প্রতি রোম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমার প্রসন্নতা দেখিয়া তিনিও হয়তো আনন্দ পাইয়া থাকিবেন। সে সময়ে বাহিরে কেহ গান করিতেছিল। ভট্টিনী আমাকে ডাকিয়া নির্বাক্‌মনোহর হাসি হাসিয়া বলিলেন—'আজ বড়ই প্রসন্ন যে ভট্ট!' প্রসন্ন তো বটেই। শক্তি থাকিলে ভট্টিনীর এই শোভার প্রতিমূর্তি নিজের হৃদয় গলাইয়া গড়িয়া লইতাম। অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া তিনি বলিলেন—'দেখুন তো, বাহিরে কে গাইতেছে!' আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আমি বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, দুইজন গৈরিকধারিণী ভৈরবী মধুর উদাস কণ্ঠে গাহিতেছেন আর আভীর সৈনিক মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছে। গান ছিল অপভ্রংশ ভাষায়। ভৈরবীরা গাহিলেন—

'অমৃতের পুত্রগণ, নগাধিরাজ হিমালয়ের শীতল বক্ষে আজ চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে। কেহ কি জানে পার্বতীগুরুর হৃদয়ে আজ এত ব্যাকুলতা কেন? যুবকগণ, প্রত্যন্ত দস্যু আসিতেছে।

সমুদ্রগুপ্তের প্রতাপ কি করিয়াছে, চন্দ্রগুপ্তের রণহুঙ্কার কি করিয়াছে, মৌখরিদের দুর্দান্ত বাহিনী কি করিয়াছে? ম্লেচ্ছগণ এখনও জীবিত। অমৃতের পুত্র, প্রত্যন্ত দস্যু আসিতেছে!

আর্যাবর্তের তরুণগণ, বাঁচিতে শেখ, মরিতে শেখ, ইতিহাস হইতে শিক্ষা কর। আর্যাবর্ত সর্বনাশের দ্বারে দাঁড়াইয়া। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

রাজাদের উপর ভরসা রাখা ভুল, রাজপুত্রদের সেনাদের মুখ তাকাইয়া থাকা কাপুরুষতা। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

সমস্ত আর্যাবর্ত এক—এক সমাজ, এক প্রাণ, এক ধর্ম। দেশরক্ষা সকলের সমান ধর্ম। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

সেই দেবপুত্রের আশা ছাড়ো, যিনি সামান্য শোকের আঘাতে মূর্ছা যান।

যে আধারের উপর দাঁড়াইতে যাইতেছ, তাহা দুর্বল। সাবধান যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

অমৃতের পুত্রগণ, এই সব রাজাদের মধ্যে লম্পটতা বাড়িয়া গিয়াছে, ইহাদের অন্তঃপুর নির্যাতিত বধূদের ক্রন্দনে পূর্ণ। রাজশক্তির মূলেই ঘুণ লাগিয়াছে। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

অমৃতের পুত্রগণ, ঝড়ের মত বহিয়া যাও, তৃণের মত ম্লেচ্ছবাহিনীকে উড়াইয়া লও। সংকটের ভয়ে কাতর হওয়া তারুণ্যের অপমান। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

ঐ দেখ, অশ্রুপূর্ণচক্ষে কুলবধূরা তোমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহাদের সৌভাগ্য তোমাদের হাতে। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

ঐ দেখ, মাতারা তোমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন, ঐ দেখ, স্তন্যপায়ী শিশুরা তোমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। থামিও না, যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

তোমাদের মাতৃস্তন্যের শপথ, কুলবধূদের শপথ; স্তন্যপায়ী শিশুদের শপথ। ওঠ, ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

কে আছে যে আর্যাবর্তকে হাহাকারের দুর্দশা হইতে বাঁচাইবে?—কোনও দেবপুত্র নয়, কোনও রাজাধিরাজ নয়, কোনও মহাসামন্ত নয়। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

তবে আর কে আছে যে আর্যাবর্তকে হাহাকারের দুর্দশা হইতে বাঁচাইবে?— আর্যাবর্তের যুবকেরা। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

অমৃতের পুত্রগণ, মরণযজ্ঞের আহুতি হও। মাতাদের জন্য, ভগিনীদের জন্য, কুলললনাদের জন্য প্রাণ দিতে শেখ। ওঠ যুবক, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

অমৃতের পুত্রগণ, মৃত্যুর ভয় মিথ্যা, বাঁচিবার জন্য মর, মরণের জন্য বাঁচ, নগাধিরাজ তোমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

মহামায়া তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। মহামায়া তোমাদের মাতা, মাতার মান রক্ষা কর, লজ্জা হইতে বাঁচাও। অমৃতের পুত্রগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

বীরগণ, মহামায়ার ত্রিশূলের শপথ, ম্লেচ্ছবাহিনীর ছায়াও যেন এই দেশের উপর না পড়িতে পায়। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।

অমৃতের পুত্রগণ, মৃত্যুর ভয় মিথ্যা, কর্তব্যে প্রমাদ করা পাপ, সংকোচ ও দ্বিধা অভিশাপ। যুবকগণ, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে।'

গানশেষ হইল। ভৈরবীরা উল্লাসের সহিত তাহাদের ত্রিশূল লুফিতে লুফিতে বলিল—'জয়, আর্যাবর্তের তরুণদের জয়! মহামায়া মাতার জয়!'

এক সহস্র গম্ভীর কণ্ঠে আভীরসেনারা প্রতিধ্বনি করিল—'মহামায়া মাতার জয়!' ভৈরবীরা পুনরায় গাহিল—

'ঐ সহস্রফণা অজগরের নিঃশ্বাসের মত কে গর্জন করিতেছে?—ইহা উত্তাল সমুদ্র নয়, বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘ নয়—ইহা হইল আর্যাবর্তের তরুণদের দূরগামী বাহিনী।

'কে আছে যে ইহার গতি রোধ করিতে পারে, কে আছে যে ইহার তরঙ্গাবর্তে ডুবিয়া না যায়, কে আছে যে ইহার ভীমবেগে না ভাসিয়া যায়—ইহা হইল আর্যাবর্তের তরুণদের দূরগামী বাহিনী।

অমৃতের পুত্রগণ, কুলবধূদের সৌভাগ্য তোমাদের হাতে, বালিকাদের লাজ-লজ্জা তোমাদের হাতে, বৃদ্ধদের মান তোমাদের হাতে—ইহাই হইল আর্যাবর্তের তরুণদের দূরগামী বাহিনী।'

আর একবার মাতা মহামায়ার জয়ধ্বনি হইলে ভৈরবীরা নীরবে চলিয়া গেল। আভীর-সৈন্যেরা নিজেরা নিজেরাই জয়ধ্বনি করিতে করিতে বলিল—'ম্লেচ্ছ-বাহিনী এ দেশের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

আমার রক্তের মধ্যে এক বিচিত্র আলোড়ন হইল। আর্যাবর্তের নবযুবকদের উপর এক অপূর্ব বিশ্বাসে বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। রণচণ্ডিকা বিকট নৃত্য করিবেন। কিন্তু আর্যাবর্তের কিছুই নষ্ট হইবে না। মহামায়ার এই শিষ্যারা আর্যাবর্তকে মহান্‌ অনর্থ হইতে উদ্ধার করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে। নারীর কোমল কণ্ঠে কি অদ্ভুত শক্তি, এই ওজস্বী সংগীতও এই কোমলকণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া শতগুণ প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। যখন তাহাদের কোমল কণ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইয়া ডাকিতে থাকিল—'তরুণেরা, প্রত্যন্ত-দস্যু আসিতেছে!' তখন মনে হইল বুঝি বায়ুমণ্ডলের প্রত্যেক স্তর কাঁপিয়া উঠিতেছে, আকাশের প্রতিটি কোণ গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, দিগন্তরালের প্রত্যেক বিন্দু উচ্ছলিত হইয়া গিয়াছে, আর কোথাও ভয়ের লেশমাত্র নাই। আর্যাবর্তের তরুণেরা আজ কৃতার্থ, দেবমন্দির ও শস্যক্ষেত্র আজ নিরাপদ, স্ত্রী ও বালকেরা আশ্বস্ত—আজ জগতের অশেষ তারুণ্য আলোড়িত হইয়াছে।

ভট্টিনী মন দিয়া ভৈরবীদের গানের সার মর্ম শুনিলেন। তিনি অল্পক্ষণ পর্যন্ত অর্ধবিস্মৃত কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন বলিয়া দেখিলাম। আমার এমন মনে হইল যে তাঁহার বুঝি মহামায়ার গানের যে সব অংশে দেবপুত্রের কথা আছে সেই সব অংশ হইতে কষ্টবোধ হইয়াছে। ভট্টিনীর চিন্তা দূর করিবার জন্য বলিলাম—'মহামায়া মাতা অর্ধসত্যই পাইয়াছেন, দেবি, আর বাকি

অর্থ পাইলে বুঝিতে পারিতেন যে লজ্জাশীলার মত উদাসীনভাব কতখানি মহাশক্তির প্রচ্ছন্ন প্রকাশ।'

ভাট্টিনীর মুখের উপর ঈষৎ হাসির রেখা খেলিয়া গেল। এক অপূর্ব রসমাধুরী তাঁহার অধরে সহসা আবির্ভূত হইল, নয়নকোয়কে এক প্রকারের লীলালোল বিলাস চমকিয়া উঠিল, বলিলেন—'আপনিও তো ভট্ট সেই অর্ধসত্যে বঞ্চিত।' ভাট্টিনীর এই পরিহাসের অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কি উত্তর দিব, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সত্যই তো আমি সেই অর্ধসত্য হইতে বঞ্চিত। পিতার হৃদয়ে তাহার সন্তানের প্রতি যে মমতা, তাহা যে কত বড় শক্তি ইহা আমি শুধু অনুমানের বলেই তো জানিতে পারি। মহামায়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমার কি অধিকার আছে? ভাট্টিনী আমার দৌর্বল্য ঠিকই চিনিতে পারিয়াছেন। আমার সঙ্কোচে ভাট্টিনীর মুখ আরও প্রসন্ন হইয়া গেল। তিনি আবার বলিলেন—'আমি অন্য কথা ভাবিতেছিলাম ভট্ট। মহামায়া ঠিকই বলিয়াছেন যে রাজা ও রাজপুত্রের দিকে তাকাইয়া থাকিলে আর্যাবর্তের উম্ধার হইবে না। কিন্তু ইহাও অর্ধেক সত্য।'—ভাট্টিনী আবার চুপ করিয়া গেলেন, তিনি কিছু বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক আভিজাত্যের গুণে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি উৎসুকভাবে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার দৃষ্টি অবনত, গ্রীবা অবনমিত, অনবধানতা হেতু উত্তরীয়প্রান্ত সীমন্ত হইতে সরিয়া গিয়াছিল। ঘনকৃষ্ণ কেশপাশের মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল সীমন্ত রেখা এমন মনোহর দেখাইতেছিল যে মনে হইতেছিল বুঝি মন্দাকিনীর ধবলধারা, মুহূর্তের জন্য পার্বতীর চিকুররাজির মধ্যভাগে আসিয়াছে, আর আসিয়া পথই ভুলিয়া গিয়াছে। সেদিন কতই শুভ হইবে, যেদিন এই সীমন্তরেখার উপরে সিন্দূরের অরুণিমা দেখা দিবে, যেদিন এই প্রবল কবরী ভারের তিমিরকান্তি বালসূর্যকে বন্দী করিবে, যেদিন চন্দ্রমণ্ডলের উপরে ঊষার রেখা স্ফুরিত হইবে, যেদিন ঘনমসৃণ মেঘমালায় অচঞ্চল বিদ্যুল্লতা নিরন্তর চমকিতে থাকিবে। আহা, সেদিন কতই মঙ্গলময় হইবে! ভাট্টিনী তির্যক্ অপাঙ্গে দেখিয়া বলিলেন—'কি ভাবিতেছেন, ভট্ট!'

কি ভাবিতেছি!

ভাট্টিনী কিশলয়তুল্য রক্তবর্ণ অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার উত্তরীয়ের প্রান্ত সীমন্তরেখার উপর টানিয়া লইলেন, আর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—'একটা কথা বলি ভট্ট, আমার জন্ম রোমকপত্তনের উত্তরবর্তী অস্ত্রীয়বর্ষে হইয়াছিল, আমি সেখান হইতে পুরুষপুর পর্যন্ত পিতার কোলেই বাড়িয়াছি। আমি অনেক দেশ দেখিয়াছি, অনেক সমাজ দেখিয়াছি, অনেক জাতি দেখিয়াছি, বাল্যাবস্থায় সকলের রহস্য বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আর্যাবর্তের

মত বিচিত্র সমাজব্যবস্থা কোথাও দেখি নাই। এখানে এত স্তরভেদ আছে যে এখানকার লোকেরা কি করিয়া বাঁচিয়া আছে তাহা ভাবিতে আমার আশ্চর্য বোধ হয়। আবার এদেশে ক্রমেই এত মহাপুরুষ ও সতী নারী দেখি যে আমার কখনও কখনও ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য লাগে, দেবতুল্য ইহারা কেন মরিয়া যায়? এখানকার জীবন ও মৃত্যু দুই-ই আমার পক্ষে প্রহেলিকা!' ভট্টিনী মুখে নির্বিকার ভাব আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়া পুনরায় বলিলেন—'এই দেখুন, আপনি যদি কোনও যবনকন্যাকে বিবাহ করেন তবে তাহা এদেশে এক ভয়ংকর সামাজিক বিদ্রোহ বলিয়া লোকে মনে করিবে। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে যবনকন্যাও মনুষ্য, ব্রাহ্মণযুবাও মনুষ্য? মহামায়া যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিতেছে তাহারাও যে মানুষ। এইটুকু ভেদ যে তাহাদের মধ্যে সামাজিক উঁচুনীচু বলিয়া এতটা ভেদ নাই। যেখানে ভারতবর্ষের সমাজে এক সহস্র স্তর আছে সেখানে তাহাদের সমাজে বড় জোর দুই তিনটি হইবে। অনেকটা এই আভীরদের মতই মনে করুন। ভারতবর্ষে যে উঁচু সে অনেকটাই উঁচু, যে নীচু তাহার নীচু হওয়ার আর কোনও তল নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সব সমান। তাহাদের নারীদের মধ্যে রানী হইতে পরিচারিকা পর্যন্ত, গণিকা হইতে বারবিলাসিনী পর্যন্ত শত শত ভেদ নাই। সকলেই রানী, সকলেই পরিচারিকা। আপনারা তাহাদের দুর্ধর্ষ রূপের কথাই জানেন, তাহাদের কোমল হৃদয়ের কথা একেবারেই জানেন না। কেমন ভট্ট, এরূপ কি হইতে পারে না যে উচ্চতর ভারতীয় সাধনা সেই পর্যন্ত পৌঁছানো যাইবে, আর নিকৃষ্ট জটিলতা এখান হইতে অপসারিত হইবে? যতক্ষণ এই দুইটি এক সংগে না হয়, ততক্ষণ শাশ্বত শান্তি অসম্ভব। মহামায়া অর্ধেকই দেখিয়াছেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীরাও তাহাই দেখিয়াছেন। ভট্ট, আপনি যদি এই পূর্ণ সত্য প্রচার করেন তো কেমন হয়!'

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম—'আমি নূতন কথা শুনিতেছি দেবি। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা আমার শিরোধার্য হইবে।'

ভট্টিনীর বঙ্কিম অপাঙ্গ বিকশিত হইয়া গেল, আনন মল্লিকাকুসুমের মত প্রস্ফুটিত হইল। বলিলেন—'আমি ভাগবত ধর্মে এই পূর্ণতা দেখিতেছি ভট্ট!' আমার ঔৎসুক্য আরও বাড়িয়া গেল। আমি আরও শুনিব আশায় প্রশ্ন করিলাম—'আমি কোন্ কাজে লাগিতে পারি, দেবি!' ভট্টিনী দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন—'আপনি? আপনি এই আর্যাবর্তের দ্বিতীয় কালিদাস, আপনার মুখ হইতে নির্মল বাগ্‌ধারা ঝরিতে থাকে, আপনার অন্তঃকরণ পরহিতকামনায় পরিশুদ্ধ, আপনার প্রতিভা হিমনির্ঝরিণীর মত শীতল ও ধবল, আপনার মুখে সরস্বতী বাস করেন। আপনি ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত এই নিষ্ঠুর জাতির চিত্তে

সমবেদনার সঞ্চার করিতে পারেন, তাঁহাদের নারীর প্রতি সম্মান শিখাইতে পারেন, বালকদের আদর করিতে শিখাইতে পারেন। ভট্ট, আপনি এই ভব-কাননের পারিজাত, এই মরুভূমির নির্ঝর। আপনার বাণী আমার মত অবলার মধ্যেও আত্মশক্তির সঞ্চার করে। আপনার ছায়া পাইলে অবলারাও এই দেশের সামাজিক জটিলতা কিছু শিথিল করিতে পারে।'

ভট্টিনীর বাক্যস্রোত আজ বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। এই পর্যন্ত আসিয়া তিনি নিজেকে থামাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বেগবান অশ্ব যেমন বল্‌গার বাধা পাইয়াও খানিকটা দূর চলিয়া যায়, তেমনই তাঁহার বাগ্‌ধারা সংযত হইলেও আরও খানিকটা অগ্রসর হইল—'একটা জাতি অন্য জাতিকে ম্লেচ্ছ মনে করে, একজন লোক অন্যকে নীচ মনে করে, ইহার চেয়ে অশান্তির কারণ আর কি হইতে পারে ভট্ট! আপনি এমন হউন যে নরলোক হইতে কিন্নরলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত একই রাগাত্মক হৃদয়, একই করুণায়িত চিত্ত হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন। মানুষ লোভের বশে মোহের বশে দ্বেষের বশে পশুতার দিকে চলিয়া যাইতেছে, আপনি তাহার হৃদয়কে সংবেদনশীল ও কোমল করিতে পারেন। দেখুন ভট্ট, এই শুষ্ক কান্তারে অন্তঃসলিলা নদীও বহিতেছে, এই ভোগপুঞ্জের আবর্তের নীচে নির্মোহ বৈরাগ্যের দেবতা স্তব্ধ হইয়া আছেন, এ সংবাদ আপনি ভিন্ন আর কে দিতে পারে? ভট্ট, আমি আপনার কাব্যসম্পদ্ পাইয়া শক্তিলাভ করিব। আপনি আমার প্রার্থনা পূরণ করুন।'

ভট্টিনীর স্বরে এ কী জড়তা? প্রথম পরিচয়ের সময়েও ভট্টিনী আমাকে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কালিদাস বলিয়াছিলেন, আজও বলিতেছেন। কিন্তু সেদিন তাঁহার বাণীতে এমন জড়তা ছিল না, সেদিন তাঁহার অপাঙ্গ এত শিথিল ছিল না। তাঁহার মুখে এতটা দীপ্তি ছিল না। বাগ্‌ধারার এত খরপ্রবাহ ছিল না। আমি নূতন কথা শুনিতেছি। আমার প্রতি রোম হইতে ভট্টিনীর বাণী ঝংকৃত হইতে চাহিতেছে— এই নরলোক হইতে কিন্নরলোক পর্যন্ত একই রাগাত্মক হৃদয় ব্যাপ্ত! এই সত্যের প্রচার হইতে কি মানুষের দুরন্ত বাসনা, অনিয়ন্ত্রিত কামনা, অবিচারিত ধারণা কিছু কম ভীষণ হইয়া যাইবে? ইহা কি সম্ভব যে কাব্য হইতে মানুষের দয়াহীন, বিবেকহীন, ধর্মহীন বৃত্তিগুলি উচ্চতর কার্যে নিয়োজিত হইয়া যায়? কালিদাসের কাব্যের দ্বারা এই উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হইয়াছে? ভট্টিনী কি চাহিতেছেন? ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিচিত মনুষ্যের মন কি করিয়া কোমল হইবে, সংবেদনশীল হইবে, স্ত্রীশক্তিকে সম্মান করিতে শিখিবে! হায় মহাকবি, তুমি কেন সত্য সত্যই আমার চিত্তে অবতীর্ণ হইলে না? অন্তত ভট্টিনীর আদেশ পালন করিবার বুদ্ধি আমাকে দাও।

এমন হউক যে আমার প্রতিভার অকুণ্ঠ গতি নরলোক হইতে কিন্নরলোক পর্যন্ত বিস্তৃত একই রাগাত্মক হৃদয়ের পরিচয় পাইতে পারে। ভট্টিনী আমার কাব্যসম্পদ্ পাইয়া শক্তিমতী হইবেন? হায়, আমার এমন কি আছে যাহা আমি ভট্টিনীকে দিতে পারি না? আমি ব্যাকুল হইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলাম—'দেবি, আমার নিকটে যাহা কিছু আছে সবই আপনার। যদি কোনও কাব্যশক্তি আমার নিকট থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই আপনাকে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইব।' আমার কথায় ভট্টিনীর মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত হইল। সেই শোভা ও শ্রীর নির্ঝরিণী আরক্তাক্ষীর হাসি হাসি মুখ দেখিয়া অর্ধোদ্ভিন্ন-কেশর পদ্মপুষ্পের কথা তো অবশ্যই মনে পড়িল। সেই মন্দ মন্দ হাসি আমার মন ধবলিত করিল, চিত্ত উৎফুল্ল হইল, হৃদয় অননুভূত রাগে রঞ্জিত হইল। আমার বাণী কৃতার্থ হইল, আমার প্রত্যেক চেষ্টা সফল বলিয়া জানিলাম, যেন আমি জীবনের সার্থকতা ভোগ করিলাম। আমি বিনয়-গদ্‌গদ স্বরে বলিলাম—

'দেবি, আপনার অনুগ্রহ আমাকে কিছু উদ্ধত করিয়া ফেলিয়াছে, আমার মানবসুলভ লঘুতা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য করিতেছে, প্রভুদের প্রসাদের লেশমাত্র পাইয়াও অধীরপ্রকৃতি মানুষ চঞ্চল হইয়া ওঠে, এক স্থানে অল্পকালও অবস্থিত হইলে চপলব্যক্তি প্রগল্‌ভ হইয়া যায়, সদ্ব্যবহারের কণামাত্রও মানুষকে ভালবাসাহেতু জড় করিয়া তোলে; তাই দেবি, যদি অনুগ্রহ করেন তো আমি জানিতে চাই, আপনার সমস্ত কথার সার অর্থ কি। এই কুসুম-কোমল শরীর, এই নবনীত-মৃদুল হৃদয়, এই বজ্রসার দৃঢ়ব্রত, এই অপূর্ব ভক্তিভাব দেবলোকেও দুর্লভ। এক মুহূর্তের জন্যও আমি ইহা ভুল বলিয়া মনে করি না। আমি ভাল করিয়াই জানি যে জাহ্নবীর নির্মল ধারার উৎস কত মনোরম হইবে, পার্বতীর উৎপত্তি-ভূমি কত পবিত্র হইবে, পদ্মার জন্মদাত্রী কত গম্ভীর হইবে। যে কুল এই দেবদুর্লভ সৌন্দর্যকে, এই ঋষি-দুর্গম সত্যব্রতকে, এই কুসুমকমনীয় চারুতাকে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা ধন্য, সে কুল পবিত্র, সেই জননী কৃতার্থ, সে পিতা সফলকাম। দেবি, আপনার মধ্যে অবশ্যই সেই শক্তি আছে যাহাতে ম্লেচ্ছজাতির হৃদয় সংবেদনশীল হইবে, তাহার মধ্যে উচ্চতর সাধনার সঞ্চার হইবে, মান্যজনকে মান্য করিতে শিখিবে। কিন্তু আমি চাহিলেও নিজের কাব্যশক্তি কি করিয়া আপনার ভিতর সঞ্চারিত করিতে পারিব? আবার এই আর্যাবর্তের জটিল স্তরভেদ দূর করিবার জন্য তো আমার নিকট কোনও শক্তিই নাই। আমি স্পষ্ট শুনিতে চাহি দেবি, কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে!'

ভট্টিনীর অধরে মন্দহাসি খেলিয়া গেল, তিনি বলিলেন—'অদ্ভুত, ভট্ট, আশ্চর্য, অপূর্ব আপনার নির্মল বাগ্‌ধারা। আমার জন্ম সার্থক, আমার

ভাগ্যহীন জীবনও আজ কৃতার্থ, আপনার এই স্তুতি আমার অন্তরে অপূর্ব আত্মগরিমা সঞ্চারিত করিয়াছে। আপনি কি মনে করেন যে আমি রানীর মর্যাদা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি? না ভট্ট, আপনার এই পবিত্র বাক্-স্রোতস্বিনীতে স্নান করিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি। ইহাতেই আমার মধ্যে আত্মবল আসিয়া গিয়াছে। আপনার নিষ্পাপ হৃদয় দেখিয়াই আমি সেবার প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইয়াছি। ভাল, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কি কঠিন, বলুন?'

ভট্টিনী আমাকে বেশিক্ষণ ভাবিবার সময় দিলেন না। বলিলেন—'কিন্তু ছাড়ুন এখন এই কথা। আচার্য ভর্বুপাদ এক সপ্তাহের ভিতরেই আসিয়া পৌঁছিবেন। কে জানে, আমার ভাগ্যে আবার কোথায় যাওয়ার কথা লেখা আছে; ইহার মধ্যে কুমার কৃষ্ণবর্ধন মহারাজাধিরাজকে এখানে লইয়া আসিবেন কথা আছে। আমার মনে আজ কাহারও প্রতি কোনও আক্ষেপ নাই। আমার নিকটে এমন কি জিনিস আছে যাহাতে তাঁহাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে পারি। আমার এক আপনিই আছেন, সর্বপ্রকারে আপনার উপরেই আমাকে নির্ভর করিতে হয়। এমন কিছু করিতে হইবে যে মহারাজাধিরাজের অভ্যর্থনা তাঁহার অনুকূল হইতে পারে। শুনিয়াছি, আজ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য নগরের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ সকলকে একত্র করা হইয়াছে, আমাদের তো সর্বস্ব আপনিই।' এই পর্যন্ত বলিয়া ভট্টিনী আমার দিকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁহার চক্ষে ছিল কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

এমন সময় দ্বারী আসিয়া সমাচার দিল যে কোনও সজ্জন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। বাহিরে আসিয়া দেখি, স্বয়ং ধাবক। ধাবকের সেই বেশ, সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ, সেই কৌতুকপ্রিয় কান্তি। এই ভরা আষাঢ় মাসে, মালতী ও জাতী কুসুমের কি অভাব আছে? ধাবক বাহুমূলে, কণ্ঠদেশ ও চূড়ায় প্রাণ ভরিয়া মালতীদাম লাগাইয়াছিল। কস্তুরিকা-ধূপিত উত্তরীয়ের সঙ্গে জাতীপুষ্পের মিলিত সুগন্ধে ধাবক তাহার এদিকে ওদিকে এক অদ্ভুত সুগন্ধিযুক্ত বাতাবরণ তৈরী করিয়া লইয়াছিল। আমার জন্যও একটি মালতী-মালা লইয়া আসিয়াছিল। তাম্বুলের তো তাহার রোগই ছিল। আজও সে নির্দয়ভাবে তাম্বুলপত্র চর্বণ করিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা দুইজন গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ রহিলাম। কুশলবার্তার পর ধাবক আমার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে বলিল—'এস গুরু, তোমার তো পোয়া বারো। আজ চারুস্মিতার ময়ূরনৃত্য,

কাল বিদ্যুদপাঙ্গার মনোহর সঙ্গীত। দেবপুত্রনন্দিনী তো তোমাকে অবাধ রাজত্ব দিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যবান হও বন্ধু! শোনো, আমাকেও এক পার্শ্বে বসিতে দিও; দেখো ভাই, মিত্রকে এ সময়ে ভুলিলে পরিণাম খারাপ হয়।' ধাবকের চোখে রহস্য-চপলতা দেখিয়া আমি বলিলাম—'কি পরিণাম হইতে পারে...' ধাবক তাম্বুল-জড়িত বাণীতে বলিল—'বড় কঠিন, মিত্র। কোন মৃণালকোমল বন্ধনে বাঁধা পড়িতে হয় আর দুঃখ এই যে সে বন্ধন ছাড়েও না, ছাড়াইতে ইচ্ছাও হয় না।' আমি আর একটু উসকাইয়া দিয়া বলিলাম—'বন্ধু, কয়বার বাঁধা পড়িয়াছ!' ধাবক বেপরোয়া হইয়া উত্তর করিল—'ওহে বন্ধু, ধাবকের কথা ছাড়। পদ্মপত্র জলে থাকিয়াও নির্বিকার। কিন্তু তোমাকে সত্য বলি মিত্র, এই নৃত্যোৎসব আমার ভাল লাগিতেছে না। কোনও বাতুল কবি একবার বর্ষাকালের সঙ্গে নর্তকীর নৃত্যোল্লাসের অনুপ্রাস শুনিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই তাহার কল্পনা এতখানি দরিদ্র হইয়া পড়িল যে সেবিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কবিরাজ অম্বরে মেঘের আড়ম্বর দেখিল, বিদ্যুল্লতাকে নৃত্য করিতে দেখিল, আর মেঘগর্জন শুনিল, অমনই বলিয়া উঠিল, এই নাট্যাড়ম্বরের সময় বিদ্যুৎনর্তকীর নৃত্যারম্ভের মঙ্গলমৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল! তাহার পর? পরে জান তো কি হইল। দগ্ধমনে পথিক কেলিমন্দিরে প্রবেশ করিল, তাহার আঙ্গিনায় ফুল্লতরুর শাখায় সমাসীন কাকের শব্দ শুনিয়া উৎসুক প্রিয়তমা প্রথম হইতেই গিয়া বসিয়াছিল![১] ছিঃ, এও কি একটা 'তুক'? আমি খেপাইবার জন্য বলিলাম—'মিত্র, তুমি কোথায় 'তুক' দেখিতে পাইলে?' ধাবকের জিভে একটুও বাধিল না, চট্ করিয়া বলিয়া উঠিল—'মিত্র, তুক তো ঝুলন খেলায় আছে। মেঘ-নিঃস্বন আর বারিপাতের রিমঝিমের সঙ্গে তো হিন্দোলেরই তুক মেলে। অমন্দ সুবর্ণকিঙ্কিনীর মন্দ মন্দ ক্বণন, ঝনন্ ঝনন্ করিয়া মেখলার তরল ঝঙ্কার, বাচাল কঙ্কণের মধুর রুনুঝুনুর সঙ্গে বিদ্যুদ্গৌর কিশোরীরাই ঝুলিতে ঝুলিতে এই বর্ষাকালে দ্যুলোকের সহিত ভূলোকের অনুপ্রাস মিলাইতে পারে।' আমি আবার খেপাইলাম--'কিছু বর্ণনা করিয়া শোনাও না বন্ধু, শুষ্ক বাক্যে আছে কি!' ধাবকের নিজের খেয়ালে তাহার শিখা পর্যন্ত ডুবিয়াছিল। বলিল—'গুরু, এই শোভাকে একজনমাত্র কবি বর্ণন করিতে পারে, সেও যদি কমলনয়নাদের প্রসাদ পায়, তবে। জান কি

[১] কোনও অজ্ঞাত কবির নিম্নলিখিত শ্লোকের সহিত তুলনীয়

মৃষ্টেরাডম্বরমম্বরে ঘনকৃতং সৌদামিনী নর্তকী
নৃত্যারম্ভমৃদঙ্গমঙ্গলরবং শ্রুত্বা চ তদ্গর্জিতম্।
পুষ্পোৎপুঙ্গভরানতাঙ্গণতরুস্কন্ধাধসংবারস
কাকাকর্ণনকৌতুকোৎসবপ্রিয়তমং পান্থা বধূর্মণ্ডিরম্॥

যে সে কে?—কোনও অঙ্গহীন দেবতা![২] ধাবক এমন করিয়া চোখ নাচাইল যেন একমাত্র সে-ই ঐ দেবতার সন্ধান জানে! আমি মজা দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কান্যকুব্জেশ্বরকে তুমি এই বুদ্ধি দাও না কেন? ধাবক উল্লসিত হইয়া বলিল—'হে ভগবান্, মগধ দেশের নির্বোধকে পাইয়াছি! ওহে বন্ধু, এই উৎসব কি তোমারই ভট্টিনীর জন্য হইতেছে? এ তো কান্যকুব্জের বিদ্রোহী জনতাকে রাজশক্তির পক্ষ হইতে মদিরা পান করানো হইতেছে। ভট্টিনীর স্বাগত তো উপলক্ষ্য। এখানকার ভ্রান্ত জনতা অনুপ্রাস দিয়া কি করিবে। চারুস্মিতা ও বিদ্যুদপাঙ্গার নৃত্য যেমনই হউক না কেন, আর যাহাই হউক না কেন, এখানে ধুমধাম হইবে। মেধাতিথি ও বসুভূতি ঘাড় ভাঙ্গিয়া মরিবে, কান্যকুব্জের জনতা মহারাজাধিরাজের যশ গাহিবে। মিত্র, তুমি এইটুকুও বোঝ না, আর দেবপুত্রনন্দিনীর মন্ত্রী হইয়াছ!' আমার উপর তাহার এই কথার কি প্রভাব পড়িল, ধাবক তাহা মোটেই গ্রাহ্য করিল না। সে অনর্গল বকিয়াই চলিল—'কিন্তু চারুস্মিতা হইল উত্তম নর্তকী। হাবভাব বিভ্রমে সে অদ্বিতীয়, সাত্ত্বিক অভিনয় তো তেমন করিতে পারে না, কিন্তু তাহার চলনে আছে বিচিত্র মাধুর্য। যেমন সুন্দর বাঁশী বাজায়, তেমন সুন্দর মৃদঙ্গ বাজায়, আলস্য তো তাহাকে স্পর্শই করে না, যেমন নাচে তাহা তো দেখিলেই বোঝা যায়, আর ভরতমুনি কি উহাকে দেখিয়াই নর্তকীর গুণ লিখিয়াছিলেন! অর্থে, রূপে, গুণে, ঔদার্যে, সৌভাগ্যে, ধৈর্যে, বীর্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। যেমন মৃদুল তেমনই মধুর; যেমন স্নিগ্ধ তেমনই লীলাবতী।[৩] ও তো এই নগরের আভূষণ। বাস্তবিক, তাহার নৃত্যে তাহার শোভাই মনোহারী করিয়া তোলে।'

আমি ধাবকের খেয়াল দেখিয়া মজা পাইতেছিলাম। আরও জানিবার ইচ্ছায় বলিলাম—'ভাল, বিদ্যুদপাঙ্গার কি কি গুণ আছে, বন্ধু।' 'বিদ্যুদপাঙ্গার গুণ অন্য ধরনের। সে গায় ভাল, আর রূপ তো বাস্, নাম হইতেই বুঝিতে পার। লোকে বলে যে লোল কটাক্ষও ততদিন হৃদয়ভেদী হয় না, যতদিন তাহা একশ দেড়শ হৃদয় বিদ্ধ না করিয়াছে। বিদ্যুদপাঙ্গার নিকটে ঐরূপই কটাক্ষ আছে।' আমি আবার টিপ্পনী কাটিলাম—'তোমাকে বিঁধিয়াছে কি, কবি?' এইবার ধাবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—'কবি বিদ্ধ হয় না, বেঁধায়। অপাঙ্গবাণে নয়, ব্যঙ্গবাণে।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধাবক এই প্রকারে হাসিতে ও হাসাইতে থাকিল। এই

---

[২] তুলনীয়—সৌকর্যমিন্দীবরলোচনানাং লোলাস্ লোলাস্ কমুলনাস।
যদি প্রসাদান্নভতে কবিত্বং জানাতি তদ্ বর্ণয়িতুং মনোজ্ঞঃ॥

[৩] তুলনীয়—অর্থরূপগুণৌদার্য-সৌভাগ্য-ধৈর্য-বীর্য-সম্পন্না।
পেশলমধুরা স্নিগ্ধা ন চ বিকলা চিত্রকর্মকুশলা চ॥—নাট্যশাস্ত্র, ৩৪।৪৬

কবিকে আমার কিছু বিচিত্র বলিয়া মনে হইল, ইহার দুনিয়া নির্লিপ্ত খেয়ালের দুনিয়া। যে কথায় অন্য কবি গলিয়া যায় তাহা হইতেও ও নিজের খেয়ালের খোরাক বাহির করিয়া লয়। চলিতে চলিতে ধাবক বলিল—'একটা ব্যাপার হইতে সাবধান থাকিও মিত্র, কান্যকুব্জে কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, সকলে তোমাকে কাটিতেই চাহিবে। আর এই যে কাশীর মীমাংসককে লইয়া আসা হইতেছে, তাহাকেও বুঝাইয়া দিও যে অনর্থক এখানে ওখানে না ঘুরিয়া বেড়ায়। কান্যকুব্জ বিচিত্র দেশ, যদি একবার তালি বাজিল তো বাজিয়াই গেল। বিরোধী পণ্ডিতদের তো এখানকার লোকেরা এমনি তুড়ি মারিয়াই উড়াইয়া দেয়।' যাইবার সময় ধাবক আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বিদায় লইল। আমি তাহাকে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে গেলাম। একদণ্ডও সে তাহার রসনাকে বিশ্রাম দিল না। উহাতে অনেক কথা বোঝা গেল। অবধূত অঘোর-ভৈরব এখানেই চণ্ডীমণ্ডপে আছেন। সুচরিতা ও বিরতিবজ্রের ত্রিভুবন হইতে নিগূঢ় সাধনা এখন শান্তিতে চলিতেছে। উড্ডিয়ান পীঠের ভণ্ড বৈষ্ণব জানি না কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে। মহারাজাধিরাজ রত্নাবলী নামে এক নাটিকা লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি মার-বধূদের শরণ্য বোধিস্থিত মুনীন্দ্রের প্রার্থনা করেন নাই।* কিন্তু পার্বতী ও লক্ষ্মীর নাম লইয়া শিব ও হরির প্রার্থনা করিয়াছেন, ধাবকের কিছু শ্লোকও তাহাতে জুড়িয়া দিয়াছেন। এই প্রকার অনেক কথাই এই খেয়াল-পাগলের নিকট হইতে অনায়াসেই জানা গেল। যখন ধাবককে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিলাম, তখন মনে মনে তাহার কথাগুলি পাক খাইয়া ঘুরিতেছিল। কত সহজ আনন্দধারা এই কবির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সে কোন্ রসনির্ঝর যাহা হইতে এত উন্মাদনা, এত উল্লাস, এত নিঃসঙ্গতা ঝরিয়া পড়িতেছে। না কোথাও বিরোধীপক্ষের সম্ভাবনার আশঙ্কা, না কাহারও উপর ভালমন্দ প্রভাবের প্রয়োজন। যেন সে এই দুনিয়া হইতে জীবনের আনন্দ টানিয়া লইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। অন্যের ইহা হইতে সুখ হউক কি দুঃখ হউক, সে নিজের রস তেমন করিয়া

---

* নাগানন্দের শ্লোক তুলনীয়

ধ্যানব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কামুন্মীল্য চক্ষুঃ ক্ষণং
পশ্যানঙ্গশরাতুরং জনমিমং ত্রাতাপি নো রক্ষসি।
মিথ্যাকারুণিকোঽসি নির্ঘৃণতরস্ত্বত্তঃ কুতোঽন্যঃ পুমান্
ঈর্ষং মারবধূভিরিত্যভিহতো বোধৌ জিনঃ পাতু বঃ॥ ১॥
কামেনাকৃষ্য চাপং হতপটুপটহাবল্গিভির্মারবীরৈ
ভ্রূভঙ্গোৎকম্পজৃম্ভাস্মিতললিতদৃশা দিব্যনারীজনেন।
সিদ্ধৈঃ প্রহ্বোত্তমাঙ্গৈঃ পুলকিতবপুষা বিস্ময়াদ্বাসবেন
ধ্যায়ন্ যো বৈরবাপ্তো বচলিত ইতি বঃ পাতু দৃষ্টো মুনীন্দ্রঃ॥ ২॥

বাহির করিয়া লয় যেমন করিয়া কৃষক দলিত ইক্ষুদণ্ড হইতে রস বাহির করে।

ধাবক বলিয়াছিল যে চারুস্মিতার নৃত্য কান্যকুব্জের বিদ্রোহী জনতা বশে আনিবার অস্ত্র। এ কি সত্য? এ যে কত মর্মন্তুদ সংবাদ, কিন্তু ধাবক কত সহজভাবে এই সংবাদ বলিয়া গেল। চারুস্মিতার যশ আমি শুনিয়াছি, তাহার গুণের কথা আজ ধাবক বলিয়াছে; হায়, কত গুণসম্পত্তি আছে আর কত হীন উদ্দেশ্যে তাহা প্রয়োগ হইতেছে। গণিকা কি নগরের সজ্জা বা শৃঙ্গার, না নরকের অঙ্গার? সে কি একসঙ্গে অমৃত ও বিষের মিশ্রণ? শূদ্রক বসন্তসেনাকে পদ্মহীন লক্ষ্মী, অনঙ্গদেবতার ললিত অস্ত্র, কুলবধূদের শোক ও মদনবৃক্ষের পুষ্প বলিয়াছেন।* ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যে লক্ষ্মী, সে-ই শোক। যে ফুল, সে-ই মারণাস্ত্র! ভট্টিনী বলিতেছেন যে যাহাদের তুমি ম্লেচ্ছ মনে কর তাহাদের স্ত্রীদের মধ্যে রানী হইতে পরিচারিকা পর্যন্ত ও গণিকা হইতে বারবনিতা পর্যন্ত একশত স্তর নাই। ইহা আমার নিকট একেবারে বিচিত্র সংবাদ। আমার মন বলিতেছে যে স্বর্গ সেই সমাজেই আছে। এই যে দুঃখতাপ, নির্যাতন, ধর্ষণ, পরদারাভিমর্শ, ইহা সব বিকৃত সমাজব্যবস্থার বিকৃত পরিণাম। ভট্টিনী একথা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার রক্তের আগুনে জ্বলিয়া এই পবিত্র জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছে। ম্লেচ্ছদের হয়তো শাস্ত্রচর্চার অভাব, ধর্মসাধনার অভাব, দারিদ্রে তাহাদের বাস। এসবের সংশোধন হইলে সেখানে স্বর্গ তো তৈরীই হইয়া আছে। এখানে স্বর্গ তৈরী করা কঠিন। এখানে স্বার্থের সংঘাত, লোভ ও মোহ প্রবল। মহাকবি যে যক্ষলোকের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সামাজিক মর্যাদা সমান ছিল, অশ্রু যদি থাকিত তবে তাহা শুধু আনন্দের, পীড়া যদি হইত তবে তাহা প্রেমের, বিয়োগ যদি থাকিত তবে তাহা প্রণয়কলহের, জরা মৃত্যুর তো সেখানে কোনও চিহ্নই ছিল না।*—ভট্টিনী যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা হইতে গিরিসংকটের ওপারে এই

---

* তুলনীয়:

অপদ্মা শ্রীরেষা প্রহরণমনঙ্গস্য ললিতং
কুলস্ত্রীণাং শোকো মদনবরবৃক্ষস্য কুসুমম্।
সলীলং গচ্ছন্তী রতিসময়লজ্জাপ্রণয়িনী
রতিক্ষেত্রে রঙ্গে প্রিয়পথিকসার্থৈরনুগতা॥ মৃচ্ছকটিক, ৫।১২

* কালিদাসের নিম্নলিখিত শ্লোক তুলনীয়:

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥—মেঘদূত ২।৪

কল্পলোকের সাক্ষাৎকার পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমার কি সেই শক্তি আছে?

আমি শুনিয়াছি যে গিরিসংকটের ওপারে অত্যন্ত ঘৃণিত ম্লেচ্ছ জাতিরা বাস করে। লুণ্ঠন করাই তাহাদের ব্যবসা, দেবমন্দির কলুষিত করাই তাহাদের ধর্ম, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ বধ করাই তাহাদের আমোদ, কুলবধূ ও বালিকাদের ধর্ষণ উহাদের বিলাস, হত্যা ও অগ্নিদানই তাহাদের পুণ্যকর্ম। পুরুষপুর হইতে সাকেত পর্যন্ত বিশাল জনপদ তাহারা চষিয়া ফেলিয়াছিল। পরম্পরাক্রমে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে মহাকবি রঘুবংশে বিধ্বস্ত অযোধ্যা বর্ণনা করিবার অছিলায় এই সব নিষ্ঠুর লুঠেরার কুকর্ম বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই দারুণ ধ্বংসলীলা স্মরণ করিতেই সমস্ত রোমকূপ খাড়া হইয়া উঠে—সায়ংকালীন প্রচণ্ড ঝটিকায় ছিন্নভিন্ন মেঘমালার মত নগরী সব শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিল; যে সকল রাজপথে গভীর রাত্রেও নির্ভয়ে বিচরণকারিণী অভিসারিকাদের নূপুরের রুনুঝুনু শোনা যাইত, সেখানে শৃগালের বিকট রব শোনা যাইতেছিল, যে সকল পুষ্করিণীতে বালক্রীড়াকালীন মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি গমগম করিত, তাহাদের নির্মল জল বন্য মহিষদের গাত্রমর্দনের ফলে দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছিল; মৃদঙ্গের তালে তালে নাচিতে অভ্যস্ত ও সুবর্ণ-যষ্টির উপর বিশ্রামকারী ক্রীড়াময়ূর বন্য হইয়া গিয়াছিল ও তাহাদের মৃদুল বর্হভার দাবাগ্নিতে ঝলসিয়া গিয়াছিল, অট্টালিকার যে সব সোপানে রমণীদের সরাগ পদসঞ্চার হইত সেখানে ব্যাঘ্রেরা রক্তলোভে ছুটোছুটি করিত, বড় বড় মদমত্ত রাজকীয় গজরাজ যাহারা পদ্মবনে অবতীর্ণ হইয়া মৃণালনালের দ্বারা করেণুকাদের সংবর্ধনা করিত, তাহারা সিংহদ্বারা আক্রান্ত হইত; সৌধস্তম্ভের উপর কাষ্ঠনির্মিত স্ত্রীমূর্তির রং ধূসর হইয়া গিয়াছিল আর তাহাদের উপর সর্পের দোদুল্যমান খোলসই উত্তরীয়ের কার্য করিতেছিল; রাজমহলের অমল-ধবল প্রাচীর কালো হইয়া গিয়াছিল, দেওয়ালের নিকটে তৃণাবলী উঁচু হইয়া পড়িয়াছিল, চন্দ্রকিরণও তাহাদিগকে পূর্ববৎ উদ্ভাসিত করিতে পারিতেছিল না, যে সব উদ্যানলতা হইতে বিলাসিনীরা অতি সন্তর্পণে পুষ্পচয়ন করিত সেগুলি বানরেরা অতিশয় ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল; অট্টালিকাগুলির গবাক্ষ না রাত্রের মাঙ্গল্যপ্রদীপে, না দিনে গৃহলক্ষ্মীদের মুখকান্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল, যেন তাহাদের লজ্জা ঢাকিবার জন্যই মাকড়সারা তাহাদের উপর জাল বুনিয়া দিয়াছিল; নদীসৈকতে পূজাসামগ্রী পড়িত না, স্নানের কলরব অন্তর্ধান করিয়াছিল আর উপান্তদেশের বেতসলতাকুঞ্জ শূন্য পড়িয়াছিল।[১]

---

[১] তুলনীয়—রঘুবংশ—১৬।১১।২১

এইভাবে সর্বনাশের খেলা খেলিতে যারা জানে সেই ম্লেচ্ছদের মধ্যেও মনুষ্য-হৃদয় আছে! ভট্টিনী এ কি বলিতেছেন? ইহাও কি সম্ভব যে মানুষ এতটা নির্দয় হইবে, এতটা বীভৎস হইবে, এতটা ক্রূর হইবে! কিন্তু ভট্টিনী বলিতেছিলেন যে উঁহাদের মধ্যেও একই রাগাত্মক হৃদয় আছে!

আমি এইভাবে চিন্তাজালে জড়াইয়া গিয়াছিলাম, এমন সময়ে নিপুণিকা ডাকিল। তখন আকাশ নীল মেঘে মেদুর হইয়া গিয়াছিল, বৃক্ষের কৃষ্ণরেখার উপর মেঘের ছায়া পড়িয়াছিল বলিয়া দূরের বনভূমি আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, মনে হইতেছিল যে আকাশ বুঝি সূর্যবিম্বকে একেবারে পান করিয়া ফেলিয়াছে। যদিও দিন শেষ হইতে তখনও কিছুটা বাকি ছিল, তথাপি আলো যেন মুছিয়া গিয়াছিল। এই কালিমার পৃষ্ঠভূমিতে নিপুণিকা নিকষপাথরে অঙ্কিত সুবর্ণরেখার সমান কমনীয় মনে হইতেছিল। তাহার পাণ্ডুর কপোল এই সময়ে আনন্দরসায়নে অপূর্ব সুন্দর হইয়া গিয়াছিল, তাহার বাণীতে আরও মিষ্টতা আসিয়া গিয়াছিল, নয়নকোরকে আরও মেদুরভাব বাহির হইয়া আসিয়াছিল। নিপুণিকাকে দেখিয়া আমার মন বড়ই প্রসন্ন হইয়াছিল। তাহার অধরে হাসির রেখা ছিল, লোচনে ছিল লীলাবিলাস, বাণীতে আবেগ। আমি প্রসন্ন হইয়া বলিলাম—'কি বলিতেছ নিউনিয়া!' নিপুণিকা আমার দিকে না তাকাইয়াই বলিল—'ভট্টিনী যাহা বলিয়াছেন তাহাব অর্থ তুমি কি বুঝিয়াছ?' আমি বলিলাম—'ভট্টিনী অনেক কিছু কথা বলিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু অংশের অর্থ আমি বুঝিয়াছি, কিছুটার অর্থ আমি বুঝি নাই, কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।' নিপুণিকা পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল—'না না। আমি সব কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি না। মহারাজাধিরাজের উপযুক্ত কিছু করিবার জন্য উনি যে আদেশ দিয়াছেন তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি।' নানা চিন্তায় আমি একথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আমি সে বিষয়ে কিছু ভাবিও নাই। নিপুণিকার প্রশ্নের কি উত্তর দিব, কিছু বুঝিতে পারি নাই। আমাকে চিন্তিত দেখিয়া নিপুণিকা আবার বলিল—'ঘাবড়াইবার কথা নয়, আমি বলিয়া দিতেছি। তোমাকে আবার অভিনয়ের অভ্যাস করিতে হইবে, আমাকেও। আমার মুখ হইতে ভট্টিনী তোমার অভিনয়কৌশলের অনেক কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার প্রচ্ছন্ন অভিলাষ যে তোমার মনোহর অভিনয় দেখেন। তোমার এই কবিমিত্র বলিতেছিলেন যে মহারাজাধিরাজ কোনও নূতন নাটিকা লিখিয়াছেন। সেইদিন কেন উহা রঙ্গভূমিতে অবতারণ কর না?' নিপুণিকা আমাকে একেবারে নূতন ফাঁদে ফেলিয়া দিল। আমি তো এই অভিনয়ের ব্যাপার অনেক-

দিন হইল ছাড়িয়া দিয়াছি। ভট্টিনীর সম্মুখে অভিনয় করা তো একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ হইলে তো অসম্ভবের মধ্যেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আমি আরও বেশি জানিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার এখনও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস আছে, নিউনিয়া?' নিপুণিকা চক্ষু নত করিল। তাহার হাসি মুহূর্তে লুপ্ত হইয়া গেল, এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার পাণ্ডুর মুখমণ্ডলকে ধোঁয়াটে করিয়া তুলিল, সে বলিল—'অভিনয়ই তো করিতেছি। যাহা বাস্তব তাহা চাপিয়া যাওয়া, আর যাহা অবাস্তব তাহা করা—ইহাই তো অভিনয়। সমস্ত জীবন এই অভিনয় করিয়াছি। একদিন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলে কি থাকিবে, আর কিই বা যাইবে?' নিপুণিকার কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। সত্যই কি এ জীবন অভিনয়? এই পায়ে পায়ে বন্ধন, শ্বাসে শ্বাসে দমন—অভিনয় তো বটেই? নিপুণিকা এজন্য দুঃখী, কিন্তু ইহা ছাড়িবে কি করিয়া। মুহূর্তে আমার মন জীবনের এই বন্ধনজড়িমার দিকে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই ইহার উত্তম দিকও বুঝিতে পারিলাম। এই বন্ধনই তো সংযম, সুরুচি, চারুতা। নিপুণিকা ব্যর্থ ক্লান্ত হইতেছে। এই বাধার কারাগারে বন্ধনগ্রস্ত জীবনসরিতেই গতিশীল হয়, সরস হয়, মধুর হয়। 'না নিউনিয়া, বন্ধনই সৌন্দর্য, আত্মদমনই সুরুচি, বাধাই মাধুর্য। না হইলে এই জীবন ব্যর্থতার বোঝা হইয়া পড়ে। বাস্তবতা নগ্ন রূপে প্রকাশিত হইয়া কুৎসিত হইয়া যায়। উদ্দীপিত দীপশিখা যেমন অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, তেমনি এই সামান্য কথা আমার হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। ম্লেচ্ছজাতির মধ্যে এই সংযমের অভাব আছে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব আছে। তাহাদের ইহা চাই। ভারতীয় সমাজ বন্ধনকে সত্য মানিয়া সংসারকে একটা বড় জিনিস দান করিয়াছিল। আমরা দুইজন অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলাম। বাহিরে ঘনঘোর বর্ষা হইতেছিল, ভিতরে চিন্তা-প্রবাহ তীব্র বেগে বহিতেছিল। ঠিক এমন সময়ে, মধুর কোমল কণ্ঠে সমস্ত শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া ভট্টিনী মহাবরাহের স্তুতি পাঠ করিলেন—

> জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা, বিষাণকোট্যাখিলবিশ্বমূর্তিনা।
> সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা, স মে স্বয়ংভূর্ভগবান্ প্রসীদতু॥

আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। ভট্টিনীর পূজা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নিপুণিকা যেন নিদ্রা হইতে উঠিল। বলিল—'হাঁ ভট্ট, বন্ধনই মাধুর্য!' আর ভট্টিনীর নিকটে চলিয়া গেল।

ঊনিশ উচ্ছ্বাস

মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষবর্ধন ও মহারানী রাজ্যশ্রীর সঙ্গে দেখা করিয়া ভট্টিনী বড়ই প্রসন্ন হইলেন। মহারাজার সৌজন্য ও স্নেহ তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া লইল। তিনি সত্যই তাঁহার সহোদরা ভগিনী হইয়া গেলেন। মহারানী রাজ্যশ্রীর আজ্ঞায় আমি বৃদ্ধ বাভ্রব্যকে ভট্টিনীর নিকট লইয়া আসিলাম। তিনি বাভ্রব্যের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ এ পর্যন্ত জানিতেন না যে দেবপুত্র নন্দিনীর জন্য সমস্ত সাম্রাজ্য চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে তিনি এক সময়ে তাঁহার শাসনে আবদ্ধ অপহৃতা রাজকুমারী ছিলেন। পথে তিনি কয়েকবার প্রশ্নও করিয়াছিলেন, 'ভদ্র, দেবপুত্রনন্দনী আমাকে ডাকিয়াছেন কেন?' বৃদ্ধের সরলতা বড়ই মুগ্ধকর ছিল। আমিও আশ্চর্যের ভাব দেখাইয়া বলিলাম, 'হাঁ আর্য, আমিও এই ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি যে দেবপুত্রনন্দিনী আপনাকে ডাকিতেছেন কেন?' শেষে তিনি নিজেই সমাধান করিয়া লইলেন। বলিলেন—'দুর্ভাগ্যের পরিহাস, ভদ্র! বিংশ বর্ষ ধরিয়া মৌখরিরাজকুলের অন্তঃপুরে কঞ্চুকীর কার্য করিতেছি। ভাগ্য শেষ পর্যন্ত মৌখরিবংশের অন্ন কাড়িয়া লইবেই স্থির করিয়াছে। এখন আমার উপর আর কে বিশ্বাস করিবে? আমি অন্তঃপুররক্ষায় নিজের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছি। জানা যাইতেছে যে মহারানীর বিশ্বাসও আর আমার উপর নাই। কে জানে এই বৃদ্ধবয়সে পুরুষপুর যাইতে হইবে, না গিরিসংকটেরও পরপার যাইতে হইবে!' বৃদ্ধের দৃষ্টি সজল হইয়া গেল। মৌখরিবংশের অন্নের মোহ হৃদয়কে কতই দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতা রাখিত!

স্কন্ধাবারের বাহিরে অলিন্দে বৃদ্ধকে বসাইয়া আমি ভট্টিনীকে সংবাদ পাঠাইতেই চাহিতেছিলাম, এমন সময় নিপুণিকা আসিয়া পড়িল। সে গলায় আঁচল বাঁধিয়া জানুপাতপূর্বক বৃদ্ধকে প্রণাম করিল। বৃদ্ধের শিথিল দৃষ্টি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু যখন সে প্রণাম করিয়া উঠিল তখন তাহাকে চিনিয়া ফেলিল। মুহূর্তে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভয়ে ভয়ে বলিলেন—'তুমি নিউনিয়া!' নিপুণিকা বৃদ্ধের মনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে করিতে বলিল—'হাঁ আর্য, আমিই, কিন্তু আপনি এত বিবর্ণ হইয়া গেলেন কেন? চলুন, আপনাকে ভট্টিনীর নিকট লইয়া যাই।' বৃদ্ধকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল। চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভট্টিনী?' নিপুণিকা বলিল—'হাঁ আর্য, ভট্টিনীই তো আপনাকে ডাকাইয়াছেন।' বৃদ্ধের শরীর বাহিয়া ঘর্ম ঝরিতে লাগিল। তিনি কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষুর জড়ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল যে

তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ক্লান্ত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি বলিতেছ নিউনিয়া, কোন্ ভট্টিনী?' নিউনিয়া ধীরভাবে বলিল—'অস্থির হইবেন না, আর্য, দেবপুত্রনন্দিনীর নিকট আপনাকে লইয়া যাইতেছি।' বৃদ্ধ সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন এবং অনিচ্ছায় নিপুণিকার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলিলেন।

বৃদ্ধকে দেখিয়া ভট্টিনীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তিনি সমাদরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ এতখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন যে সেই প্রণামের উত্তরও দিতে পারিলেন না। অত্যন্ত আশ্চর্য ও সাধুবসের সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'জয়, ভাবী মহাদেবীর জয়!' ভট্টিনীর কপোলপালির উপর দরবিগলিত অশ্রুধারা বহিয়া চলিল। বৃদ্ধ কিছুটা বুঝিতে বুঝিতে বলিলেন—'অপরাধ মার্জনা করুন, দেবি, অভ্যাসবশে যদি কিছু অনুচিত বলিয়া থাকি তাহা ক্ষমার্হ। ছোট রাজবাড়ির ভাবী মহাদেবীকে চিনিতে কি ভুল করিয়াছি? দেবি, মৌখরিদের কণ্ডুকীর সমস্ত জীবনের উপার্জন আমি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, আজ মহাদেবীকে দেখিয়া আমার বুঝিতে আসিতেছে না যে আমি প্রসন্ন হইব না বিষণ্ণ হইব। দেবি, শিথিলাঙ্গ বৃদ্ধ কৃপার পাত্র। আমি বিশেষ কিছু জানিতে চাই, সেই অনুগ্রহের প্রার্থী।' ভট্টিনী কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি প্রস্তরীভূত চক্ষু দিয়া অনেকক্ষণ বৃদ্ধকে দেখিতে থাকিলেন। নিপুণিকাও নানা স্মৃতির আকস্মিক জাগরণে নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ বারে বারে সকলের দিকে দেখিতে লাগিলেন, কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে আমিই বলিলাম—'আর্য বাভ্রব্য, চমকিতের ন্যায় দেখিতেছেন কেন? আপনার সম্মুখে দেবপুত্রনন্দিনীই আছেন। ইঁহাকেই মৌখরিদের ছোট মহারাজ তাঁহার অন্তঃপুরে বলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। 'ভাবী মহাদেবী' বলিয়া আপনি বৃথাই ইঁহার পুরানো ক্ষত নবীন করিয়া তুলিতেছেন। নিউনিয়াকে সাধুবাদ দিন, তাহার সাহসের জন্যই আজ আর্যাবর্ত সর্বনাশের গহ্বরে পতন হইতে বাঁচিবার আশা রাখে।' এতখানি শুনিবার পর, বৃদ্ধের বিস্ময়বিমূঢ়তা কিছুটা কমিয়া গেল। তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিলেন। গদ্‌গদ কণ্ঠে আশীর্বাদ দিতে দিতে তিনি ভট্টিনীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন—'প্রীত হইলাম, কন্যা, আজ আমার পরিতাপ ধুইয়া গিয়াছে। মৌখরিদের মান রক্ষা করিতে না পারার ক্ষোভ আজ আমার মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। কুড়ি বৎসর ধরিয়া আমি কণ্ডুক ধারণ করিয়াছি। এই দীর্ঘ কালে শুধু দুইবার আমাকে কর্তব্যচ্যুত হইবার অপরাধ স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু ত্রিপুরভৈরবীর এমন কিছু বিচিত্র মায়া আছে যে দুইবারই আমার অপরাধে বৃহত্তর জগতের লাভ হইয়াছে। বড়ই অনুতাপের সঙ্গে আমাকে গত

কয়েক মাস কাটাইতে হইয়াছে। আমি বরাবর ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে আমার শেষজীবনে কলঙ্ক স্পর্শ করিল; কিন্তু তোমার পরিচয় পাইয়া আমি আশ্বস্ত হইয়া গেলাম। ত্রিপুরসুন্দরীর মায়া কে জানিতে পারে!'

ভট্টিনী বৃদ্ধকে আসন গ্রহণ করিবার জন্য সংকেত করিলেন। তাঁহার গলা তখনও ভরা ভরা ছিল। বৃদ্ধ আসন গ্রহণ করিলে আমরা সকলে আসন গ্রহণ করিলাম। তাঁহার চোখ স্নেহের জলে ভরিয়া ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনও বিস্মৃত ঘটনা স্মরণ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি ভট্টিনীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ইহার মধ্যে নিপুণিকা প্রকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছিল। সেও গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—'আর্য, বিশ্বাসঘাতিনী নিপুণিকা ক্ষমা চাহিবার যোগ্যও নহে। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা আজ পর্যন্ত অমাকে এই বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য দোষী বলে নাই। আর্যকে সংকটে ছাড়িয়া দেওয়ার দুঃখ আমার বড়ই ছিল আর আমার চেয়েও বেশি ছিল ভট্টিনীর। প্রথম সুযোগ মিলিতেই ভট্টিনী আপনাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার তো কষ্ট হইয়াছেই।' বৃদ্ধের চোখে জল আসিয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'যদি আমাকে জীবন্ত পোড়াইয়া ফেলা হইত তাহা হইলেও আমার তত দুঃখ হইত না, তিল তিল করিয়া অনুতাপের আগুনে জ্বলিয়া যেমন হইতেছে। হায়, যখন আমাকে সহসা কুমার কৃষ্ণের বাড়িতে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইল, তখন যদি আমাকে কেহ দেবপুত্রনন্দিনীর যথার্থ পরিচয় বলিয়া দিত, তবে আমি পরিতাপের অনলে এমন করিয়া পুড়িতাম না।' এইবার ভট্টিনী টিপ্পনী করিলেন—'আর্যকে কোনও দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল না কি!' বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—'মা, দণ্ড আর কোথায় দিল, আমি কিছু বুঝিতেই পারি নাই যে এত বড় অপরাধের জন্য আমাকে শূলে কেন দেওয়া হয় নাই!'

বৃদ্ধ অল্পক্ষণ পর্যন্ত চক্ষু বন্ধ করিয়া কিছু ভাবিতে থাকিলেন। পুনরায় ভট্টিনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'মা, তুমি চলিয়া গেলে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম। আমার সর্বদাই মনে হইত যে আমি আমার অন্নদাতার সেবার ত্রুটি করিয়াছি, তুষানলে পুড়িলেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। পরন্তু দেবি, আজ আমার বিশ্বাস যেন টলিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আজ হইতে ১৫ বৎসর পূর্বে তান্ত্রিকযোগী যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। আজ আমি সম্ভবতঃ জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য দেখিতেছি। আমার রোমে রোমে শিহরণ লাগিতেছে।'

ভট্টিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তান্ত্রিক যোগী কি বলিয়াছিলেন, আর্য!'

বৃদ্ধের অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। ভট্টিনী নিপুণিকার দিকে দেখিলেন।

নিপুণিকা শীঘ্র চলিয়া গিয়া একটু দুধ লইয়া ফিরিল। দুধ পান করিবার পর বৃদ্ধের মধ্যে চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিপুণিকা ধীরে ধীরে পাখা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমি কুড়ি বৎসর পূর্বে কঞ্চুক ধারণ করিয়াছিলাম। আরম্ভে আমি মৌখরিনরেশের অন্তঃপুরে কঞ্চুকী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। তখন যদিও আমার সত্তর বৎসর বয়স ছিল তথাপি এই নাড়ীতে শক্তি ছিল। কি বলিব কন্যা, রাজার অবরোধগৃহে বেত্রযষ্টি ধারণ করাই নিয়ম। আমি তখনকার দিনে এই বেত্রযষ্টি আচার হিসাবেই ধারণ করিয়াছিলাম। এখন যখন শরীরে প্রাণ-শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে তখন এই বেত্রযষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ভর দেওয়ার লাঠি। এখন আমার পক্ষে অস্খলিত গতিতে চলাও দুর্ভর হইয়া গিয়াছে। ছোট রাজবাড়িতে তো আমি কেবল পাঁচ বৎসর আছি। এই বিশ বৎসরে এই অবরোধগৃহে না জানি কত তরুণী আনীত হইয়াছে। আমি সকলকে মৌখরি-বংশের কুলবধূর উপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছি। ইহাই ছিল আমার পিতৃপিতামহদের শিক্ষা। আমি কোনও বালিকার পরিচয় জানিতে চেষ্টা করি নাই। আমার পক্ষে তাহাদের ছিল একই পরিচয়—তাহারা সকলে মৌখরিবংশের কুলবধূ। কেবল জীবনে দুইবার মাত্র অনিচ্ছাপূর্বক এই কুলবধূদের পূর্বজীবনের কথা জানিতে হইয়াছে। একটিতো আজই, আর একটি আজ হইতে ১৫ বৎসর পূর্বে।'

বৃদ্ধের চক্ষে এক নূতন জ্যোতি দেখা দিল। তিনি কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—

'আজ হইতে ১৫ বৎসর পূর্বে গ্রহবর্মার অন্তঃপুরে এমন এক ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা সাধারণতঃ রাজকীয় অন্তঃপুরে ঘটে না। মৌখরিরাজা কুলুত-রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ আমার নিয়োগের প্রথমেই হইয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও মুখরা দাসীরা আমাকে বলিয়া যাইত যে রাজা ও রানীতে বনিবনাও নাই। কিন্তু আমি রানীর মধ্যে কোনও কঠোরতা বা দুঃখের ভাব দেখি নাই। তিনি রাতদিন পূজাপাঠে লাগিয়া থাকিতেন। মহারাজা তাঁহার নিকট কদাচিৎ আসিতেন, কিন্তু আসিলে রানী তাঁহার পর্যাপ্ত সম্মান করিতেন, তবু কোথাও কিছু না কিছু গণ্ডগোল নিশ্চয় ছিল, কেননা রাজা এক মুহূর্তের বেশি কখনও তাঁহার নিকটে থাকিতেন না। আমি এই রহস্য বুঝিতে কখনও চেষ্টা করি নাই। অন্তঃপুরিকাদের রহস্যের প্রতি জিজ্ঞাসার ভাব কঞ্চুকিধর্মের বিরুদ্ধে। আমার পিতৃপিতামহেরা আমাকে শুধু একটি শিক্ষা দিয়াছেন, প্রাণ দিয়াও কুলবধূদের মান রাখিতে হইবে। আমার পক্ষে সকলেই নমস্য, সকলেই সমান। অন্তঃপুরের মর্যাদা যাহারা লঙ্ঘন করে

তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেলাই আমার ধর্ম, তা সে রাজাই কেন হউন না। আমার পিতৃপিতামহেরা এই শিক্ষা দিয়াছেন যে রাজা সমস্ত সংসারের রাজা হইতে পারেন, কিন্তু অন্তঃপুরে তিনি স্বতন্ত্র নহেন। কঞ্চুকী রাজার অন্ন খায় না, খায় রানীর অন্ন। তাই আমি কুলূতরাজদুহিতার রহস্য জানিবার জন্য কোনও চেষ্টা করি নাই।

'একদিন রানী আমাকে নিজে ডাড়াইয়া লইলেন আর আদেশ দিলেন যে মহারাজকে যেন জানাইয়া দিই, মহামায়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। আমি আশ্চর্য, দুঃখ ও জিজ্ঞাসার ভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। তিনি গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং এক সিন্দুরলিপ্ত ত্রিশূলে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। লোধ্র-পুষ্পের বনে প্রস্ফুটিত চন্দ্রমল্লিকার মত তাঁহার মুখ চকিত ও ব্যাকুল দেখা যাইতেছিল। পতিশোকাতুরা রতির মত ঐ বৈরাগ্যবেশেও তাঁহাকে কমনীয় দেখা যাইতেছিল। তাঁহার সেই রূপ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি শান্তভাবে ছিলেন। অতিশয় স্নেহ ও আদরের সহিত তিনি আমাকে পুনরায় মহারাজের নিকট যাইতে বলিলেন। বলিলেন—"আর্য বাভ্রব্য, আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি। আমার মন অন্তঃপুরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, শরীর ভিতরে থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি। মহারাজ যদি আমাকে অনুমতি দেন তবে আমি অন্তঃপুর ছাড়িয়া দিব, অনুমতি না দিলে এখানেই পড়িয়া থাকিব, কিন্তু এখন আমি গৃহস্থ হইয়া থাকিতে পারি না। ডাক আসিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আপনি মহারাজকে এই সংবাদ দিয়া দিন।"

'আমি জোড়হাতে নিবেদন করিলাম, "দেবি, আপনার এই বেশ দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সংসার আপনাকে কোথায় বাধা দিয়াছে যে আপনি সংসার ছাড়িয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন? আমি অবশ্যই মহারাজকে আপনার সংবাদ দিব কিন্তু বৃদ্ধের অপরাধ ক্ষমা করিবেন দেবী, আমি জানিতে চাই যে এই কঠোর সংকল্পের কারণ কি? মহারাজ কি আপনার মর্যাদার বিরোধী কোন আচরণ করিয়াছেন?"

'রানীর শান্ত মুখমণ্ডলের উপর সহজ হাসির রেখা খেলিয়া গেল। বলিলেন—"না আর্য, মহারাজ কোনও অনুচিত আচরণ করেন নাই। তিনি যথাসাধ্য আমাকে সন্তুষ্ট রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি আমাকে সংসার ছাড়িতেই হইবে। ত্রিপুরসুন্দরীর ইহাই ইচ্ছা। আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে যে ডাক শুনিয়াছি তাহা উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। ধ্যানে দেখুন, আর্য! ত্রিপুরসুন্দরীর মূর্তি হাসিতেছে। ইহা মহা অনর্থের সূচনা করে। আমি যদি এ সময় মহারাজার সহিত সম্বন্ধ ভাঙিয়া না দিই তবে তাঁহার অমঙ্গল

নিশ্চিত।" রানীর কথা শুনিয়া আমি খুব মন দিয়া মূর্তিটি দেখিলাম, কিন্তু কোথাও হাসির ভাব দেখিতে পাইলাম না। মুহূর্তের জন্য আমার মনে প্রশ্ন জাগিল, রানীর চিত্তবিক্ষোপ হয় নাই তো। রানী আমার কথা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—"আপনি দেখেন নাই আর্য? মন দিয়া দেখুন!"

'কি দেখিব! মূর্তি নিত্য যেমন, তেমনই দেখাইতেছে, কিন্তু রানীর মন রাখিবার জন্য বলিয়া দিলাম যে সত্যই মূর্তি হাসিতেছে। রানী প্রসন্ন হইলেন। পুনরায় সমাদর করিয়া বলিলেন—"আর্য বাভ্রব্য, মহারাজের সহিত বিবাহ হইবার পূর্বেই আমার বাগ্‌দান হইয়া গিয়াছিল। আমার পিতা কুন্তলরাজ নহেন। আমি অপহৃতা বালিকা। ছলনা করিয়া আমার বিবাহ ধূর্তেরা মহারাজার সঙ্গে করাইয়া দিয়াছিল। এই অন্তঃপুরে আমি অনেক কাঁদিয়াছি। মহারাজাকে আমি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলাম যে আমি তাঁহার পত্নী নই। যাঁহার নিকট আমি পিতা কর্তৃক বাগ্‌দত্তা আমি তাঁহারই পত্নী। মহারাজ আমার মনোভাবের মর্যাদা দিলেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহে ও সৌজন্যে আমাকে রাখিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে পত্নীরূপে পাইবার মোহ ছাড়িতে পারেন নাই। যে যুবককে আমার পিতা আমার পতিরূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন সে নিরাশ হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া গেল। সে বিন্ধ্যমেখলার ধূম্রগিরিতে না জানি কি তপস্যা করিতেছে। আর্য, আমি বরাবর তাহার ডাক শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু কাল রাত্রে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা রোমাঞ্চকর। আমাকে সংসার ত্যাগ করিতেই হইবে। আপনি মহারাজকে সংবাদ দিন। বিলম্ব হইলে অনর্থ হইয়া যাইবে।' আমি মাথা নোয়াইয়া অনিচ্ছায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম!"

ভট্টিনী মধ্য পথে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রানীর নাম ছিল মহামায়া, না আর্য?' বাভ্রব্য স্বীকার করিলে তিনি বিস্মিত হইয়া আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। নিপুণিকা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল—'আশ্চর্য!' বৃদ্ধ বলিয়া চলিলেন—

'মহারাজ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই রানীর কাছে যাইবেন বলিয়া উৎকণ্ঠা দেখাইলেন। তাঁহার আদেশে আমিই তাঁহাকে লইয়া রানীর নিকটে আসিলাম। মহারাজা রানীকে সন্ন্যাসবেশে দেখিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"দেবি, অন্তঃপুরের বিরোধী বেশ ধারণ করিবার কি কারণ আজ উপস্থিত হইয়াছে? আমার অজ্ঞাতসারে কোনও অপরাধ হইয়াছে কি?"

'মহামায়ার মুখের উপর কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি শান্তভাবে বলিলেন—'মহারাজ, আজ পর্যন্ত আমি নিজের ভিতরে যে সংঘর্ষ চলিতে দিয়াছি তাহা আজ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরসুন্দরীর আদেশ আজ পাওয়া গিয়াছে। যদি ইহার পরও আমি আপনার অন্তঃপুরে বন্দী অবস্থায় থাকি তাহা

হইলে অমঙ্গল নিশ্চিত। দেখুন মহারাজ, ভাল করিয়া দেখুন, দেবীমূর্তি আজ হাসিতেছে। এরূপ অমঙ্গলের চিহ্ন আমি প্রথমে কখনও দেখি নাই। মহারাজ, আমি রাত্রে দেবীর দর্শন পাইয়াছি। বিন্ধ্যমেখলার ধূম্রগিরি হইতে আমাকে আকর্ষণ করিবার জন্য বড়ই সবল আকর্ষণ-বাণী শোনা যাইতেছে। দেবী আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন, আমি আজই যদি মহারাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া না দিই, তাহা হইলে অমঙ্গলের চিহ্নে মহারাজের সর্বনাশ হইবে। মহারাজ, আমি দেখিয়াছি যে সহস্রফণায় অজগর সমস্ত মৌখরিবংশের প্রাধ শোষণ করিতেছে।”—বলিতে বলিতে রানীর গলা ধরিয়া আসিল। চোখ জলে ভরিয়া গেল, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। জানুপাত করিয়া তিনি বলিলেন—“অপরাধ ক্ষমা করুন মহারাজ, সন্ন্যাসিনী না হইয়া আমি আপনার সহিত সম্পর্ক ছাড়িতে পারি না। লোক ও শাস্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অন্য রাস্তা নাই।”

মহারাজ কিছুক্ষণ মর্মাহত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। পুনরায় বলিলেন, “আজ পর্যন্ত আমি তোমার কোনও ইচ্ছার বিরোধ করি নাই। শুধু একবার তুমি আমার ইচ্ছায় বাধা দিতে বিরত হও।” রানী কৃতজ্ঞতাপূর্বক বলিলেন—“কি ইচ্ছা, মহারাজ!”

...“দেবি, আমার সন্দেহ হইতেছে যে কোনও বশীকরণের অভিচারক্রিয়া কোথাও হইতেছে। ইহা আমার পাপচিত্তের কলুষচিন্তাও হইতে পারে, কিন্তু আমি সরল ভাবে নিজের চিন্তা প্রকাশ করিয়াছি। অনুমতি হইলে আমি একবার ধূম্রগিরি গিয়া সমস্ত কিছু দেখিয়া আসি। ততক্ষণ অন্তঃপুরে থাকিবার অনুগ্রহটুকু কর। আমার সঙ্গে বিশ্বাসী কোনও অনুচর পাঠাইতে পার।”

সন্ন্যাসিনী রানীর অধরে নিষ্ঠুর হাসি দেখা দিল। বলিলেন—“দেখিয়া আসুন মহারাজ, আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।”

“কিন্তু আমার নিজের উপর আমার বিশ্বাস নাই, দেবি। কারণ আমি প্রাণ দিয়াও তোমাকে অন্তঃপুরে রাখিতে চাই।”

“আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, মহারাজ।”

“না, তোমাকে নিজস্ব এক অনুচর আমার সঙ্গে অবশ্য পাঠাইতে হইবে।”

“তবে এই বৃদ্ধ বাভ্রব্য আপনার সঙ্গে যাইবে।”

মহারানীর আজ্ঞায় আমি মহারাজের সঙ্গে ধূম্রগিরি রওনা হইলাম। রথের সাহায্য অতি অল্প দূর পর্যন্তই পাইলাম। বিন্ধ্যমেখলায় প্রবেশ করিতে পায়ে চলা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

‘এক বিশাল গিরিখণ্ড নীচ হইতে উপর পর্যন্ত তৃণগুল্মহীন কপিশ

প্রস্তরে নির্মিত ছিল, শুধু সবচেয়ে উপরের পথে কঙ্কনরাজি দেখা যাইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন কোনও বিশাল অগ্নিপিন্ডের উপর ঈষৎ কালো রঙের ধোঁয়া ছাইয়া আছে। সুতরাং এই কারণেই ধূম্রগিরি নাম দেওয়া হইয়াছিল। পর্বতে আরোহণ করিবার শুধু একই পথ ছিল যাহা কাটিয়া পরিশ্রম করিয়া নির্মিত হইয়াছিল। পথে যোগিনীদের মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল, আর বিচিত্র তান্ত্রিক যন্ত্রও খোদাই করা ছিল। পর্বতের উপরে ছিল স্বচ্ছ জলের কুন্ড, তাহার উপর বড় বড় পাথর সাজাইয়া একটা সেতুর মত তৈরি করা হইয়াছিল। কুন্ডের এ পারে কিছু গুহা ছিল, অপর পারে ছিল ধূম্রেশ্বরীর মন্দির। মন্দির তো নামমাত্র। বাস্তবিক একটা গুহার ভিতর ছিল অন্তর্গুহা, তাহাতে দশভুজামূর্তি স্থাপনা করা হইয়াছিল। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল মন্দির। অত্যন্ত ক্লেশে আমরা ঐ মন্দির পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম। মন্দিরের দ্বারে এক যোগীর সঙ্গে দর্শন হইল। যোগী হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রে নির্মিত কন্থা ধারণ করিয়া ছিলেন, হাতে এক বক্র কাষ্ঠখন্ড। তাঁহার কণ্ঠ, বাহুমূলে ও কানে বড় বড় রুদ্রাক্ষ ঝুলিতেছিল, বিকট জটামন্ডল ঘিরিয়া এক বরাটক মালা লম্বিত ছিল, সম্মুখে এক লোহার কপালপাত্র রক্ষিত ছিল। তিনি আমাদের দুই জনকে দেখিয়াই বিকট হাস্য করিলেন। রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গ্রহবর্মা, তুই ভাগ্যহীন। ধূম্রেশ্বরীকে দর্শন কর, তোর ঘোর অনর্থপাত হইবে।"

'রাজার মুখমন্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। যদিও তিনি বীর ছিলেন এবং তাঁহার নামে সমস্ত উত্তরাপথ কম্পিত হইত, তথাপি যোগীর এই কথায় তিনি ভীত হইলেন। যোগী আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"তুই ভাগ্যবান্। যেদিন তুই বুঝিতে পারিবি যে যাহা তুই ধর্ম মনে করিস তাহা অধর্ম আর যাহা অধর্ম মনে করিস তাহা ধর্ম, সেদিন তুই ত্রিপুরসুন্দরীর সাক্ষাৎকার পাইতে পারিবি। যা, দর্শন করিয়া আয়।"

'মহারাজ হাত জোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোগিরাজ, আমি ত্রিপুর-সুন্দরীর দর্শন কবে পাইব?"

"তুই ভন্ড। এই কঞ্চুকী মূর্খ। এ ধর্ম অধর্মের বাঁধা রাস্তার উপর চলে। কোনও দিন এ সত্যের সাক্ষাৎকার পাইতেও পারে, কিন্তু তুই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করিস, তুই ধর্মভাব দেখাস। ভন্ড কোথাকার। যা, দর্শন করিয়া নে।"

'মহারাজ, এমন অভিভূত হইলেন যে যোগীর পায়ের উপর পড়িয়া গেলেন। বলিলেন—"যোগিরাজ, আমার ভন্ডামি কেন করিয়া কমিবে?"

'যোগীর মুখমন্ড উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"দেখ মহারাজ, তুমি নিজেকে বরাবর ধোঁকা দিয়াছ। রানীকে তুমি কখনও ছাড়িতে চাও নাই, কিন্তু তুমি কখনও তাহাকে আপন করিয়া লইবারও চেষ্টা কর নাই। বশীকরণ

দেখিতে আসিয়াছ? বশীকরণ নিজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করাকে বলে। তুমি নিজেকে নিঃশেষভাবে দিয়াও দেও নাই, অন্যকে নিঃশেষভাবে পাইবার চেষ্টাও কর নাই। যাও, ভিতরে যাও। তুমি বশীকরণ দেখিতে পারিবে। যাও—শীঘ্র যাও।"

'অন্তর্গুহায় দশভুজার মূর্তি ছিল। মূর্তির সম্মুখে এক কঙ্কালসার মনুষ্য নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল। সে হয়তো কত বৎসর স্নানও করে নাই। ভোজনই বা তাহার কয়দিন জুটিয়াছিল কি জোটে নাই তাহা কে জানে! যোগী বলিলেন—"দেখ, বশীকরণ চলিতেছে। ভিতরে যাও, আরও ভিতরে।"

'যেমন যেমন আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকিলাম, তেমন তেমন দশভুজা মূর্তিতে পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করিল। শেষে যখন আমরা সেই যুবক তপস্বীর নিকটে পৌঁছিলাম তখন মূর্তি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া রানী মহামায়াতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! ভয়ে বিস্ময়ে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মহারাজও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। যোগী পুনরায় উসকাইয়া বলিলেন—"কি দেখিতেছ মহারাজ, দেবীকে প্রণাম কর, তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া যাইবে।" মহারাজের সারা শরীর বাহিয়া স্বেদধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি কাতর চীৎকার করিয়া বসিয়া গেলেন ও ধীরে ধীরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। আমি ত্রাহি ত্রাহি করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার ডাকে যুবা তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। যোগী আমাকে আশ্বাস দিতে দিতে বলিলেন—"ভয় করিও না, দেবীকে প্রণাম কর।" আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম। যোগীরাজ যুবককে কি একটা নাম ধরিয়া ডাকিলেন। এ নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। নাম ছিল একটা কিছু বিকটধরনের। ঐ শীর্ণ যুবক তপস্বী আশ্চর্যের সঙ্গে আমাদের দুইজনকে দেখাইল। যোগিরাজ বলিলেন—"বৎস, এই হইল গ্রহবর্মা আর ঐ তাহার কঞ্চুকী।" যুবকের চক্ষে বিচিত্র প্রেমভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল—"গ্রহবর্মা! ওঃ!!" আর ধীরে ধীরে মহারাজের কপালের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। মহারাজকে সেখান হইতে উঠাইয়া আমরা কুণ্ডের উপরে লইয়া আসিলাম। কিছু সেবাশুশ্রূষার পর যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন যোগিরাজ বলিলেন—"ভুল হইয়াছে মহারাজ, তুমি দেবীকে প্রসন্ন করিতে পারিলে না। বাড়ি ফিরিয়া যাও। মৌখরিবংশের ভবিষ্যৎ ভাল নয়। যদি কোনও দিন তুমি ত্রিপুরসুন্দরীর রূপ দেখিতে পারিতে! মহামায়াকে তুমি দেবীরূপে পাইতে পার নাই, কিন্তু দেবীকে তুমি মহামায়ার রূপে দেখিয়া লইয়াছ। চেষ্টা কর, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে দেবীকেও কোনও দিন দেখিতে পারিবে, কিন্তু মৌখরিরাজলক্ষ্মীর এখন আর ভরসা নাই। তুমি বেশি দিন

বাঁচিতে পারিবে না, কিন্তু তোমাকে অন্য বিবাহ অবশ্যই করিতে হইবে। দেবী কাল রাত্রে বলিয়াছেন যে সমগ্র আর্যাবর্ত ভস্ম হইতে যাইতেছে। মহামায়াই ইহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে। তুমি তাহাকে আটকাইও না।"

'আমার প্রতি তাকাইয়া যোগী বলিলেন—"মৌখরিবংশের অমঙ্গল দূরে করিবার জন্য আমি যে লাঠি ফেলিয়াছিলাম তাহা তুই নিজেরই উপরে লইয়াছিলি! মূর্খ কণ্চুকী, প্রমাদবশে তুই কি অনর্থ করিয়া ফেলিলি! কিন্তু তোর ভুলে কোনদিন আর্যাবর্তের কল্যাণ হইতে পারে। যা, বাড়ি ফিরিয়া যা।"

'মহারাজ নীরবে শুনিতে থাকিলেন। যুবা তপস্বী এক দৃষ্টে মহারাজার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি গোল গোল কড়ির মত, তাহাদের মণি হইতে জ্যোতির মত বাহির হইতেছিল। তিনি নড়িলেন না, মুখে কিছু বলিলেন না, বিচলিতও হইলেন না। মহারাজ উঠিলে যুবা তাপসের নেত্র কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরিয়া গেল। মহারাজার উপর ইহার প্রভাব পড়িল। কিন্তু তিনিও মৌনই রহিলেন।

'ফিরিবার সময়ে মহারাজ বরাবর নীরবে থাকিলেন। না জানি তিনি কি না কি ভাবিতেছিলেন। নগরে প্রবেশ করিতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাভ্রব্য, তুমি কি দেখিলে!" আমি সসম্ভ্রমে উত্তর দিলাম—"দেব, মহাদেবীই ধূম্রেশ্বরী!" মহারাজ ধমক দিয়া বলিলেন—"মূর্খ!"

'আমি চুপ করিয়াই রহিলাম। মহারাজ আবার প্রশ্ন করিলেন—"বাভ্রব্য, ইহা কি বশীকরণের অভিচার ছিল না?"

"অভিচার!"

"হাঁ, অভিচার! আমি এই ভণ্ড তান্ত্রিকদের মায়ায় ফাঁসিতে পারি না। আমি ছাড়িতে পারি না। সে যে মৌখরিবংশের লক্ষ্মী!"

'বাড়ি ফিরিয়া মহারাজ রানীকে না জানি কি কি বুঝাইলেন। সন্ধ্যাকালে গোধূলির সময় মহামায়া রানী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে আমি সমস্ত কথা যেমন যেমন হইয়াছে শুনাইয়া দিলাম। মহামায়া চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোগিরাজ কি আমাকে আটক না করিবার কথা বলিয়াছিলেন?" আমি বলিলাম, 'হাঁ দেবি, যোগীরাজ মহারাজকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে রানীকে আটক করিও না।' মহামায়া কিছুক্ষণ চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"বাভ্রব্য, আমাকে ধূম্রাগিরি যাইতে দাও। মহারাজ মোহগ্রস্ত, সত্যকে দেখিতেছেন না। তোমরা চেষ্টা করিয়া তাঁহার অন্য বিবাহ দাও। আমাকে বন্দী করিয়া রাখিলে আজই মৌখরী-লক্ষ্মী রুষ্ট হইবেন। শীঘ্র কর!"

'আমি রানীকে অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে দিলাম!

'পরের দিন মহারাজ যখন ডাকিলেন তখন আমি সমস্ত কথা যেমন যেমন ঘটিয়াছিল তেমন তেমন বলিয়া দিলাম। মহারাজ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন আমাকে শুধু এইটুকুই বলিলেন, "যাও, নিজের কাজ কর।"

এই পর্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ বাভ্রব্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ভট্টিনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'কন্যা, যদিও আমি মহারাজের সম্মুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম, তথাপি আমার ভিতর হইতে সর্বদা এই ধ্বনি বাহির হইতেছিল যে আমি উচিত কাজই করিয়াছি। আজ বুঝিতে পারিতেছি যে আমার দ্বিতীয় প্রমাদও ভালই হইয়াছে।' এই পর্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন। সস্নেহে তিনি ভট্টিনীর কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অনেক-ক্ষণ ধরিয়া সেখানে সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিল। শেষে বৃদ্ধই উপসংহার করিলেন। বলিলেন—'আর্যাবর্ত সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবে। দেবপুত্রনন্দিনী ও মহামায়া ভৈরবী তাহাকে রক্ষা করিবেন। যোগীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইবে না। সিদ্ধবাক পুরুষের বাণী মিথ্যা হয় না।' পুনরায় নিপুণিকার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'কন্যা, তুমি ধন্য। আমি তোমাকে অনেক অভিশাপ দিয়াছিলাম। আজ আমি নিজের সমস্ত অভিশাপ বরদান বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। আজ স্পষ্ট দেখিতেছি যে যতই বিধি-বন্ধন আচার-নিয়ম থাকুক না কেন, তাহাতে ধর্মকে আঁটা যায় না। উহা নিয়ম হইতে বড়, আচার হইতে বড়। আমি যাহা ধর্ম মনে করিতেছিলাম তাহা সর্বদা ও সকল অবস্থায় ধর্মই ছিল না, যাহা অধর্ম মনে করিতেছিলাম তাহাও সর্বদা ও সব অবস্থায় অধর্মই বলা যাইতে পারে না। যোগী আমাকে বলিয়াছিলেন, যে দিন তুই ধর্মকে অধর্ম ও অধর্মকে ধর্ম বুঝিতে পারিবি, সেই দিন ত্রিপুরসুন্দরীর সাক্ষাৎকার পাইতে পারিবি। আশ্চর্য!

নিপুণিকা কৃতজ্ঞভাবে বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বলিল—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আর্য। মৌখরি-নরেশকে যোগী অন্য একটা বিবাহ করিবার জন্য কেন বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে আর্যা রাজ্যশ্রীর মত সাধ্বীর জীবন কি ব্যর্থ হইয়া যায় না? বৈধব্য হইতে বেশি ব্যর্থতা স্ত্রীজাতির পক্ষে আর কি হইতে পারে?' বৃদ্ধ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ছিঃ নিউনিয়া, এমন কথাও বলে! রাজ্যশ্রীর জীবন ব্যর্থ হইয়াছে? মূর্খ কন্যা, সার্থকতার অর্থ কি? যোগী ঠিকই বলিয়াছিলেন, নিজেকে নিঃশেষভাবে দিয়া দেওয়ার নামই বশীকরণ। শেষ জীবনে মৌখরি রাজা এই সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন। দেখ কন্যা, মানুষ যতখানি দেয়, ততখানিই পায়। প্রাণ দিলে প্রাণ পায়, মন দিলে মন মেলে। আত্মদান এমন বস্তু যাহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই সার্থক করে। রাজ্যশ্রী উহা দানও করিয়াছিল, উহা পাইয়াছিলও। লৌকিক

মানদণ্ডে আনন্দ নামক বস্তু মাপা যায় না। দুঃখ তো শুধু মনের বিকল্প, মনুষ্য তো নীচ হইতে উপর পর্যন্ত কেবল পরমানন্দস্বরূপ। নিজেকে বিশেষ-ভাবে দিয়া দেওয়াতেই দুঃখ চলিয়া যাইতে থাকে, পরমানন্দ পাওয়া যায়। এই যোগীর কথা আমার নিকট বড়ই ভাবপূর্ণ লাগিয়াছিল। আমি আরও একবার তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম, কিন্তু ভালমানুষটি আমাকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। শুধু একবার বলিয়াছিলেন, 'মূর্খ, তুই যদি দুঃখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতিস!' কোথায় গ্রহণ করিয়াছি, কন্যা!'......

কিছুক্ষণ পর্যন্ত আবার সমস্ত নীরব। জিজ্ঞাসা করিলাম—'আর্য, তাপস-যুবার নাম কি অঘোরভৈরব ছিল?'

বৃদ্ধ বিস্মিত আনন্দের সঙ্গে বলিল—'হাঁ ভট্ট, বিকট নাম।'

নিপুণিকা ভট্টিনীর দিকে তাকাইল। ভট্টিনীর হরিণীর মত নেত্র বিস্ফারিত হইয়া কর্ণমূল পর্যন্ত পেঁাছিল। তিনি বলিলেন—'আশ্চর্য, অদ্ভুত!' আর আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া আবিষ্ট ভাবে দেখিতে থাকিল। নিপুণিকা সর্বহারার মত দাঁড়াইয়া থাকিল। অল্পক্ষণ পর্যন্ত তাহার মধ্যে স্পন্দনের লেশমাত্র অনুভব করা গেল না। পুনরায় স্বপ্নোত্থিতার মত সে বলিয়া উঠিল -'নিজেকে নিঃশেষভাবে দিয়া ফেলাই বশীকরণ।'

বিংশ উচ্ছ্বাস

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আর বেশি কান্না কাঁদিব না। কিন্তু অদৃশ্য শক্তি দ্বারা মানুষের জীবন গড়িয়া ওঠে। যদি নিয়তি-নটীর অভিনয় নিজের আয়ত্তে থাকিত, তাহা হইলে মানুষের প্রতিজ্ঞাও টিকিত। কি করিয়া বলি যে এই বিংশ উচ্ছ্বাস আমার দুর্ভাগ্যের ক্রন্দন নয়? আর ইহাও কি করিয়া বলি যে ইহাতে আমার চরম সৌভাগ্য প্রকট হয় নাই? বস্তুত ইহা আমার পরম লাভই বটে, ইহা বাড়াইয়া কি লিখিব?

মহারাজাধিরাজ তাঁহার নবীন নাটিকা ভট্টিনীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নাটিকাটির নাম রত্নাবলী। ধাবক এই নাটিকার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভট্টিনী ও নিপুণিকা বিশেষ আগ্রহের সহিত নাটিকাটি পড়িলেন। তাঁহাদের ইহা ভাল লাগিয়াই থাকিবে, কারণ একদিন তাঁহারা ইহা প্রকাশ করিলেন যে যদি মহারাজের অনুমতি হয় ও আমি প্রসন্ন হই, তবে এই নাটিকা অভিনয়

করিয়া মহারাজাধিরাজকে দেখানো যায়। আমি এদিকে অনেক দিন ধরিয়া নানা উৎসবে মাতিয়া ছিলাম। চারুস্মিতা ও বিদগ্ধপাঙ্গার নৃত্যগীতে নগরে অপূর্ব মাদকতার সঞ্চার হইয়া গিয়াছিল, ইহার মধ্যে সংবাদ আসিল যে আচার্য ভর্বুপাদ আসিতেছেন। মৌখরিদের ব্রাহ্মণ-গুরুর আগমন সংবাদে জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া গেল। এ সংবাদে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী বসুভূতির বড় কষ্ট হইল। নগরে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে সদ্ধর্মীরা ভর্বু শর্মাকে বধ করিবার সংকল্প করিয়াছে। স্থাণ্বীশ্বরে এই সংবাদ অরণ্যানীতে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। বড়ই বিকট সময়ে জনসাধারণের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন হইল। ঘটনাসূত্রে আমার অগ্রজ উড়ুপতি ভট্ট সেই সময়ে কাশী হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। কুমার কৃষ্ণবর্ধন এই সময়ে বড় ক্লান্ত ছিলেন। তিনি জানিতেন, ভর্বু শর্মাকে অপ্রসন্ন করিলে এই সময়ে বড় অনর্থের সম্ভাবনা। তিনি বার বার মহারাজাধিরাজের সঙ্গে দেখা করিতেন, কিন্তু কোনও যুক্তি ভাবিয়া পাইতেন না। হঠাৎ একদিন তিনি আমাকে ও আমার অগ্রজ উড়ুপতি ভট্টকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমরা যখন তাঁর বাড়ীতে গেলাম তখন তিনি অতিশয় সম্মানের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। উড়ুপতি ভট্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আর্য, মহারাজাধিরাজ স্থির করিয়াছেন যে বৌদ্ধপণ্ডিত বসুভূতির সঙ্গে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৃত কোনও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের শাস্ত্রার্থবিচার করা হইবে। এখানকার কান্যকুব্জ-পণ্ডিতেরা আপনাকে এই তর্ক-সভায় প্রতি-পক্ষরূপে বরণ করিতে চান। আপনি কি বসুভূতিকে শাস্ত্রার্থবিচারে পরাজিত করিতে পারেন? আপনার জয়ের উপরই এখানকার ব্রাহ্মণদের মান-সম্মান সমস্ত নির্ভর করে, সমগ্র আর্যাবর্তের ভবিষ্যৎও নির্ভর করে।' উড়ুপতি কোন ইতস্তত বা সংকোচ না করিয়াই উত্তর দিলেন যে তিনি সম্মত আছেন। কুমার তাঁহাকে লইয়া মহারাজাধিরাজের নিকটে চলিয়া গেলেন। আমি ভট্টিনীর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে উড়ুপতি ভট্ট ও বসুভূতির শাস্ত্রবিচার অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। পরের দিন নগরে ঢোল পিটাইয়া দেওয়া হইল যে শাস্ত্রার্থবিচারে উড়ুপতি ভট্ট বিজয়ী হইয়াছেন এবং মহারাজাধিরাজের পুনরায় ব্রাহ্মণধর্মে আস্থা হইয়াছে। মহারাজ গ্রহবর্মার সময়ে যেমন ছিল ঠিক তেমন করিয়া এখন হইতে রাজসভায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সম্মান হইবে। মহারাজাধিরাজ প্রায় একশত সামাধ্যায়ীকে নূতন করিয়া ভূমিদান করিলেন। যদিও চতুর্বেদ, ত্রিবেদ ও দ্বিবেদ বলিয়া ব্রাহ্মণদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হইবে। ভর্বুশর্মার বংশধর এখন বালক। তিনি এ পর্যন্ত দুইটি বেদই অভ্যাস করিয়াছেন, কিন্তু এই দ্বিবেদের তেমনই সম্মান করা হইবে যেমন সম্মান করা হয় চতুর্বেদীয় ও

ত্রিবেদীয় ব্রাহ্মণদের। বৌদ্ধমঠের জন্য যে দান করা হইয়াছিল তাহাও পূর্ববৎ বজায় রহিল। মহারাজাধিরাজ সকলকে সমান ভাবে সম্মান করিবেন স্থির করিলেন। এতদিন পর্যন্ত রাজারা নিজেদের তেজ ও প্রতাপের পরিচয় দিতে গিয়া বিক্রমাদিত্যের নাম ধারণ করিতেন। আজ হইতে মহারাজাধিরাজ সকলের ক্লেশ শান্তি করিয়াছেন বলিয়া 'নরেন্দ্র-চন্দ্র' নাম ধারণ করিবেন। তাঁহাদের প্রতাপে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিবে। এই ঘোষণা জনসমাজে অপূর্ব বিজয়-উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। নগরের রাজপথগুলি 'নরেন্দ্রচন্দ্রে'র জয়-জয়কারে মুখরিত হইয়া উঠিল। উল্লাসের কোলাহল এত দূর উঠিয়াছিল যে সমস্ত নগর উন্মত্তের মত নাচিয়া উঠিল। ইহারই পৃষ্ঠভূমিতে আচার্য ভর্বুপাদের আগমন। ভট্টিনীর আনন্দ আজ বাঁধ ভাঙিয়া দিতে চাহিতেছিল। সহজ-গম্ভীর ভট্টিনী আজ ক্ষুদ্র বালিকায় রূপান্তরিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ ও ভর্বুশর্মার আগমন উপলক্ষে রত্নাবলী নাটিকা অভিনয় করিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। মহারাজ শুধু অভিনয়ের অনুমতিই দেন নাই, তাহার মধ্যে যথেচ্ছ পরিবর্তনের অধিকারও আমাকে ও ধাবককে দিয়াছিলেন। আমি এদিক ওদিক অল্প-স্বল্প পরিবর্তন করিয়াও দিয়াছিলাম। এক শ্লোকে আমি বড় চতুরতার সহিত নিজের নামও যোগ করিয়া দিয়াছিলাম। শ্লোকটি ছিল নাটকের আরম্ভেই। তাহাতে আমি আমার 'দক্ষ' নামটি সুকৌশলে জুড়িয়া দিয়াছিলাম :

শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী
লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্ ।[১]

শ্লোকটি মহারাজার খুবই পছন্দ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অন্যান্য নাটকের মধ্যেও উহা জুড়িয়া দিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ কথা, উহাতে মহারাজাধিরাজের ঘোষণা যোগ করা হইয়াছিল। তাহার প্রভাব জনতার উপর ভাল হইয়াছিল, আচার্য ভর্বুপাদের উপরও হইয়াছিল। অভিনয়ের দিন সূত্রধার যখন গদ্‌গদকণ্ঠে পড়িলেন :

জিতমুড়ুপতিনা নমঃ সুরেভ্যো দ্বিজবৃষভা নিরুপদ্রবা ভবন্তু।
ভবতু চ পৃথিবী সমৃদ্ধশস্যা প্রতপতু চন্দ্রবপুর্নরেন্দ্রচন্দ্রঃ ॥[২]

তখন আচার্যদেব সাধু সাধু বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। আচার্যদেবের সাধুবাদ হইতে সভায় উপস্থিত লোকেরা অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

কিন্তু নাটকের পাত্রনির্বাচন বড় কঠিন। আমার অনুরোধে চারুস্মিতা রত্নাবলীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন। তিনি বর্ণিকাভঙ্গে

---

১ রত্নাবলী, প্রস্তাবনা
২ ঐ

অদ্ভুত কৌশলী ছিলেন। উহা প্রস্তুত করিতে মোটেই পরিশ্রম হয় নাই। নিপুণিকা স্বয়ং 'বাসবদত্তা' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য উৎকণ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। আমি নিজে রাজা সাজিয়াছিলাম। ধাবক তো পূর্ব হইতেই তৈয়ারী বিদূষক। আরও কিছু পাত্র এদিক ওদিক হইতে জুটিয়া গেলেন। এই অভিনয়ে ভট্টিনী তো অপূর্ব উৎসাহ অনুভব করিতেছিলেন। অভিনয়ের দিন তিনি কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া এই প্রসঙ্গেই আসিতেন। একবার আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'দেবি, এই নাটিকায় এমন কি আছে যাহা আপনাকে মুগ্ধ করিয়াছে ?' উত্তরে তিনি শুধু হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু নিপুণিকা এতটা গম্ভীর থাকিতে পারে নাই। সে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিল—'ভট্ট, তুমি দেখ না কি যে বাসবদত্তা কেমন করিয়া দুই বিরোধী দিকে প্রবহমান প্রেমকে একসূত্রে করিয়া দিল? প্রেম এক ও অবিভাজ্য, শুধু ঈর্ষা ও অসূয়া আসিয়া উহাকে বিভাজিত করিয়া ছোট করিয়া দেয়!' তখনও যদি আমি নিপুণিকার কথা গভীরভাবে বুঝিতাম তবে যে অনর্থ আমার জীবনকে উজাড় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা হয়তো বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কর্তব্য আমার চোখেই পড়ে না, আর এখন তো কি আর পড়িবে!

যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই ছিল। অভিনয় বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। বাসবদত্তার ভূমিকায় নিপুণিকা তো সকলকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার হর্ষ, শোক ও প্রেমের অভিনয়ে বাস্তবিকতা ছিল। হতভাগ্য আমি, সর্বদা উহা অভিনয়ই মনে করিয়াছি, কিন্তু উহা কোথাও কোথাও অভিনয় হইতে বেশি ছিল, ভিন্ন ছিল। এই বাস্তবে নিপুণিকা নিজেকেই উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছিল। শেষ দৃশ্যে যখন সে রত্নাবলীর হাত আমার হাতে দিতে লাগিল তখন সত্যই বিচলিত হইয়াছিল। সে মাথা হইতে পা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার শরীরে এক একটি শিরা শিথিল হইয়া গেল। ভরতবাক্য শেষ হইতে হইতেই সে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল। নাগর জন যখন সাধু সাধু বলিয়া আনন্দধ্বনিতে দিগন্তর কাঁপাইতেছিল তখন যবনিকার অন্তরালে নিপুণিকার প্রাণ বাহির হইতেছিল। ভট্টিনী দৌড়িয়া তাহার মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন। আর হরিণীর মত কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'হায় ভট্ট, অভাগিনীর অভিনয় আজ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রেমের দুইটি দিক সে একসূত্র করিয়া দিয়াছে!' এই বলিয়া আছাড় খাইয়া তিনি নিপুণিকার মৃতদেহের উপরে লুটাইয়া পড়িলেন! অভিনয় করিয়া যাহাকে পাইয়াছিলাম, অভিনয় করিয়াই আমি তাহাকে হারাইলাম!

ধাবক সেকথা এক মুহূর্তে বুঝিয়া ফেলিল, যাহা আমি সারা জীবনেও বুঝিতে পারি নাই। সে যবনিকা ফেলিবার কার্যে বড়ই ক্ষিপ্রতার পরিচয়

দিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ ও আচার্য ভর্বুপাদ এই দুর্ঘটনার সেদিন আদৌ কোনও সংবাদ পান নাই। পৌরজনের আনন্দোল্লাসে রঙ্গমঞ্চে এতটুকু ব্যতিক্রম হইতে পারে নাই। ধাবক ভট্টিনীকে সেখান হইতে বড়ই কৌশলে সরাইয়া বড় ক্ষিপ্রতার সহিত নিপুণিকার শব শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। আমিই মুখাগ্নি করিলাম। ধাবকও শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিতে পারিল না। অভিভূত হইয়া সেও চিতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। যে মুখমণ্ডল হইতে শুধু আনন্দই উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত, তাহার উপর বিষাদের অন্ধকার প্রথমবার ছড়াইয়া পড়িল। যে জিহ্বা হইতে শ্রাবণের ধারার মত বাক্যের ধারা ঝরিতে থাকিত, তাহাতে যেন চাবি পড়িয়াছে। ধাবকের দশা বিচিত্র হইয়া গিয়াছিল। আমরা যখন চলিয়া আসিব তখন দেখি যে চারুস্মিতা এক শ্বেতশাড়ী পরিয়া হাতে পুষ্পস্তবক লইয়া উপস্থিত! সেই শ্বেতবস্ত্রে তাহার সৌন্দর্য আরও খুলিয়াছিল। মেঘমালা জলপূর্ণ হইলেও দেখিতে মনোহর, জলরিক্ত হইলেও তেমনি মনোহর। চারুস্মিতার চক্ষে ছিল শ্রদ্ধার জ্যোতিঃ। সে জানু পাতিয়া চিতাকে প্রণাম করিল, মূর্ধানিষক্ত অঞ্জলিপুট হইতে সুকুমার ভাবে অদৃশ্য স্বর্গগামিনীকে লক্ষ্য করিয়া পুষ্পস্তবক নিবেদন করিল। ধাবকের চক্ষুর সুখ অশ্রু এখন বহিয়া চলিল। আমার অবস্থা যে কী হইয়াছিল তাহা কি করিয়া বুঝাই! আমার দশ দিক শূন্য মনে হইতেছিল, ব্যোমমণ্ডল কুলালচক্রের মত ঘুরিতেছে মনে হইতেছিল। চারুস্মিতা আমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিয়াছিল—'চলুন আর্য, এই নশ্বর জগতে ইহাই এক শাশ্বত সত্য। নিপুণিকা ছিল স্ত্রীজাতির ভূষণ, সতীত্বের মর্যাদা, আমাদের মত উন্মার্গগামিনী নারীদের পথপ্রদর্শিকা।' চারুস্মিতার চক্ষে এক করুণকোমল ভাব দেখা দিল। ধাবক দীর্ঘকালব্যাপী মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিল- 'হাঁ ভদ্রে, চলুন।' আমি ধীরে ধীরে ধাবক ও চারুস্মিতার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইলাম। পথে শুধু একবার চারুস্মিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'পৃথিবী শুধু পাথরের প্রতিমার জন্য প্রাণ দেয়!' তাহার অন্তর্যামীই জানেন সে কোন অর্থে একথা বলিয়াছিল।

ভট্টিনীর স্কন্ধাবারে তখন শান্ত ভাব ছিল। আমি মনে মনে ভয় পাইতে-ছিলাম যে শোকসন্তপ্ত ভট্টিনীকে একা রাখিয়া আসিলে কোথাও আর কোনও অনর্থ না হইয়া যায়; কিন্তু সেই শান্তভাবে আমার মন খানিক আশ্বস্ত হইল। ভিতরে গিয়া দেখি যে ভট্টিনীর মাথা কোলে লইয়া সুচরিতা বসিয়া আছে। ইদানীং সুচরিতা নিত্যই প্রহররাত কাটিলে আসিত; সায়ংকালের

পূজা ও পতি ও গুরুর পরিচর্যা যথাবিধি সমাপ্ত করিবার পর তাহার সময় মিলিত। আজ আসিতেই সে নিপুণিকার মৃত্যুর সংবাদ শুনিল। সেই চিতায় ফুল দিবার জন্য যাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু ভট্টিনীর শোকব্যাকুল অবস্থা দেখিয়া থামিয়া গেল। ইহা ভালই হইল, না হইলে ভট্টিনীর তখন যে অবস্থা তাহাতে অনর্থ ঘটিবার আশংকা ছিল। সুচরিতা শান্ত স্পন্দহীন প্রতিমার মত বসিয়াছিল আর ভট্টিনী অর্ধশায়িত ভাবে তাহার কোলে শুইয়া স্থির-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। আমাকে তিনি দেখেন নাই। সুচরিতা ইশারা করিয়া আমাকে নীরবে বসিতে বলিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানে ঐ প্রকারের শান্ত ভাব বিরাজিত থাকিল। ভট্টিনীর চোখে জল ছিল না, অন্তর্বর্তী শোকাগ্নি তাহা একেবারে শুকাইয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার চক্ষু ন জানি কোন্ অনন্তের দিকে উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। অবশ ভুজলতা সুচরিতার কোলে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, শিথিল কবরী তাহার বামস্কন্ধে বিলুলিত হইয়াছিল। ভট্টিনীর এই নিদারুণ অবস্থা দেখিয়া আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। নিউনিয়া, তুমি এ কি করিলে! সমস্ত জীবন তিল তিল দিয়া যে পাষাণকে প্রসন্ন করিতে চাহিয়াছিলে তাহা শেষ পর্যন্ত পাষাণপিণ্ডই থাকিল, কিন্তু যে নবনীতপুত্তলিকা তুমি বল্কলের মত আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা কেমন হইয়া গেল! হায়, অভাগা বাণভট্টের এমন দিন দেখাও ভাগ্যে ছিল! আর্য বাভ্রব্য যেদিন বলিয়াছিলেন যে নিজেকে নিঃশেষ-ভাবে দিয়া দেওয়াই বশীকরণ, সেই দিন হইতে নিপুণিকার মধ্যে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। রত্নাবলীর বাসবদত্তার মধ্যে সে ঐ বৈশিষ্ট্যই দেখিয়াছিল। ছিঃ সরলে, বশীকরণের জন্য এ কেমন আত্মদান! আমি চক্ষু মুদিয়া স্পষ্টই দেখিতেছি, নিপুণিকা স্বর্গে প্রসন্নচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছে—'আমি কিছুই রাখি নাই; নিজের সব কিছু তোমাকে দিয়া দিয়াছি, ভট্টিনীকেও দিয়া দিয়াছি। দুজনের মধ্যে কোথাও কিছু বিরোধ নাই। প্রেমের পরস্পরবিরোধী দুই দিক একসূত্রে হইয়া গিয়াছে! হায়, সত্যই কি একসূত্রে হইয়া গিয়াছে!

ভট্টিনী ক্ষীণকণ্ঠে সুচরিতাকে ডাকিলেন, 'ভদ্রে সুচরিতে!'

'হাঁ, আর্যা'

'ভট্ট আসিয়াছেন?'

'আসিয়াছেন, দেবি।'

'ডাকিয়া দেও।'

'এখানেই আছেন।'

ভট্টিনী ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন। সুচরিতা থামাইতে

চেষ্টা করিলেন—'ধীরে, দেবি!' কিন্তু ভট্টিনী থামিলেন না, উঠিয়া বসিলেন। আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। ভট্টিনীর সে দৃষ্টি আমার মর্মস্থল ভেদ করিল। আমার চক্ষে যে অশ্রুধারা এ পর্যন্ত রুদ্ধ ছিল তাহা এখন বাঁধ ভাঙিয়া বহিতে লাগিল। সুচরিতাও কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু ভট্টিনী পূর্ববৎ যেন কিছু ভুলিয়া গিয়াছেন, যেন কিছু হারাইয়াছেন এই ভাবে তাকাইয়া রহিলেন। এই প্রকারে কিছুকাল কাটিল। পুনরায় বলিলেন—'ভট্ট, সে চলিয়া গিয়াছে। তুমি রহিয়া গিয়াছ, আমি রহিয়া গিয়াছি। হায় ভট্ট!'—এই বলিয়া তিনি অবশভাবে শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন। সুচরিতা ধীরে ধীরে তাঁহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল আর আমাকে পাখা দিয়া হাওয়া করিবার জন্য সংকেত করিল। ধীরে ধীরে ভট্টিনী ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সুচরিতা আমাকে স্কন্ধাবার হইতে বাহিরে যাইতে সংকেত করিল। বাহিরে ধাবক ও চারুস্মিতা তখনও চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সুচরিতা তাহাদিগকে দেখিলই না। সে আমাকে কিছুটা আশ্বস্ত করিতেও চেষ্টা করিল। তখনও তাহার স্বরে সুস্পষ্ট মধুর ধ্বনি পূর্বের মতই ছিল। যদিও তাহার ভিতরে ভিতরে তাহার প্রিয় সখীর সহিত দেখা না হওয়ার জন্য অতিশয় ক্ষোভ ছিল তাহা হইলেও সে মোটেই শোকে কাতর হয় নাই। সে খুব ভাল ভাবেই বলিল—'আর্য, নিপুণিকা ধন্য হইয়া গিয়াছে, তাহার শোক ত্যাগ করুন। তাহার বলিদান তখনই সার্থক হইবে যখন আপনি তাহার দানের সম্মান করিবেন। ভট্ট, ভগবানের মায়া বড়ই বিচিত্র। কে জানিত যে নিপুণিকা তাহার দুঃখময় জীবন দিয়া নারীত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবে! শোক করিবেন না আর্য, ভট্টিনীর সেবা করুন, যে অনর্থ হইয়া গিয়াছে তাহা নারায়ণের প্রসাদরূপে গ্রহণ করুন। কিছু শুভ তো হইবেই। ভট্টিনী বলিতেছিলেন যে নরলোক হইতে কিন্নরলোক পর্যন্ত একই রাগাত্মক হৃদয়ের সন্ধানের কাজ মধ্যপথেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেন বন্ধ হইবে আর্য! নিপুণিকার জীবনের বলিদান তখনই সার্থক হইবে যখন এই সন্ধান সফল হইবে। উষাকাল হইয়াছে, আমাকে প্রয়োজনীয় কার্যে যাইতে হইবে। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আপনি সাবধানে থাকিবেন। আমি এখন আসি।'

সে যখন যাইবার জন্য মুখ ফিরাইল তখন চারুস্মিতাকে দেখা গেল। সে কৃতাঞ্জলি হইয়া চারুস্মিতাকে নমস্কার করিল। সুচরিতা আমার দিকে তাকাইল। সে এই অপূর্ব সুন্দরীর পরিচয় জানিতে চাহিল। আমি সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম- 'কান্যকুব্জের নগরশ্রী চারুস্মিতা!' সুচরিতা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। অবিশ্বাসের স্বরে বলিয়া উঠিল—'চারুস্মিতা!'

চারুস্মিতা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল—'হাঁ দেবি, আমিই চারুস্মিতা।

অনুমতি হইলে আমি আজ ভাট্টিনীর সেবা করি।' সুচরিতার বিশাল নেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। বলিল—'আজ নয় ভগিনী, আজ ভাট্টিনীর নিকট ইঁহাকেই থাকিতে দেও।' চারুস্মিতার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল। ধাবক বুঝিতে পারিল। ধীর কণ্ঠে বলিল—'হাঁ ভদ্রে, আমাদের ভাট্টিনীকে সেবা করিবার আরও সুযোগ মিলিবে। অপরিচিতদের আজ সেখানে যাওয়া ঠিক নয়।' পুনরায় সুচরিতার দিকে তাকাইয়া ধাবক সবিনয়কণ্ঠে বলিল—'দেবি, চারুস্মিতা আর্য বেঙ্কটেশ ভট্টের দর্শন পাইতে ইচ্ছা করেন। আপনি কি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন?' সুচরিতা আরও বিস্মিত হইল, সে চারুস্মিতাকে মনোযোগ সহকারে দেখিয়া বলিল—'ভগিনী, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার কুটিরে আসিতে পারিবেন?' চারুস্মিতা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পাইলেন, তাঁহার অভীষ্ট বর লাভ হইল। তিনি গদ্‌গদভাবে বলিলেন—'হাঁ দেবি।' আর শ্রদ্ধায় মাথা নাড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুচরিতা চলিয়া যাওয়ার পর ধাবক ও চারুস্মিতাও বিদায় হইল। আমি একা ভাট্টিনীর নিকটে থাকিয়া গেলাম। আজ আমার হৃদয় খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইতেছিল। নিপুণিকাবিহীন ভাট্টিনীর কল্পনা আমি কখনও করি নাই। ভাট্টিনী তখনও ঘুমাইয়াই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি অঙ্গ অবসন্ন চৈতন্য-হেতু কাঁপিতেছিল। বস্তুতঃ তাঁহার চৈতন্যে তখন নিদ্রার ভাব কম, সমাধির ভাব অধিক, শুধু তাঁহার চিত্তবৃত্তিগুলি তাঁহার অদৃশ্য সহচরীর মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে প্রাতঃকাল হইয়া আসিল। ভাট্টিনী উঠিলেন, তাঁহার ক্লান্ত নেত্র কোণায় কোণায় ঘুরিয়া গেল; যেন যাহা হারাইয়াছেন তাহার জন্য কতখানি রিক্ততা হইয়াছে তাহার হিসাব করিলেন। শয্যা হইতে যখন উঠিলেন তখন মনে হইল কাহারও হস্তাবলম্বন খুঁজিতেছেন। আমি নিকটে গিয়া বলিলাম—'কি আজ্ঞা, দেবি।' ভাট্টিনী আমার হাতের সাহায্য লইয়া স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে স্নানের ঘর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম। তাহার পর নীরবে শয্যার নিকটে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরে ভাট্টিনীর পদসঞ্চার শোনা গেল। তিনি মহাবরাহ মূর্তির দিকে চলিয়া গেলেন। মুহূর্তকাল পরে তিনি ডাকিলেন। তাঁহার গলা ভরা; বলিলেন—'আজ মহাবরাহের স্তুতি আপনিই পড়ুন ভট্ট, আমি পড়িতে পারিতেছি না।'

গলা তো আমারও রুদ্ধ ছিল, কিন্তু ভাট্টিনীর আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে, একথা ভাবিয়া আমি ব্যাকুল কণ্ঠে সেই স্তব পড়িলাম। হে জলৌঘমগ্না, সচরাচর ধরার সমুদ্ধর্তা, এ তোমার কি পরিহাস! দীননাথ, ইহার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণকামনা লুকানো আছে? নিপুণিকা চলিয়া গিয়াছে, ভাট্টিনী

কর্তিতপক্ষ কোকিলার মত অবসন্ন। তোমার স্তব কে গাহিবে? যেমন তেমন করিয়া আমি পড়িলাম :

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা বিষাণকোট্যাখিল বিশ্বমূর্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা স মে স্বয়ংভূর্ভগবান্ প্রসীদতু॥

ভট্টিনী অবসন্ন হইয়া মহাবরাহের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। হায়, এ আবার অন্য কি অনর্থ? তাঁহার মুখমন্ডল প্রভাতকালীন চন্দ্রমণ্ডলের মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। আমি ভট্টিনীর মাথা কোলে লইয়া বসিলাম। মহাবরাহের জন্য নিবেদিত পবিত্র জলের দুই চার ফোঁটা মুখে ছিটাইয়া দিলাম আর সকাতরে প্রার্থনা করিলাম—'হে ভগবান্, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নাই, হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডগুরু, যে তুমি এখান হইতে টানিয়া আমাকে নরকের দ্বার পর্যন্ত লইয়া যাইতে চাও? হে ত্রিভুবনমোহিনী, তুমি ভট্টিনীকে বাঁচাও।' আমার প্রার্থনা ব্যর্থ যায় নাই, ভট্টিনী চোখ মেলিলেন। তিনি অবশভাবে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আমি উৎসাহ দিবার জন্য বলিলাম—'দেবি, উঠুন, কাতর ভাব আপনাকে মানায় না। নরলোক হইতে কিন্নরলোক পর্যন্ত প্রসারিত একই রাগাত্মক হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া বাকি আছে। আপনার সেবককে উচিত মার্গ প্রদর্শন করুন। নিপুণিকার জন্য শোক নাই, শোক আমার জন্য। আমাকে আরও অনাথ হইতে দিবেন না। উঠুন দেবি, আর্যাবর্তকে বাঁচাইতে হইবে, ম্লেচ্ছদেশকে বাঁচাইতে হইবে, মনুষ্যজাতিকে বাঁচাইতে হইবে। এই অবশভাব দেবপুত্রনন্দিনীকে শোভা পায় না।' ভট্টিনীর শিরায় শিরায় চৈতন্য-ধারা প্রবাহিত হইল। তিনি কোল হইতে মাথা উঠাইবার চেষ্টা করিলেন না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—'নীচ হইতে উপর পর্যন্ত একই রাগাত্মক হৃদয় প্রসারিত আছে। নিপুণিকা তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। কি বলিতেছেন ভট্ট, আপনি আমার সহায় হইবেন বলিয়া কথা দিতেছেন তো?' আমি অবিচলিত কণ্ঠে বলিলাম—'হাঁ দেবি, সেবক প্রত্যেক আজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত।'

ভট্টিনী উঠিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—'আর্যাবর্তের বিপদ এবারকার মত কাটিয়া গিয়াছে ভট্ট। আচার্য ভর্বুপাদ বলিয়াছেন যে, এই অল্প-কালের মধ্যেই মহামায়ার লক্ষ শিষ্য পুরুষপুরের অগ্রে একত্র হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশেরই কোনও শিক্ষা ছিল না, কোনও সংগঠন ছিল না; আমার পিতা তাহাদের সংগঠন করিবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কুভার অপর পারে দস্যুদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাকথিত ম্লেচ্ছদের হৃদয়ের পরিবর্তন এখনও হয় নাই। আপনি আমার সঙ্গে আসিয়া তাহাদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হন। হায় ভট্ট, নিপুণিকাকে আমার কথা কখনও বলাই হয় নাই। আমি তাহাকে

কখনও এই সত্যের প্রতি উন্মুখ করিতে পারি নাই। সে নিজের পথে চলিয়া গেল।

আমি ভট্টিনীর সঙ্গে যাইব বলিয়া কথা দিয়া দিলাম। উল্লসিত হইয়া ভট্টিনী ও তাঁহার সঙ্গে আমি একত্র মহাবরাহকে প্রণাম করিলাম। মহাবরাহ গোপন হাস্যে আমাদের উল্লাসকে তিরস্কার করিয়া থাকিবেন, কারণ নিপুণিকার শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইতেই আচার্য ভর্বুপাদ আমাকে পুরুষপুর যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনি স্পষ্টই আদেশ দিলেন যে ভট্টিনী ততদিন স্থাণ্বীশ্বরেই থাকিবেন। একথা শুনিবামাত্র ভট্টিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আনত চক্ষুকে আরও নত করিয়া তিনি বলিলেন—'শীঘ্রই ফিরিবেন।'

আমি কাতরকণ্ঠে বাষ্পরুদ্ধ বাক্য চেষ্টা করিয়া সংযত করিলাম। কিন্তু অন্তরাত্মার অতল গহ্বর হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল—'আবার কি দেখা হইবে?'

উপসংহার

'বাণভট্টের আত্মকথা'র এইটুকু অংশই পাওয়া গিয়াছিল। এই 'কথা' অসম্পূর্ণ, একথা তো স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমার সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, শুধু বাণভট্টের রচিত পুস্তকের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন অংশের সঙ্গে তুলনা করিলেই হইবে না, ভিতরের সাহিত্যপ্রতিভার সম্বন্ধেও পরীক্ষা করিতে হইবে। কাদম্বরীর রচনারীতির সঙ্গে আত্মকথার রচনারীতির উপরে উপরে অনেক মিল দেখা যায়, চক্ষুর প্রাধান্য ইহাতেও অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বেশি—রূপ, বর্ণ, শোভা, সৌন্দর্য ইহাতেও জমাটভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু এই পর্যন্ত আসিয়াই সাহিত্যিক পরীক্ষা শেষ হয় না। প্রত্যেক সহৃদয় পাঠক আত্মকথা মন দিয়া পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে আত্মকথালেখক যে সময়ে 'কথা' লেখা শেষ করিয়াছেন তখন তিনি সমস্ত ঘটনা জানিতেন না। আত্মকথা অনেকটা আজ-কালকার ডায়েরীর ভঙ্গীতে লেখা। মনে হইতেছে, যেমন যেমন ঘটনা অগ্রসর হইতেছে লেখক তেমনি তেমনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছেন। যেখানে তাঁহার ভাবাবেগের গতি তীব্র, সেখানে তিনি আসর জমাইয়া লেখেন, আর যেখানে দুঃখের আবেগ বাড়িয়া যায়, সেখানে তাঁহার লেখনী শিথিল হইয়া পড়ে। শেষ উচ্ছ্বাসগুলিতে তিনি যেন নিজেই নিজের মধ্যে ডুবিতেছিলেন। কথাটা আমার বিচিত্র বলিয়া মনে হইল। এই ধরনের রচনাভঙ্গী সংস্কৃত সাহিত্যে একেবারেই অজ্ঞাত। আমার একথা সন্দেহজনক বলিয়াও মনে হইল। আরও একটা কথা, কাদম্বরীতে প্রেমের অভিব্যক্তির মধ্যে এক জাতীয় দৃপ্ত ভাবনা ছিল, কিন্তু এই আত্মকথার মধ্যে সর্বত্র প্রেমের ব্যঞ্জনা গূঢ় এবং অদৃপ্তভাবে প্রকট। জানা যাইতেছে, এক স্ত্রীজনসুলভ লজ্জা সর্বত্র ঐ অভিব্যক্তিকে বাধা দিতেছিল। সমগ্র কথার মধ্যে নারীর শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিপূর্ণ ও সবল সমর্থন আছে। 'আত্মকথা'র আরম্ভ যে ভাবে হইয়াছে তাহাতে উহার স্বাভাবিক পরিণতি গূঢ় ও অতৃপ্ত প্রেমেই হওয়া সম্ভব। আমি আত্মকথার স্বাভাবিক বিকাশের দৃষ্টিতে ইহাতে কোনও বিরোধ বা দোষ দেখিতে পাই না, কিন্তু বাণভট্টের লেখনী হইতে সম্ভবতঃ ইহার চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও অধিক দৃপ্ত অভিব্যক্তি আশা করা যাইতে পারিত। আবার কাদম্বরীতে প্রেমের যে সকল শারীরিক বিকারের—অনুভাব, হাব, অযত্নজ অলঙ্কারের—প্রাচুর্য, তাহার স্থানে আত্মকথায় মনোবিকারের—লজ্জা, অবহিত্থ, জড়িমার অধিক প্রাচুর্য। এ কথাও আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি উদাহরণ দিয়া এই সব কথা বুঝিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলাম।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তুবরমিলিন্দ এক সমস্যা। বাণভট্ট কাদম্বরীর আরম্ভে

ভর্বুশর্মার স্তুতি করিয়াছেন। ইনি ছিলেন বাণভট্টের গুরু। এই পুস্তকে অবধূত অঘোরভৈরবের প্রতি বাণভট্টের আস্থা অধিক প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, ভর্বুশর্মার প্রতি কম। 'ধাবকে'র বহুৎপত্তি দেখিয়া কোনও কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেন যে, ইনি জাতিতে ধোবা ছিলেন। 'আত্মকথা' এই অনুমানের সমর্থন করে না। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ছোটখাট কিছু কিছু অসঙ্গতি হয়তো বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত আত্মকথার কোনও বিরোধ নাই। বিশেষ লক্ষ্য করিবার কথা আত্মকথার ভৌগোলিক নাম ও স্থান। স্থাণ্বীশ্বর ও চরণাদ্রি দুর্গের নামমাত্র উল্লেখ আছে, কিন্তু ভদ্রেশ্বর দুর্গ ও তাহার সমীপবর্তী স্থানগুলির বর্ণনা আছে যথেষ্ট—ইহার মধ্যে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে।

আত্মকথা হইতে রত্নাবলীর 'জিতমুড়ুপতিনা'—শ্লোক সম্বন্ধে সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইয়া যায়। এই শ্লোক অনেক দিন হইতে পণ্ডিতদের বাগ্বিলাসের বিষয় হইয়া আসিতেছে। এ পর্যন্ত ইহার কোনও ভাল ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় নাই। ব্যাখ্যা কি হইবে তাহা লইয়া ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে দিদির নিকট হইতে এক পত্র পাওয়া গেল। আত্মকথার রহস্য এই পত্রের সাহায্যে কতখানি সমাধান হয়, তাহার উত্তর সহৃদয় বিচারকদের উপর ছাড়িয়া দিই। নিজের মত সংক্ষেপেই বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিব।

"প্রিয় ব্যোম,

ছয় বৎসর ধরিয়া অস্ট্রিয়ার দক্ষিণভাগে নিরাশা ও নিরুদ্যোগের জীবন কাটাইতেছি। তুমি যুদ্ধের সংবাদ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার প্রকৃত নিষ্ঠুর ক্রুর রূপ তুমি দেখ নাই। দেখিলে আমার মত তুমিও মনুষ্যজাতির জয়যাত্রা সম্বন্ধে ভীতিগ্রস্ত হইতে। তুমি যে এই ঘৃণিত নরহত্যা দেখ নাই, ইহা ভালই। এই দৃশ্য ছিল মনুষ্যবধের নয়, মনুষ্যত্ব বধের। আমি ছয় বৎসর পর্যন্ত শ্বাস রুদ্ধ করিয়া এই বৃদ্ধাবস্থায় এ বীভৎস দৃশ্য দেখিতেছিলাম। লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী বালক বালিকার মৃত্যু হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মত বৃদ্ধা কেন বাঁচিল তাহা জানি না। তুমি বাণভট্টের আত্মকথা ছাপাইয়া ভালই করিয়াছ। পুস্তকরূপে না দেখিলেও পত্রিকারূপে মুদ্রিত আত্মকথা দেখিতে পারিয়াছি, ইহা কি কম কথা? এখন আমার দিনগুলি গুণতির মধ্যে। ইহার পূর্বে 'আত্মকথা'র সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ছাপাইও না। আমি আর তোমাদের মধ্যে আসিতে পারিব না। আমি সত্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছি। আমি নির্জন বাসের স্থান বাছিয়া লইয়াছি। এই আমার শেষপত্র। 'আত্মকথা'র বিষয়ে তুমি এক মস্ত ভুল করিয়াছ। তুমি তোমার কথামুখে উহাকে এমনভাবে

দেখাইয়াছ যে উহা যেন এক 'অটোবায়োগ্রাফী'। বা রে! তুমি সংস্কৃত পড়িয়াছ বলিয়া আমার ধারণা ছিল, কিন্তু এ কি অনর্থ করিয়া বসিয়াছ! বাণভট্টের আত্মা শোণ নদের প্রত্যেক বালুকাকণায় বর্তমান। ছিঃ, তুমি কত বড় নির্বোধ, সেই আত্মার ধ্বনি তুমি শুনিতে পাও নাই! দেখ, তুমি পুরুষ, তুমি যুবক, এতখানি প্রমাদ তোমার শোভা পায় না।

সেই হতভাগী বিড়াল শাবকদের এক পল্টন দাঁড় করাইয়াছে। যুদ্ধে এত বোমা পড়িল, কিন্তু এই সব শয়তানের মধ্যে একটাও মারা গেল না। আমি কতদূর সামলাইব? জীবনে একবার যে ভুল হয় সেই ভুলের আর উপায় নাই—তাহা হইয়াই যায়। এই বিড়াল পোষাও একটা ভুলই ছিল। তোমার প্রতি আমার একটা অভিযোগ বরাবরই রহিয়া গিয়াছে। তুমি কথা বুঝিতে পার না। বোকারাম, 'বাণভট্ট' শুধু ভারতেই হয় না। এই নরলোক হইতে কিন্নরলোক পর্যন্ত একই রাগাত্মক হৃদয় প্রসারিত আছে। তুমি কি কখনও তোমার দিদিকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলে! প্রমাদ, আলস্য ও ক্ষিপ্রকারিতা—তিন দোষ হইতে বাঁচ। তোমার দিদি তো প্রত্যহ এই সব কথা বুঝাইতে আসিবে না। জীবনের এক ভুল—এক প্রমাদ—এক অসামঞ্জস্য না জানি কত দিন ধরিয়া দগ্ধ করিতেছে। আমার আশীর্বাদ, তুমি এই সকল হইতে অব্যাহতি পাও। দিদির স্নেহ।—কে."

তাহা হইলে আত্মকথার অর্থ 'অটোবায়োগ্রাফী' মনে করিয়া দিদির বিচারে আমি অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছি! আমার প্রমাদ, আলস্য ও অজ্ঞানের প্রশ্ন যতদূর, ততদূর পর্যন্ত আমার নিজস্ব অধিকার। কিন্তু এই পত্রে তো শুধু এই কথাই নাই। সহৃদয়দেরও কিছুটা প্রাপ্য আছে। মনে পড়িল, দিদি সেদিন খুবই ভাবে অভিভূত ছিলেন। তিনি এক শৃগালের কথা শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ঐ শৃগাল বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। বাণভট্টের সমসাময়িক কোনও জন্তুও কি তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন? শোণ নদের অনন্ত বালুকাকণা হইতে কোন কণাটি না জানি বাণভট্টের আত্মার এই মর্মভেদী আহ্বান দিদিকে শোনাইয়াছিল! হায়, ঐ বৃদ্ধ হৃদয়ে কতখানি পরিতাপ সঞ্চিত ছিল! অস্ট্রিয়বর্ষের যবনকুমারী দেবপুত্রনন্দিনী কি অস্ট্রিয়াদেশবাসিনী দিদি নিজেই? তাঁহার এ কথার অর্থ কি যে 'বাণভট্ট কেবল ভারতেই জন্মায় না'! অস্ট্রিয়ায় যে নবীন বাণভট্টের আবির্ভাব হইয়াছিল তিনি কে ছিলেন? হায়, দিদি কি আমাদের অজ্ঞাত তাঁহার সেই প্রেমিক কবির দৃষ্টি দিয়া নিজেকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন! এ কী রহস্য! দিদি ভিন্ন আর কে এই রহস্য বুঝাইয়া দিবে? আমার মন ঐ বাণভট্টের সন্ধান পাইবার জন্য ব্যাকুল। আমি কেন দিদিকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম না? আমার কিছুটা তো বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু 'জীবনে যে ভুল একবার হয়, তাহা তো হইয়াই যায়!'

পত্রখানি পড়িবার পর আমার মনে এই প্রতিক্রিয়া হইল। যদি আমার অনুমান ঠিক হয় তবে সাহিত্যে ইহা অভিনব প্রয়োগ। মধ্যযুগের কোনও কোনও কবি, কৃষ্ণ তাঁহাতে কি রস পান তাহা জানিবার জন্য রাধিকার উৎকট অভিলাষ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণও রাধিকার দৃষ্টিতে নিজেকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং এইজন্য নবদ্বীপে চৈতন্যমহাপ্রভুর রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে কাব্য ও ধর্মসাধনার যে কল্পনা ছিল তাহা দিদি নিজের জীবনে সত্য করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই কথায় আমার এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব হইয়াছিল। কিন্তু গুণিজনের রসবোধের পথে আমি এই ব্যাখ্যার দ্বারা বাধা সৃষ্টি করিতে চাই না। তাই আমি সাহিত্যিক সমীক্ষার সংকল্প হইতে বিরত হইতেছি। 'আত্মকথা' যেমন ছিল তেমনই তাঁহাদের সম্মুখে রাখিলাম, পরিবর্তন করিলাম না।— বো.